দাম : ৭০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা ১৪৩২
২২ সেপ্টেম্বর,
২০২৫

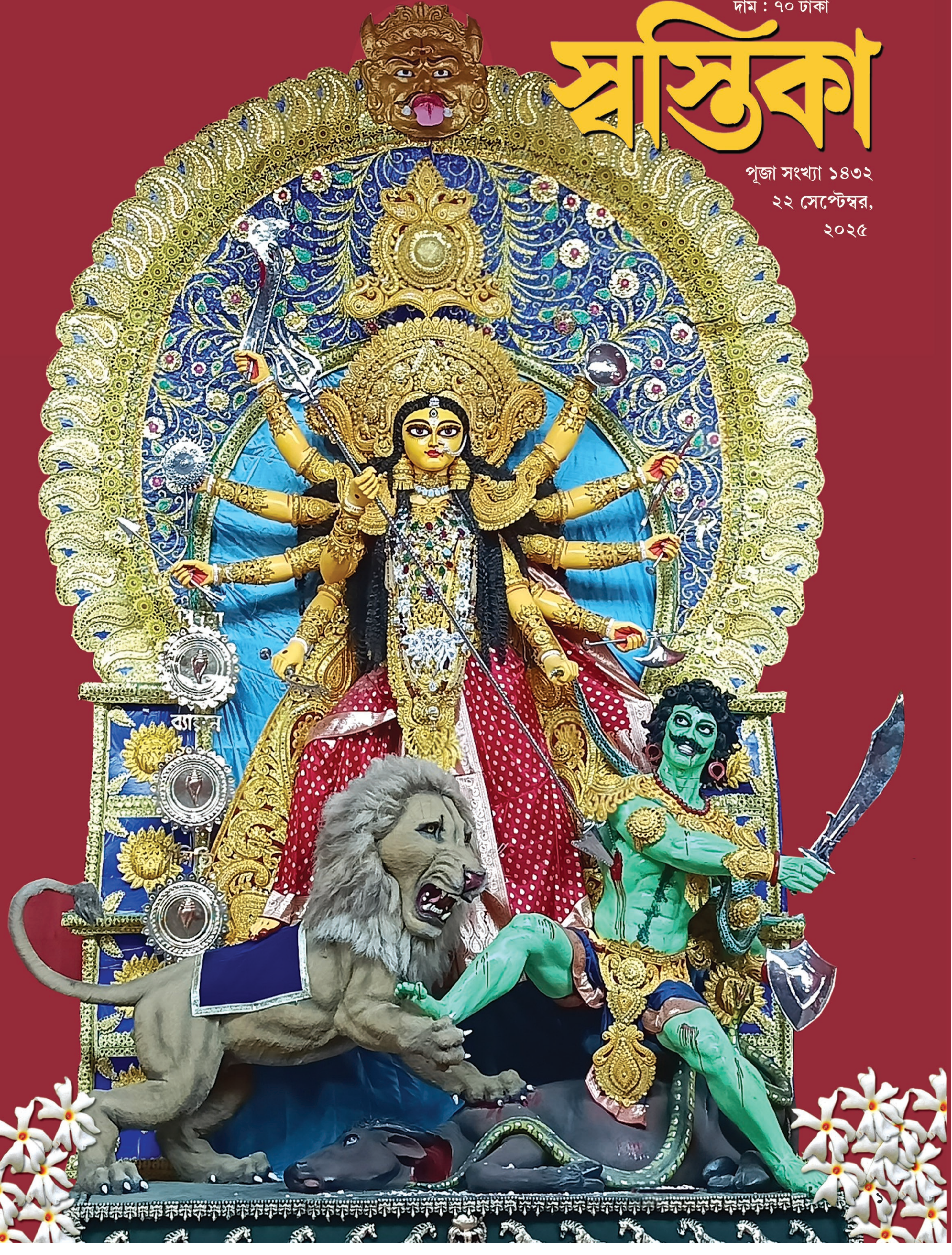

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পূজা সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৫ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২২ সেপ্টেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

দেবীমাহাত্ম্য

নব-নয়নে নবপত্রিকা ও মঙ্গলঘট
স্বামী ত্যাগিবরানন্দ ১৯

উপন্যাস

সেই কাঠের বাড়িটা
প্রবাল ১৬৯

অনির্বাণ হোমশিখা রায়বাঘিনী
নন্দলাল ভট্টাচার্য ১০৩

ভাগ্য বিড়ম্বিত মহাবীর দানবীর কর্ণ
গোপাল চক্রবর্তী ১৯৯

পায়ের তলার মাটি
এষা দে ১৩৩

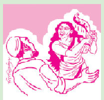

নন্দরানির মুক্তিযুদ্ধ
বাসুদেব ধর ৬৭

গল্প

ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা
সত্যানন্দ গুহ ২৪১

খুড়োমশাই
সিদ্ধার্থ সিংহ ২৪৫

পরিবর্তন
মৌ চৌধুরী ৭৯

গল্প

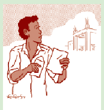
গৌরব
গার্গী দেব ১৯৩

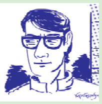
আমেরিকায় জন্ম
দেবদাস কুণ্ডু ৬০

প্রবন্ধ

জনসমাজে বেড়েছে সঙ্ঘের স্বীকৃতি
দত্তাত্রেয় হোসবলে ২৩

শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ
ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ২৭

দুর্গাপূজা বিপ্লবের আগুনে উৎসর্গের যজ্ঞ
ড. রাজলক্ষ্মী বসু ৩৫

ভারতীয় দর্শনে মায়ার স্বরূপ, প্রসঙ্গ ও সমসাময়িকতা
ড. আশিস গিরি ৩৯

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আদিনা মসজিদ-আদিনাথ মন্দির বিতর্ক
বিনয়ভূষণ দাশ ৪৭

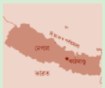
ভারত ও নেপাল গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কে আবদ্ধ
অধ্যাপক উচ্ছল ভদ্র ৫৫

বিবেক আলোকে আলোকিত সুভাষ
ড. পঙ্কজ কুমার রায় ৮৭

প্রবন্ধ

বঙ্গদেশে শক্তি সাধনায় অগ্রগণ্য সাধক পূর্ণানন্দ গিরি
প্রবীর ভট্টাচার্য্য ৯৩

রেনেসাঁসের বঙ্গে হিন্দুত্বের চেতনা
অর্ণব নাগ ১২৩

সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বিষয়ে শিশির বসুর গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর
ডা: মধুসূদন পাল ১৫৩

টেরর স্টেট পাকিস্তানের এটাই এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ইমেজ
সুজিত রায় ১৫৯

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের প্রাসঙ্গিকতা
ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ১৮৩

চলচ্চিত্র পর্যালোচনা

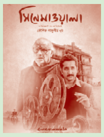

প্রেক্ষাগৃহহীন বাংলা ছবি
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫

নবাঙ্কুর

পাতালপুরীর রহস্য
অজয় ভট্টাচার্য ২৫১

শেক্সপিয়রের বরপুত্র
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ২৫৩

নব-নয়নে নবপত্রিকা ও মঙ্গলঘট

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ

বর্ষার অবসানে ও শরতের সমাগমে জীবের কল্যাণে মহাশক্তি জননীরূপ ধারণ করে নেমে আসেন এই ধরাধামে। সকল শ্রেণীর (Class) ও সকল পর্বের (Phylum) খাদ্য ও ঔষধি গুণসম্পন্ন নয়টি উদ্ভিদ যথা—হলুদ, ধান, কলা, কচু, দাড়িম, মানকচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী প্রভৃতি সমাবিষ্ট হয়ে অপরাজিতার ফিতায় মাথা বেঁধে 'শাকম্ভরী শতাক্ষী যা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা'– (শ্রীশ্রীচণ্ডী) 'শাকম্ভরী' নামটি নিয়ে নববধূটি সেজে গণপতির পাশে দাঁড়িয়ে মহাযজ্ঞের সূচনা করেন। নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে বিরাটেরই পূজা। এই পূজা মূলত একবীজ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, দুর্বল ও সবল কাণ্ডযুক্ত একাধিক ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সমাহার যুক্ত বনজ সম্পদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং মানব স্বীকৃতির উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। আমরা সকলেই জানি যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে

মাতৃগর্ভের প্লাসেন্টা নামক স্থানে। সেইরূপ দেবতাদেরও প্রথম আহ্বান করা হয় মঙ্গলঘটরূপ প্লাসেন্টায়। 'ঘট' মঙ্গল কেন? খুব সহজ এর উত্তর। এই দেহঘটটি দিয়েই মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তাই, দেহরূপ ঘটরূপ মন্দিরটি রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘট স্থাপনের বিশেষত্ব কী? শিশু মাতৃভূমি স্পর্শ করার আগে যেমন সেই স্থানটিকে যেমন জীবাণুনাশক ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ রাখা হয়, সেইরূপ ঘট স্থাপনের পূর্বে বেদীটিকেও শোধন করা হয়। বেদী শোধন মন্ত্রটি হলো ঃ 'ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপআপ্যতে প্রণীতোঅগ্নিরগ্নিনা।।' প্রথমে শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিক্ষেপ করে তার উপর ধোওয়া সুলক্ষণযুক্ত ঘট এবং সেই ঘটে দক্ষ্যক্ষত দিয়ে শুদ্ধজলপূর্ণ করে তার কণ্ঠে আচারাৎ লাল সূতা ও আলতা দিতে হয়। মধ্যে পঞ্চপল্লব (যথা—আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞীয়ডুম্বর শাখা), অভাবে কেবল আম্রপল্লব, তা যদি না থাকে তৎপরিবর্তে পান দেওয়া। এরপর একসরা চালে একটা হরীতকী, কিংবা সুপারি দিয়ে তদুপরি একটি নির্দোষ সশীর্ষ ফল ডাব বা কলা দেওয়া হয় (যেহেতু ডাব বা নারিকেল ও কলা একই ফ্যামিলির Palme'র অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু নারিকেল বা কলা বেছে নেওয়া হয়)। সেই ফলকে সিঁদুররঞ্জিত করে ও ঘটের গায়ে একটা সিঁদুরপুত্তলিকা অঙ্কন করে, পঞ্চরত্ন, ঘটের গলায় দুটি কাপড় বা গামছা দিয়ে আবৃত করতে হয়। এরপর ঘটটি জলপূর্ণ করা হয়। কারণ, জলই জীবন বা প্রাণ। জলে তাই প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা। মৃত্তিকার উপর পঞ্চশস্যাদি, পুষ্প ও অখণ্ড ফল দিয়ে সিঁদুরাঙ্কিত করে নববস্ত্রদ্বারা তা আবৃত করা কর্তব্য। দেবতা ঐশ্বর্যময়। তিনিই (মহাশক্তি 'সুপার-ভয়েড্') সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি-মুক্তিদাতা। সুতরাং, তিনিই পূর্ণতা বা সিদ্ধির কারণ। ঘট হৃদয়গুহার অনুকল্প। হৃদয়গুহা অবলম্বন করেই পূজা করার বিধান। ধ্যান ও মানসপূজায় আছে ঃ'হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং সদসদখিলভেদা- তীতমেকস্বরূপম্। প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং বিমলপরমহংস......ইত্যাদি।।' সুতরাং সম্মুখে স্থাপিত ঘটটি পূজকের হৃদয় গুহারই প্রতিরূপ। এই তত্ত্বটি অনুভব করতে না পারলে পূজায় সফলতা আসে না। দেবতাদির সামনের যে ঘটটি থাকে সেটি মূলত পূজকের হৃদয়েই প্রতীকরূপে প্রতিবিম্বিত। হৃদয় যেহেতু অনুভবের স্থান, সেহেতু সামনের ঘটটিকে হৃদ্‌স্বরূপই অনুভবতত্ত্ব। মঙ্গলঘটের মুখে যে পঞ্চপল্লব (আম, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞীয়ডুম্বরশাখা) পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতীক, পঞ্চধাতু (সোনা, রুপা, তামা, লোহা, দস্তা) হলো পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতীক এবং ঘটের নিম্নভাগে যে পঞ্চশস্য (ধান, গম, যব, তিল, ডাল) নিক্ষেপ করা হয় তা হলো পঞ্চতন্মাত্রের প্রতীক। এছাড়া মন, বুদ্ধি, (চিত্ত ও অহংকার) এই সপ্তদশ অবয়ব নিয়েই সূক্ষ্মশরীর। ঘটের গায়ে সিঁদুরমূর্তি সূক্ষ্মদেহেরই প্রতিরূপ। দেবতাপূজায় সূক্ষ্মদেহের অনুভবই বিশেষ প্রয়োজনীয়। হৃদয় থেকেই দেবশক্তির আবির্ভাব হয়। যতক্ষণ দেবতার উদ্দেশে অর্পিত পত্র পুষ্প প্রভৃতি উপচার স্বকীয় হৃদয়স্পর্শের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে না পারে, ততক্ষণ বুঝতে হবে—যথার্থরূপে ঘটস্থাপন হয়নি। এই কারণশরীরে লীন হয়। তখন কারণাতীত ক্ষেত্রের দিকে অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার দিকে নিপতিত হয়। এভাবেই জীব আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। তাই সিঁদুরবিন্দু মূলত সূক্ষ্মদেহেরই প্রতীকচিহ্ন।

সেই ঋগ্বেদীয় যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মঙ্গলঘট ও ডাব মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসাবে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে বিশেষ সমাদর লাভ করে এসেছে। বৈদিক সোম-ঘটের নামানুসারে এই ঘটের নাম 'মহিমা'। বেদে আছে ঃ 'যজ্ঞো বৈ মহিমা' (যজু, ৩১।১৬, শ, ব্রা. ১০।২।২।) 'মহিমা' বা মঙ্গলঘট আসলে সূর্যেরই প্রতীক। বৈদিক যজ্ঞে যে তিনটি ঘটের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো একই সূর্যের তিনটি বিবর্তিত অবস্থামাত্র। সূর্যের তিন বিবর্তিত রূপ হলো প্রাতঃসূর্য যার দেবী সরস্বতী। মধ্যাহ্ন সূর্য যার দেবী দুর্গা এবং সায়ং সূর্য যার দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মাকেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা পরবর্তীকালে ত্রিরত্ন বা ত্রিশক্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তারই প্রতিরূপ ঘটত্রয়। এই ত্রিশক্তিই মাতৃকারূপে পূজিতা হন মঙ্গলঘটে। যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাই আমরা এই তিনটি ঘটের সহাবস্থান দেখতে পাই। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে দুটো এবং মূল অনুষ্ঠান কেন্দ্রে পূজকের সামনে একটা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ঘট বা পুণ্যকলস সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মাতৃকারূপে পূজিতা হন। বৈদিক সাহিত্যে অস্ফুট মাতৃকা শক্তিই বিভিন্ন পুরাণে অলৌকিক বিভায় ও ব্যাপ্তিতে বিবাসিতা হয়েছেন। ত্রিশক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরই প্রতীক বলেই এই ঘট মঙ্গলঘট নামে পরিচিত। যার ঊর্ধ্বাঙ্গে ব্রহ্মা, গলদেশে মহেশ্বর, মূলে বিষ্ণু, মধ্যে মাতৃগণ এবং চতুর্দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত। এই ত্রিশক্তিরই প্রতিভূরূপে প্রণব মন্ত্র অর্থাৎ ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক হিসেবে ঘটের গায়ে আঁকা থাকে। ঘটে তাই দেব দেবীর আবাহন করে কৃতাঞ্জলি পূর্বক পাঠ্য করা হয় ঃ 'ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব/দেবী গণৈঃ সহ।।' সুতরাং, ঘট দেবশক্তিরই প্রতীক বলেই তা মঙ্গলময়ের চিহ্ন।

ঘটের উপরে ডাব বা নারকেল দেওয়ার কারণ হলো—আমাদের উত্তমাঙ্গ বা মস্তক হলো জ্ঞানশক্তির বা বুদ্ধিশক্তির উৎপত্তিস্থল বা স্নায়ুতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির স্থান যেহেতু মাথা, সেহেতু মাথার প্রতীক হিসেবে 'ডাব' ঘটের উপরে থাকাই স্বাভাবিক। আবার, পুরাণকারের মতে ব্রহ্মা যেহেতু প্রথম বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিলেন, সেহেতু, ব্রহ্মার প্রতীক হিসেবে ডাবের স্থান ঘটের উপরে থাকাই যথার্থ। ডাব বা নারিকেল বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়। হৃদয়ের সকল ভাব জ্ঞানেই প্রস্ফুটিত হয়। জ্ঞানশূন্য ভাব স্নায়বিক উত্তেজনামাত্র। সুতরাং ডাব ছাড়া ঘট

কেবল মস্তকহীন দেহ মাত্র। যোগের দিকে বিচার করলেও ডাব ঘটের উপরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, মাথা জ্ঞানশক্তির প্রতীক বলে মাথা দেহের উপরেই বিদ্যমান। আবার, মণিপুর ও আজ্ঞাচক্রের মাঝে অনাহত চক্র এখানেই হৃদয়ের অবস্থান বা আবেগের স্থান, এই হৃদয়েই ভক্তির আবেগ উদ্বেলিত ও অনুভূত হয়। (নাভির নীচে) মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান চক্র। এই স্থান কেবল অসুরদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় সেখানে দেবতারা প্রবেশ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাই পূজকের মন সর্বদা অনাহত থেকে মস্তক মধ্যে সহস্যদ্বারে থাকা উচিত। এই পথে মন রাখাই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির সাধনার উত্তরণের পথ। এইভাবে পূজক ক্রমে দেবভাবে পূর্ণ হয়ে পরম সত্যলাভ করেন। কোনো স্থানে ডাবের পরিবর্তে 'নারকেল' দেওয়া হয়। নারকেলের অগ্রভাগে তিনটি ছিদ্র ত্র্যম্বকেশ্বর রুদ্রেরই ত্রিনেত্রের প্রতীক হিসেবে ধরা হয় বলেই নারকেলের স্থানও ঘটের উপরে। আবার, কৈলাসপতির বাস যেহেতু হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে সেই হিসাবে তাঁর স্থানও ঘটের উপরেই। পশ্চিম ভারতে রাখিপূর্ণিমার দিন 'নারকেল-পূর্ণিমা উৎসব' সমাদরে পালিত হয়। বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে নারকেল সমুদ্রে নিবেদন করে গৃহস্থরা পুণ্যার্জন করেন। তাই, প্রতীক হিসাবে নারকেল নির্বাচন মঙ্গলময়।

এছাড়া যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে মঙ্গলঘটে নারকেল নিবেদনের একটা বিশেষত্ব আছে। তা হলো---নারকেলের ভিতরের জল কামনা-বাসনার প্রতীক এবং তার কঠিন-আবরণ (খোলা) অহংকারের প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। তাই যে কোনো অধ্যাত্ম পিপাসু ঘটের উপরের এই নারকেল থেকে এই শিক্ষা নেবেন যে, যদি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে চান তাহলে সর্বাগ্রে তাকেও অহংকারের প্রতীকরূপ নারকেলের শক্ত খোলটাকে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির আধার মাথাটাকে ভাঙতে হবে এবং অন্তরে জমে থাকা কামনা-বাসনারূপী ভালো-মন্দ, পাপ- পুণ্য শুভাশুভ কর্মের ঘোলা জল গিরীশ ঘোষের মতো ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে হবে। এইরূপ শরণাগত হলেই মঙ্গলময়ের অমৃত-প্রসাদরূপে নারকেলের শাঁসালো মিষ্টি শাঁস প্রাপ্তি হবে। সুতরাং সেই অমৃত (ভগবতামৃত) আস্বাদন করতে হলে সর্বাগ্রে অহংকাররূপী মাথাটাকে ভাঙতে শিখতে হবে। নারকেলের খোলরূপী অহংকার ভাঙলে বাসনারূপ জল বেরিয়ে গেলেই অমৃত শাঁসের আস্বাদ (ভগবৎ আনন্দ) পাওয়া যাবে। তাই, নারকেল আমাদের অহং নাশের প্রতীক। সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলেও ডাব বা নারকেলের অনেক গুণ। স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ডাব খুবই উপকারী। ডাবের জলে থাকে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি মিলারেল যা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। এছাড়া সেই জল মূত্রাশয়ের সমস্যা মুক্ত করে, অন্ত্রে ও পাকস্থলির কৃমি নাশ করতে, কিডনির পাথর গলাতে, বমি রোধ করতে, রক্ত পরিশ্রুত করতে এবং এইচআইভি, ফ্লু প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং ডাব আমাদের মাথার মণি। তাই ঘটের উপরে থাকাই বিধেয়। বৌদ্ধিক কিংবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, জ্ঞান ক্রমবিকশিত বা ক্রমবিবর্তিত হয়েই শ্রেষ্ঠত্বের আসন গ্রহণ করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে। সুতরাং জ্ঞানশক্তির স্থান ও সম্মান যেহেতু সমাজের উপরে, সেহেতু তারই প্রতীক ডাবও থাকবে কলসের উপরে। জ্ঞানশক্তির স্থান সর্বোচ্চে। আমরা যেমন গুরুজনদের প্রণাম করে প্রায়ই বলে থাকি যে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন, কখনই বলি না যে আমার হৃদয়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন। এর কারণ, জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির স্থান মাথাতেই। অন্ধকারকে নিঃশেষে দূর করে বহ্নিশিখার গতি যেমন সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী, ঘটমস্তকে সুশোভিত সশীর্ষ নারকেলও তেমনি জ্ঞানাগ্নির বা জ্ঞানশক্তির প্রতীক হিসাবে ঊর্ধ্বমুখী। উপনিষদেও সেকথা বলা হয়েছে, 'তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ। স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোহক্ষরঃ পরমঃ স্মরাট্।।'— (তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১০।।১১-১২)। —পরমাত্মা বিশেষরূপে যেন শিরে প্রকটিত। সুতরাং, ডাব ও শিষ জ্ঞানশক্তিরই প্রতীক হিসাবে শীর্ষে থাকাই যুক্তযুক্ত।

ঘটের গায়ে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা থাকার কারণ হলো—ঘট বা ডাবের গায়ে আঁকা স্বস্তিক চিহ্ন মূলত সূর্য বা বিষ্ণুর চক্রের প্রতীক হিসাবেই পূজিত হয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের কেন্দ্রস্থলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং অবস্থান করে সংসারী জীবকুলকে সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে নিয়ত রক্ষা করেন বলেই মঙ্গলঘট স্থাপন বিধেয়। আর এই চক্র (স্বস্তিক) বিশ্বের সকল জাতিরই সুপ্রাচীন প্রতীক ও কল্যাণমূর্তির পরিচায়ক। স্বস্তিকের তিনটি রূপ থাকে, তা হলো— দক্ষিণাবর্ত, বামবর্ত ও নন্দ্যবর্ত। এই তিনরূপ হলো বিভিন্ন ভাব, ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের নির্দেশক ও প্রকাশক। বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত এই সুপ্রাচীন স্বস্তিক পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদের 'ক্রুশ' বা 'ক্রশ'-এ বির্বতিত হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। অতএব স্বস্তিক চিহ্ন মঙ্গলেরই প্রতীক হিসেবে পূজিত। সেজন্য বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, বিচার-সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে স্বস্তিক চিহ্ন মঙ্গলেরই চিহ্ন হিসেবেই ঘটে, ডাবে বা দেওয়ালে অঙ্কিত করা হয়। যে ঘট এত মঙ্গলময় সেই ঘটকে কীরূপে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব? সত্যি কথাই যে ঘট স্থাপনা করে সংসারে নানা বাধাবিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি তাকে বিসর্জন দিতে কার মন চায়? আসলে, সাধক যখন গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর অতিক্রম করেন, তখনই সাধক এই তিন শরীরের প্রত্যেক তত্ত্বে আপনার জীবন্ত ইষ্টবিগ্রহকে লীলারত দেখতে পান। তখন আর কোনো বাহ্য প্রতীকের প্রয়োজন হয় না। তাই এই মঙ্গলঘট বিসর্জন মঙ্গলেরই কারণ।

।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

(লেখক সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কৈলাসর, ত্রিপুরা)

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

QMS ISO 9001 Approved Company
JAS-ANZ

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

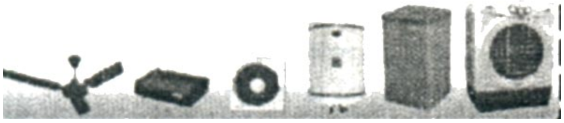

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

জনসমাজে বেড়েছে সঙ্ঘের স্বীকৃতি

দত্তাত্রেয় হোসবলে

সঙ্ঘের কাজ শতবর্ষ পূর্তির পথে। এই অবস্থায় সাধারণ জনমানসে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সঙ্ঘ এই সময়কালকে কী দৃষ্টিতে দেখবে। সঙ্ঘ স্থাপনার সময় থেকেই এটা স্পষ্ট যে, এই সময়কালকে কেবলমাত্র উৎসব পালনের দৃষ্টিতে না দেখে আত্মনিরীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখা বা নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি পুনরায় সমর্পিত হওয়ার কথা ভাবা দরকার। তার সঙ্গে সেইসময় সমগ্র আন্দোলনকে যারা পরিচালিত করেছেন সেই সমস্ত মহামানব এবং নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে যুক্ত হওয়া স্বয়ংসেবক বা তাদের পরিবারবর্গকে স্মরণ করার সময়।

গত ১০০ বছরের এই যাত্রাকে ফিরে দেখার এবং বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধিসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ একমুখী ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংকল্প নেওয়ার জন্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মজয়ন্তী ছাড়া অন্য কোনো

ক্ষণের কথা ভাবাই যায় না, যা কিনা হিন্দু ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন বর্ষপ্রতিপদ। ডাঃ হেডগেওয়ার ছিলেন জন্মজাত দেশভক্ত। ভারতমাতার প্রতি অগাধ ভালবাসা ও শুদ্ধসমর্পণ ভাব বাল্যকাল থেকেই তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে দেখা গেছে। কলকাতা শহরে ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সবরকম আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন, এমনকী সত্যাগ্রহও করেছেন। ডাঃ হেডগেওয়ার, যাঁকে সবাই ডাক্তারজী বলে জানে, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সবরকম প্রচেষ্টাকে সম্মান করতেন এবং কোনো একটি বিশেষ প্রচেষ্টাকে দুর্বল ভাবতেন না।

এসবের মধ্যে সমাজ পরিবর্তন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ চর্চার মূল বিষয় ছিল। একজন যুবক এমন একটা সময়ে ডাক্তার হয়েও সামাজিক সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন যখন আমরা সকলে বিদেশি শাসনে আবদ্ধ। সেই সঙ্গে তিনি সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান করার কথাও নিশ্চিত করেন। তিনি অনুভব করেন, দৈনন্দিন সমাজজীবনে দেশভক্তির অভাব, সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় চেতনার ঘাটতি। যার ফলে সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ পাচ্ছে। সামাজিক অনুশাসন কমে যাওয়ায় বিদেশি আক্রমণকারীদের অবস্থান শক্ত হয়েছে। এটাও অনুভব করলেন যে, দেশের জনগণ বিদেশিদের দাসত্ব করতে গিয়ে নিজেদের দেশের গৌরবপূর্ণ ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। এই কারণে ওইসমস্ত লোকের মনে নিজেদের সংস্কৃতি ও জ্ঞানপরম্পরা বিষয়ে হীন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে কিছু লোকের নেতৃত্বে এবং কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের মতো প্রাচীন রাষ্ট্রের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য তিনি এমন এক পদ্ধতি সমাজের সামনে রাখলেন যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনকে অতিক্রম করে এক দূরগামী ভাবনাচিন্তার পরিণাম দেখতে পেলাম শাখা রূপী সঙ্ঘের এক অভিনব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অপরকে কীভাবে উৎসাহিত করা যায় তার জন্য ডাক্তারজী সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন তৈরি না করে সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করার এই কার্যপদ্ধতি নির্মাণ করেন।

আজ শতবর্ষ পরেও হাজার হাজার যুবক ডাক্তারজীর প্রদর্শিত পথে চলছেন এবং তারা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নিজের সর্বস্ব অর্পণ করতে প্রস্তুত। শতবর্ষের যাত্রাপথে সমাজে সঙ্ঘের স্বীকৃতি যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রত্যাশাও বেড়েছে। এ সমস্তই ডাক্তারজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যপদ্ধতিকে সামাজিক স্বীকৃতির ইঙ্গিত। এই চলমান দর্শনের নিত্যনতূন বিকাশ যে কোনো অপূর্ব কৌশলের চেয়ে কম নয়।

With Best Compliments From -

GURDEV SHARMA
(DEVI)

Cashier BJP Punjab & Incharge Central Constituency Ludhiana
689, Issa Nagri Puli, Ludhiana - 141 008
(Punjab) India

হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রীয় ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ কাজ নয়। কারণ ওই সময় অধিকাংশ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকে ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। যা ছিল তা ইউরোপীয় ধারণায় সংকীর্ণতা ও দেশবিরোধী মনোভাবে পূর্ণ। ডাক্তারজী কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত সবার সামনে উপস্থাপন না করে এক সরল কার্যপদ্ধতি চালু করেন যা এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এক পথপ্রদর্শক শক্তি হিসাবে প্রতীয়মান। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই ভারতের প্রতিটি প্রান্তে সঙ্ঘের কাজ পৌঁছে যায়।

যখন আমরা স্বাধীনতা পেলাম, দুর্ভাগ্যবশত সেই সঙ্গে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে গেল। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সদ্যসৃষ্ট পাকিস্তানের বিভাজনজনিত হিংসার মোকাবিলা এবং উদ্বাস্তু হিন্দুদের সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে পুনর্স্থাপিত করার জন্য নিজেদেরকে উজাড় করে দেয়। সংগঠনের জন্য সংগঠন—এই মন্ত্র রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠনাত্মক শক্তি সঞ্চারিত করতে সাহায্য করেছে।

স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে মূলধারণা হলো সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে ওতপ্রোত থাকা, যা কিনা শিক্ষা থেকে শুরু করে শ্রম ও রাজনীতির মতো ক্ষেত্রেও নিজেদের দিশা ঠিক রাখতে পারে। সবকিছুই রাষ্ট্রীয় চিন্তনের উপর ভিত্তি করে পুনর্স্থাপিত হওয়া চাই। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) ওই সময়ের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। ভারত এক প্রাচীন সভ্যতা, যার দ্বারা নিজস্ব আধ্যাত্মিক পরম্পরার ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণে রত। ভারতের কল্যাণ যদি এই একাত্ম ও সার্বজনিক সদ্ভাবনাপ্রসূত হয় তাহলে ভারতীয়দের এই লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এজন্যই শ্রীগুরুজী এক মজবুত মতাদর্শ সবার সামনে রাখেন।

হিন্দুসমাজের পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ তখনই গতি পেল যখন ভারতের সমস্ত মত-পথের সাধুসন্তদের থেকে ঘোষণা করা হলো, সমাজে কোনো প্রকারের ভেদভাব ধর্মীয় মান্যতা পাবে না। জরুরি অবস্থার সময় যখন সংবিধানের উপর জঘন্য আঘাত আসে, সেসময় গণতন্ত্র যথাবৎ রাখার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালানোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওই সময় স্বয়ংসেবকরা শাখায় যাওয়ার পরিবর্তে সমাজের সজ্জনশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেবা কাজে মন দেন। সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার ফলে গত ৯৯ বছর ধরে তার উল্লেখযোগ্য প্রগতি দেখা গেছে। শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের মতো বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ভারতের সব ক্ষেত্রকে মত-পথ নির্বিশেষে সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। জাতীয় সুরক্ষা থেকে সীমান্ত সুরক্ষা, প্রশাসনে অংশগ্রহণ থেকে গ্রামীণ বিকাশ পর্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো অংশই স্বয়ংসেবকদের অধরা ছিল না। আনন্দের কথা যে, এই ব্যবস্থা পরিবর্তনে অংশ নেওয়ার জন্য সমগ্র সমাজ নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে।

আজকাল সকলে যে কোনো বিষয়কে রাজনীতির চশমা দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। এই রকম পরিস্থিতিতেও সঙ্ঘ সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং সঠিক চিন্তনকারী লোক ও সংগঠনকে এক মজবুত পরিকাঠামোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করে চলেছে। সামাজিক পরিবর্তনে এবং পরিবার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার কাজে মাতৃশক্তির অগ্রণী ভূমিকার বিষয়ে গত কয়েক বছর ধরে সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যখন লোকমাতা অহল্যাবাঈ হোলকারের ত্রিশতাব্দী জন্মজয়ন্তী পালন করার আহ্বান করা হয়, তখন প্রায় ১০ হাজার স্থানে কার্যক্রম আয়োজিত হয় এবং তাতে ২৭ লক্ষের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এর থেকে প্রমাণ হয়, আমরা যেকোনো জাতীয় উৎসবকে কীভাবে সমাজকে সঙ্গে নিয়ে পালন করে থাকি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘ যখন নিজস্ব গতিতে শতবর্ষে প্রবেশ করেছে, তখন রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য ব্যক্তি নির্মাণ এবং গ্রাম ও খণ্ডস্তর পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এই উপলক্ষ্যে গত এক বছর সুপরিকল্পিত যোজনা এবং তার ক্রিয়ান্বয়নের মাধ্যমে ১০ হাজার শাখা বৃদ্ধি হয়েছে। স্বয়ংসেবকদের সংকল্প সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতিটি গ্রাম ও বসতি পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্য এখনো অনেক বাকি কিন্তু তার জন্য আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন।

আগামীদিনে সঙ্ঘকার্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পঞ্চ পরিবর্তন অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের স্বকীয় কার্যক্রম রাখা হয়েছে। শাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘ কয়েকটি বিষয় নাগরিক কর্তব্যবোধ, সামাজিক সমরসতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং 'স্ব'- এর ভাবনা জাগ্রত করা—যাতে মাতৃভূমিকে পরম বৈভবে নিয়ে যেতে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু না কিছু যোগদান থাকে।

গত ১০০ বছরে সঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণ কেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের নানা স্তর যেমন উপেক্ষা, উপহাস, আগ্রহ পেরিয়ে বর্তমানে স্বীকৃতি পর্যায়ে পৌঁছেছে। সঙ্ঘ কারও প্রতি বিরোধিতা করায় বিশ্বাসী নয়। আমাদের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি সঙ্ঘকাজে বাধা দিয়েছেন তিনিও একদিন না একদিন রাষ্ট্রনির্মাণের পবিত্র কাজে সঙ্ঘের সঙ্গে সহযোগী হবেন।

এরকম সময়ে যখন সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিংসাজনিত সংঘর্ষের মোকাবিলা করছে, তখন ভারতের প্রাচীন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সমাধান হিসেবে নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে। এই বিশাল তথা অপরিহার্য কর্মকাণ্ড তখনই সম্ভব, যখন ভারতমাতার প্রত্যেক সন্তান নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন এবং এমন এক রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্মাণের কাজে অংশ নেবেন, যা দেখে বাকিরা কাজ করার প্রেরণা পাবেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে সজ্জনশক্তির নেতৃত্বে সমগ্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বের সামনে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংগঠিত ভারতের আদর্শ প্রস্তুত করার সংকল্প নিই।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

With Best Compliments from-

KOHINOOR INDIA (P) LIMITED

Basti Bawa Khel, Kapurthala Road,
Jalandhar - 21 (Pb.) India
Phone : (O) 3050052, 3050057, 3050066
Fax : +91-181-3050014
E-mail : nipun@kohinooronline.com
Web : www.kohinooronline.com

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Manufacters & Exporters of :

CYCLE PARTS & AIMEX BRAND ALLEN BOLTS-NUTS, GRUB SCREW & TURNING PARTS

B-6, Textile Colony, Industrial Area A, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, 4652326
e-mail : anoopam_met@hotmail.com, www.anoopammetal.com

শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ

ড. বাপ্পাদিত্য মইতি

উপনিষদ ভারতীয় জীবনধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদ প্রভাবিত। কৌষীতকি উপনিষদে বলা হয়েছে, ''যদৈবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈবিরেব প্রাণৈ: সহ পুত্রমাবিশতি। এবং বিৎ যদা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি তথা স: এভি: এব প্রাণৈ: সহ পুত্রমাবিশতি।'' অর্থাৎ পিতার মৃত্যুকাল সমাসন্ন হলে নববস্ত্র ও মাল্যভূষিত হয়ে পুত্র তাঁর মুখোমুখি হন। পিতা তাঁর বাক্, মন ও প্রাণের সাহায্যে পুত্রে অনুপ্রবিষ্ট হন। অস্যার্থে পিতা তাঁর গুণাবলী পুত্রকে সমর্পণ করেন। কথাগুলো এজন্য বলা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহস, ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে পুত্র শ্যামাপ্রসাদেই সর্বোত্তম রূপ নিয়েছিলেন। আশুতোষ ছিলেন বিপুল বপু ও শক্তির উৎস। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা থেকে 'বাঙ্গলার বাঘ' অভিধা সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বলদর্পী সাহসী ফরাসি প্রেসিডেন্ট তাঁর সুবিখ্যাত গোঁফের জন্য ফরাসি শার্দুল বলে বিবেচিত হতেন।

ফরাসি রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে চওড়া গোঁফের পৌরুষদীপ্ত আশুতোষের তুলনা করে অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁকে 'বাঙ্গলার বাঘ' বলে অভিহিত করে। মননশীল নাগরিক পটভূমিতে স্বচ্ছন্দ আশুতোষের মতো শ্যামাপ্রসাদও ছিলেন বিপুল বপু ও শক্তির উৎস। আশুতোষ আইন নিয়ে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে যোগ দিলেন। ১৯০৭ সালে উপাচার্য হিসেবে প্রথম সমাবর্তনে আশুতোষের উচ্চারিত কথাগুলো বিষিয়ে যাওয়া এ যুগে খুব প্রাসঙ্গিক ''Sound education should be imported and discipline should be enforced in all schools.'' কৃতবিদ্য আশুতোষ নব-নালন্দা তৈরি করতে চাইলেন জ্ঞানের জগতের উৎকৃষ্টদের সসম্মানে নিয়ে এসে। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বিপুল দানের উপর নির্ভর করে সার্কুলার রোডে তৈরি হলো ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স। রসায়নে অধ্যাপনার জন্য এলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পদার্থবিদ্যায় স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন। আশুতোষের অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। নিয়ে এলেন দীনেশচন্দ্র সেনকে। বাংলাভাষায় অভিসন্দর্ভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা তাঁরই সময়। মায়ের নামে যে 'জগত্তারিণী পদক'-এর ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশে প্রদত্ত হয় আজও। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বও কিছু সময়ের জন্য বাংলা বিষয়ের হেড একজামিনার হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে আসেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো জ্ঞানতাপসেরা।

তিনি চিনতেন প্রতিভার দ্যুতি। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে যিনি জগদ্বিখ্যাত হবেন সেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন এম.এ পাশ করেন, তখন আশুতোষ তাঁকে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলেন। সুনীতিকুমার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— ''সবে পাশ করেছি আর একেবারে এমএ ক্লাসে পড়াতে হবে। আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, পারব কি? তিনি অমনি একটা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, পারবে না কেন? যেটুকু পড়েছ সেটুকু তো ভালো করেই পড়েছ। তবে আর ভয় কীসের? সেইদিন তাঁর কাছে ওইরকম উৎসাহ পেয়েই তো অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলাম।''

১৯২৪ সালে আশুতোষের অকালপ্রয়াণ ঘটলে পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য হন। প্রায় এক দশক পরে ১৯৩৪ এর ১৯ জুলাই শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে তৎকালীন উপাচার্য হাসান সুরাবর্দির স্থলাভিষিক্ত হলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পিতা আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা চর্চায় গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে উপাচার্য হিসেবে সমাবর্তনে তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। অবশ্য মাতৃভাষার প্রচলনের জন্য আরও বেশ কিছু বছর আশুতোষকে অপেক্ষা করতে হয়। ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি বাংলাভাষার মর্যাদাকে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছিল। ১৯১৯-এ স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ও অঙ্ক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে বাংলাতে পাঠদানের কথা বলা হয়। দ্বিতীয়বার উপাচার্য হবার পর তাঁরই উদ্যোগে ১৯২১—২২ সালে ইংরেজি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে বাংলাতে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ উপাচার্য হয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দিলেন। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ সেনেট সদস্যদের সামনে পিতা আশুতোষের অবদানের কথা স্মরণ করে কম্বুকণ্ঠে আবেদন করেন ''Let no recall today the great idealism which was behind the scheme. When it was first brought forward in 1921 and let us declare that the time has come to bring the long and heated controversy to an end. Let us no falter, but let us go forward looking ahead to the time when our mother tongue will be the medium not only fo our Matriculation examination but also of the highest examination of the university.''

শ্যামাপ্রসাদ ঋজু—দেহে ও মনে। ব্রিটিশ রাজত্বে দাঁড়িয়েও তিনি উন্নতশীর্ষ। ১৯২৮-এ হুতাত্মা যতীন দাসের মরদেহ নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করে। কিছু পরে ১৯৩০-এ গাড়োয়ানরা ধর্মঘট করলে ছাত্রেরা আবার সমর্থন ব্যক্ত করে। এসময় পুলিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে খানাতল্লাশি চালালে শ্যামাপ্রসাদ বিধান পরিষদে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমালোচনা করেন। পুলিসও ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়।

উপাচার্য হিসেবে তিনি বৃত্তিশিক্ষা ও শারীরচর্চাকে পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। ছাত্রীদের জন্য সেলাই, গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁর পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মাতৃভাষার উন্নতিতে সবিশেষ জোর দিয়ে জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের বই প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের কথা', সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক', অসিত হালদারের 'ভারতীয় শিল্পকলা' ইত্যাদি বিষয়ক বই প্রকাশিত হয়।

ছাত্রবন্ধু ছিলেন তিনি সর্বাগ্রে। স্বল্পমূল্যে ছাত্ররা যাতে চিকিৎসার সুযোগ পায়, সেজন্য ছাত্রকল্যাণ দপ্তর খোলেন। ঢাকুরিয়াতে রোয়িং ক্লাব তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ করে ছাত্ররা যাতে কর্মসংস্থানে যথাযথ অংশ নিতে পারে সেজন্যও তাঁর পরিকল্পনা ছিল অন্তহীন। ভবিষ্যতের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৩-এ নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—

''There must also be closer relationship between the University and practical businessmen in whose land has

the control of established traders and industries, for that alone, will prevent us from making our teaching too theoretical.''

বিশ্বজুড়ে যে বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে তা দেশবাসীর কাছে তিনি উজাড় করে দিতে চেয়েছিলেন। তরুণ প্রজন্ম এর ফলে অনুপ্রাণিত হবে এবং পরাধীন এদেশেও তার স্বাধীন সত্তা খুঁজে পাবে। পিতার শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ছিল, তা পুত্রের ক্ষেত্রেও অসাধারণভাবে দেখা দিল। এই স্বাভিমান, স্বাজাত্যবোধের যথাযথ স্ফুরণ ঘটে ১৯৩৭-এ। ওই বছর সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ আসতে রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তে—যদি তাঁকে বাংলায় ভাষণ দিতে দেওয়া হয়। প্রথা ভেঙে কবিকে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে শ্যামাপ্রসাদ কী দূরদর্শিতা ও স্বাজাত্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাবর্তনে উপাধি প্রাপকরাও পোশাক নির্বাচনে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় চৈত্র ১৩৪৩-এ লেখা হল---''আর একটি স্বতঃস্বীকার্য সত্য এবং কনভোকেশনে কার্যত স্বীকৃত হইয়াছে বাঙ্গালি ছাত্রেরা ধুতি পরিয়া পদবি সন্মান লইতে পারিয়াছে। গাউনের পরিবর্তে দেশি কোনোরকম শোভন পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইতে পারিলে পরিবর্তনটি পূর্ণাঙ্গ হইবে। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, কবি এ কারণে গাউন পরিতে রাজি হন নাই যে উহাতে একটা অবাস্তবতা আছে। তাহা সত্য।''

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাবর্তন ভাষণে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তার সামাজিক ঐতিহাসিক ও সামগ্রিক মূল্য চিরকালীন—''ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলিন্যবর্গ আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হলেন না। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকেই আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষা মন্ত্রের থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠান বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাঙ্গলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ঠ শাখায় আজ এল নব পল্লবের উৎসব।''

এই 'নবপল্লবের উৎসব'-এ শ্যামাপ্রসাদের পরিশ্রম, ত্যাগ, মেধা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল সীমাহীন। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যিনি আশুতোষের সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উজ্জ্বল অধ্যাপক ছিলেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে বলেছিলেন 'বাপ কা বেটা'। এজন্যই কৌষীতকি উপনিষদের কথা শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী। তারই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স। স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমন এর সঙ্গে যুক্ত হন ১৯০৭-এ। ১৯৩০-এ এখান থেকেই তিনি নোবেল প্রাইজ পান। ১৯৩৩ এর ১ এপ্রিল তিনি যোগ দেন ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ। অবশ্য ব্যাঙ্গালোরে যোগ দিয়েও

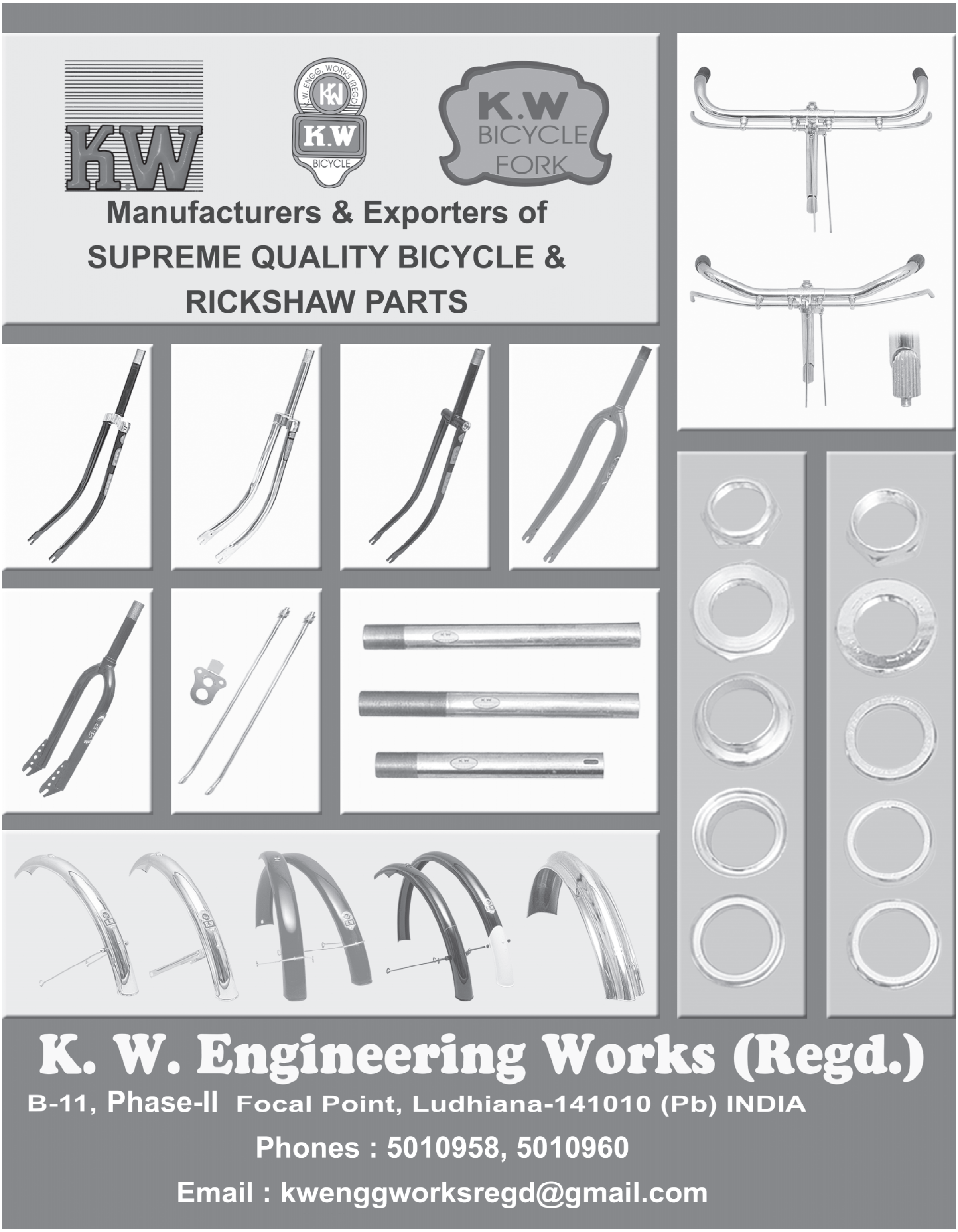

K.W
K.W. ENGG. WORKS REGD.
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
Manufacturers & Exporters of
SUPREME QUALITY BICYCLE &
RICKSHAW PARTS
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Phase-II Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : 5010958, 5010960
Email : kwenggworksregd@gmail.com

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অধিবেশনে বলছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪৯)।

কালটিভেশন অফ সায়েন্সের পালিত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন নি। নতুন কর্মস্থলে একটু স্থিতু হয়ে ১৯৩৪-এর ২০ জুন তিনি পালিত অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কেন তিনি কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর গেলেন সে নিয়ে উঠল বিতর্ক। ১৯৮৮-তে রমনের জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত হলো ড. জি. বেঙ্করমনের বই 'জার্নি ইনটু লাইট', সেখানে অভিযোগ করা হল বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্যই নাকি রমনকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। মহেন্দ্রলাল সরকারের অধ্যাপক পদ পাওয়া নিয়ে মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক কৃষ্ণানের মধ্যে বিরোধ বাধে। ফলে রমনকে সরতে হয় বলে মিথ্যা অভিযোগ ওঠে। মনে রাখতে হবে গ্যালিলিওর মহাকাশ সংক্রান্ত আবিষ্কারের পর জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সেরা দশ আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে সাহার তাপীয় আয়নকরণ তত্ত্ব। স্বয়ং আইনস্টাইন সাহা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় 'জার্নি ইনটু লাইট' বইটি প্রকাশ করেন। বইটিতে বলা হয় এলাহাবাদে অধ্যাপক হিসেব সাহার অবস্থা খুব ভালো না থাকায় নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে তিনি রমনকে সরাতে চেয়েছিলেন। এতো মিথ্যাচার মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীর পক্ষে ছিল অমর্যাদাকর।

রমনের সঙ্গে সাহার যোগসূত্র তৈরি হয় ১৯১৬ তে। সে বছর সত্যেন বসুর সঙ্গে সাহাও এম.এস.সি. পাশ করলে রমন তাঁদের আহ্বান জানান তাঁর অধীনে কাজ করতে। রমন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি নিয়ে কাজ করছিলেন আর সাহা অন্য বিষয়ে আগ্রহী থাকায় সবিনয়ে তাঁর অনিচ্ছা জানিয়ে দেন। রমন ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্সে যেমন বিপুল নামের অধিকারী হলেন, তেমনি সাহাও থার্মাল আয়োনাইজেশন থিয়োরির জন্য বিশ্ববন্দিত হলেন। সাহা ১৯২৩-তে এলাহাবাদ চলে যান। কোথাও কোনো অসন্তোষের কালো মেঘ দেখা যায়নি। রমন নোবেল পেলে সাহা যে নিবন্ধ লেখেন তাতে 'রমনকে তাড়ানো'র চিহ্নমাত্র উদাহরণও নেই। মেঘনাদ সাহা লিখলেন—

"ইউরোপীয়রা চিরকালই বলে এসেছে ভারতীয়রা কেবল দার্শনিক চিন্তায় পারঙ্গম। তাদের বাস্তব দক্ষতা নেই বললেই হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে এই প্রথাগত ভূমিকা দুটি উলটে গেল— ইউরোপীয়রা যেসব তত্ত্বগত ধারণার বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হয়নি একজন ভারতীয় সেই কাজে সফল হলো। যে যাই বলুক রমনের কাজের স্বীকৃতি একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য এবং অন্যদের কথায় তাঁর গৌরব এতটুকু ম্লান হয় না।"

রমন যখন কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট তখন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষ্ণনকে নিয়ে আসেন। রমন পেতেন কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা। সংস্থায় আজীবন সদস্য পদ পেতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন লাগত না। রমন এক্ষেত্রে তা অনুমোদন সাপেক্ষে করেন। আজীবন সদস্য হতে পারবেন না এর ফলে তাঁর মনোনয়ন ছাড়া আর কেউ। এবার শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব।

মাথাপিছু ২৫০ টাকা দিয়ে ৬৮ জনকে আজীবন সদস্যপদে জুক্ত করলেন। এতোজনকে সদস্য হতে দেখে ক্ষুব্ধ রমন কৃষ্ণনকে নিয়ে দ্রুত সভাস্থল ত্যাগ করেন। কিছু পরে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় তিনি সভায় যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার পর্যবেক্ষণ—''স্যার সি.ভি. রমন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথমত এই নতুন আজীবন সভ্যদের সভার কার্যে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার স্বীকার করিতে যথেষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু স্যার সি.ভি. রমনের সম্মুখে ট্রাস্টিদিগের স্বাক্ষরযুক্ত চাঁদার রসিদ দেখানো হয়। ....শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বলেন, নিয়মাবলীর পরিবর্তনমূলক প্রস্তাবগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য ম্যানেজিং কমিটিতে প্রেরিত হউক। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মুখুজ্যে বলেন, পরিবর্তিত নিয়মগুলি গৃহীত হইলে ফল এই দাঁড়াইবে যে ভবিষ্যতে কেহই ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ব্যতীত সমিতির আজীবন সভ্য হইতে পারিবে না। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের অর্থ এই, স্যার সি.ভি. রমন ও তাঁহার মনোনীত কয়েকজন বক্তির অনুমোদন ব্যতিত কাহারও এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইবার সৌভাগ্য ঘটিবে না।''

ওই সভায় শ্যামাপ্রসাদ দ্বার্থহীন ভাষায় বলেন ড. রমন বিগত পঁচিশ বছর ধরে যেভাবে সংস্থা পরিচালিত করেছেন তাতে কেউই সন্তুষ্ট নয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিত্ব কেন সমিতির সভ্য হতে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ পক্তৃতার পর স্যার নীলরতন সরকার প্রেসিডেন্ট ও ড. শিশির কুমার বসু সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে রমনের বিরোধে শ্যামাপ্রসাদ গণতন্ত্রের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৩৯ এর ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি দিনলিপিতে রমনের বিরোধিতার কথা স্পষ্ট বলেছেন নীতিগত কারণে— ''At Bangalore Meeting of the finance committee lasted from 11 a.m. to 6 p.m. expenditure side of the budget was curtailed as far as possible, even then it was a deficit Budget Raman's action is excluding his budget grant and making purchases of appliance for the workshop were regarded as irregular and unauthorised. This resolution was unanimously passed although the A.G. of Madras made a feebled attempt to support or save Raman, it he could.''

মেঘনাদ সাহার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের ছিল স্বার্থহীন শ্রদ্ধার সম্পর্ক। সাহার অনুরোধে ১৯৪৮-এর ২১ মার্চ কলকাতায় ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ভিত্তি প্রস্তর শ্যামাপ্রসাদ স্থাপন করেন। তিনি তখন ভারত সরকারের শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী। কাশ্মীর যাত্রার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সাহা তাঁর অকৃত্রিম এই সুহৃদকে সচেতনও করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুর পর সংসদে সাহা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে বলেছিলেন— 'Dr. Mokherjee was a very eminent man. I have known him since his boyhood. I had worked with him. He was one of the most loveble man I know.''

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আদ্যন্ত শিক্ষানুরাগী। আজন্ম প্রশাসক। তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন তখন থেকেই শিক্ষার বহুস্তরীয় উন্নয়নে সক্রিয় থেকেছেন। বাংলা বানান সংস্কার ও বাংলা পরিভাষা নির্মাণে তাঁর প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য প্রার্থী হতে চাইলে কবি সাগ্রহে সম্মত হন। কবি এ সময় দুটি ভাষণ দেন—'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (ডিসেম্বর ১৯৩২) ও 'শিক্ষার বিকিরণ' (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩)। ভাষণ দুটি 'শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেন বাংলা বানানবিধি ও পরিভাষা নির্মাণ প্রসঙ্গে। শ্যামাপ্রসাদ তখন উপাচার্য না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছেন। তিনি সশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন প্রাথমিক পরিকল্পনা নির্মাণে। কবিকে সাহায্য করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ গবেষণা সহায়ক বা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের পদ প্রবর্তন করেন। ১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক হিসাবে কার্যকাল শেষ হলে এ কাজের সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ কবি প্রস্তাবিত বানান বিধি ও পরিভাষা রচনার জন্য ইতিমধ্যে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করেন।

ইংরেজি ভাষার প্রতি মোহ ও অর্থশূন্য কৌলীন্যের বশবর্তী হয়ে একদল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে মাতৃভাষার ব্যবহারে বিরূপ হন। ড. মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পাঠদান ও পরীক্ষার প্রশ্ন শুরু হলো। এজন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষা তৈরীতে তাঁর সহৃদয় মনোভাব সমস্ত প্রশংসার ঊর্ধে।

আমরা আগেই বলেছি বাংলা বানান সংসারে শ্যামাপ্রসাদ অগ্রবর্তী সেনানীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ লেখেন—''কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের নীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর (১৯৩৫) মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সকলের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়— যে সকল বানানের ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধ্য না থাকে তার কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা।'' ড. মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় উদ্যোগে 'বাংলা বানানের নিয়ম' গ্রন্থটি ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। এরপর পক্ষে ও বিপক্ষে নানা

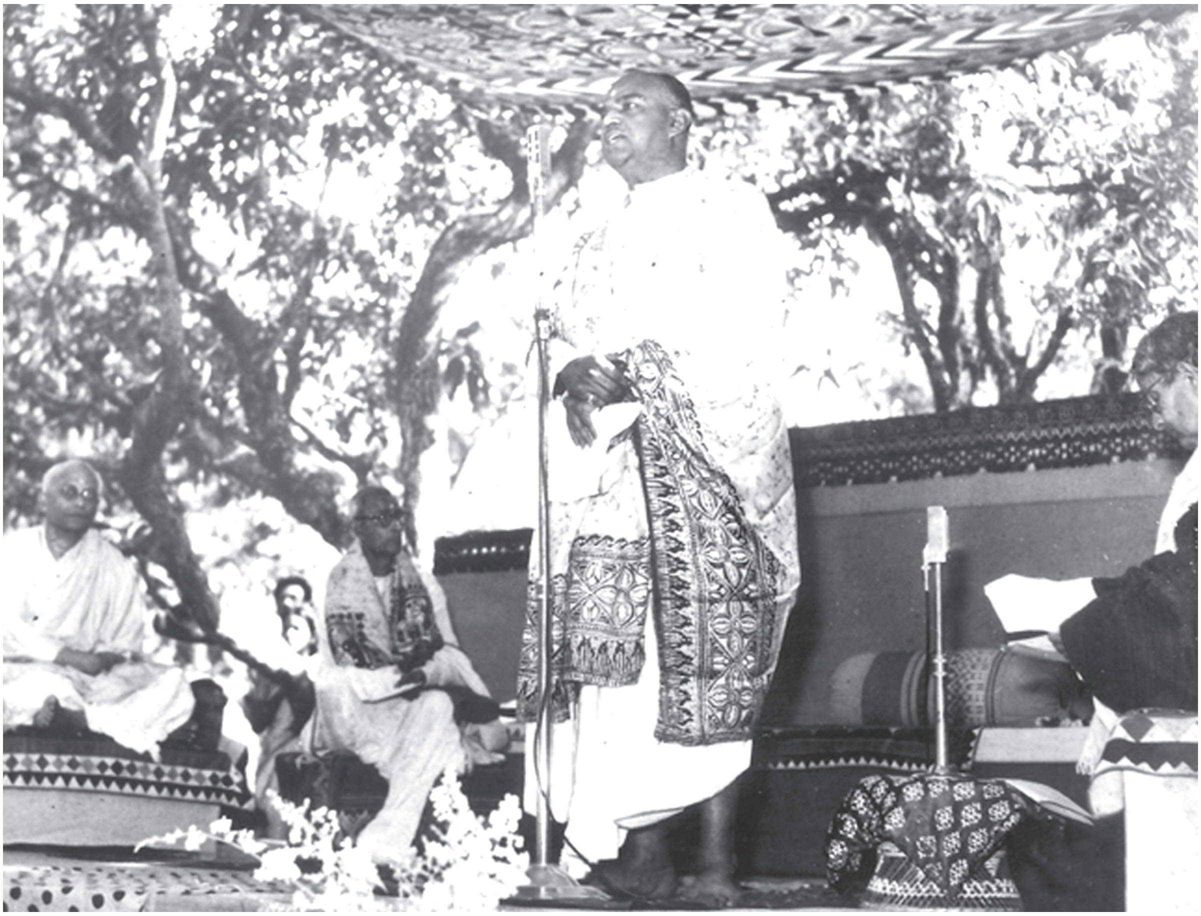

বিশ্ব ভারতীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শ্যামাপ্রসাদ (১৯৫০)।

মতবাদের ঝড় উঠলেও এই বানান রীতিই আদর্শরূপে গৃহীত হয়। মাত্র ছ-মাসের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে বইটি আরোও সর্বজনীন হয়। কবি লিখলেন, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬-এ ''বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।''

মাত্র বাহান্ন বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল শ্যামাপ্রসাদের। কাশ্মীরে রহস্যমৃত্যু তাঁর জীবন প্রবাহে ইতি টানলেও তাঁর অবদান যতিহীন ভাবেই প্রবাহিত। অসম্ভব রহস্য মৃত্যু তাঁর জীবন প্রবাহে ইতি টানলেও তাঁর অবদান যতিহীন ভাবেই প্রবাহিত। অসম্ভব মেধাবী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শ্যামাপ্রসাদ বাস্তববাদী দূরদর্শী রাজনীতির জন্য যত আলোচিত, পরিচিত ততটা আলোচিত হন না শিক্ষাব্রতী জগতে। হিসাবে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ও রূপায়নে, রমন সাহা দ্বন্দ্বের নিরসনে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তনে, পরিভাষা নির্মাণ ও বাংলা বানান বিধি নির্মাণে তাঁর ভূমিকা অগ্রণী। সে সময় দাঁড়িয়ে বেকার সমস্যা সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন বলেই বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদব্যাপী কৌলীন্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও ছাত্রীদের জন্য সেলাই, গৃহবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় প্রবর্তন করে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় যে উদাসীন থাকতে পারে না সেকথাও আমরা আলোচনা করেছি। বাস্তববাদী, দূরদর্শী, রাষ্ট্রবাদী মনোভাবাপন্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় রেখেছিলেন যুগান্তকারী মনোভাব। পিতা আশুতোষ উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে আরো মহিমান্বিত ও স্বমহিমায় উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ব্রিটিশ যুগে দাঁড়িয়েও স্বাভিমান ও জাতীয়তাবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে মাতৃভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে মর্যদাসিক্ত করে স্বাধীনতার আবেগকেই তরান্বিত করেছিলেন। পিতা আশুতোষের উপাচার্য ও শিক্ষাবিদসত্তা শ্যামাপ্রসাদে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আরও ফলবতী হয়ে ভারতীয় স্বাভিমানকেই শীর্ষস্তরে নিয়ে গিয়েছিল।

NAVYUG®
COGGED, VEE & POLY BELTS

Environmental Friendly
ISO 14001 : 2015 Certify Unit

NAVYUG

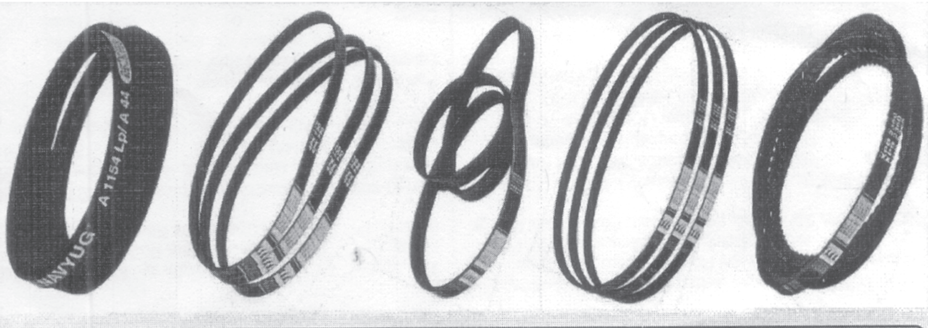

ACCREDITED
Management System
Certification
MSCB-119

MEMBER OF MULTILATERAL
IAF
RECOGNITION ARRANGEMENT

IS : 2494
CM/L NO. 9065679

BSCIC Certifications
BSCIC
Private Limited.
ISO 9001:2008

RECOGNISED STAR EXPORT HOUSE BY GOVT. OF INDIA

Manufacturers & Exporters of : Vee, Cogged & Poly Belts
For Industrial & Automotive Application

Winners of Export Excellence Awards from AIRIA & CAPEXIL

Supplies to OEMs, Railways, STUs, ASRTU, BHEL etc.

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009 (PB.)
Phones : 0181-4299900/ 01/ 02/ 2420551
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

দুর্গাপূজা বিপ্লবের আগুনে উৎসর্গের যজ্ঞ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আনন্দ পারিজাতের কুঞ্জবনে দুর্গাপূজা। শরতের অরুণরাগে যেন মা দুর্গা আমাদের আনাচে কানাচে। এখন ফেস্টিভ সিজন রূপে অধিকাংশ বাঙ্গালি পূজার দিন কাটান, রাজ্য সরকার জনগণের করের অর্থে কার্নিভাল করে। অনেক লগ্নি, অনেক ব্যয়। এতকিছুর মাঝে আমাদের স্মরণ করানো হয় না সেই বিপ্লবকালের দুর্গাপূজার বৃত্তান্ত। যখন দেবী হয়ে উঠলেন মুক্তি যুদ্ধের প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশকে দেবী দুর্গা রূপে বন্দনা করেছেন। ভারতমাতা ও দেবী দুর্গা যেন পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য রূপ। আনন্দমঠ উপন্যাসে মহেন্দ্রকে গুরু ভবানন্দ দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি দর্শন করিয়ে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পর, স্বদেশী আন্দোলন কালের অগ্নিগর্ভ সময়ে আমাদের দেশের বীর যোদ্ধারা, বিপ্লবীরা, দেশসেবকরাও যেন সেই আধ্যাত্মিক বীরচিত্তেই দেশমাতৃকা ও দুর্গাপূজা লক্ষ সেবাপ্রদীপে আঁজল ভরে পালন করেছে। মাতৃবন্দনা তথা দেশ বন্দনার প্রতীক হয়ে উঠল দুর্গাপূজা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক মঞ্চ হয়ে উঠল সেদিন দুর্গাপূজা। ১৯১৯ সারা বঙ্গজুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের শিখা প্রজ্বলিত হলো। কলকাতা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম সর্বত্রই স্বদেশী ভাবধারায় জেগে উঠছে এক নতুন প্রজন্ম। গড়ে উঠেছিল অনেক বিপ্লবী দল। তাদের এক ছাদের তলায় আনার সফল মাধ্যম হলো দুর্গাপূজা। ঋষি অরবিন্দ এবং বাঘা যতীনের

ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬, সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে দুর্গাপূজা শুরু। মা দুর্গার প্রতি সেই ভীষণ সময়ে নজরুল লিখলেন—

''দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে দশভুজা।
''ময় ভুখা হুঁ মায়ি'' বলে আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাশ হতে গিরি-রানীর মা দুলালী কন্যা অয়ি''

সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজা আবার কলকাতার প্রথম বারোয়ারি পূজাও। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে অতীন্দ্র বসু এই পূজার আয়োজন করেন। অতীন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রায়ই থাকতেন নেতাজী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে হোগলা পাতার প্যান্ডেলে পূজা করা নেতাজীর মস্তিষ্কপ্রসূত।

তারপর নেতাজীর উৎসাহেই শুরু হলো বীরাষ্টমী। তখন পুলিশের কড়া নজর সিমলা ব্যায়াম সমিতির ওপর। সরলা দেবী চৌধুরাণীও বলে উঠলেন—'বলং বলং বাহু বলং।' বীরাষ্টমী উৎসব বঙ্গে ছেয়ে গেল সরলা দেবীর উদ্যোগে। সেই বীরাষ্টমীতেই বাঙ্গালি ছেলেদের তিনি বললেন, ''তোমরা সেই ভারতের সন্তান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারত বালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত করো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবত্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, তার প্রতি দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো, তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর।'' এই বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল অনেক তরতাজা তরুণ। স্বদেশী মন্ত্রের অমৃত সুধা দান করেছিল বীরাষ্টমী। বীরাষ্টমীর স্তোত্র রচনা করেছিলেন খিদিরপুরের বিশিষ্ট স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ।

''বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্ব পূর্বগতান্ বীরান্
নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।''

দীর্ঘ স্তোত্রে শ্রীরামচন্দ্র থেকে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, ছত্রপতি শিবাজী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ, বীর প্রতাপাদিত্য সমগ্র বীর রাজপুত জাতি এবং অতি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। যে যেভাবে দেশভক্তি মননে, চেতনায়, বোধে সঞ্চারিত করা যায় তার পূর্ণ প্রয়াস ছিল বীরাষ্টমী। জাতীয়তাবোধের সঞ্চার দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ্য করে হয়ে উঠল এক গভীর আরাধনা। আজকে ভ্রষ্টাচারী নেতারা জেলের মধ্যে বসেও সমাজবিরোধী ফন্দি আঁটে। সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যে বসে দুর্গাপূজার আয়োজন নিয়ে ভেবেছিলেন। ১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে বন্দি। সহকর্মীদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন পূজা করার। জেল সুপারিনটেনডেনটের সঙ্গে রীতিমতো বিতর্ক করে সেবার পূজা করেন জেলের ভিতর নেতাজী। তার আগে পর্যন্ত কেবলমাত্রই খ্রিস্টান বন্দিদের সরকারি ব্যয়ে বড়দিনের অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ দেওয়া হতো এবং তারজন্য বছরে ১২০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যেই দাবি তোলেন তারাও তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সরকারি ব্যয়ে করবেন। প্রাথমিকভাবে পূজা নিজেদের ব্যয়ে করলেও সেই অর্থ সরকারি তহবিল থেকে দিতে অস্বীকার করলে রেগে ফেটে পড়েন সুভাষচন্দ্র। তিনি লিখছেন, 'নেতিবাচক জবাব এলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম...।' তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মদনমোহন ভৌমিক, জীবন লাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা। মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজা করা এবং তা সরকারি ব্যয়ে মঞ্জুর করিয়েই ছাড়া—বাঙ্গালি বিপ্লবীদের মনে আরও জোর উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। সেও তো বড়ো বিপ্লব ছিল সুভাষচন্দ্রের ওই বিপর্যস্ত বিপরীত সময়ে। অনশন শুরু করলে তখন সারা দেশ ক্ষোভে ফুটেছে। সুভাষচন্দ্র দুর্গাপূজার মধ্যে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবোধের যে নিবিড় আয়োজন করলেন তা অনন্যতার বিভাস রাগে ভরা। বিপ্লব মানসে তা নতুন আশ্বাস জুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যখন দেশে ফিরে গণ আন্দোলনের জোয়ার আনলেন তখন দুর্গাপূজা হয়ে উঠল এক শক্তিপীঠ। দক্ষিণ কলকাতার আদি লেক পল্লী পূজা, মধ্য কলকাতার ৪৭,পল্লী পূজা, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি সবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। লেক পল্লীর পূজা ছিল বিপ্লবীদের জমায়েত স্থল। স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র যেতেন, আসতেন আরও অনেক বিপ্লবী। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন সেনগুপ্তর মতো দেশপ্রেমীরা হাজির হতেন সিমলার বীরাষ্টমীতে। তখন অষ্টমীর দিন অন্নকূট উৎসবের চল ছিল। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করেছেন ১৯৩৮ সালে। অন্নকূট দেখাশোনা করতেন বিপ্লবী হেমন্ত কুমার বসু। পুতুলখেলা, পোস্টার লেখা নানান মাধ্যমে সিমলার পূজা জাতীয়তাবোধ প্রচার করত। স্বদেশীদের আনাগোনা এতোটাই বেড়ে যায়, যে ১৯৩২-৩৪ পুলিশ ওই পূজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার তা শুরু হয়। ১৯৩৬-এ বাগবাজারে সরলা দেবী যখন বীরাষ্টমী শুরু করলেন সেখানে সুভাষচন্দ্র বক্তব্য রাখলেন, 'কাপুরুষতা ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পূজার জন্য তৈরি হতে হবে। সে পূজার জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।' অনুশীলন সমিতির লাঠিখেলা, ব্যায়াম প্রদর্শনের মঞ্চ ছিল বাগবাজার পূজা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকারের মতো বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মানুষের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল সেই পূজা।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় এতোটাই পরিবর্তন আনল যে বৌবাজারের গণেশ চন্দ্র বাড়ির পূজাও হয়ে উঠল বিপ্লবের পূজা।

জাঁকজমক, বাবু কালচার ছেড়ে চন্দ্র পরিবার মুক্তি সংগ্রামে শামিল হলো পূজার ডালি হাতে। গণেশ চন্দ্রের নাতি নির্মল চন্দ্র ছিলেন প্রথম সারির বিপ্লবী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ যেন চাঁদের হাট বসিয়েছিলেন মা'কে ঘিরে। দেশাত্মবোধের জন্য যে আত্মত্যাগ তার শক্তি অন্বেষণ হতো দেবীর কাছে নিবেদনে। আসলে বঙ্কিম-ভাবনার সঙ্গে ভারত-ভাবনায় সব বিপ্লবীই একমত, একজোট ছিলেন। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে মায়ের ত্রিরূপ দর্শন করালেন— মা যেমন ছিলেন, যেমন হয়েছেন, যেমন হবেন। দেশের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ রূপ—জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা। ভবিষ্যতের ভারতমাতা যেন মা দুর্গা। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রস্তর রূপে দেশবোধের জন্ম দিলেন। তিনি মা দুর্গার বর্ণনায় লিখলেন, ''মহেন্দ্র দেখিলেন এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দির মধ্যে সুবর্ণ নির্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধ রূপে নানা শক্তি শোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ ধারিণী, শত্রু বিমর্দিণী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।''

সরলা দেবী

বঙ্কিম ভাবনায় এই ছিল আগামী ভারতবর্ষের ছবি। রাষ্ট্রবোধ, দেশপ্রেম, বিপ্লব, আধ্যাত্মিকতা থাকলেই হিন্দুরাষ্ট্র ভারত তার হৃতগৌরব ফিরে পাবে। পরাধীন ভারতে স্বদেশী যুগ তাই দুর্গাপূজাকে রাষ্ট্রপূজায় সজ্জিত করে। আরও এক বার্তা এসেছিল এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করেই। সেও ছিল এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার্তা। ১৯৩৭ এর অক্টোবর, আন্দামান সেলুলার জেল থেকে বিপ্লবীরা চিঠি লিখছেন মোহনলাল সাক্সেনাকে, ''Thanking you and all the donors concerned wholeheartedly, we would like to submit that in view of the recent happenings in the Andaman Cellular Jail i.e. flogging of a political prisoner, regarding which we have already submitted a representation to the Indian Government. We are not in a position either to celebrate the (Durga) Puja or any other celebration at the present juncture and consequently we are compelled to forgo such a friendly donation....''

বিপ্লবী ডাঃ নারায়ণ রায় ও গণেশ ঘোষ আন্দামান জেল বন্দিদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ওই চিঠি লিখে প্রতিবাদে পূজা না করার যে সিদ্ধান্ত রেখেছিলেন, তাও ছিল মা দুর্গার পূজা দেশের প্রতি বড়ো অর্ঘ্য। কাশীবোস লেনের পূজা শুরু করেছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশদের কড়া নজর ছিল। পুলিশ যতই নজর রাখুক, দেবীবেদীতে তো আর উঠবে না। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা ওই সুযোগটা নিয়েছিল। ঠিক হলো প্রতিপদ থেকে বিজয়াদশমী পর্যন্ত এগারো জন পুরোহিত পূজা করবেন। আসলে একজন পুরোহিত, বাকি সবাই ছদ্মবেশী বিপ্লবী। ওরা পূজার মাঝেই পরের আক্রমণ, পরিকল্পনা দিব্যি ঝালিয়ে নিত। ঠাকুর দেখা, ভোগ গ্রহণ করা, পূজা সবইপুলিশকে কাঁচকলা দেখানো এবং দেবীর চরণে থেকেই ভারতমায়ের সেবা করেছেন তাঁরা।

শুধুমাত্র কি কলকাতা ? মেদিনীপুরের বীরেন শাসমল যে পূজার সূচনা করেছিলেন তা ছিল অত্যাচারী গ্রিফিথের বিরুদ্ধে গর্জন। কর্ণগোলার সেই পূজা আজকেও বিপ্লবীদের নামে উৎসর্গ করে চলছে। কলকাতার বিপ্লবী নারায়ণ দে, ভূপাল বসু যাঁরা টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমা মেরেছিলেন তারাও কিন্তু সিমলা ব্যায়াম সমিতি পূজার ছেলে ছিলেন।

ঋষি অরবিন্দ মা দুর্গার উদ্দেশে যে স্তোত্র লেখেন তা যেন সেই ভবানন্দেরই প্রতিচ্ছবি— ''মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, শুন মাতঃ, উঁর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।

...জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।।''

দীর্ঘ স্তোত্রে অরবিন্দ চেয়েছেন মায়ের কাছে যেন সব বিপ্লবী অবিরাম প্রেম ও শক্তি আহরণ করে, স্বদেশব্রতীরা যেন দেশকে, জাতিকে সব সংকীর্ণতার সীমা পার করায়, সত্য ও জ্ঞান যেন প্রদীপ ধরে, সবাই যেন দেশের সংকল্পে ভয়হীন হয়, রিপু নাশ হয়। শ্রী অরবিন্দ বারবার বলছেন, মা দুর্গার স্তোত্রতে ভারতের ভার যেন বঙ্গজননী বহন করে। তিমির নাশ করুক এই পূজা। ঋষি অরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র মনযোগ সহকারে পাঠ করলে চিত্ত উদার হবেই। প্রতিটি দেশপ্রেমী-প্রাণ হাতে বিনাশ-অতিক্রমী ত্রিশূল নেবেই নেবে। ভারত ইন্দ্রাণীকে জাগাতে যে সাহস, বোধ, দর্শন এঁরা দিয়েছেন তা সহস্র পূজার সমান। দুর্গাপূজাকে কেবলমাত্রই আচারে সীমিত না রেখে তাকে অন্তর্নিহিত মর্মে, মা দুর্গার মর্যাদায় দেশরক্ষা-বোধে পুষ্ট করা এক রাষ্ট্র ধ্বজ উড্ডীন করা। দুর্গা পূজা হয়ে উঠল বিপ্লবের আগুনে উৎসর্গের যজ্ঞ। □

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

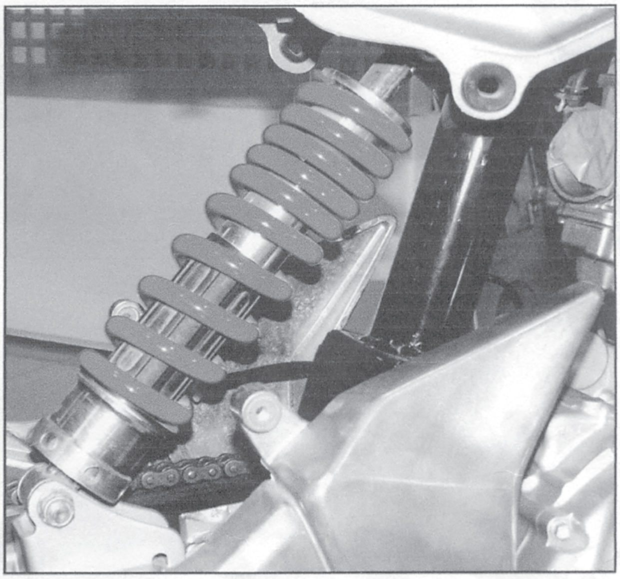

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- Struts/Gas Struts
- Shock Absorbers
- Front Forks; and
- Gas Springs

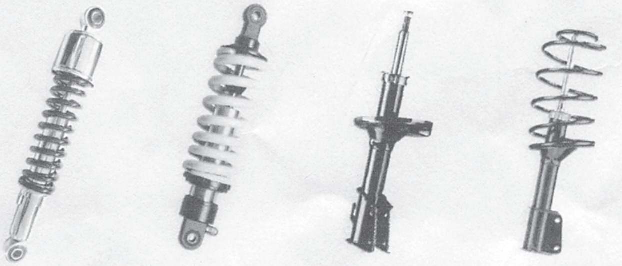

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100

• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100

• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100

মধ্বাচার্য

ভারতীয় দর্শনে মায়ার স্বরূপ
প্রসঙ্গ ও সমসাময়িকতা

ড. আশিস গিরি

ভারতীয় মায়াতত্ত্বের বিশেষ পরিচিতি

ভারতীয় দর্শনে, বিশেষ করে হিন্দু দর্শনের অদ্বৈত বেদান্ত শাখায় মায়া কথাটি পাওয়া যায়। 'মায়াতত্ত্ব' এমন একটি মত যা জাগতিক বিশ্বের মায়াময় প্রকৃতিকে তুলে ধরে মানুষকে ভাবতে শেখায়, এই দৃশ্যমান জগৎ চূড়ান্ত অর্থে অলীক বা অনিত্য। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রচার করতে গিয়ে কখনও কখনও ভক্তিমূলক চেতনা বা সাধারণভাবে সমাজ ও জাতির সেবার পরিপন্থী মত হিসেবে বিবেচিত হয়। আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। মায়া শব্দটি ভ্রম বিষয়ক। ঐতিহাসিকভাবে, শব্দটি বেদান্ত, বৌদ্ধগ্রন্থ-সহ নানান জায়গায় উল্লিখিত আছে। মায়াতত্ত্বের সঙ্গে সাধারণত মায়া দর্শন, অদ্বৈত বেদান্ত, একেশ্বরতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বের মতো বিশেষ দার্শনিক মত সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে 'মায়া' শব্দটি মূলত দেবতাদের জাদুকরি শক্তিকে বোঝাতো, যার মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে এমন কিছুতে বিশ্বাস করাতেন যা আসলে একটি

বিভ্রম মাত্র। পরে, এর অর্থ প্রসারিত হয়ে এক শক্তিশালী মহাজাগতিক শক্তিকে বোঝাতে শুরু করে এবং ধারণা সাধারণ মানুষকে দৃশ্যমান জগৎকে কেবলমাত্র মায়াময় বলে ভাবাতে বাধ্য করে। কেউ কেউ মনে করেন এই মায়াতত্ত্ব অদ্বৈত বেদান্তের একটি মৌলিক ধারণা। এই বিশ্বাসের ফলে জগৎ একটি মায়া এবং অদ্বৈত তত্ত্বই এর প্রধান বিচার্য। অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সবকিছুই মায়া। বহু নাম ও রূপের এই মহাবিশ্ব আমাদের কাছে মায়ার কারণে প্রতিভাত হয়, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র অন্তর্নিহিত বোধ যিনি জগৎ সংসারের নিয়ন্ত্রক। মায়াতত্ত্বের মধ্যে কিছুটা 'বিভ্রম' বা 'অলীক' প্রকৃতির একটি দ্বৈত দিক লক্ষ্য করা গেলেও অদ্বৈত বেদান্তের 'মায়া' শব্দটি অস্তিত্বহীনতার চেয়েও গভীর ও সূক্ষ্ম অর্থ বহন করে। বলা যায় চূড়ান্ত বাস্তবতা এবং অনুভূত বাস্তবতা এই দুটি বিষয় থেকে আলাদা একটি দার্শনিক তত্ত্ব।

প্রাথমিকভাবে কোনো ধারণা পাঠককে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে যে অদ্বৈত জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন, কিন্তু বিস্তারিত অবগাহনে বোঝা যায় জগৎ অনিত্য হলেও শর্তাধীনভাবে ব্রহ্মের উপর তা নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই মতবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না বরং আমরা বিশ্বাস করি জগতের ব্যবহারিক বাস্তবতা (ব্যবহারিক সত্তা) আছে, কিন্তু পরমার্থিক বাস্তবতা (পরমার্থিক সত্তা) নেই। যদি জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হতো, তাহলে মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, নৈতিক কর্ম বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কোনো ভিত্তি থাকত না। জাগতিক মিথক্রিয়া, মানুষের নৈতিক আচরণ এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য অপরিহার্য, মানুষকে চূড়ান্ত সত্য (পারমার্থিক) উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি অদ্বৈতের পথকে আকার দেয়, অস্তিত্বতত্ত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকারের পরিবর্তে উপলব্ধির রূপান্তর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জোর দেয়। অবাস্তবতা ও বাস্তবতার 'অন্টোলজিক্যাল অবস্থা' সম্পর্কে মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। এই গভীর উপলব্ধি অদ্বৈততত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সাধারণ সমালোচনাগুলিকেও (যেমন এটি শূন্যবাদী বা পলায়নবাদী) সরাসরি নস্যাৎ করে।

মায়াতত্ত্বকে কেউ কেউ 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত' হিসেবে চিহ্নিত করেন, একাধিক তথ্যে অদ্বৈতকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা গুপ্ত বৌদ্ধমত' হিসেবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণবতত্ত্বের সমালোচকরা শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম ও মায়ার ধারণাকে বৌদ্ধ মতের সঙ্গে যুক্ত করে একধরনের যুক্তি খাড়া করেন। কোথাও কোথাও তাঁরা এও বলেছেন, বৌদ্ধমতের পতনের পর বৈদিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধ শ্রমণরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি আপোশকৃত ধর্মীয় শিক্ষা বিলোতে শুরু করলেন যা দ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্বের একটি সম্মিলিত রূপ, এটি অত্যন্ত বিতর্কিত। অদ্বৈততত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বেদের গভীরেই প্রোথিত। তবে সমসাময়িক বৌদ্ধমতে এর থেকে কিছু পদ্ধতিগত বা অন্টোলজিক্যাল উপাদান গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধ পরিভাষা (যেমন, বিজ্ঞান-মাত্র) এবং যৌক্তি কাঠামোর (যেমন, চতুষ্কণ-নিষেধ) ব্যবহার সম্ভবত এসবেরেই sofisticated বৌদ্ধিক কৌশল বলে মনে হয়।

মায়াতত্ত্বের ধারণাটি ভারতীয় দর্শনে একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস, যা উপনিষদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের দ্বারা পদ্ধতিগত বিকাশের পথ ধরে বিস্তৃত হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন পরবর্তীকালে সুসংগঠিত হলেও, এর মূল নীতিগুলি প্রকৃতি ও মায়ার ধারণায় বিকশিত ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। উপনিষদের বাণী, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (এই সবই ব্রহ্ম), বাস্তবতার একত্ব ও সর্বব্যাপী প্রকৃতির উপর জোর দেয় এবং ব্রহ্মকে চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা, বিশুদ্ধ চেতনা (চৈতন্য) হিসেবে বর্ণনা করে, বিশ্বাস করে সবকিছুই জাগতিক রূপ এবং সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে বিদ্যমান। এই মৌলিক বিবৃতিগুলি দৃশ্যমান জগৎকে একক বাস্তবতার একটি প্রকাশ বা প্রতিভাস হিসাবে বোঝার জন্য পরোক্ষভাবে ভিত্তি স্থাপন করে।

গৌড়পাদের অবদান (মাণ্ডুক্যকারিকা) ঃ

গৌড়পাদ আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের একজন মূল পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃত। তিনি 'মাণ্ডুক্যকারিকা' (গৌড়পাদ কারিকা বা আগাম শাস্ত্র) এর রচয়িতা বা সংকলক হিসেবে পরিচিত। মাণ্ডুক্য উপনিষদের মতবাদগুলির একটি সংক্ষিপ্ত, শ্লোকবদ্ধ ব্যাখ্যা। 'মাণ্ডুক্যকারিকা' অদ্বৈত বেদান্তের প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। এই গ্রন্থে, গৌড়পাদ জীবনের স্বপ্নাবস্থা, ব্রহ্ম সম্পর্কে অসীমতা ও সসীমতার ধারণা, স্থান ও কালের প্রকৃতি, কার্যকারণ, ক্ষয় এবং উৎপত্তির বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই সমস্ত কথা এবং যুক্তি অদ্বৈত মতবাদকে সমর্থন করে।

গৌড়পাদ স্পষ্টভাবে অদ্বৈত তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, মানুষের জীবনে কোনো প্রকৃত দ্বৈততা নেই; মানবমন, জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়, মায়ার ('বিভ্রম') মধ্য দিয়ে চলে। অদ্বৈতই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য কিন্তু এই সত্য বিভ্রমের অজ্ঞানতা দ্বারা আবৃত থাকে।

গৌড়পাদের দার্শনিক চেতনা স্বতন্ত্রভাবে বৈদান্তিক। তবে তিনি কিছু বৌদ্ধমত, যেমন বিজ্ঞান-মাত্র (শুধুই চেতনা) এবং 'চতুষ্কোণ-নিষেধ' ইত্যাদি নানান সময়ে গ্রহণ করে সেগুলিকে বৈদান্তিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে, তিনি বৌদ্ধমত থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ছিলেন, কারণ তিনি স্ব-ভাব (সার্বজনীন প্রকৃতি) সহ একটি অজাত (অ-উৎপন্ন) ব্রহ্মকে স্থাপন করেছিলেন, যা বৌদ্ধদের নিস্বভাবে (কোনো সার্বজনীন প্রকৃতি নেই) ধারণার বিপরীত।

আদি শঙ্করাচার্য ! অদ্বৈত বেদান্ত ও মায়াতত্ত্বের সুসংগঠক ঃ

আদি শঙ্করাচার্য অষ্টম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট দার্শনিক, তার অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের দার্শনিক চেতনাকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি ভারতে অদ্বৈততত্ত্বের প্রচার ও প্রসারের জন্য পূজিত হন এবং প্রায়শই তাকে ভগবান শিবের অবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এও বলেছেন যে এই দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণ মায়াময়। তার মূল দার্শনিক তত্ত্বে তিনি বলেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অন্য সবকিছুই মায়া।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য), এ বর্ণনা করেছেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' (ব্রহ্মই চূড়ান্ত বাস্তবতা, জগৎ একটি বিভ্রম এবং জীবাত্ম ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়)। এই গভীর বোধ অদ্বৈতবাদকে বোঝার ভিত্তিপ্রস্তর। শঙ্করাচার্য একজন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারক। তিনি ভারতের চারটি প্রধান দিকে চারটি মঠ (কেন্দ্র) স্থাপন করেন— শৃঙ্গেরী (দক্ষিণ), দ্বারকা (পশ্চিম), পুরী (পূর্ব) এবং বদ্রীনাথ (উত্তর)। এই কেন্দ্রগুলি বৈদিক জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান।

শঙ্করাচার্য বলেছেন, মোক্ষ (মুক্তি) জ্ঞান ও কঠোর আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা মায়াকে অতিক্রম করে আত্মার মিলন ঘটায় পরমাত্মার সঙ্গে। এই মিলনের পথে তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ভক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও বলেছেন। তাঁর রচনায় অহংকার বিলীন করার এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার নির্বাণকৌশল বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সাবলীল ভাবে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রামকৃষ্ণাইয়া উত্তর-শঙ্কর অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে তিনি অন্যতম, তাঁর 'বিবর্তনতত্ত্ব' এই মহাবিশ্বকে ব্রহ্মের একটি 'মায়াময় রূপান্তর' হিসাবে প্রতিভাত করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিক ও কবি শ্রীহর্ষকে কিছু পণ্ডিত অদ্বৈত বেদান্তের সমর্থক বলে মনে করেন। তার দার্শনিক রচনা 'খণ্ডনখণ্ডনখাদ্য' অদ্বৈতবাদের সপক্ষে বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও তিনি শঙ্করাচার্যের অনুসারীদের সার্বিক ধ্যানধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন না।

মায়ার ধারণা যদিও উপনিষদে প্রাথমিক রূপে বিদ্যমান ছিল, গৌড়পাদ এবং প্রধানত শঙ্করাচার্যের দ্বারাই উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আদিগুরু রূপে পরিচিত শঙ্করাচার্যের প্রচেষ্টাতেই অদ্বৈত্বতত্ত্ব ব্রহ্মের পরম অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল জগতের সমন্বয় সাধন করে একটি গভীর দার্শনিক ও বৌদ্ধিক মত হিসেবে প্রচারিত হয়। উপনিষদ থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি কঠোরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি একটি সুসংহত দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বকে উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, মায়ার ধারণা, যা প্রাথমিকভাবে হয়তো 'ঐশ্বরিক জাদু' বা 'অন্যসৃজন শক্তি' হিসেবে বিবেচিত হতো তার সঙ্গে ব্রহ্মের অদ্বৈততা এবং জগতের অনুভূত বহুত্বের আপাত বিরোধ ব্যাখ্যা করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। শঙ্করাচার্যের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ভারতীয় মায়াবাদের দার্শনিক ভিত্তিকে মজবুত করেছিল। মূলত জ্ঞানমার্গের সঙ্গে, ভক্তিমার্গের মিলনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের চূড়ান্ত উপলব্ধি মানব জীবনের অধ্যাত্মিক বিকাশকে সহজতর করবে এটাই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য।

অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাথমিকভাবে জ্ঞান ও মুক্তির প্রত্যক্ষ উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে, এই দর্শনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অনুশীলনে ভক্তির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অহংকার বিলীন করার এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার একটি উপায় হিসাবে উচ্চতর শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এই দর্শনে। অদ্বৈততত্ত্বে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সর্বোচ্চ কল্যাণ উপলব্ধি করতে হলে ভক্তি মার্গ অতিক্রম করতে হবে।

মনকে বিশুদ্ধ করার এবং আত্মজ্ঞানের জন্য এবং তার সাপেক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে একাগ্রতার এবং নিঃস্বার্থ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা অর্জন করতে হয়। ভক্তি অহংকারকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে, মনকে বিশুদ্ধ করে এবং আত্মানুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, এটাই জ্ঞানের পথের জন্য অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি অদ্বৈতের একটি বাস্তববাদী দিক।

মায়াতত্ত্বের মূল দার্শনিক ভাব ঃ

মায়াতত্ত্ব, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার প্রকৃতি, আত্মন, মায়া, জগৎ ও মুক্তির ধারণাকে কেন্দ্র করে একটি সুসংহত দার্শনিক কাঠামো। এর মূল বিষয়গুলি হলো— ব্রহ্ম পরম সত্তাঃ।

ব্রহ্ম অদ্বৈত বেদান্তের মূল ভিত্তি, যা একক, অসীম সর্বব্যাপী চেতনা এবং সমস্ত অস্তিত্বের উৎস। ব্রহ্মকে দুটি প্রধান দিক থেকে বর্ণনা করা হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মকে পরম, গুণাতীত সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা কাল, স্থান ও কার্যকরণের ঊর্ধ্বে। অন্যদিকে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হলেন মায়ার সঙ্গে যুক্ত ব্রহ্ম, যিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। অদ্বৈত বেদান্ত ব্রহ্মকে সৎ-চিৎ-আনন্দ (সত্তা-চেতনা- পরমানন্দ) হিসেবে বর্ণনা করে, যা অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং পরম সুখের চূড়ান্ত অবস্থা।

আত্মা হলো ব্যক্তিগত সত্তা ঃ

আত্মন হলো জীবের প্রকৃত সত্তা, বিশুদ্ধ চেতনা, যা ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই) এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম) প্রধান মহাবাক্য যা এই অভিন্নতাকেই প্রকাশ করে। জীবের আপাত স্বতন্ত্রতা হলো অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) এবং দেহ-মন-অহংকারের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করার ফল।

মায়া ভ্রমের শক্তি ঃ

মায়া হলো সেই নীতি যা একত্ব সত্ত্বেও জগতের বৈচিত্র্য ও দ্বৈততার ব্যাখ্যা দেয়। এটি একটি মহাজাগতিক বিভ্রম যা ব্রহ্মের প্রকৃত সত্তাকে আবৃত করে রাখে। মায়া মৌলিকভাবে অবর্ণনীয় ও

অনাদি, তবে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে এটি আবার বিলীন হতে পারে। এটি কোনো অশুভ শক্তি নয়, বরং ব্রহ্মের একটি নিরপেক্ষ ও সৃজনশীল দিক। মায়ার দুটি প্রধান দিক হলো, আবরণ শক্তি (বাস্তবতাকে গোপন করা) এবং বিক্ষেপন শক্তি (অবআস্তবতা/জগৎকে প্রক্ষেপ করা)। দড়ি ও সাপের উদাহরণটি মায়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এই উদাহরণে দড়িটি অন্ধকার বা অজ্ঞতার কারণে সাপ হিসাবে ভুল দেখা হয়। যখন আলো আসে বা প্রকৃত জ্ঞান হয়, তখন সাপের বিভ্রম দূর হয় এবং দড়িটি তার আসল রূপে প্রকাশিত হয়। একইভাবে মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে এবং জগৎকে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে প্রক্ষেপ করে, যা আসলে ব্রহ্মের উপর আরোপিত একটি বিভ্রম। জগৎকে 'মিথ্যা' বলা হয়, অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ বাস্তবও নয়, সম্পূর্ণ অবাস্তবও নয়। এটি অভিজ্ঞতা থেকে জারিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তা বিলীন হয়।

জগৎ ঃ জাগতিক বিশ্ব ঃ

এই মত অনুযায়ী জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব নয়। বহুত্বের উপলব্ধি ভ্রান্ত বিচার এবং অজ্ঞানতার কারণেই জন্মায়। জগতের সবকিছুই স্থান, কাল এবং কার্যকারনের দ্বারা শর্তাধীন। এটিকে একটি চলচ্চিত্রের পর্দার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে পরিবর্তনশীল চিত্রগুলি অপরিবর্তনীয় পর্দা (ব্রহ্ম) এর উপরই নির্ভরশীল।

অবিদ্যা ও অজ্ঞান ঃ

অজ্ঞানতা ও অবিদ্যা হলো সেই আবরণ যা আমাদের প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে। যার ফলে দেহ-মন-অহংকারের সঙ্গে একীভূত হয়। অবিদ্যা হল ব্যক্তিগত অজ্ঞানতা, জীবের বিশ্বাস যা মায়া বাস্তব হিসেবে বিবেচিত হয়। অবিদ্যা ব্রহ্মকে গোপন করে এবং মায়াকে উপলব্ধি করায়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা দূর করা যায়। কখনও কখনও অবিদ্যা এবং মায়া শব্দ দুটি একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, অথবা অবিদ্যাকে মহাজাগতিক মায়ার ব্যক্তিগত দিক হিসাবে দেখা হয়।

মোক্ষ ঃ মুক্তি ঃ

মোক্ষ হলো অদ্বৈতের চূড়ান্ত লক্ষ্য, জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের চক্র (সংসার) এবং জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি। এটি আত্মন-ব্রহ্মের অভিন্নতার জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। জ্ঞান অবিদ্যা ও মায়াকে দূর করে। এই মুক্তি এই জীবনেই সম্ভব (জীবনমুক্ত)। জীবনমুক্ত ব্যক্তি মহাবিশ্বকে অদ্বৈত ব্রহ্ম হিসেবে দেখে তখন তা সুখ-দুঃখ দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

মায়া অবিদ্যা এবং বাস্তবতার স্তরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অদ্বৈতের অভিজ্ঞতার একটি বহুস্তরীয় ব্যাখ্যা। মায়া ও অবিদ্যা কীভাবে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুভূত জগৎ এবং জীবের বন্ধন সৃষ্টি করে তা খুব সাবলীল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাস্তবতার তিনটি স্তর--- পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। মায়া হলো মহাজাগতিক শক্তি যা জগৎকে প্রক্ষেপ করে (বিক্ষেপ শক্তি) এবং ব্রহ্মকে গোপন করে (আবরণ শক্তি)। অবিদ্যা হলো এই অজ্ঞানতার ব্যক্তিগত প্রকাশ, যা জীবকে ব্যবহারিক (জাগতিক) বাস্তবতাকে পারমার্থিক (পরম) বাস্তবতা থেকে দূরে থাকতে প্রলুব্ধ করে।

এই বহু-স্তরীয় কাঠামো অদ্বৈতকে ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রকৃতির সঙ্গে আপোশ না করে জগৎ এবং ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে অন্যতম মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি মুক্তির একটি সুসংহত কাঠামো। অবিদ্যার অপসারণের মাধ্যমে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক উপলব্ধি থেকে পারমার্থিক উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র পথ।

বিবর্তনতত্ত্ব বনাম পরিণামতত্ত্ব ঃ

সৃষ্টির প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের অপরিবর্তনীয়তা এই দুই বিপরীত ধারণা অদ্বৈততত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অদ্বৈততত্ত্ব কেন বিবর্তনতত্ত্বকে সমর্থন করে তা তুলে ধরা হয়েছে উপযুক্ত যুক্তির মাধ্যমে। সমস্ত বেদান্তিক মত সৎকার্য তত্ত্বকে সমর্থন করে। পরিণামতত্ত্ব সম্পর্কে কপিল, রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য প্রভৃতি দার্শনিকরা মনে করেন যে কারণই কর্যের উৎস। সেখান থেকেই 'প্রকৃত' পরিবর্তন সাধিত হয় (যেমন দুই দইয়ে পরিণত হয়)। শঙ্করাচার্যের মতে, ব্রহ্মের 'প্রকৃত' পরিবর্তন হলে তা তার অপরিহার্য প্রকৃতি হারাবে, কখনোই অসীম, অপরিবর্তনীয় থাকবে না।

বিবর্তনবাদীরা দাবি করেন যে ব্রহ্ম জগৎ হিসেবে 'প্রতিভাত' হয় কোনো প্রকৃত পরিবর্তন ছাড়াই, যেমন একটি দড়ি সাপ হিসাবে 'প্রতিভাত' হয় দড়িটির কোনো পরিবর্তন ছাড়াই। জগৎ ব্রহ্মের উপর একটি 'অধ্যারোপ' (বিবর্ত)। এই পার্থক্য অদ্বৈতের জন্য ব্রহ্মকে নির্গুণ (গুণাতীত) এবং অপরিবর্তনীয় হিসাবে মনে করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একই সঙ্গে জাগতিক অস্তিত্বের ব্যাখ্যাও দেয়। এটি একটি অপরিবর্তনীয় পরম সত্তা কীভাবে একটি পরিবর্তনশীল জগতের উৎস হতে পারে, তার সরাসরি ব্যাখ্যা দেয়।

মায়াতত্ত্বের প্রমাণ ও যুক্তি ঃ

অদ্বৈত বেদান্ত এবং মায়াবাতত্ত্বের ধারণা উভয়ই উভয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই দুই পদ্ধতিই ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রকৃতি এবং জগতের মায়াময় সত্তা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মায়াতত্ত্বের ধারণাটি মূলত উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতার মতো প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে উদ্ভূত।

উপনিষদে যে সমস্ত 'মহাবাক্য' বা 'মহান উক্তি' রয়েছে, সেগুলোর কিছু উত্থাপিত এর শাস্ত্রীয় সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন—

*'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (চেতনা ব্রহ্ম)—ঋগ্বেদ (ঐতরেয় উপনিষদ)।

*'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই)—সামবেদ (ছান্দোগ্য উপনিষদ)।

*'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মা ব্রহ্ম)—অথর্ববেদ (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)।

*'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম)—যজুর্বেদ (বৃহদারণ্যক

উপনিষদ)

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ (এই সবই ব্রহ্ম) এবং ‘একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম’ (ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয়হীন)।

ব্রহ্মসূত্র ঃ

ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের শিক্ষাকে মানবজীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। শঙ্করাচার্যের ‘ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য’ এসবের একটি আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মধ্যে যে বিখ্যাত উক্তিটি পাওয়া যায় তা হলো, ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ’ অর্থাৎ ব্রহ্মই চূড়ান্ত বাস্তবতা, জগৎ একটি বিভ্রম, এবং জীবাত্মা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভগবদ্গীতা ঃ

ভগবদ্গীতাকে সমস্ত বৈদান্তিক শিক্ষার সারাংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গীতাতে মায়াকে একটি ঐশ্বরিক বিভ্রম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিভ্রম অতিক্রম করা কঠিন (‘দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া’—ভগবদ্গীতা ৭,১৪)। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই মায়া তাঁরই শক্তি, যা অতিক্রম করা কঠিন, তবে যারা তাঁর শরণাপন্ন হয়, তারা এটি অতিক্রম করতে পারে।

যৌক্তিক প্রমাণ ও উপমা ঃ

মায়াকে ‘অনির্বচনীয়’ বলা হয়, অর্থাৎ এটি ‘সৎ’ (বিদ্যমান) আবার ‘অসৎ’ (অবিদ্যমান)ও নয়। এটি অবর্ণনীয়। এর কার্যকারিতা থেকে একটি অনুমান করা যায়, কিন্তু এটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত, কিন্তু ‘কেন’ তা অবর্ণনীয়। এই অনির্বচনীয়তা মায়া যে রহস্যময় এবং যুক্তির অতীত তাকেই তুলে ধরে।

অদ্বৈত বেদান্তের মূল যুক্তি হলো, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত ভুল ধারণা দূর করে এবং মুক্তি এনে দেয়। মায়া জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যয়। আত্মানুসন্ধান এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন এই জ্ঞান অর্জনের প্রধান উপায়।

অদ্বৈতের জ্ঞানতত্ত্বের সুসংহত শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে অভিজ্ঞতামূলক উপমাগুলিকে একত্রিত করে। অদ্বৈত কীভাবে কার্যকরভাবে শ্রুতি (বেদ/উপনিষদ) কে প্রাথমিক প্রমাণ (জ্ঞানের মাধ্যম) হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর বিমূর্ত অদ্বৈতবাদী মতবাদগুলিকে সহজলভ্য ও অভিজ্ঞতামূলকভাবে যাচাইযোগ্য করে তুলেছে তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আমাদের মহাকাব্যগুলিতে চূড়ান্ত সত্যের (আত্মা = ব্রহ্ম) প্রত্যক্ষ বর্ণনা আছে। এগুলি স্বপ্রমাণিত। তবে, জাগতিক মনের জন্য এই বিমূর্ত সত্যগুলি উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

মায়াতত্ত্বের সমালোচনা ঃ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে, মায়া বিশেষত অদ্বৈত বেদান্তের মূল মত, বিভিন্ন দার্শনিক মতের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনা মায়াতত্ত্বের যৌক্তিক সঙ্গতি, নৈতিক প্রভাব এবং

রামানুজাচার্য

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

বৈষ্ণবতত্ত্ব ঃ

বৈষ্ণব দর্শনের দুটি প্রধান শাখা, দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত। দ্বৈতমতের মূল প্রচারক মধ্বাচার্য (১২—১৩ শতক) শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমতের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মূল মত ছিল জীবাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। তিনি বিবর্তনবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এটি জীবনের প্রকৃত কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে। মাধবাচার্য মায়ার ধারণার সমালোচনা করে বলেন—যদি ব্রহ্ম অভেদ হয়, তাহলে মায়াকে ভুল বোঝার জন্য তার পূর্বজ্ঞান কীভাবে থাকতে পারে? মাধবাচার্য অদ্বৈতকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম’ বা ‘গুপ্ত বৌদ্ধধর্ম’ বলে অভিযুক্ত করেছেন, তাঁর মতে এর নির্গুণ ব্রহ্ম এবং মায়ার ধারণা বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে অদ্বৈতের ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্যোতি) ব্যাসদেবের ব্রহ্ম (কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম) এর মতো নয়, তাই অদ্বৈতের ব্রহ্ম ‘ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত’।

বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্ব ঃ

রামানুজ (১১-১২ শতক) শঙ্করাচার্যের অবস্থানকে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মকে অসীম গুণাবলী সম্পন্ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি গুণাতীত (নির্গুণ) নয়। রামানুজ মায়াতত্ত্বের বিভ্রমকে খণ্ডন করে বলেছেন, জগতের বাস্তবতা ও

সত্য জ্ঞানই দৃঢ়। তিনি চূড়ান্ত সত্যের অনুসন্ধানে যৌক্তিক, বিচারমূলক চিন্তাভাবনার গুরুত্বের উপর জোর দেন। রামানুজাচার্য যুক্তি দেন যে যদি ব্রহ্ম অভেদ হয়, তাহলে জ্ঞান পার্থক্য প্রকাশ করে, একত্ব নয়। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মের পরস্পরবিরোধী গুণাবলী থাকতে পারে না। তিনি আত্মা-দেহ সম্পর্কে বলেছেন, জগৎ ব্রহ্মের দেহ বা প্রকার, যা জাগতিক মন্দ বা গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

সাংখ্যযোগ ঃ

সাংখ্য একটি দ্বৈতমতের দর্শন, যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি সমান এবং বাস্তব, শাশ্বত ধারণা হিসেবে স্বীকার করা হয়। সাংখ্য দর্শনে অদ্বৈতকে নিছক একটি বিভ্রম হিসেবে সমালোচনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানভিক্ষু (১৬ শতক) যুক্তি দেন যে কোনো ব্রহ্ম-সূত্রে বন্ধনকে নিছক প্রতারণা হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি। সাংখ্যের পরিণামবাদ (প্রকৃত রূপান্তর) অদ্বৈতের বিবর্তবাদের বিপরীত। সাংখ্যে অভিজ্ঞতার সমস্যা হলো, পুরুষ (গুণবিহীন বিশুদ্ধ চেতনা) কীভাবে একজন অভিজ্ঞতাকারী হতে পারে যখন অভিজ্ঞতার জন্য গুণাবলীর প্রয়োজন হয়?

ন্যায় ঃ

ন্যায় একটি বাস্তবধর্মী দর্শন হিসেবে বলা হয়, যা বাহ্যিক জগৎকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে। এটি অদ্বৈতের আদর্শকে বাস্তবতা থেকে পালানো একটি সীমাবদ্ধ মত বলে সমালোচনা করে। ন্যায় দর্শনের মতে অদ্বৈতবাদ জগৎকে মিথ্যা (ব্যবহারিক বাস্তবতা, পরম নয়) হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানবাদীদের বিরুদ্ধে একটি পালটাা যুক্তি। ন্যায় যুক্তিবাদী এবং জগতের স্বাধীন বাস্তবতা দাবি করা একটি দার্শনিক মত। ন্যায়তত্ত্বের প্রশ্ন, মায়া যদি অবর্ণনীয় হয়, তাহলে কীভাবে তা জানা বা অতিক্রম করা যায়?

মীমাংসা ঃ

মীমাংসা দর্শন (বেদের কর্ম-কাণ্ড) (আচার-অনুষ্ঠান)-এর উপর জোর দেয়, যেখানে বৈদিক নির্দেশাবলীর (বিধি) প্রাধান্য রয়েছে। মীমাংসা মনে করে যে বেদ অপৌরুষেয় (মানুষের দ্বারা রচিত নয়, শাশ্বত, স্ব-প্রমাণিত)। এটি নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে খুব কম আগ্রহ দেখায়; শক্তি এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। মীমাংসা অদ্বৈতের জ্ঞান এবং জগতের 'অবাস্তবতা' এর উপর জোর দেওয়ার সমালোচনা করে। মীমাংসা উপনিষদকে (জ্ঞানকাণ্ড) আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে। অদ্বৈতের জ্ঞান দ্বারা মুক্তির উপর জোর দেওয়া, আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে, একটি বিতর্কের বিষয় ছিল।

বৌদ্ধমত ঃ

বৌদ্ধমতের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং যোগাচার, মায়াতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উভয়ই দেখা যায়।

মাধ্যমিক ঃ

সাদৃশ ঃ অদ্বৈততত্ত্ব এবং জাগতিক উভয়ই জগতের ক্ষণস্থায়ীত্বতার উপর জোর দেয়। পার্থক্য হলো মাধ্যমিকের শূন্যতা (অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের শূন্যতা, নিস্বভাব) বনাম অদ্বৈতের ব্রহ্ম (স্বভাব সহ চূড়ান্ত বাস্তবতা)। মাধ্যমিক কোনো অন্তর্নিহিত চূড়ান্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে; অদ্বৈত ব্রহ্মকে একটি অতিপ্রাকৃত পরম বাস্তবতা হিসেবে মনে করে।

যোগাচার ঃ

বিজ্ঞানমাত্র ('শুধুই চেতনা' বা 'কেবলমাত্র প্রতিভাস') মতবাদ। জগৎ মানসিক কারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়, এতে কোনো বাহ্যিক বস্তু নেই। সাদৃশ্য হলো উভয়ই জগৎকে প্রতিভাস হিসেবে দেখে। গৌড়পাদ বিজ্ঞান-মাত্র পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। পার্থক্য হলো যোগাচার অতিপ্রাকৃত আদর্শের কাছাকাছি, এটি চেতনার জ্ঞান রূপান্তরের উপর জোর দেয়। অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে চূড়ান্ত উপস্তর হিসেবে স্থাপন করে, যা যোগাচার করে না।

ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রভাব ঃ

মায়াতত্ত্বের প্রভাব ভারতীয় দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও সংস্কৃতির উপর গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। এটি বিশিষ্টাদ্বৈত (বিশিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব) এবং দ্বৈত (দ্বৈততত্ত্ব)-এর মতো অন্যান্য বেদান্তিক মতগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। শঙ্করাচার্যের মঠ স্থাপনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় অনুশীলনগুলিকে একত্রিত করে বৈদিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়াতত্ত্ব জ্ঞানের পথ, আত্ম-অনুসন্ধান এবং আত্মন-ব্রহ্মের অভিন্নতার উপলব্ধির উপর জোর দেয়। এটি বৈদিক গ্রন্থগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের জন্য একটি সমন্বিত দার্শনিক ভিত্তি। এটি জাগতিক বিভ্রান্তি অতিক্রম করে শাশ্বত সত্যের উপর মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করে।

বিজ্ঞান ও মায়াতত্ত্ব ঃ

আধুনিক ব্যাখ্যায় অদ্বৈততত্ত্বের ধারণা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। অদ্বৈততত্ত্ব কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিপরীতমুখী প্রকৃতি (কণাগুলি একাধিক অবস্থায় বিদ্যমান, আন্তঃসংযোগ) এর সঙে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোয়ান্টাম তত্ত্বে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা উপনিষদের এই ধারণাার প্রতিধ্বনি করে তা চেতনা বাস্তবতাকে আকার দেয়। নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরির অনুসন্ধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন মায়ার ধারণায়, জগৎ একটি ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ, পদার্থবিদদের মতে আমাদের বাস্তবতা একটি বৃহত্তর, বহুমাত্রিক অস্তিত্বের সীমিত অংশ। বেদান্ত সমালোচনামূলক প্রশ্ন এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে, যা বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নৈরাশ্য ও বাস্তবতার প্রতি উদাসীনতার অভিযোগের জবাব ঃ

সমালোচকরা যুক্তি দেন যে মায়াতত্ত্বের মতে, জগৎ একটি বিভ্রম, যা নৈরাশ্য ও উদাসীনতাকে উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবাদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত, জগতের ব্যবহারিক বাস্তবতা (ব্যবহারিক সত্তা) আছে, পরমার্থিক বাস্তবতা (পরমার্থিক সত্তা)

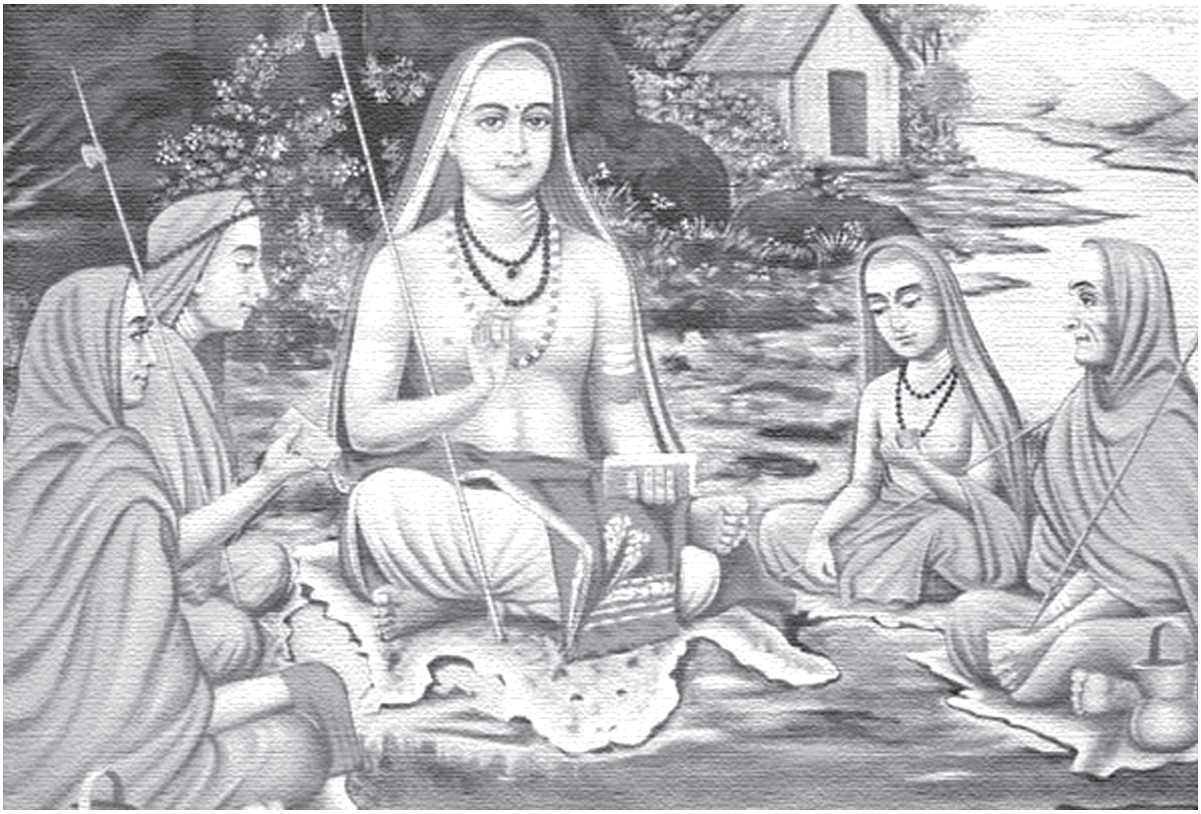

নেই। এটি অস্তিত্বহীন নয়।

সমসাময়িক সমাজে প্রাসঙ্গিকতা ঃ

মায়াতত্ত্ব সত্যের সন্ধানীদের অনুপ্রাণিত করে এবং আত্মোপলব্ধির পথকে আলোকিত করে। নিঃস্বার্থ কর্ম, ধ্যান, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক শুদ্ধীকরণকে উৎসাহিত করে। মায়াতত্ত্ব প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে একত্রিত করে বাস্তবতার একটি সামগ্রিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন অদ্বৈততত্ত্বের একটি মূল লক্ষ্য, অদ্বৈততত্ত্বের বিমূর্ত ধারণা, বিশেষ করে মায়া ও ব্রহ্ম, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব, ইত্যাদির মধ্যে আশ্চর্যজনক সমান্তরাল এক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, যা চূড়ান্ত সত্যের অন্বেষণকে উৎসাহিত করে। অদ্বৈতবাদ এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরি এবং বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে সরাসরি সংযোগ আছে বলে মনে করা হয়। বেদান্ত বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনাকে একত্রিত করতে সাহায্য করে। অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা একটি একক কাঠামো থেকে সমস্ত শক্তি ব্যাখ্যা করার একটি মহৎ একীভূত তত্ত্ব যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মায়াতত্ত্বকে অনুভূত জগৎ সৃষ্টির নীতি হিসেবে, আমাদের ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানীয় কাঠামো কীভাবে একটি বৃহত্তর, বহুমাত্রিক বাস্তবতা একটি সীমিত 'খণ্ড' উপস্থাপন করে তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রাচীন আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি নিছক রহস্য না হয়ে বাস্তবতার মৌলিক দিকগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যা আধুনিক বিজ্ঞান এখন অন্বেষণ শুরু করছে।

ভারতীয় মায়াতত্ত্ব, বিশেষত আদি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের কেন্দ্রীয় মত হিসেবে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। মায়াতত্ত্বকে প্রায়শই পলায়নপর বলে ভুল বোঝা হলেও, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ মানসিক শুদ্ধীকরণ, নৈতিক জীবনযাপন এবং জগতে নিযুক্ত কর্মের উপর জোর দেয়। জীবনমুক্তির ধারণা এবং প্রকৃত মুক্তিতত্ত্ব উদাসীনতার দিকে নিয়ে যায় না, বরং গভীর সহানুভূতি এবং মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করে।

ভারতীয় মায়াতত্ত্ব কেবল একটি দার্শনিক মতবাদ নয়, আত্মোপলব্ধি ও অস্তিত্বের একটি সামগ্রিক দর্শনের একটি গভীর পথ। এর স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা ভারতীয় দর্শনের একটি জীবন্ত ও গতিশীল অংশ, যা বিশ্বজুড়ে সত্যসন্ধানীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

With Best Compliments from :-

RAJKUMAR KARWA

Managing Director

SANAUTO ENGINEERS (INDIA) PVT. LTD.

Manufacturers of

ENGINEERING COMPONENTS

AEROSPACE, OIL & GAS, AUTOMOTIVE

789, Industrial Estate, Sector - 69

Faridabad - 121 004, Haryana

Tel. : 91 129-2989789 / 790

Website : www.sanauto.com

E-mail : info@sanauto.com

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আদিনা মসজিদ-আদিনাথ মন্দির বিতর্ক

বিনয়ভূষণ দাশ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে সেন রাজত্বের অবসানের পরে ক্রমান্বয়ে হিন্দুযুগও সমাপ্ত হয়। বখতিয়ার খিলজির নবদ্বীপ (নদীয়া) দখলের পরে ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গে মুসলমান শাসনের প্রসার ঘটে। যদিও সেন রাজবংশের রাজারা তখনও পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। গুপ্ত তথা মহারাজা শশাঙ্কের সময় থেকে সেনযুগ অবধি কালপর্বে মন্দির তথা স্থাপত্য শিল্পে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের যে ধ্রুপদী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও সমুজ্জ্বল ছিল তার গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাচীন বঙ্গের প্রত্নসম্পদ এবং তার সুউচ্চ শিখরযুক্ত মন্দির ও দেবদেউলগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে সেই ধ্বংসাবশেষ দিয়ে দুশো বছরের সুলতানি শাসনে ব্যাপকভাবে মসজিদ ও মাজার তৈরি করাই ছিল মুসলমান শাসকদের মূল লক্ষ্য। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ধ্বংস করা হিন্দু প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির অবশেষ যেন হয়ে উঠেছিল বঙ্গের ইটভাটা। সুলতানি আমলে বঙ্গের প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় তারা ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। সেখানে বিনা পরিশ্রমে, সহজেই সংগ্রহ করা যেত নানান মসজিদ ও মাজার তৈরি করার মালমশলা। বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের পরে তারা ত্রয়োদশ

শতাব্দীর শুরুতে প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গৌড়ে তাদের শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে। ধ্বংস করে পুরনো মন্দির ও দেবমূর্তিসমূহ। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল (ই বি হ্যাভেল) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, Indian Architecture গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন, When the capital fell into decay on the decline of Muhammadan rule, Gour was used as a brickfield and quarry by the builders of Dacca, Murshidabad and Calcutta; the right to dismantle Gour of its enameled bricks being farmed out to landholders of the district in the early days of our revenue administration. (p. 52)। অপূর্ব দেবমূর্তিগুলি ভেঙে তার অবশিষ্ট অংশে আরবি-ফারসি লিপিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হলো। হুগলীর পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেণী, মালদহের গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হয় বিরাট বিরাট মসজিদ ও কবরসৌধ। গৌড়লক্ষ্মণাবতীর সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি ধ্বংস করে সেগুলির মশলা দিয়ে গড়ে তোলা হল রাজধানী এবং সুবিশাল আদিনা মসজিদ।

এই আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে শিবমন্দির ধ্বংস করে। এই মন্দিরের তিনটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভই প্রাচীন হিন্দু সৌধ থেকে নেওয়া। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক পার্শি ব্রাউন তাঁর Indian Architecture (Islamic Period) গ্রন্থে লিখেছেন, The Adina Mosque presents a certain grave and stately dignity..... None of the stone work is original, it was all stripped from pre-existing Hindu structures at Lakhnauti in its and places 'immediate neighbourhood.' ওই পুস্তকে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, Many temples and places appears to have been dismantled to provide the amount of stone required and it is not improbable that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnauti were demolished in order to produce this one Mohammedan mosque. প্রখ্যাত মন্দির বিশেষজ্ঞ প্রণব রায় তাঁর 'বাঙ্গলার মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দুমন্দির ধ্বংসকর্ম অন্তত পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলে। সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তিগুলি ভগ্ন করে নদী বা দীঘিতে নিক্ষিপ্ত করা হয়। (মাঝে মাঝেই পুকুর বা জলাশয় খনন করার সময়ে দেবদেবীর মূর্তি পাওয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে?) বঙ্গে মুসলমান আগমনের প্রথমযুগে সুলতানি আমলে হুগলী জেলা অঞ্চলে এবং গৌড়-মালদহে এই ধ্বংসাত্মক অভিযান বেশি চলে। কিন্তু মুঘল সুবেদারদের আমলে, বঙ্গের নবাবি আমলে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ধ্বংসের বিস্তার ঘটে, ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে। তবে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেও তার সমস্ত চিহ্ন লোপাট করতে পারেনি মূর্তি ভগ্নকারীদের নির্মম হাত, মাঝে মাঝেই তার চিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এখানে, সেখানে (p. 14, Mediaeval India under Mohammedan Rule, 712-1774, Stanley Lane-poole)।

মন্দির ধ্বংসের এই সাধারণ বিষয়টি উল্লেখ করার পরে আসা যাক বিশেষভাবে আদিনা মসজিদ তথা আদিনাথ মন্দির প্রসঙ্গে।

১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ। জনশ্রুতি, এই বছরেই তৎকালীন বঙ্গের সুলতান ইলিয়াস শাহ মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত প্রাচীন আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করে। এই জনশ্রুতি মালদহ জেলায় বহুল প্রচলিত। ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-৮৯) পরে ওই ধ্বংসস্তূপের উপরে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করে (নির্মাণের তারিখ 14 February, 1369, p. 82, John Henry Ravenshaw, Gour : Its ruins and Inscriptions, 1874)। আর এই জনশ্রুতি যে কতটা সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় আদিনা মসজিদ দেখতে গেলেই। প্রথম প্রমাণ হলো ওই মসজিদের দেওয়ালের কারুকার্য। দেওয়ালের উপরিভাগ রক্তবর্ণের ইটের তৈরি আর নীচের দিক ধূসরবর্ণের প্রস্তর দিয়ে গঠিত। মসজিদের নীচের তলার গ্যালারিতে ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি সহজেই চোখে পড়বে। এ সম্পর্কে ই বি হ্যাভেল তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, 'But the plan of it (Adina Mosque) is evidently of Buddhist-Hindu origin; the mihrabs are converted Hindu shrines, and it is much more than probable that in this brick-building country Indian builders wee using radiating arches, either round or pointed, for structural purposes before the Muhammadans came.' It seems more logical to assume that the Bengali builders, being bricklayers rather than stonemasons, had learnt to use the radiating arch whenever it was useful for constructive purposes long before the Muhammadans came there.' (pp. 53-54). তিনি এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, 'Gaur was a great Hindu capital, in the heart of the Magadhan country, and its Hindu craftsmen were the direct heirs of the building traditions of the Buddhists. Fergusson, in trying to prove his theory that Hindu builders never under any circumstances used the radiating arch until the Muhammadan builders taught them to do so, seems to ignore the fact that all the Muhammadan buildings builders taught them to do so, seems to ignore the fact that all the Muhammadan buildings at Gaur are just as obviously adaptations of the local Hindu building tradition as are all the mosques in Western India.' (p. 55). এই প্রসঙ্গে তিনি অর্থবহ মন্তব্য করেছেন, 'The Muhammadan buildings at Gaur, Pandua and Malda are Bengali, not Arabian or Persian.' (p. 57). এসব কথা এত বিস্তৃতভাবে বলার কারণ হলো আদিনা মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ যা আমরা মালদহে দেখতে পাই তার নির্মাণশৈলীও এমনকী আরবীয় বা পারসিক নয়, সম্পূর্ণভাবে বঙ্গ শৈলীর। হ্যাভেল আরও লিখেছেন, The beautiful mihrab of the fourteenth century Adina mosque at Gaur is so obviously Hindu in design hardly to require comment. One only has to search among

as the ancient sculptures which are scattered in profusion about the districts surrounding Gaur to find any number of its Hindu or Buddhist prototypes.' তিনি লিখেছেন, 'the mosques of Musulman Gaur were modification of Hindu temples adapted to the ritual of Islam.'

আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল একথা তিনি সরাসরি না বললেও কোনো হিন্দু মন্দির ভেঙেই যে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এটা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

আর শুধু বিদেশি ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরাই শুধু নয়, ভারতীয় ও বাংলাদেশি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরাও হিন্দু মন্দির ও স্থাপত্য ধ্বংস করে সেই মালমশলা দিয়ে মসজিদ ও অন্যান্য ইসলামি স্থাপত্য স্থাপন করেছে তা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে লিখে গিয়েছেন, যদিও একটু অন্যভাবে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশি প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর পিএইচ ডি গবেষণা সন্দর্ভ, Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, Dacca, এ লিখেছেন, The Muslim invaders were necessarily impressed by Indian architecture and sculpture, expressing as they do foreign religious emotions in terms of images and emblems.What they saw at Delhi, and other cities of India, which they attacked, was absolutely foreign to them. Yet when they came to raise their own religious buildings, they were not averse to using the spoils of their temples.' (p. 33). যদিও গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মসজিদে প্যাগান বা কাফেরদের ধর্মীয় চিহ্ন থাকা নিষিদ্ধ। এর পরেই তিনি লিখেছেন, The ruthless desecration and makeshift conversion of Indian temples into mosques has led many scholars to regard Indo-Muslim architecture as nothing more than a local variety of hybrid nature. In point of fact, these early Indian mosques which were compiled from Brahamanical fragments.' 'On the other hand to use of the spoils of non-Muslims ruins was a widely recognized feature in early Muslims architecture.

প্রত্নতাত্ত্বিক Henry Creighton-কে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন, It appears to have been the general practice of the Muhammadan conqueros of India, to destroy all the temples of the idolators, and to raise Mosque out of their ruins.' (Ruins of Gour : Described and Reprsented, London, 1871). যদিও ক্রেইটনের এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলেই মনে হয়। কারণ , সেউ সময়ের বেশকিছু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এখনও বর্তমান। যদিও মালদহ জেলায় তার সংখ্যা খুবই স্বল্প।

এবারে আমরা বিযেশভাবে আলোচনা করব আদিনা মসজিদ তথা আদিনাথ মন্দিরের বিষয়টি নিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক ই বি হ্যাভেল তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, 'The image of Vishnu or Syrya has trefoil arched canopy, Symbolizing the aura of the god, of exactly the same type as the outer arch of the mihrab, Beglar says that the Muslims delighted in plcing the sanctum of his orthodox cult on the spot, where hated infidel and his sanctum.' এস কে সরস্বতী আদিনা মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন, 'An examination of the stones used in the construction of the Adina Masjid (one of the them bearing a Sanscrit inscription, recording meerely a name of Indranath (Adinath?), in the character of the 9th century AD) and those lying about in heaps all round reveals the fact, which no careful observer can deny, that most of them came from temples that once stood in the vicinity.' এখানে তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন, আদিনা মসজিদে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে ইন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, হিন্দুধর্মে ইন্দ্রনাথ বলে কোনো দেবতার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং, শিলালিপিতে উল্লিখিত দেবতার নাম অবশ্যই 'আদিনাথ' হবে। প্রখ্যাত লেখক সীতারাম গোয়েল তাঁর পুস্তকে Hindu Tamples–What happened to them (volume–II) গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, The Muslim builders out of sheer expendiency felt no scruple to use these fragments in their mosques by concealing the carved sides into the wall and utilizing the flat reverse side of the these black basalts for arabesque design in shallow carvings. Piecemeal utilization of Hindu sculptures were also to be seen in the earlier monuments, such as, the Mosque and Tomb of Zafar Khan at Tribeni, the Mosque at Chhoto pandua, the Adina Masjid at Hazrat Pandua, etc. প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম আদিনা মসজিদের মিনার দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, The steps leading up to the pulpit have fallen down, and, on turning over one of the steps I found a line of Hindu sculpture of very fine bold execution... এরপরে তিনি লিখেছেন, It is, therefore, clear that the exigencies of the circumstances led to the utilization of some Hindu materials available on the site.' (Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879–80, vo. 15).

মজার বিষয় হলো, তিনি ওই প্রত্নস্থলে ওইসব মালমসলা কোথা থেকে এল তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় পরিষ্কার বলেছেন, মসজিদ নির্মাণের মালমসলা বাইরে থেকে আনা হয়নি, এখানকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই মধ্যেই পাওয়া গেছে ওই নির্মাণ সামগ্রী। ফলে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায়, কোনো মন্দির ভেঙেই মসজিদ নির্মাণের ওই মালমসলা সংগৃহীত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক J. D. Beglar আদিনা মসজিদের উৎস হিসেবে মুসলিম-পূর্ব স্থাপত্যের (অর্থাৎ হিন্দু স্থাপত্যের) উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আদিনা মসজিদের স্থানে আগে এক হিন্দু মন্দির ছিল যা আমাদের হিন্দু রাজা আদিশূরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। J. D. Beglar-এর মতে, আদিনা মসজিদের মিহরাব

কোনো হিন্দু মন্দির থেকে আহরিত হয়েছিল। (J. D. Beglar (1878) A Tour through the Bengal Province, Report of the Archaeological Survey of India, 1872–73, Vol. VIII, Calcutta.) জে আর র‍্যাভেনশ তাঁর Gour : Its Ruins and Inscriptions গ্রন্থে লিখেছেন, In one of its (Adina Masjid) corners stands a beautifully carved pulpit, below the steps of which a large slab of stone, now fallen, bears the features of a Hindu God on its reverse side. (p. 82). p. 64 তিনি আরও বলেছেন, 'The existence of the foundation of a Hindu Temple in the Adina Masjid is as far-fetched as to consider the circular pedestalto the west of the qibla wall as remains of a Buddhist stupa. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত দুটি খন্ড থেকেও এটা প্রমাণিত যে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার আদিনা এবং অন্যান্য মসজিদে অমুসলিম ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মালমসলা যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা ভোলানাথ চন্দ্রের 'The Travels of a Hindu' (with an introduction by J. Talboys Wheeler) গ্রন্থে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় প্রাচীন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ সম্পর্কে লেখা হয়েছে,' Of Hindoo Gour, probably no more traces exist than in the Hindoo Figures and Inscriptions found in the ruins of mosques built with the materials of Hindoo temples destroyed to assert the superiority of Islam. (p. 89) কি নির্মমভাবে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় প্রাচীন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস করা হয়েছিল তা তাঁর নিচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, So immense was the number of its edifices, that a tax of 8,000 repees was annually levied for permitting bricks to be brought from Gour for buildings in Moorshedabad.' (p. 90). এমনকী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) উল্লেখ করেছেন, হাজারদুয়ারি প্রাসাদের ত্রিপোলিয়া গেট নির্মাণে প্রয়োজনীয় ইট ইত্যাদি মালদহ ও গৌড় থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ'-এ বলেছেন, 'মুসলমান বিজয়ের বহু আগে ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশি ও বিধর্মী জাতি-কতৃক বিজিত হইয়াছে, কিন্তু মুসলমান জেতারাই প্রথমে বিজিত জাতির মন্দির ও দেবমূর্তির ভগ্নাংশ দ্বারা নিজের ধর্মমন্দির নির্মাণ আরম্ভ করে। মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপাদান হইতে মসজিদ গঠনের উল্লেখ মুসলমান আক্রমণের আগে দেখা যায় না। আদিনা মসজিদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আদিনা মসজিদ ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ কর্তৃক হিজিরা ৭০ অব্দে (খ্রিঃ ১৩৬৯) নির্মিত হয়। আদিনা মসজিদে যে বেদীটি আছে তাহাতে বহু হিন্দু-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।'

আদিনা মসজিদের প্রতিষ্ঠা ও স্থাপত্য সম্পর্কে গোলাম হুসেন সেলিমের (অনুবাদ রামপ্রাণ গুপ্ত) 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আদিনা মসজিদের মধ্যে কয়েক স্থানে ভগ্ন দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এজন্য বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন যে, সেকেন্দার শাহ একটি দেবমন্দিরকে মসজিদে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। (পৃষ্ঠা-১২২)। অন্যদিকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ The History of Bengal (volume-ii, Muslim Period) গ্রন্থে আদিনা মসজিদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ' According to Riyaz-us-Salatin, this mosque (i.e, Adina Mosque) was begun in 1364 A.D. and was not completed in 1368 A.D. which is borne out by an inscription on the west side of its wall.This magnificent structure, equalling in size the Great Mosque of Damascus, was built by the spoliation of Hindu and Buddhist shrines. According to R. K. Chakravartty, a Buddhist stupa was dismantled to secure the necessary materials for its building, but the remains of Hindu images as well are visible today in every part of this mosque. A block with the carved head of a lion which is said to have formed part of a Hindu throne, is found attached to the steps leading to the pulpit; many mutilated figures of Hindu deities are found in the dor-sills and prayer-niches all over the mosque.The four hundred pillars with their graceful fluted shafts and expanding lotus-capitals which produce such an imposing effect, were similarly transplanted from Hindu shrines and ' It is not improbable , 'says Percy Brown,' that the finest monuments of the Hindu capital of Lakhnawti were demolished in order to produce this one Muhammadan mosque.' (p.113).

মালদহ নিবাসী পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বিখ্যাত 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সিকান্দার একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিয়া আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের কয়েকস্থানে ভগ্ন দেবমন্দির পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমিত হয়, কয়েকটি দেবমূর্তিও এই মসজিদ নির্মাণকালে চূর্ণীকৃত হয়।' (পৃষ্ঠা-২০২)। স্যার যদুনাথ সরকার ও পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতানুযায়ী সিকান্দার শাহ একটি বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করে মসজিদটি নির্মাণ করেন। আবার পণ্ডিত চক্রবর্তী পরক্ষণেই বলেছেন, কয়েক স্থানে ভগ্ন দেবমন্দির পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ মন্দির অথবা হিন্দু মন্দির যাই হোক; মন্দির ধ্বংস করে তার মালমসলা দিয়েই যে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল তা সন্দেহাতীত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যযুগ)-এ আদিনা মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন,—'হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কারুকার্যশোভিত স্তম্ভ খুলিয়া নিয়া মিহরাবটি তৈয়ারি হইয়াছে। আদিনা (আদিনাথ?) মন্দিরের ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মিহরাব দুইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়া নির্মিত। (পৃষ্ঠা—৪৩৪)।

খান সাহেব আবিদ আলি খান তাঁর গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ

কাহিনি, 'Memories of Gour and Pandua' (সংশোধন ও সম্পাদনা—এইচ ই স্টেপলটন, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা—চৌধুরী শামসুর রহমান) আদিনা মসজিদ সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের জানিয়েছেন; যদিও মুসলমানদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সেখানে পরিষ্কার। স্টেপলটন তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, 'গৃহীত ফোটোগ্রাফে প্রত্যেক দিকে পাঁচ মাইল দীর্ঘ দুর্গপ্রাকারের এবং মধ্যস্থলে আদিনা মসজিদের নিকটে দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাসাদ দুর্গের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। প্রাকারের মধ্যে যেসব দীঘি বা পুকুর রয়েছে, তার সবই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং এ থেকে পাণ্ডুয়ার প্রাচীনত্বই যে প্রমাণিত হয় শুধু তাই নয়; বরং এটাও অনুমান করা যায় যে, এ প্রাচীন হিন্দু রাজধানী থেকে প্রস্তর সংগ্রহ করেই গৌড়ের অট্টালিকারাজি ও পাণ্ডুয়ারও মুসলিম যুগের পাথরের দালানগুলো নির্মিত হয়েছিল।' আদিনা মসজিদের নির্মাণ করা সম্পর্কে আবিদ আলি খান মন্তব্য করেছেন, 'সুলতান সেকেন্দার শাহ্ তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে সিলেটের হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর নির্মিত আদিনা মসজিদে অনেক প্রস্তর দেখা যায়, যা সম্ভবত হিন্দু মন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। স্বভাবতই মনে করা যায় যে, তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং নিজের প্রজাদের তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতেন, যাতে পাণ্ডুয়া নগরীর সব মুসলমান জুম্মাবারের দিনে একত্রে সমবেত হতে পারে। সে উদ্দেশ্যেই যে তিনি সুবৃহৎ এই আদিনা মসজিদ তৈরি করেন তা পরিষ্কারই বোঝা যায়। কিন্তু মসজিদটি যে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়নি, তাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের পেছনের দিকে দেয়ালের মাঝখানে চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবলা ও তার সন্নিহিত উত্তর পার্শ্বে 'মিম্বর' রয়েছে। পশ্চাৎ দিকের সব দেয়ালই অতি সুন্দরভাবে কারুকার্যখচিত করা হয়েছে। কিন্তু এসব কারুকার্য খোদাই খুব গভীর করে করা হয়নি। অথচ কোনো হিন্দু ভগ্নস্তূপ থেকে সংগৃহীত কতগুলো দরজার বাজু পার্শ্বেই এক সারিতে লাগিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলোর খোদাই কাজের গভীরতা লক্ষযোগ্য। এর পরেই তিনি লিখেছেন, 'মিম্বরের ভগ্ন ধাপের ভেতরে একটি সিংহের মস্তক দেখা যায়। মনে করা যেতে পারে যে, সিংহটি কোনো হিন্দু রাজার সিংহাসনের অংশ ছিল। মসজিদের দরজার বাজুতে এবং মিহরাবসমূহে আরও বহু ভগ্নমূর্তির চিহ্ন দেখা যায়। তাঁর এইসব মন্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার যে, মসজিদ তৈরি করার উপকরণসমূহ অন্য কোথাও ধ্বংস করা মন্দির থেকে নয়, ওই স্থানেই অবস্থিত কোন মন্দির ধ্বংস করে তার থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তা থেকেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আর মুসলিম স্থাপত্য নির্মাণশৈলী থেকেও দেখা যায়, তাঁরা কোনো মন্দির ধ্বংস করে সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণ করেছে। আর যে দ্রুততার সাথে মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয়েছে তা থেকেও স্পষ্ট যে, মসজিদ নির্মাণের মালমসলা খুব তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে যা স্বাভাবিক উপায়ে সম্ভব নয়, মন্দির ধ্বংস করেই তা সংগ্রহ করা সম্ভব তখনকার দিনে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আবদুল করিম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙ্গলার ইতিহাস—সুলতানি আমল'-এ লিখেছেন, 'পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ সুলতান সিকান্দর শাহের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। .... মসজিদের ধ্বংসাবশেষে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দিরের মালমসলার সাহায্যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।' স্বাভাবিকভাবেই এই মালমসলা অন্যত্র থেকে বয়ে নিয়ে আসা হয়নি, ওই স্থলেই অবস্থিত কোনো মন্দির ধ্বংস করে তা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তা তিনি উল্লেখ করেননি; অর্ধসত্য বর্ণনা দিয়েছেন।

এরপরে আসা যাক বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তথা ওই সময়ের ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকারের উল্লেখযোগ্য পুস্তক, 'বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'মালদহে সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৭—৮৯) বিশাল আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন (১৩৬৯)। কেহ কেহ বলেন যে ইহা আদিনাথের বা শিবমন্দির ছিল। (পৃষ্ঠ—৪৯)। তিনি অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, 'হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের চিহ্ন বহন করিতেছে এই সমস্ত মসজিদ ও দরগা। পাণ্ডুয়ায় বেশিরভাগ মসজিদই

মন্দিরের রূপান্তর (তদেব, পৃষ্ঠা–১০৫-৬)। দেখা যাচ্ছে, ডঃ সরকার পরিষ্কারভাবেই ওখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরকে আদিনাথের শিবমন্দির বলেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও কয়েকটি ধ্বংসকরা মন্দিরের উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে নুর কুতুব আলমের মসজিদ ও দরগার উল্লেখ করেছেন। ওই মসজিদ ও দরগাটি ভালেশ্বরী মন্দির ধ্বংস করে তার উপরে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিকের সঠিক তথ্য চেপে যাওয়া প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক তথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একদা সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের পূর্বোক্ত পুস্তকের ভূমিকায় উল্লিখিত মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনায় রত অনেক হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহাসিকের এ জাতীয় স্খলন ঘটেছে। এই ব্যাপারে সম্প্রতি আর একটি বিপদ দেখা দিয়েছে সেটিকে বলা যেতে পারে রাজনৈতিক। বর্তমানকালে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ স্থাপন করেছি এবং দেশ শাসনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রয়োগ করে চলেছি। এ পর্যন্ত বেশ ছিল। আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু এর জন্য যদি কেউ এমন দাবি করেন—ইতিহাসকেও আমাদের শাসননীতির অথবা রাজনৈতিক প্রত্যয়ের খাতিরে ঢেলে সাজাতে হবে, অতীতে যেখানে সমাজে বা দেশে ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে....ইতিহাস থেকে সে সব অধ্যায় সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে, যা তথ্যসাক্ষ্যকে উপেক্ষা করে তার নতুন রকম 'অসাম্প্রদায়িক' ব্যাখ্যা করতে হবে—প্রকৃত ঐহিসিক সেখানে আপত্তি করবেন। ইতিহাসের ভিত্তি তথ্যের উপর। তথ্য নির্বাচন করে ইতিহাস রচনা করলে তা লেখকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হতে পারে বা কোন রাজনৈতিক সংস্কারকে তৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসপদবাচ্য হবে না। 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম'.....কদাচ ঐতিহাসিকের নীতি নয়। মুসলমান বিজেতারা নির্মমভাবে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন।'

আবার প্রখ্যাত মন্দির বিশেষজ্ঞ ও 'বাঙ্গলার মন্দির–স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক প্রণব রায় বলেছেন, 'গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে সুবিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি ভেঙে ফেলে সেগুলি দিয়ে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজধানী এবং বিশালাকার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এইভাবে পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদটি' সম্পূর্ণ হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং লক্ষণাবতীতে সেন-রাজাদের প্রাসাদের ভগ্ন অংশ থেকে নির্মিত হয়েছিল' (পৃষ্ঠা—১৭-১৮)। বস্তুত, মালদহ ও পাণ্ডুয়ার সমস্ত প্রাসাদ, মসজিদ ও মাজারই নির্মিত হয়েছিল প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর History of Mediaval Bengal গ্রন্থে আদিনা মসজিদ সম্পর্কের মন্তব্য করে বলেছেন, 'The most important Muslim building in Pandua is the Adina Mosque built by Sikandar Shah in A.D. 1375, which belongs to the third category mentioned above. Materials of a Hindu building were largely used in constructing it, and J. D. Beglar, who made some excavations at the site, was of opinion that the mosque was built on the ruins of a Hindu temple. The destruction of the temple, if there were any, has been so complete that it is now impossible to form any idea of the structure. But the mosque, which is also now in a very dilapidated condition, was according to Marshall ''the most ambitious structure of its kind ever essayed in Eastern India.'' (p. 260)

বঙ্গের মধ্যযুগ তথা সুলতানি আমল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গলার ইতিহাসের দুশো বছর— স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮)' গ্রন্থে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মসজিদ, মাজার ও প্রাসাদ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ওই পুস্তকে লিখেছেন, 'তাঁর (সিকান্দার শাহের) একটি অক্ষয় কীর্তি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। স্থাপত্য-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও বহু হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে, সুলতানের আদেশে বিভিন্ন হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হবে ধর্মের ব্যাপারে সিকান্দার শাহের মনোভাব খুব উদার ছিল না (পৃষ্ঠা–৭৭)। তারপরে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে-সমস্ত মসজিদ তৈরি হতো, তাতে সাধারণত দেব-দেবীদের মূর্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হতো অথবা উলটে রাখা হতো; কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যেসব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজাভাবেই বসানো আছে, তাদের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভিতরে বেশ ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে (প্রসঙ্গত, আগেই উল্লেখ করেছি যে, জে আর র‍্যাভেনশ তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, আদিনা মসজিদের গায়ে অনেক দেবমূর্তিই উলটো করে রাখা হয়েছে। এই বিষয়টি শ্রীমুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেননি।) দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের প্যানেলে খুব সুন্দরভাবে হিন্দুদেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে; ওই প্যানেলগুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত, কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়, বাইরের থেকে আনা মূর্তি-সংবলিত প্যানেলকে দরজার মাপের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে মেলানো হলে তার মধ্যে এমন সুষমতা ও পরিপূর্ণতা রক্ষা করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না" (পৃষ্ঠা–৭৭)। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ওই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আদিনাথ মন্দির ভেঙে তাতে অনেক দেবমূর্তি ও বিভিন্ন হিন্দু চিহ্ন অবিকৃত রেখেই তাতে কিছু দরকারী সংযোজন করে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছিল;

সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাঁদের ছিল না। ফলে অনেক কিছুই অবিকৃত রাখতে হয়েছিল। তাছাড়াও ইসলামে অনুমোদিত নয় এমন অনেক কিছুই মসজিদটিতে রয়েছে। এতেও প্রমাণিত হয়, দ্রুত মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করায় মন্দিরের অনেক চিহ্নই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, 'বাদশাহ-কা-তখৎ' নামে সুলতান ও তাঁর পরিবারবর্গের বসবার জন্য একটি উঁচু স্থানে একটি মঞ্চ আছে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী সুলতানদের আলাদা স্থানে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। ফলে এই স্থান মসজিদে থাকার কথা নয়। আর ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী সিকান্দার শাহ্ গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে এটাও সম্ভব নয় যে, অন্য স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নানান হিন্দু 'মোটিফ' এনে আদিনা মসজিদে স্থাপন করলেন। আসলে ওই স্থানেই ধ্বংস করা আদিনাথের শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরে মসজিদ নির্মাণ করায় মসজিদে নানান হিন্দু অনুষঙ্গ থেকে গেছে তাড়াহুড়োয়। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর প্রবাসী পত্রিকায় (প্রবাসী, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'পাণ্ডুয়া ভ্রমণ' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি সাতাশ বৎসর পূর্বে একবার পাণ্ডুয়া দেখিতে গিয়াছিলাম.... তখন আদিনার ভিতর বিস্তর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দিয়া খচিত নামাজের স্থানে উঠিবার সোপান দেখিয়াছিলাম। যেমন মসজিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্খলিত হইতেছিল, অমনি মুসলমান ভয়ে লুক্কায়িত গণেশ-কার্তিকেয়-কৃষ্ণ-বিষ্ণু বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সে সকল মূর্তির নাক প্রায় ভাঙা ছিল। বেচারা কালাপাহাড়ের উপর তার কারণ অর্পিত হইত। এখন সে সকল মূর্তি দেখা গেল না। কোথায় গেল?' মনে করা স্বাভাবিক যে, হিন্দু অনুষঙ্গগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলার চেষ্টাও হয়েছে। বর্তমান সময়ে ওই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন পাণ্ডুয়ার মেলার সময় শয়তানকে পাথর ছোড়ার অজুহাতে আদিনার গায়ে থাকা হিন্দু মূর্তিগুলিকে ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করেছে। স্থানীয় হিন্দুদের মতে, এটিও প্রমাণ লোপাটের প্রচেষ্টার অঙ্গ। একাধিক মূর্তির গায়ে এরকম ইটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক অধিগৃহীত ঐতিহ্য এটি; তা সত্ত্বেও সর্বসমক্ষে প্রতিরোধহীন ভাবেই চলছে এই বেআইনি ধ্বংসাত্মক কাজ। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালের আগের বেশকিছু সিএস রেকর্ড ও আরএস রেকর্ডে যে স্থানগুলি হিন্দু মন্দির অথবা হিন্দু জনসাধারণের ব্যবহার্য বলে উল্লেখ ছিল, সেগুলিও রহস্যজনকভাবে বর্তমান সরকারি রেকর্ডে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, সরকারি দলিলেও রেকর্ড ট্যাম্পারিং করা হয়েছে। আর এটা শুধু মালদহ জেলা নয়, মুর্শিদাবাদ-সহ অন্যান্য জেলায়ও করা হয়েছে। এইভাবে হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি গ্রাস করে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে। এই বিষয়ে রাজ্যে একটি চক্র বিশেষ সক্রিয় বলেই মনে হয়।

একেবারে সাম্প্রতিককালে আদিনা মসজিদ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা হয়েছে। তার কিছু প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক কালের মালদহ গবেষক অধ্যাপক ডঃ সুস্মিতা সোম সিকান্দার শাহকে আদিনা মসজিদের নির্মাতা না বলে 'সংস্কারক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'শোনা যায়, আদিতে এটি জৈন পথপ্রদর্শক আদিনাথের মন্দির ছিল। পরে পরিণত হয় বৌদ্ধ বিহারে। কেউ বলেছেন, এখানে একটি বিশাল মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়। শেষ হওয়ার আগেই মুসলমানরা এই প্রদেশ আক্রমণ করে, ফলে তখন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে মুসলমান বাদশাহের আদেশে ওই মন্দির তৈরির কাজে জোগাড় করা মশলাগুলি ব্যবহার করে ইমারতটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।' আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন, ''দ্বাদশ শতাব্দীর একটি লিপি যা এখানে পাওয়া গেছে তার পাঠোদ্ধার করেছেন দীনেশচন্দ্র সরকার। এই লিপিটির আটটি অক্ষরের শেষ দুটি অক্ষর হলো 'শ্রীউতঙ্গ শিবঃ, অর্থাৎ এটি উতঙ্ক নামীয় কোনও ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের লিপি। তাছাড়া, শিবলিঙ্গ-বিহীন গর্ত সহ একটি গৌরীপট্টও অবহেলিত অবস্থায় পাওয়া যায় মসজিদ চত্বরেই। দুটি গণেশ মূর্তিসহ অক্ষত দুটি দ্বার আদিনা মসজিদের পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রাচীরে লক্ষ্য করা যায়। ......এছাড়াও সমগ্র মসজিদটির পূর্ব-নির্মিতির গায়ে বহু জৈন বৌদ্ধ প্রতীকী চিহ্ন রয়েছে। আসলে পাল-সেন আমলের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির অনেকটাই ধারণ করে আছে এই সৌধ। এছাড়াও একটি উঁচু বেদীর মতো স্থান আছে যেটিকে মুসলমানরা বলছে সেটি একটি কবর। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মসজিদে কবর থাকা নিষিদ্ধ। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, কথিত আদিনা মসজিদ চত্বরে বহু প্রত্নচিহ্ন বর্তমান যা মুসলিম ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বৈধ নয়।

আর তাছাড়াও মূল প্রশ্ন হলো, সিকান্দার শাহের মতো সুলতান যে ১৩৬৯ সালে নিজেকে আরব ও পারস্যের সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম এবং পরে 'মুসলিমদের খলিফা' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তার পক্ষে নিজের স্থাপিত মসজিদে এত অমুসলিম বা হিন্দু অনুষঙ্গ রাখা আদৌ বাস্তবসম্মত কিনা।

অবশ্য মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা এর মধ্যেও সম্প্রীতি আবিষ্কার করতে পারে। কারণ তারা মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার মধ্যেই সম্প্রীতি খুঁজে পান। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সিকান্দার শাহ্ হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করত এবং সে অনেক মন্দির ধ্বংস করেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেই সিকান্দার শাহকে সম্প্রীতির কাণ্ডারি তা বলা যাবে না।

দেখা যাচ্ছে, কিছু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সরাসরি আদিনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর আদিনা মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ না করলেও তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীন একটি মন্দির ধ্বংস করে তার উপরেই আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেছিল সুলতান সিকান্দার শাহ্। কিন্তু তাঁর রাজত্বের বেশিরভাগ সময়

যুদ্ধবিগ্রোহে লিপ্ত থাকায় তিনি মসজিদ থেকে হিন্দু অনুষঙ্গগুলি বাদ দেওয়ার সময় পাননি। ফলে মসজিদ গাত্রে ও মসজিদ চত্বরে সেই ধ্বংসাবশেষের অনেক চিহ্নই থেকে গেছে।

এই সকল উদ্ধৃতি ও তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায়, আদিনা মসজিদটি সুলতান সিকান্দার শাহ্ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার উপরে নির্মাণ করেন। একথা বেশিরভাগ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত। আর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি যে আদিনাথ বা শিবের মন্দির ধ্বংস করে তার ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছে সেকথাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার, স্যার যদুনাথ সরকার, এস কে সরস্বতী, জে ডি বেগলার, ডঃ সুস্মিতা সোম প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক। এখন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের উচিত যথাযথ প্রত্নতাত্বিক নিরীক্ষণ চালিয়ে 'সৌধটির' সঠিক অবস্থান জনসমক্ষে এনে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা।

তথ্যসূচি ঃ

1. Ernest Binfield Havel—Indian Architecture, Gyan Publishing House, Delhi-2, 2nd Impression, 2022 (First Published, London.).

2. Percy Brown—Indian Architecture (Islamic Period), Life Span Publishers and Distributors, New Delhi, 2022.

3. Stanley Lane-poole—Mediaeval India under Mohammedan Rule, 712-1764, G. P. Putnam's Sons, Londo : T. Fisher Unwin, 1903.

4. প্রণব রায়— 'বাংলার মন্দির–স্থাপত্য ও ভাস্কর্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-২০০৪।

5. John Henry Ravenshaw–Gaur : Its ruins and Inscriptions, C. Kegan Paul & Co., London, 1878.

6. Syed Mahmudul Hasan–Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal, Dacca, 1979.

7. Henry Creighton–Ruins of Gour : Described and Representations, Black, Parsury and Allen, London, 1871.

8. Sitaram Goel–Hindu Temples–What Happened to them, Volume-II, Voice of India, New Delhi, Eight Reprint : 2021.

9. Alexander Cunningham–Report of a Tour in Bihar and Bengal in 1879–80, vol. 15, Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1882.

10. Joseph Jadunath Sarkar–The History of Bengal, Muslim Period, volume–II, B. R. Publishing Corporation, Delhi–35, Reprinted–2003.

11. Joseph David Bengal (1878)–A Tour through the Bengal Province, Report of the Archaeological Survey of India, 1872-73, Vol. VIII, Calcutta.)

12. Bholanauth Chunder–The Travels of a Hindu (with an introduction by J. Talboys Wheeler), Vol. I, N. Trubner & Co. London, 1869.

13. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

14. গোলাম হোসেন সেলিম—রিয়াজ-উস-সালাতিন (অনুবাদ–রামপ্রাণ গুপ্ত), সেপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১।

15. রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

16. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭।

17. খান সাহেব আবিদ আলী খান—গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভ্রমণ কাহিনী, (Tr. of Memoirs of Gour and Pandua, সংশোধন ও সম্পাদনা এইচ ই স্টেপলটন, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা—চৌধুরী শামসুর রহমান, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

18. আব্দুল করীম—বাংলার ইতিহাস–সুলতানী আমল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, ঢাকা।

19. ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার—বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

20. Dr. Ramesh Chandra Majumdar–History of Mediavel Bengal, Tulshi Prakashan, Kolkata, 2006.

21. সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮–১৫৩৮), দিব্য প্রকাশ, ২০১৮, ঢাকা।

22. রজনীকান্ত চক্রবর্তী—পাণ্ডুয়া ভ্রমণ (প্রবন্ধ), প্রবাসী, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

23. সুস্মিতা সোম—মালদহঃ ইতিহাস-কিংবদন্তি, সোপান পাবলিশার, কলকাতা।

24. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মুসলমান মসজিদে হিন্দুকীর্তির অবশেষ (প্রবন্ধ, বানী, ফাল্গুন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ)। প্রবন্ধটি বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত)।

ভারত ও নেপাল গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কে আবদ্ধ

অধ্যাপক উচ্ছল কুমার ভদ্র

নেপাল। গৌতম বুদ্ধদেব, মাতা জানকীর পবিত্র জন্মস্থান। অনেক তীর্থক্ষেত্র সংবলিত ও দেবদেবীর আবাস ও বিচরণক্ষেত্র গিরিরাজ হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটা দেশ। ভারতমাতার সঙ্গে আদরের রোটি-বেটি সম্পর্কের ছোট্ট প্রতিবেশী। এককালে ভারতভূমির অঙ্গীভূত ছিল।

২০০৬ সালের আগেও নেপাল ছিল ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র। ভারতে পড়াশোনা করতে এসে কয়েকজন নেপালি ছাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতাদর্শ ও কার্যক্রমে প্রভাবিত হয়ে ১৯৯২ সাল নাগাদ নেপালে স্থাপন করেন 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' (এইচএসএস)। ধারাবাহিকভাবে মতাদর্শগত উৎসাহ পায় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ থেকে। আবার মাঝে মাঝে ভারত থেকে প্রচারকদেরও কেউ কেউ নেপালে এসে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক করে বিভিন্ন রকমের জনহিতকর ও সাংগঠনিক কাজকর্ম করেন। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নেপালে হিন্দুত্ব আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নেপালের রাষ্ট্রবাদী মানুষের আন্দোলনের প্রধান বিন্দু হচ্ছে ২০০৬ সালে নেপালের হিন্দুরাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অবতরণের মতাদর্শগত ও কার্যকরী বিরোধিতা করা।

২০২১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী নেপালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৮১%, বৌদ্ধ ৮%, ইসলাম ৫%, কিরাত ৩%, খ্রিস্টান ২%। বর্তমানে নেপালে দুই শতাধিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। ১৯৯০ সালের

আগে নেপালে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। দেশের শাসন ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে। রাজাই ছিলেন আইন। দেশে ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। রাজা মহেন্দ্র ১৯৬০ সালে এটির প্রচলন করেছিলেন। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে গণতন্ত্রের দাবিতে নেপালের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস (NC) এবং সংযুক্ত বাম মোর্চা তথা ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট (ULF) যুগ্মভাবে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৯০ সালের এপ্রিলে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো পেশাদার ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হরতাল করে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের পঠনপাঠন অচল করে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অধিকাংশেরই অনেক বিদেশি ডোনার থাকে এবং তারা অনুদানের টাকায় কাজকর্ম করে। হরতাল দেশের বিভিন্ন অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাজা বীরেন্দ্র বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক দলগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র স্থাপন করার বিষয়ে সম্মতি দেন। রাজার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও পূর্ণ রাজতন্ত্র সমাপ্ত হয়ে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের শুরু হয় এবং রাজা সংবিধান ও পার্লামেন্টের অধীনে চলে আসেন।

এর পর থেকেই নেপালে শুরু হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ক্ষমতা দখলের নাটক। এগুলি এখন প্রায় নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০ সালের ওই রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনের পর কোনোও নির্বাচিত সরকারই তার পূর্ণ সময় ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর গঠিত শেষ সরকারের কথাই ধরা যাক। ২৭৫ আসনের প্রতিনিধি সভায় বড়ো তিনটে দলের মধ্যে নেপালি কংগ্রেস জিতেছিল ৮৯ টি আসন, নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ইউনিফায়েড মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) পেয়েছিল ৭৮ টি আসন, নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী কেন্দ্র) পেয়েছিল ৩২টি আসন। কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় ন্যূনতম ১৩৮ টি আসন পেয়ে সরকার গড়তে হলে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে আসন সমঝোতা হতে হবে। বৃহত্তম নির্বাচিত দল হিসেবে নেপালি কংগ্রেসেরই সরকারে থাকার কথা এবং তার নেতা শের বাহাদুর দেওবারই হবার কথা প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে দুই বৃহৎ বামপন্থী দল হাত মিলিয়ে ফেলল (এতে অবাক হবার কিছু নেই) এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো দলগুলোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ১৩৮-এর ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছে গেল। প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন দুই বামপন্থী দলের দুই নেতা পুষ্পকমল দাহাল (মাওয়িস্ট) এবং খাগড়া প্রসাদ শর্মা ওলি (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)। এরা ঠিক করলেন পাঁচ বছরের ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে আড়াই আড়াই বছর করে ভাগাভাগি করে নেবেন। ক্ষমতার কাড়াকাড়ি কিন্তু শেষ হলো না, কিন্তু সেসবে আর আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালের পারস্পরিক সম্পর্ক বহুদিন ধরে বহমান এক গভীর ফল্গুধারা। এর মূলে রয়েছে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত অনেক মিল। নেপালের সঙ্গে ভারতের প্রায় ১,৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই ভৌগোলিক নৈকট্য পারস্পরিক আদান-প্রদান, সংস্কৃতি বিনিময় ও বাণিজ্যের পথ সুগম করে জন্ম দিয়েছে এক হার্দিক ঘনিষ্ঠতার। ইতিহাসের পাতায় ভারত ও নেপালের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের বহু উদাহরণ রয়েছে। ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মুঘল শাসন এদের সবারই প্রভাব পার্শ্ববর্তী নেপালের ওপর সব সময়েই কম-বেশি পড়েছে। আলেকজান্ডারকে পরাস্ত করে পরাক্রমশালী মৌর্য সাম্রাজ্যের (৩২১-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র সম্রাট অশোক যে সমস্ত অশোকস্তম্ভ বানিয়েছিলেন, তার অনেকগুলো নেপালের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে। গুপ্ত যুগকে (৪র্থ – ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয় ভারতের স্বর্ণযুগ। সেই সময়ে নেপালে লিচ্ছবি রাজাদের অগ্রাহ্য করে কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় আবীর গুপ্ত বংশ আধিপত্য বিস্তারের কাজ করে চলেছে। মুঘল শাসনকালে (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে) তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের রাস্তাই ছিল নেপালের মধ্যে দিয়ে। কাজে কাজেই নেপালের রাজপরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছাড়া তা আদৌ সম্ভব ছিল না।

বস্তুতপক্ষে ভারত ও নেপাল এই দুটি দেশের উল্লেখযোগ্য ও সফলতম শাসকরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কার্যকরী সুসম্পর্ক বজায় রেখে সুযোগ-সুবিধে ও নানাবিধ আদান-প্রদানের রাস্তা প্রশস্ত করে কাজ করে গেছেন। কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় রেখে নেপালের রাজপরিবার অনেকবারই ভারতের অনেক রাজ্যের রাজপুরুষদের সঙ্গে সময়ে সময়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। যেমন ১৭৪০ সালে রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ ভারতের গোরখপুরের রাজপুত রাজা অভিমান সিংহের কন্যা নরেন্দ্র রাজ্যলক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। গোয়ালিয়রের রাজা জীবজী রাও সিন্ধিয়া ১৯৪১ সালে নেপাল রাজপরিবারের কন্যা

লেখা দিব্যাশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেন। এই দিব্যাশ্বরী দেবীই পরবর্তী কালে বিজয়রাজে সিন্ধিয়া নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিংহের পুত্র ড: করণ সিংহ বিয়ে করেছিলেন নেপালের শেষ রাণা প্রধানমন্ত্রী মোহন শমশের রাণা'র নাতনি রাজকন্যা যশো রাজ্যলক্ষ্মী দেবীকে। বরোদার রাজপরিবারের প্রতাপসিংহরাও এবং সংগ্রামসিংহরাও বিয়ে করেছিলেন নেপালের রানা পরিবারের এবং নেপাল রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ প্যার জং থাপা'র কন্যা প্রজ্ঞাশ্রী দেবীকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নেপাল সৈন্যবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ এখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জেনারেল পদমর্যাদায় আসীন থাকেন।

রাজা ত্রিভুবন নারায়ণ শাহ নেপালকে সঙ্ঘবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা করছিলেন, তাতে করে নেপালের সৈন্যবাহিনী সিকিমের বেশিরভাগ, গাড়োয়াল আর কুমায়ুন অঞ্চলের উত্তরাখণ্ড ইত্যাদি দখল করে নেয়। তার এই আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত দখলকারী ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে তাঁর বিক্ষিপ্ত সঙ্ঘর্ষ (১৮১৪-১৮১৬) শুরু হয়। শেষ সঙ্ঘর্ষে পরাজয়ের পর নেপাল আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা সুগউলী চুক্তি (১৮১৬) বলে খ্যাত, যার ফলে রাজা ত্রিভুবন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, স্ব-ভূখণ্ডে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকবেন এবং অধিকৃত জমি ছাড়াও আরও কিছু জমি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; এগুলো মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি হয় এবং নেপাল আলাদা রাজ্য হিসাবে থাকতে শুরু করে। কয়েক শত ভাষার প্রাচুর্যে সজ্জিত ভারতের অসাধারণ ভাষাগত বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতেও ভারত ও নেপালের গভীর সম্পর্ক দৃশ্যমানভাবে উপস্থিত। নেপালি ভাষা সংস্কৃত-আধারিত ভারতীয় ভাষাগুলোর একটি। অতএব বিশেষত, বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি এই সব ভাষার সঙ্গে নেপালি ভাষার চমকপ্রদ মিল লক্ষ্য করলে অবাক হবার আদৌ কিছু নেই। আর আঞ্চলিক ভাষাগুলোর কথা যদি ধরেন তবে দেখতে পাবেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতেও এই মিল প্রবলভাবে লক্ষণীয়। যেমন ধরুন, নেপালের তরাই অঞ্চলে ভোজপুরী, আওয়াধি, মৈথিলি এই সমস্ত ভাষা বা তাদের উপভাষাগুলো ভারতের সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতেও মানুষ যে শুধু বোঝে তাই নয়, নির্বিকারভাবে ব্যবহারও করে।

ভারত-নেপালের রোটি-বেটি সম্পর্ক রান্নাঘরেও দেখতে পাওয়া যায়। ডাল-ভাত-তরকারি প্রভৃতি ভারতীয় খাবারের থালায় তারা উপস্থিত। আপনি তরাই অঞ্চলে কোনা নেপালি পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করলে খাওয়া দাওয়া নিয়ে আপনার আদৌ বিশেষ কিছু অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এছাড়া বিরিয়ানি, সমোসা (সিঙ্গাড়া), মোমো এই সমস্ত খাবারগুলিও ভারত ও নেপাল এই দুই দেশেই বহুলভাবে প্রচলিত। বাঙ্গালিরা মিষ্টি খাবারের অতিশয় ভক্ত, বিশেষত রসের মিষ্টি বাঙ্গালির খুবই প্রিয়। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে, চিনি বা মিষ্টত্বের ব্যবহার নেপালিদের মধ্যে লক্ষণীয় ভাবে কম। বস্তুত গুড় (নেপালি ভাষায় 'শক্কর') দোকানে গোখাদ্য হিসেবে বিক্রি হয়। স্বাভাবিকভাবে তাঁরা দৈনন্দিন খাবারে, পায়েসে, অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরিতে বেশ কম মিষ্টি দেন। কিন্তু তাই বলে আমাদের মতো বেশি মিষ্টির খাবারও তাঁদের মোটেই অপছন্দ নয়। তাঁদের কাছে সেটা উৎসবের ভোজ।

নেপাল ও ভারতের মধ্যে যে গভীর সাংস্কৃতির বন্ধন লক্ষ্য করা যায়, আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবাধ যাতায়াত একে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করেছে। কুম্ভমেলায় নেপাল থেকে শত শত তীর্থযাত্রী ভারতে আসেন। নেপালে ভারত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন দশেরা উদ্‌যাপনের সময়ে তীর্থ করতে বা শুধুই ঘুরে বেড়াতে। অযোধ্যার পবিত্র শ্রীরাম জন্মভূমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনকপুরের জানকী মন্দির থেকে এক পুরোহিতের নেতৃত্বে ৩০০০ উপঢৌকনের বাক্স সমেত ৫০০ জন নেপালি এসে যোগ দিয়েছিলেন।

রোটি-বেটি সম্পর্ক ছাড়াও ভারতের কাছে ছোট্ট নেপাল ভূখণ্ডের উল্লেখযোগ্য আন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, নেপালের সঙ্গে আছে ভারতের পাঁচ পাঁচটি রাজ্যের সীমান্ত। ওই পাঁচটি রাজ্য হলো উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও বিহার। দ্বিতীয়ত, নেপাল ও ভুটান ভারত ও চীনের মধ্যে এক অতি কার্যকরী 'নিরাপদ অঞ্চল' যা চীনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথে কার্যকরী বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তৃতীয়ত, ভারত-নেপাল সীমান্ত মাদক চোরাচালানের এক গুরুত্বপূর্ণ পথ। চতুর্থত, সীমান্ত অবাধ হবার কারণে আতঙ্কবাদীদের যাতায়াতের এক উল্লেখযোগ্য দরজা হচ্ছে এই ভারত-নেপাল সীমান্ত। পঞ্চমত, নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বর্তমান সরকারে বামপন্থী ও মাওবাদী মতাদর্শের নেতৃত্ব এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর ভারতকে তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক নজর রাখতে হয়। নেপাল-ভারত

জানকী মন্দির

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চির-উষ্ণতার প্রমাণ সরকারি স্তরে এই দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন আদান-প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ভারতের হাল ধরার পর বেশ কয়েকবার নেপালে সরকারি কার্যক্রমে সফর করেছেন। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে গেছেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিতে, আবার নভেম্বরে অষ্টাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাগড়া প্রসাদ শর্মা ওলি এসে ঘুরে গেছেন। ২০১৬ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী ওলি'র বিশেষ দূত হয়ে এলেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিমলেন্দ্র নিধি। ওই বছরেই আবার সেপ্টেম্বরে সরকারি সফরে এসে ঘুরে গেছেন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল (প্রচণ্ড), তারপর আবার পরের মাস অক্টোবরেই এসেছেন গোয়ায়, প্রথম ব্রিক্স-বিমস্টেক নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে। ভারতের রাষ্ট্রপতির নেপাল সফরের ১৮ বছরের খরা কাটিয়ে ২০১৬ সালের নভেম্বরে নেপাল ভ্রমণ করেছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়; পরের বছর এপ্রিলেই ভারত সফর করেছেন নেপালের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী। নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের মে মাসে গেছেন জনকপুরে, আবার আগস্টে কাঠমাণ্ডুতে ৪র্থ বিমসটেক সম্মেলনে, ২০২২ সালের মে মাসে লুম্বিনী। উচ্চ কূটনৈতিক স্তরে এই রকমের বহু আদানপ্রদান ছাড়াও আইনসভা ও সংসদীয় স্তরে অনেক আদানপ্রদান হয়ে চলেছে, এবং এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য হলো নেপালি সংসদ ২০১৯ সালের মে মাসে তাদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের আঠারো জন সদস্য নিয়ে একটা 'ভারত-নেপাল সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠী' তৈরি করে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে সক্রিয়ভাবে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে চলেছে। এই সমস্ত বহমান কার্যক্রমের বিস্তারিত ফিরিস্তি না দিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আদানপ্রদান, বিশেষত নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দৃশ্যতই উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উৎসাহে ভারতীয় রেল 'রামায়ণ চক্র' বলে এক চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছে, যা রামায়ণে বর্ণিত ভারত ও নেপালে অবস্থিত ১৫টি বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানকে এক সূত্রে গেঁথে রেলপথে ভ্রমণের এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই প্যাকেজে যেমন রয়েছে অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি, অপর দিকে রয়েছে সীতাদেবীর জন্মস্থান নেপালের জনকপুর। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল (যিনি 'প্রচণ্ড' নামেই বেশি পরিচিত) সরকার গঠন করার পরেই ভারতে সরকারি সফরে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনায় এই বিষয়টা চূড়ান্ত করে গেছেন। ভারতের জয়নগর থেকে নেপালের জনকপুর হয়ে বর্দিবাস পর্যন্ত ৬৯ কিলোমিটার রেলপথ ভারতের তরফ থেকে নেপালকে উপহার। এর কাজের সিংহভাগই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং জনকপুর অবধি ট্রেন চলাচল শুরুও হয়ে গেছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও নেপালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদানপ্রদান ও সহযোগিতা এই দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। নেপালি সৈন্যবাহিনীর

নেপালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভব্য অভিনন্দন।

আধুনিকীকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা দ্ব্যর্থহীন। যুগ্ম সামরিক মহড়া, যুগ্ম সামরিক অভিযান, এই সমস্ত ছাড়াও ব্যাটেলিয়ন স্তরের সূর্যকিরণ কার্যক্রম প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে নেপালে ও ভারতে নিয়ম করে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এছাড়া আগেই বলেছি, এই দুই দেশ একে অপরের সৈন্যবাহিনীর প্রধানদের সাম্মানিক 'জেনারেল' পদমর্যাদায় ভূষিত করে থাকে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সুপ্রসিদ্ধ গোর্খা রেজিমেন্ট অংশত, নেপালের পাহাড় অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এই গোর্খা রেজিমেন্টে বর্তমানে প্রায় ৩৫,০০০ নেপালি যুবক কর্মরত রয়েছেন। এদের অবসরোত্তর পেনশন ও উপযুক্ত নিয়োগ, পুনর্বাসন ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার কাঠমাণ্ডুতে একটি মিলিটারি পেনশন অফিস চালায়; ভারতের আরও দুটি পেনশন অফিস চালু রয়েছে নেপালের পোখরা ও ধারানে। এছাড়াও ভারত সরকার নেপালে ২২টি জেলা সৈনিক বোর্ড সক্রিয়ভাবে চালু রেখেছে। এই সমস্তই চলে কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে ভারত সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে।

২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সৌর জোটে যোগদান করতে পেরেছে। একই সঙ্গে নেপালের রেল খাতে ভারতীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা, পেট্রোলিয়াম খাতে সহযোগিতা এবং নেপাল অয়েল কর্পোরেশন এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মধ্যে দক্ষতা বিনিময়-সহ দুটি দেশের মধ্যে তিনটে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৪ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন নেপাল-ভারত যুগ্ম কমিশনের এক বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং নেপালের বিদেশমন্ত্রী নারায়ণ প্রকাশ সৌদ বাণিজ্য, অর্থ, জমি, রেলপথ, আকাশ-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পর্যটন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। গতবছর ৩ নভেম্বর নেপালে যে বড় রকমের ভূমিকম্প হয়েছে তার জন্য ১০০০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য অনুদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে নেপালকে ৮৮০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছিল, যা তার আগের বছরের অনুদানের চেয়ে ২৯.৪১% বেশি। সকলের মনে থাকতে পারে যে, ২০১৫ সালে নেপালে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল, ভারত তখন বিপর্যয়ের ৬ ঘণ্টার মধ্যে ১৬টি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা টিম এবং ৫৭১ টন ত্রাণসামগ্রী ভারতীয় বিমান বাহিনীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এবং তারপর ২১০০ কোটি টাকা অনুদান ছাড়াও ৫০ হাজার পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিল। মোদীজীর নেতৃত্বে ভারত এখন এক আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী দেশ; ভুটান, নেপাল, আফগানিস্তান, মরিশাস, সেশেলস, মালদ্বীপ, আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান বিভিন্ন দেশগুলোকে অর্থ সাহায্য করে; ভুটান পায় সবচেয়ে বেশি টাকা, আর তার পরেই নেপাল। নেপালকে আরও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করবে ওই ৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখেই স্বাক্ষরিত একটি বিদ্যুৎ বণ্টন চুক্তি, যার ফলে ভারত নেপালের কাছ থেকে পরবর্তী ১০ বছরে ১০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করবে।

অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে দ্রুত অগ্রসরমান আধুনিক ভারত 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর ভারত, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে, অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র ভারতের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধির যে সুবাতাস সারা উপমহাদেশে তথা সারা বিশ্বে প্রবহমান, তাতে ভারতকন্যা নেপাল যে দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির পথে স্থিরভাবে চলতে থাকবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। □

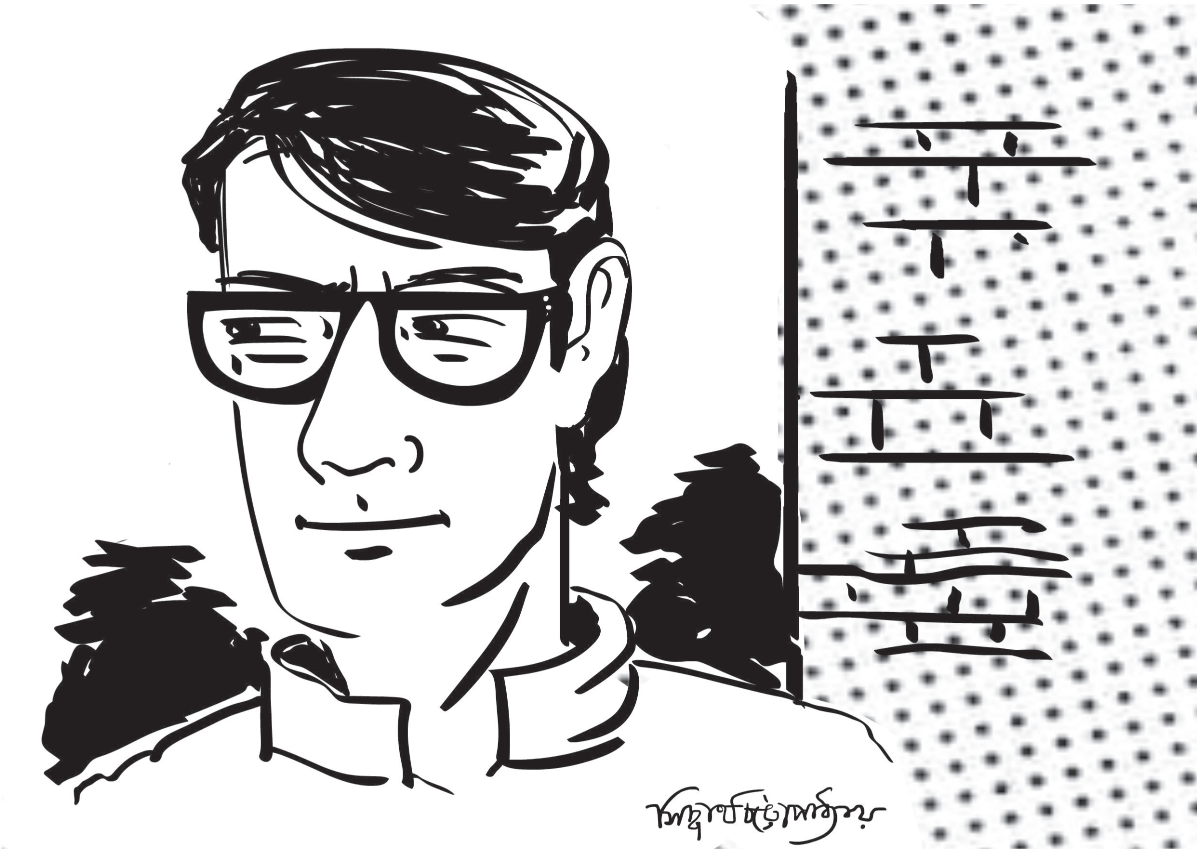

আমেরিকায় জন্ম

দেবদাস কুণ্ডু

কমলা রঙের আকাশের তলা দিয়ে যাচ্ছিলেন দেবব্রত। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকল। পিছনে তাকালেন ঘাড় বেঁকিয়ে। দুলাল। বাড়ির গেটের কাছে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুলালই তো! চিনতে পারা যাচ্ছে না। সুঠাম চেহারার গৌরবর্ণের উজ্জ্বল মুখের সেই দুলালই কি এই দুলাল! কতদিন পর দেখছে সে। দু'বছর? না তিন বছর পর? কোভিডের পরেই তো সে অসুস্থ হলো। প্রায় এক বছর ভুগলো। দেবব্রত দুলালের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আরও চমকে উঠলেন। একি চেহারা হয়েছে ওর! দাঁত বেরিয়ে আসার মতো বুকের হাড়গুলো জেগে উঠছে। ইঁদুরের গর্তের মতো দু'টো চোয়াল ঢুকে গেছে। চোখ দুটো অক্ষিগর্তে নিষ্প্রভ। মাথায় সামান্য চুল। সেই চুলের কিছু অংশে ফুটেছে কাশফুল। বয়স পঁচান্ন ছাপান্ন হবে। ভাঙা গলার স্বর যেন গভীর খাদ থেকে উঠে আসছে। বলল—আচ্ছা দেবু, তুমি আমার বউয়ের প্রিমিয়াম নিতে আসছো না কেন?

—আমি এখন কারও প্রিমিয়াম নিতে যাই না।

—আমি অন্যের কথা জানি না। আমারটা কেন জমা দিচ্ছো না? এই পথ দিয়ে যাচ্ছো তো।

—এটা রাস্তা তাই যাচ্ছি। এই রাস্তা দিয়ে গেলে তোমার প্রিমিয়াম নিতে হবে এমন কথা কি লেখা

আছে নাকি কোথায়ও?

—আচ্ছা, পলিসিটা করার সময় তো দু'তিন মাস ঘোরাঘুরি করেছিলে। এখন প্রিমিয়াম জমা দেবে না কেন?

—আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশের মানুষকে একটা ইনস্যুরেন্স করার জন্য গলায় রক্ত তুলে বোঝাতে হয়, বিদেশে হয় না।

—দেখ দেবু এটা বিদেশ নয়।

—তাই জন্য তো তুমি একথা বলতে পারলে। আর আমাকে শুনতে হচ্ছে।

—আমি প্রিমিয়াম জমা দিচ্ছি আর তুমি কমিশন পাচ্ছো। তাই তো?

—তোমার প্রিমিয়াম কত?

—পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা।

—ফাইভ পার্সেন্ট কমিশনে হয় সাতাশ টাকা পঁচিশ পয়সা। আমি ওই টাকা তিনমাস অন্তর দিয়ে যাবো তোমাকে।

—এটা কেমন কথা হলো দেবু? এবার দুলালের গলায় উষ্ণতা। এখন আর ওকে বিপন্ন মনে হচ্ছে না।

—তুমি তো কমিশনের কথা তুললে। তাই বললাম।

—এই সব টেরা কথার কী মানে? তুমি পলিসিটা করিয়েছো তোমার কোনো দায়িত্ব নেই পলিসিটা চলছে কিনা?

---পলিসিটা করানো পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। তারপর তুমি পলিসি চালাবে কী চালাবে না, সেটা তোমার ডিসিশন।

—তোমার কোনো স্বার্থ নেই? দুলালের গলার স্বরের পারদ এবার আরও উঁচুতে উঠল।

দেবব্রত শান্ত গলায় বললেন---না, নেই। আমার কোনো স্বার্থ নেই। এখন আমি এজেন্সি করি না।

—তাহলে প্রিমিয়ামটা জমা করবো আমি আর কমিশন খাবে তুমি?

---ফালতু কথা একদম বলবে না। দেবব্রতর গলায় উঠে এল রাগ। বললেন—তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ। একবার তো বললাম কমিশনের টাকা আমি তোমায় দিয়ে যাবো।

—কেন আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে যাবো?

—আরে বাবা কমিশনের জন্যই তোমার এতো জ্বালা হচ্ছে।

—হওয়াটাই স্বাভাবিক।

—তুমি কি জানো কত মানুষ নিজের প্রিমিয়াম নিজে জমা দেয়?

—কে কী করে আমার দেখার দরকার নেই। আমি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি সারাদিন।

—হ্যাঁ। তোমার সায়ার ব্যবসা এখন কেমন চলছে?

—ভালো না।

—তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন?

—ফুসফুসের অসুখে ভুগছি।

—তার জন্য তো চেহারা এতোটা ভাঙার কথা নয়।

—চিন্তায়।

—কীসের চিন্তা?

—ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তার টাকা জোগান দেওয়া। সংসার খরচ বেড়ে গেছে। বউয়ের শরীর ভালো না। ব্যবসা আগের মতো নেই। সায়া সেলাই করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

—এসব প্রবলেম সবার আছে। তা নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ হবে না। আমি চলি।

—প্রিমিয়ামটা তাহলে তুমি জমা দেবে না? কমিশন খাবে। দেবব্রত কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলেন। দু'পাশে বস্তি। মাঝখানে সরু রাস্তা। প্রায় হন হন করে গলি রাস্তাটা পার হয়ে এলেন দেবব্রত। মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

।। দুই ।।

এটা কবিরাজ বাগান করাতকল। কাঠের গুড়ি মেশিনে ফেলে লম্বা করাত দিয়ে চেরাই করে তক্তা বের করা হচ্ছে। মুখে নাকে কাপড় বেঁধে কাজ করছে দু'টো লোক। আগে ছয়-সাতটা করাত কল ছিল এখানে। বড়ো বড়ো কাঠের গুড়ি ফেলা থাকতো মাঠ জুড়ে। এখন সেই মাঠে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠে গেছে। একটাই করাত কল সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সে দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেল দেবব্রত। পটারি পুকুরের কাছে এসে থামল। আগে এখানে একটা পটারির কারখানা ছিল। একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। পৌনে বারোটা বাজে। এখন কি শীতলদা থাকবেন? পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করে দিল দুলাল। শীতলদার বাড়িটা অনেক দূর। সেই পুরনো বন্ধ ম্যাচ ফ্যাক্টরির কাছে একটা গলির শেষ মাথায়। বাড়ির গায়ে বোর্ড। লেখা প্রতীতি প্রকাশন। শীতল দাস। দোতলা বাড়ি। নীচ তলায় প্রকাশনার অফিস। এগারোটায় যাবার কথা ছিল। নিশ্চয় বাজারে চলে গেছে শীতলদা। এক ঘণ্টার আগে ফিরবেন না। একবার ফোন করে নিলে ভালো হয়। এতোটা পথ। গিয়ে দেখা গেল শীতলদা নেই। মন খিচরে যাবে। দেবব্রত ফোন করলেন। ফোন বেজে গেল। ধরলেন না। তাহলে বাজারেই চলে গেছেন। নাকি নীচে অফিসে ফোন রেখে ব্রেকফাস্ট করতে গেছেন দোতলায়। এতো বেলায় কেউ ব্রেকফাস্ট করে? শীতলদা করেন। অদ্ভুত মানুষ এই লোকটা। গ্যাটের টাকা খরচ করে তিন মাস অন্তর একটা পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার নাম প্রতীতি। এই পত্রিকা সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ। পরিচয়। বন্ধুত্ব। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে ঠোঁটে জ্বলে উঠছে বিড়ির আগুন। মাঝে মধ্যে অসুস্থ হন। হার্টের অসুখ আছে। ডাক্তার বলেছেন, একটা ভালভ পালটাতে। সে ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেই। একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল— অপারেশন করিয়ে নিচ্ছেন না কেন? শীতলদা শীতল চোখে তাকিয়ে বললেন—ও অনেক টাকার ধাক্কা। চলছে চলুক না।

—সাহিত্যের পিছনে যে টাকা খরচ করছেন। হার্টের পিছনে করবেন না কেন?

—সাহিত্য আমার নেশা। নেশায় মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। শুনেছেন তো মহাভারতে পাশাখেলায় পাণ্ডবরা সর্বস্বান্ত হয়েছিল। জানেনেই তো সব। আপনি লেখক মানুষ।

—স্যার, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে? চিন্তা কেটে যায় দেবব্রতর। বলেন—বিপাশা তুই! কবে এলি?

—এক মাস হয়ে গেল। ফর্সা মুখে এক মুখ হাসল বিপাশা। ওর মুখটা নির্জন স্থানের মতো শান্ত। যখন তাঁর কোচিঙে পড়তো বিপাশা, তখনও মুখটা ছিল শান্ত। মনে হয় চোখের মণি দুটো নড়ে না। এতো ফর্সা বিপাশা যে মনে হয় ও একটা মেয়ে নয় একটা আলোর অবয়ব। এখন বিপাশার পিছনে

পটারি পুকুর। নোংরা জল। সেই জলে ফুটে আছে অসংখ্য জলপদ্ম। সবুজের বুকে লালের আভা। দারুণ লাগছে।

—আবার কবে যাবি আমেরিকায়?

—যাবো এক সপ্তাহ পর। ছ'মাস পর ফিরে আসব। তারপর আর যাবো না।

—মানে? প্রবল ভাবে চমকে ওঠেন দেবব্রত।

---আমেরিকার চাকরি ছেড়ে চলে আসবো।

দেবব্রত বড্ড ধাক্কা খায়। বলে কী মেয়েটা! আর আমেরিকায় যাবে না! সেদিন তেলেঙ্গা বাগানের মুখে দেখা হয়েছিল সুভাষদার সঙ্গে। বিপাশার বাবা। সেদিন তিনি বলেছিলেন—তোমার ছাত্রী লেকচারশিপ করছে একটা কলেজে। আর বোধ হয় আসবে না ভারতে। ওখানেই সেটেল করবে। আর আজ বিপাশা বলছে ও আর আমেরিকায় যাবে না। কিন্তু কেন? কবে দেখা হয়েছিল সুভাষদার সঙ্গে? তা প্রায় এক বছর হবে। এই এক বছরে কী হলো যে আমেরিকার মতো দেশের চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবে বিপাশা। এই দেশে কী আছে? দুলালের মতো অসংখ্য মানুষে ভর্তি একটা দেশ। সেখানে ফিরে আসবে বিপাশা? কেন? জিজ্ঞেস না করে পারলেন না দেবব্রত। বিপাশা বলল—আসুন না স্যার বাড়িতে। কথা বলা যাবে। চা খাবেন। একটু গেলে দুলালদের গলি রাস্তার শেষ মাথায় বিপাশাদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। একটু আগে সেই বাড়ি পার করে এখানে এসেছে সে। বললেন—চা! ওটা আমার কাছে এখন বিষ।

—আমরা যখন পড়তাম তখন তো খুব চা খেতেন ঐ সিগারেট খেতেন। এখন চা খান না? সিগারেট খান না?

—বিষ না খেয়ে এদেশে বাঁচা যায়?

বিপাশা হাসল। ওর সাদা মুখে আলো জ্বলে উঠল। বলল—তার মানে এখনও আপনি লিখছেন?

---পুরোদমে। এই তো এখন এক প্রকাশকের কাছে যাচ্ছি। প্রুফ আনতে।

---আমরা যখন পড়তাম আপনি আজকাল পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছিলেন ধরিত্রীর মৃত্যু। খুব ভালো গল্প। এখনও মনে আছে।

—বলিস কী রে! সে তো পনেরো বছর আগের লেখা। এখনও মনে রেখেছিস?

—রবীন্দ্রনাথ কোন যুগে কাবুলিওয়ালা লিখেছেন। আমরা কি ভুলে গেছি সেই গল্প?

—বেশ সুন্দর কথা বলতে শিখেছিস তো। লেকচার দিয়ে বুঝি এই গুণ অর্জন হয়েছে। বেশ ভালো। ছাড় এসব কথা। এখন তুই বল কেন আর আমেরিকায় যাবি না?

—কী বলবো স্যার আমার.... ফোনটা বেজে উঠল। ধরল বিপাশা। কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ফোনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল—স্যার আসছি। মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘরে বাবা নেই। আমি যাচ্ছি। পরে কথা হবে।

—ঠিক আছে। যা যা। তাড়াতাড়ি যা। দেখ কী হলো।

বিপাশার ফর্সা পা দ্রুত গলির বাঁকে অদৃশ্য হলো।

।। তিন ।।

সরু গলির শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে বর্তমানে থাকেন বিপাশার বাবা সুভাষদা আর বিপাশার মা। বিপাশাদের বাড়ির নীচতলায় একটা ছোট্ট রান্নাঘর। আর একটা শোবার ঘর। দোতলায় একটা ছোট্ট ঘর। তারপর বাকিটা ছোট্ট ছাদ। বিপাশা দোতলার ঘরে থাকতো, পড়াশোনা করতো। কখনো ছাদে মাদুর পেতে বইখাতা ছড়িয়ে পড়ত। কোনোদিন হঠাৎ বিপাশাদের বাড়ি গিয়ে দেবব্রত এই দৃশ্য দেখেছেন। সুভাষদার শিয়ালদায় একটা লটারির দোকান আছে। সারাদিন দোকানে থাকে সুভাষদা। ওর মা অসুস্থ অনেক দিন। কী অসুখ? সে জানে না। যখনই সুভাষদার সঙ্গে রাস্তায় কিংবা বাজারে দেখা হয়েছে বিপাশার কথাই জিগেস করেছেন। আসলে মাস্টারমশাইরা বুঝি সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই জানতে চান। অভিভাবকদের কথা নয়। যেমন বিপাশার মা'র কথা কোনোদিন জানতে চায়নি সে। আসলে ছাত্র-ছাত্রীরা হলো মাস্টারমশাইদের আত্মার অংশ। তাই জানতে চায় নিজেকেই। তার আত্মার অংশ কেমন আছে? কী করছে? এও এক প্রকার আত্ম অনুসন্ধান যে আমি মাস্টার হিসেবে সারা জীবন কী করলাম। দেশকে কী দিলাম?

না, আর একবার শীতলদাকে ফোন করা যাক। ফোন করতেই ধরলেন।

শীতলদা—আপনি বাড়ি আছেন?

---আছি মানে আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করছি।

—আমি তো ফোন করেছিলাম। কোনো সাড়া পেলাম না। আমি এখন পটারিপুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

—আমি ফোন নীচে রেখে টিফিন করতে উপরে গিয়েছিলাম। চলে আসুন।

—আসছি।

* * * *

গল্পের বইয়ের প্রুফের বান্ডিলটা নিয়ে ফিরছেন দেবব্রত। জামাই ডাকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দেখলেন বন্ধ স্কুল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ধীরেন পাল। ফ্যাকাসে ফর্সা মুখ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি বললেন—এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ম্যাচ ফ্যাক্টরির দিকে একটা কাজ ছিল। বাষট্টি বছর বয়স্ক দেবব্রত বললেন।

—তোমার নাকি শরীর খারাপ হয়েছিল। নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলে। তা এখন কেমন আছো?

—ভালো। আসি। কাজ আছে।

এই ধীরেন পাল চাকরি করতেন সরকারি অফিসে। এমন অফিসে যেখানে অবসরের পর পেনশন নেই। বরাদ্দ এককালীন টাকা। তা দিয়ে কি সংসার চলে? ঠাকুর বানান এই অসুস্থ শরীর নিয়ে। তবু দেবব্রতর বিশ্রী লাগছিল। সত্তর বছর বয়স্ক ধীরেন পাল বস্তির রাস্তায় হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে বসে আছেন। দামড়া দামড়া লোকগুলো হাফপ্যান্ট পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকী তরুণী মেয়েগুলো হাফপ্যান্ট, ছেঁড়াফাঁটা প্যান্ট পরে রাস্তায় পার্কে ঘোরাঘুরি করছে। ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। কবিরাজ বাগানের করাত কল পার করে দেবব্রত ঢুকে পড়ল আবার সেই শীর্ণ গলিতে। এসে দাঁড়াল বিপাশাদের বাড়ির কাছে। ওর কাছে জানতে হবে আমেরিকার মতো দেশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও কেন এদেশে চলে আসতে চাইছে। ওর

মা অসুস্থ। সেটা মারাত্মক অসুখ নয়। সুভাষদা সুস্থ। এখনও শিয়ালদায় দোকানদারি করেন। বিয়ে এখন বিপাশা করবে না। সুভাষদা একদিন রাস্তায় দেখা হতে সেকথা বলেছিলেন। তাহলে কেন ও ওই দেশ থেকে চলে আসতে চাইছে? এখানের কোনো একটা কলেজে পার্টটাইম পড়াচ্ছিল। তারপর স্কলারশিপ পেয়ে চলে গেল আমেরিকায়। দু'বছর পর ফিরে এল। তারপর চাকরি নিয়ে চলে গেল আমেরিকায়। সুভাষদার মুখে গর্বের আলো। মোবাইলে আমেরিকায় বিপাশার ঘোরাঘুরি, ওর ক্লাস নেওয়া আরও নানা কাজের মুহূর্তের দুর্লভ ছবিগুলি তাকে দেখিয়েছিল। সেই বিপাশা বলছে, আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবে! ওদেশে যাবার জন্য, পড়াশোনা, পরীক্ষা, পিএইচডি, কত কিছু করে, কত অর্থ ব্যয় করে নিজেকে যোগ্য করছে। এখন চলে আসতে চাইছে! কী এমন ঘটল এই দু'বছরে? মেয়ে আমেরিকার কলেজে পড়ায়, সুভাষদার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গর্বের আলোতে। সে দেখেছে অনেকদিন মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলে। গর্ব হওয়াটা তো স্বাভাবিক। এখন প্রায় প্রতিটি ছেলে-মেয়ে কেরিয়ারিস্টিক। তাঁরা বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকায় যাবার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলে। সুভাষদার দেখানো সেই ছবিগুলিতে বিপাশাকে দারুণ সুখী হাসিখুশি আর স্বর্গীয় আনন্দে ভেসে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। সেই বিপাশা বলছে আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবে! কেন? এই প্রশ্নটা দেবব্রতকে ভাবিয়ে তুলেছে। জানতেই হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে জানতে পারছে না। বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। বোধ হয় ওর মাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছে। সুভাষদা বা বিপাশা কারও মোবাইল নম্বর তাঁর কাছে নেই। আবার আসতে হবে। জানতে হবে বিপাশা কেন এই অভাবের দেশে ফিরে আসতে চাইছে। পুস্তক ভবনের গলি দিয়ে বেরিয়ে আসতে আবার দুলালের বাড়িটা বাঁদিকে পড়ল। যাবার সময় ডানদিকে পড়েছিল। পাঁচশো চুয়ান্ন টাকার প্রিমিয়াম আনার জন্য এক সময় দুলালের কাছে দু'তিনবার যেতে হতো। অন্য এজেন্ট হলে যেত না। তার মনে পড়ল অমলেশ, বৃন্দাবনদা, কাকলি এদের পলিসি করে দেবার পর দ্বিতীয় বছর প্রিমিয়াম আনতে গেলে তারা বলেছিল, আমরা নিজেরা আমাদের প্রিমিয়াম জমা করে দেবো। আপনাকে আসতে হবে না স্যার। শুনে সেদিন দেবব্রতর খারাপ লেগেছিল। ওরা বোধ হয় তাকে বিশ্বাস করছে না। টাকা নিয়ে যদি সে প্রিমিয়াম জমা না দেয়। শিক্ষক হিসেবে সেদিন তাঁর সম্মানে বড়ো আঘাত লেগেছিল। যদি অবিশ্বাস করেও থাকে ওরা, অন্যায় কিছু করেনি, একটু ভাবতে এটা মনে হয়েছিল। কারণ অনেক এজেন্ট প্রিমিয়ামের টাকা পলিসি হোল্ডারের কাছ থেকে নিয়েও অফিসে জমা করে না। আত্মসাৎ করে ফেলে। অভাবী এজেন্ট। অবশ্য সে ওদের চেক দিতে

বলতে পারতো। অনেকের চেকবই নেই। কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। হঠাৎ তার দুরন্ত পা দু'টো রথীনের ঘরের দরজার কাছে থেমে গেল। সোফায় বসেছিল রথীন। তিনি বললেন—তোর দুটো প্রিমিয়াম ডিউ পড়ে গেছে। কী ব্যাপার?

—জানি স্যার। একটু অসুবিধার মধ্যে আছি। দিয়ে দেবো দু'টো এক সঙ্গে। ভিতরে আসুন না স্যার।

---না। থাক। অসুবিধা! কীসের অসুবিধা?

---আমি তো মেডিক্লেমের এজেন্সি নিয়েছি।

—কেন? কাপড়ের ব্যবসা কী হলো?

—করোনার পর বাজার খারাপ হয়ে গেছে।

—পলিসি উঠছে?

—হচ্ছে স্যার। সবে নেমেছি তো।

—হ্যাঁ। সময় লাগবে। তবে প্রথমে নোন সার্কেলে ঢুঁ মার।

---তাই তো করছি। আপনি কিছু রেফারেন্স দেবেন স্যার।

—অবশ্যই দেবো। আমি এখন এজেন্সি করছি না। কেউ বললে তোর কাছে পাঠাবো। এলআইসি ডিউ লিস্ট পাঠায় বলে দেখলাম তোর দু'টো কিস্তি ডিউ পড়ে গেছে।

—স্যার চা খেয়ে যান।

---না। তাড়া আছে। ছেলে কেমন আছে? বউ, বাবা?

—সবাই ভালো আছে স্যার। ওরা একটু বেরিয়েছে।

—আসছি। আশ্চর্য! রথীন সারা ভারত ঘুরে কাপড় বেচতো। নানা রাজ্যে গিয়ে হোটেল ভাড়া নিয়ে থাকত ওরা। একটা টিম যেত। হোটেলের লোকদের কাছ থেকে কাস্টমারের ফোন নম্বর জোগাড় করতো। তারপর ফোনে কন্টাক্ট করে সেই সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। তখন আর বাইরে না গিয়ে এই হরিশ নিয়োগী রোডের ওপর সব ঝা চক চকে সুন্দর শাড়ির দোকান করেছে। রথীন ততটা সম্পদ করে উঠতে পারেনি। তবে শাড়ির ব্যাবসাটা খারাপ চলছিল না। কিন্তু করোনার পর আর ব্যবসায় সেই জোয়ার নেই। এখন ভাটা। এদিকে রয়েছে সংসার। তাই রথীনের মতো ছেলেরা এখন অন্য ব্যাবসায় গা ভাসিয়েছে। যে দেশে কর্মসংস্থানের এতো সমস্যা। শিল্প নেই। চাকরি তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। সেই দেশে বিপাশা ফিরে আসতে চাইছে! এতো আলো থেকে অন্ধকারে ফেরা! এর পিছনে কারণ কী? সেটা জানতে হবেই।

।। চার।।

প্রুফ দেখছিলেন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন দেবব্রত! আজকাল চেনা পাড়া দিয়ে যেতে ভয় হয়। সেদিন সে আসছিল শেঠবাগান দিয়ে। হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল রবি। বলল—কাজটা কি আপনি ঠিক করলেন স্যার?

দেবব্রত একটু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন—কী ব্যাপার রে! আমি আবার কোন খারাপ কাজটা করলাম? পড়াশোনা করতিস না, তাই বকাঝকা করেছি। সে তো কত বছর আগের কথা।

—সে কথা হচ্ছে না। আপনি প্রিমিয়াম নিতে আসছেন না আর আমারও ব্যবসার চাপে মনে থাকছে না। পলিসিটা তো ল্যাপস হয়ে গেল। দশ হাজার টাকা ফরফিট হয়ে গেল।

—তার জন্য তুই আমাকে দায়ী করছিস কেন? আমি তো তোকে রিমাইন্ডার দিয়েছি। এমনও বলেছি মিনিমাম তিন বছর পলিসি চালাবি। বল বলিনি?

---বলেছেন। কিন্তু আমরা ব্যবসায়ী মানুষ ভুলে যাই। আবার যখন মনে পড়ে তখন টাকা থাকে না। আপনি যদি আসতেন ঠিক টাকা জোগাড় করে দিতাম।

—প্রিমিয়াম দিসনি ক'বছর হয়েছে?

—দু' বছর।

—এখনো চালু করতে পারবি।

—ফাইন দিতে হবে তো?

—সে তো দিতে হবে।

—তখন আপনি জোর করে পলিসি করালেন। তারপর আর আপনার কোনো দায়িত্ব নেই?

সেই দুলাল রবির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বললাম—আমি পাঁচশোর ওপর পলিসি করিয়েছি, তাঁরা প্রিমিয়াম জমা করছে না? যা বলছি শোন। সল্টলেক অফিসে যা, অমিতাভ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে পলিসিটাকে চালু কর। গালটালগুলো এতো ফুলেছে কেন? খুব মদ খাচ্ছিস?

—রবি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

—মেয়ের বয়স কত হলো?

—দশ বছর।

—আর রিংকি কেমন আছে? কোচিঙে পড়ার সময় তো প্রেম করেছিলি। যাক, এখনো সেই প্রেম আছে তো?

—মাথা নীচু করে থাকে রবি।

—আমার ওপর রাগ করিস না। আমি এখনো পুরো সুস্থ নই। ধর আমি যদি এই পৃথিবীতে না থাকতাম তুই কি পলিসিটা বন্ধ করে দিতিস? মেয়ে আর রিংকির কথা ভেবে পলিসিটা আবার চালু কর।

—এখন কতগুলো টাকা। ছোটাছুটি। আপনি আসলে—

আর বাকিটা শোনার জন্য দেবব্রত দাঁড়ায়নি। যখন ফুল দমে সে এলআইসি করছিল তখন কতজনের কাছে যে কতবার প্রিমিয়ামের জন্য ছুটতে হয়েছে, তার হিসেব নেই। আজ না, কাল আসুন। এখন নয়, তখন। এবেলা নয়, ওই বেলা আসুন। রাত দশটার পর আসুন। আরও কত বাহানা। কোচিঙে ভাটা পড়েছিল বলে এলআইসির এজেন্সি। যন্ত্রণা বুকে চেপে এই প্রফেশনে ষোলোটা বছর কাটিয়েছে সে। এছাড়া অদ্ভুত কিছু পলিসি হোল্ডার ছিল। তারা বলতো–এতো তাড়া দিচ্ছেন কেন? এক মাস তো গ্রেস প্রিরিয়ড রয়েছে। সে বোঝাতে পারতো না যে এই গ্রেস প্রিরিয়েডের মধ্যে কিছু হলে ডাবল এক্সিডেন্ট ডেথ বেনিফিট পাবে না। তারা অহংকারের সঙ্গে বলত—না না, এখন মরছি না। এই অবুঝ, অসচেতন, মৃত্যুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া মানুষের দেশে ফিরে আসতে চাইছে বিপাশা! সকলের স্বপ্ন আমেরিকায় চাকরি করতে যাবে। যে দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা সঙ্গে সঙ্গে পলিসি করে সন্তানের জন্য। আর এখানে যখন পলিসি হলো কিন্তু কোনো কমিশন পেল না এজেন্ট। কারণ শর্তই ছিল প্রথম বছরের কমিশনের টাকা পলিসি হোল্ডারকে দিতে হবে। অলিখিতভাবে এই চুক্তি চলে এসেছে। তাহলে তার কী লাভ?

পলিসি চালালে পরের বছর থেকে ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন সে পাবে। প্রথম বছরের মোটা কমিশনের প্রিমিয়ামটা খেয়ে নিল। সেই দেশে ফিরে আসতে চাইছে বিপাশা! যারা আমেরিকায় গেছে তাঁরা সেই দেশের নাগরিকত্ব পাবার জন্য অপেক্ষা করে। পেলে মনে করে স্বর্গ পেল। সেই স্বর্গ থেকে ফিরে আসতে চাইছে নিজের দেশে। বিপাশা এই সিদ্ধান্ত নিল কেন? জানতেই হবে।

আবার প্রুফে মন বসাতে চাইলেন দেবব্রত। পারলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে রণবীর সামন্তকে ভোট দিন। উলটোদিকে বাড়ির দেওয়াল লিখনে চোখ পড়তে রণবীরের মুখটা মনে পড়ল। এই রণবীর ভোটে দাঁড়ায়নি। এই রণবীর তাঁর ছাত্রীর দাদা। রণবীর বড়ো ব্যবসায়ী। ব্যবসা রেডিমেড গার্মেন্টের। হাওড়া ও হরিশা হাটে তাঁর দোকান আছে। চারতলা বাড়ি আছে। কোটি কোটি টাকার মালিক। এলআইসি করেছে একটা চেক সই করতে বললে ডাক দেবে স্ত্রী কল্যাণীকে। একদিন দেবব্রত বলেছিল—আপনি সই করুন না। বউকে ডাকছেন কেন?

—না মানে..... রণবীরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেবব্রত তবু আপনি বলে। বলেছিল—কল্যাণী এখন বুঝি ব্যস্ত আছে। আজ আপনিই সই করুন। সই করতে দশ মিনিট লেগেছিল। কলম ভেঙে ফেলে আর কী। লেটারগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। দেবব্রত বলেছিলেন—চেক পাশ হবে তো?

—হয়ে বেশি। ব্যাংক ম্যানেজার আমাকে চেনে। আমার চেক আটকাবে না।

—তাহলে কল্যাণীকে ডাকেন কেন?

—ব্যাপার আছে মাস্টারমশাই।

সত্যি সেই হেলানো বাঁকানো লেটারে সই করা চেক দিব্যি পাশ হয়ে গিয়েছিল। আবার একটা এলআইসি'র জন্য গিয়েছিল দেবব্রত। রণবীর বলেছিল—-এলআইসি অনেক আছে। এলআইসি আর নতুন করবো না। ওই যে কী বলে অসুখ হলে টাকা পাওয়া যায় তার একটা করবো।

—মেডিক্লেম?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাসি ফুটে ওঠে সেভেন ফেল রণবীরের মুখে। বলে—মেডিক্লেম কি আপনি করেন?

—হ্যাঁ করি।

তখন এলআইসি'র পাশে সদ্য জিআইসি'র লাইসেন্স নিয়েছেন দেবব্রত। একটা মেডিক্লেম করল রণবীর। প্রিমিয়াম বছরে চল্লিশ হাজার। দু'বছরের মাথায় পুজোর সময় অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করে বসলো রণবীর। পুজোয় ছুটি। ক্যাশলেস হয়নি। নগদ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে অপারেশন করেছে। সেই টাকা আদায় করে দিতে হবে তো। যাকে বলে রি-এমবাসমেন্ট। জেনারেলি অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া অন্য রোগে তিন বছরের আগে ক্লেম পাওয়া যায় না। দেবব্রতর ভিতর শুরু হলো টেনশন। অফিসের কাগজপত্র সই করে চিকিৎসার অরিজিন্যাল কাগজপত্র নিয়ে সে যখন চলে আসছে, তখন রণবীর ডাক দিল—মাস্টারমশাই শুনুন।

---দেবব্রত দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—ডাকলেন কেন?

—এটা কি আপনার প্রথম ক্লেম?

—হ্যাঁ।

---আপনি কি ক্লেম নিয়ে টেনশন করছেন?

—না—মানে। তিন বছরের আগে—

—শুনুন। তিরিশ হাজার টাকার কেস। কেন ক্লেম দেবে না আপনি ভাবছেন? টাকা দেবে কোম্পানি। না দিলে আমাকে অফিসে নিয়ে যাবেন। অফিসারের সামনে আমি জামাপ্যান্ট খুলে দাঁড়িয়ে যাবো, দেখি টাকা না দেয় কী করে? আপনি একদম টেনশন করবেন না।

—যতটুকু টেনশন ছিল দেবব্রতর ভিতর, রণবীরের কথা শুনে চতুর্গুণ বেড়ে গেল। কোটি কোটি টাকার মালিক রণবীর মাত্র তিরিশ হাজার টাকার জন্য নগ্ন হতে পারে! ভাবা যায়! এই দেশে ফিরে আসতে চাইছে বিপাশা! কেন? বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর। তাঁর ছাত্রী আমেরিকায় প্রফেসারি করে, এই সুপ্ত অহংকারটা ভেঙে দেবে বিপাশা?

।। চার ।।

কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না দেবব্রতর। ছাদে চাঁদের সাদা আলো। একটা ফাঁকা চেয়ার।

বিপাশা বলল—স্যার, আপনি বসুন। দেবব্রত বসলেন। বিপাশার মুখে এখন কোনো উদ্বেগ নেই। ওর মা ভালো আছেন। তিন বছর আমেরিকায় থেকে গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হয়েছে বিপাশার। আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই ক্লাস নাইন-টেনে পড়া বিপাশাই রয়েছে। সত্যি কি তাই? এখন বিপাশার বয়স কত হবে? তিরিশ একত্রিশ। বিপাশা বলল—স্যার, আপনার কী দরকার আছে বলছিলেন এখন বলে ফেলুন।

কীভাবে কথা শুরু করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না দেবব্রত। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যাপারে কি কিছু জিগ্যেস করা যায়? অথচ সেদিন পটারি পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে বিপাশার বলা কথাটা তাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বার বার মনে জেগেছে বিপাশা কোথাও ভুল করছে। ওর প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তার একটা কর্তব্য আছে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে না তো?

—কী হলো স্যার চুপচাপ আছেন কেন? বলে ফেলুন।

বিপাশা গলার স্বর খুব স্বাভাবিক। কিন্তু দেবব্রত আজ স্বাভাবিক হতে পারছেন না। একরাশ দ্বিধা তাকে জড়িয়ে ধরেছে আর্দ্র বাতাসের মতো। দেবব্রত সেই দ্বিধান্বিত গলায় বললেন—একদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তুই কিছু মনে করবি না তো? সেই পুরনো হাসি। সেই আগের স্বর। বিপাশা বলল—কিছু মনে করবো না। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। আপনি তো আমাদের সঙ্গে ক্লাসে খোলামেলা আলোচনা করতেন। আজ দ্বিধা করছেন কেন?

—সেদিন তুই বলছিলি আমেরিকার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে আসবি। কেন?

বিপাশা কোনো উত্তর দিল না। ছাদের কার্নিশের কাছে চলে গেল। ছাদ থেকে উঁকি দিল নীচের দিকে। তারপর একবার আকাশের দিকে তাকালো। ছাদে ক'টা ফুলগাছ আছে। তার ওপর হাত বোলাল। আবার সামনে এসে দাঁড়াল।

—সবাই যেখানে বিদেশে বিশেষ করে

আমেরিকায় চাকরি করতে যায়, সেখানেই সেটেল হয়। তুই ফিরে আসতে চাইছিস কেন?

বিপাশা এবারও চুপ। মাথার চুলে হাত বোলাল একবার। অকারণে ঠোঁট মুছল। চুড়িদারের ওড়না ঠিক করল। তারপর ধীর স্থির শান্ত গলায় বলল—আমি জানি স্যার আর পাঁচজনের মতো আপনি আমার এই ব্যাপারটা সাপোর্ট করবেন না।

—তুই আগে বল। আমি শুনি। তারপর আসছে সাপোর্ট করা, না করা।

—আমার আমেরিকা দেশটা ভালো লাগছিল না।

কথাটা শুনে দেবব্রত প্রথমে ধাক্কা খেল। আমেরিকা দেশটা ভালো লাগছিল না! স্বপ্নের দেশ। পর মুহূর্তে তাঁর মনে হলো একজনের আমেরিকা ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু কেন ভালো লাগছিল না? সেটা তো জানতে হবে। বিপাশা বলল—ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ একদিন আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটার কথা মনে পড়ল। একদিন মনে পড়ল আমার পড়ার ছোট ঘরটার কথা। এই ছাদটার কথা। এই ফুল গাছগুলোর কথা। একদিন দুপুরবেলা চোখে ভেসে উঠল আমার লাল স্কুল বাড়িটা। আরও আশ্চর্য আমার পড়ার ঘরে জানলায় বসে দু'টো শালিক ঝগড়া করতো। সেই শালিক দুটোর জন্য মন ভীষণ খারাপ থাকতো। স্কুল থেকে ফেরার সময় পুরনো কাঠ পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতো এক অন্ধ ভিখিরি। টিফিনের পয়সা থেকে ওকে দিতাম কোনো কোনো দিন। ওর কালো মুখে গর্তে ঢোকা বোজা চোখ দু'টো। আমার চোখে ভাসতো। কতদিন বিকেলে মরা আলোর মতো মা'র মুখটা জেগে উঠতো। মায়ের অ্যাজামা আছে। মাঝে মাঝে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আমার কোনো দাদা বা ভাই নেই। বাবাকে দোকান, হাসপাতাল ছুটতে হয়। এবার নিঃশ্বাস ফেলল বিপাশা। শ্বাস নিল। কিছু সময় চুপচাপ থেকে বলল—ছ'মাস আগেই চলে আসতাম। সেশন শেষ না করে তো আসতে পারছিলাম না।

দেবব্রতর মনে হচ্ছিল এগুলি কারণ হলেও হতে পারে। এর বাইরেও অন্য কোনো কারণ আছে। এগুলো তো স্বাভাবিক কারণ। এমনটা তো হবার কথা ছিল। তখন হয়তো আমেরিকায় যাবার আতিশয্যে মনে জেগে ওঠেনি এসব ভাবালুতা। তখন চোখে শুধু আমেরিকা! আমেরিকা! আমেরিকা! স্বপ্নের দেশ! রূপকথার দেশ! সব পাওয়ার দেশ! অহংকারের দেশ! সুখ সমুদ্রের দেশ!

---তুই যা বললি একে বলে পিছুটান। কিছুটা দায়িত্ববোধ। কিন্তু আমার মনে হয় এর বাইরেও একটা কিছু আছে। সেটা কী? বিপাশা মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। পুরনো আকাশ। সেদিক তাকিয়ে বিপাশা বলল—আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার। আর একটা কারণ তো আছে।

—বল সেটা। সেটাই তো শুনতে চাইছি।

—আমি আমেরিকায় চাকরি করি তাই সকলে আমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। ভাবে এই মেয়েটার ভেতর কত মেধা! কত বুদ্ধি! কত পড়াশোনা! আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ে সে নয়! যেখানেই যাই খুব খাতির যত্ন করে। একদিন মামাবাড়ি গেছি, সঙ্গে আমার আর এক মাসতুতো বোন রতি, মামারা আমাকে কত আদর যত্ন করছে, রতির দিকে তেমন তাকাচ্ছে না। যতটুকু না করলে নয় ততটুকু যত্নই রতিকে করছে। তাকে যত্ন বলে না অবহেলা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই বৈষম্য কেন? আমি রানি হতে চাই না। যেখানেই গেছি এই অতিরিক্ত ভালোবাসা, খাতির আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি একটা সাধারণ মেয়ে হয়ে থাকতে চাই। এটুকু স্বাধীনতা আমার থাকবে না?

দেবব্রত চুপ। কোনো কথা বলতে পারছিল না। বলল—আসি।

—দাঁড়ান স্যার, আরও একটা কারণ আছে।

দেবব্রত আবার বসে পড়ল। এরপর আর কী কারণ থাকতে পারে?

স্যার আমেরিকায় এতো সুখ আমার ভালো লাগছিল না। আমার এই না-পাওয়া, আধ-পাওয়া দেশই ভালো। এখানের কোনো একটা কলেজে পড়াবো।

মানুষ সুখের পিছনে ছুটছে। সুখ, আরও সুখ! আরও টাকা! আরো সম্পদ! সেখানে বিপাশা কি অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে গেল? দেবব্রত দেখলেন বিপাশা পুরনো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন আকাশে বহু পুরনো নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলছে। □

নন্দরানির মুক্তিযুদ্ধ

বাসুদেব ধর

নন্দরানির সংসারে সদস্য বাড়লো। রাতভর বৃষ্টি ছিল, ভোরের দিকে ধরে আসে। কিন্তু আকাশে এখনো মেঘের রাজত্ব। অন্ধকার সরিয়ে আলো ছড়াতে সূর্য যেন যুদ্ধ করছে। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে নন্দর। দোর খুলেই দেখে বারান্দায় শেফালি বসে আছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। নন্দর আগমন টের পায়নি।

উঠোনে জল জমেছে। বৃষ্টি হলেই জল জমে। সরতে সময় নেয়। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, আজ বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে। নন্দ শেফালির কাছে এসে দাঁড়ায়, কীরে আমায় ডাকিসনি কেন? অনেক বেলা হয়ে গেল যে!

শেফালি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই কোলে কুকুরের বাচ্চাটা চোখে পড়লো। শেফালি বলে, তুমি ঘুমাচ্ছিলে মাসি, তাই ডাকিনি। কুকুরের বাচ্চাটা দেখো মাসি, ওই কামিনী ফুলের গাছের নীচে বসে কুঁইকুঁই করছিল। ভিজে একশা। মায়া হলো, তুলে নিয়ে এলাম। খুব সুন্দর না মাসি?

শেফালির বলার ধরন দেখে হেসে ফেলে নন্দ, আমাদের সংসারে সদস্য সংখ্যা বাড়লো মনে হচ্ছে। তোর হাতে যখন পড়েছে। এখন কাজে যা। দেরি হলে সামলাতে পারবি? স্কুল কামাই করবি না কিন্তু!

মাসির কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই শেফালির। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, নামও একটা রেখে দিয়েছি মাসি, ডগি। ভালো নাম না? কুকুরের বাচ্চাটা কেমন নিশ্চিন্তে শেফালির কোলে মুখ গুঁজে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে নন্দর দিকে। নন্দ লক্ষ্য করে, এরই মধ্যে শেফালির ডগি বুঝে গেছে, তাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে না। নন্দরও মায়া হচ্ছে, সদ্য জন্ম নেয়া বাচ্চা। কিন্তু কীভাবে বাড়ির আঙ্গিনায় এল বোঝা যাচ্ছে না। একটা আশঙ্কাও হচ্ছে, আশপাশে নিশ্চয়ই আরও বাচ্চা-সহ মা-ও আছে। এরাও যদি ঢুকে পড়ে তাহলে সমস্যা হবে।

শেফালির ভেতর চলে যাওয়া দেখলো নন্দ। মেয়েটা বড্ড মমতাময়ী। এই শেফালিকেও কুড়িয়ে পেয়েছিল নন্দ। স্থানীয় কালীমন্দিরের পুরোহিত কমলাকান্ত চক্রবর্তী, নন্দ যাকে ঠাকুরদা ডাকে, এক সকালে ডেকে পাঠায় নন্দকে। মন্দিরে ছুটে গেলে কমলাকান্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কোলে এক শিশু, প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছিল। সদ্যোজাত বাচ্চা, কিছুতেই থামাতে পারছেন না কমলাকান্ত। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নন্দর কোলে শিশুটিকে তুলে দেন, আমাকে তুই বাঁচা নন্দ। তুই ওকে নিয়ে যা।

কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নন্দ। আর আশ্চর্য, নন্দর কোলে এরই মধ্যে চুপ হয়ে গেছে শিশুটি। এখনো গায়ে সদ্য জন্মের রক্তের দাগ। জন্মের পর ভালো করে পরিষ্কার করা হয়নি।

দেখছিস, তোকে চিনে ফেলেছে এরই মধ্যে। আমি বাঁচলাম বাবা। সকালে মন্দির খুলতে এসে দেখি, বারান্দায় কাঁথায় জড়ানো শিশুটা কাঁদছে। এক সব্বোনাশার কাজ। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগেই কেউ রেখে গেছে। ভাগ্যিস কুকুর-বেড়াল এসে পড়েনি। আমি তো ফেলে রাখতে পারি না। কোলে তুলে নিলাম, পুজা আমার মাথায় উঠলো। কোথায় ফুল তোলা, কোথায় জোগাড় যন্তর। এখন যা, আমি চানটান করে পূজার কাজ করি। ওবেলায় গিয়ে দেখে আসবো।

এর মধ্যে নন্দ একটা কথা বলারও সুযোগ পায়নি। সবকিছু কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে। একবার ঠাকুরদা একবার শিশুটির দিকে তাকায়। পাড়ার অনেকে ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না নন্দ। শিশুটি নন্দর বুকে মুখ গুঁজে আবার কান্না শুরু করেছে। খিদে পেয়েছে সম্ভবত।

কমলাকান্ত আবার কাছে এসে দাঁড়ান। নন্দর মাথায় হাত রাখেন। বলেন, তুই তো ছেলে-মেয়ের মা হতে পারলি না। আমার মা কালী ওকে তোর কাছেই পাঠিয়েছেন। আজ থেকে তুই-ই ওর মা। এখন যা। আমি পূজায় বসবো। অনেক কাজ পড়ে আছে।

নিঃশব্দে কিছু সময় গড়িয়ে যায়। নন্দ কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। এক সময় বলে, ঠাকুরদা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আমার কাছে থাকবে, গ্রামের মানুষ কী বলবে। পরে এ নিয়ে ঝুটঝামেলা হলে আমি কী করবো? আমার ভয় হচ্ছে।

কোনো ভয় নেই। আমি ওবেলা থানায় গিয়ে পুরো বিষয়টি জানিয়ে আসবো। তুই এখন যা, শিশুটিকে কিছু খাওয়া। ওকে বাঁচা। বুঝতেই তো পারছিস, কোনো পাষণ্ডের কাজ। তোর ঘরে দুধটুধ নিশ্চয়ই আছে। তোর কোনো কষ্ট হবে না। দ্যাখ, শিশুটি আশ্রয় না পেলে মারা যাবে। ও তো কোনো পাপ করেনি নন্দ, ঠাকুরদা অভয় দেন। উপস্থিত সবাই কমলাকান্তকে সমর্থন করেন।

* * * * *

সেই তেরো-চোদ্দ বছর আগের ঘটনা। সেদিনের ঘটনা স্বপ্ন মনে হয়। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে নন্দকে। একদিকে দোকানপাট সামলানো, অন্যদিকে শিশুটিকে মায়ের যত্নে বড়ো করা। অনেকটা যুদ্ধের মতো। ঠাকুরদা পাশে ছিলেন, নানাভাবে সহায়তাও করেছেন। কিছুদিনের মধ্যে নন্দ বুঝতে পারে, এই শিশু তাকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। তারও মা হওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল। শেফালি সেই বাসনা পূরণ করেছে। এখন শেফালি বড়ো হয়ে গেছে। নন্দই আসল মা, যদিও মাসি ডাকে। নামটা রেখেছেন ঠাকুরদা। বলেন, শেফালিফুল আমার মায়ের পুজোয় দিই। মায়ের মন্দিরে ওকে পেলাম। ওর নাম শেফালিই থাকুক।

শেফালি সকাল থেকে নন্দর সঙ্গে কাজ করে হোটেলে। এগারোটা বাজতেই স্কুলে যায়। বিকেলে ফিরে আবার হোটেলে থাকে, খদ্দের সামলাতে নন্দকে সাহায্য করে। সন্ধ্যার পর শেফালিকে কোনো কাজ করতে দেয় না নন্দ, পড়তে বসিয়ে দেয়। ভাবে, লেখাপড়াটা আপাতত চালিয়ে যাক, তারপর একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুলে ভর্তি করার পর নন্দ নিজেই নিয়ে যেত। আবার ছুটির পর নিয়ে আসতো। স্কুল কাছেই। প্রথম দিকে হোটেল আর স্কুলের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ করতে হতো। ভাগ্য ভালো স্কুল খুব দূরে নয়।

অতীত মাঝেমধ্যে সামনে চলে আসে নন্দর। তখন আনমনা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আকাশে মেঘে মেঘে আলোর আভা ফুটছে। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি সূর্যের দেখা মিলবে না। ভোরবেলাটা খুবই প্রিয় নন্দর। কিন্তু ভোর দেখা হয় না কখনো। একটু বেলা হলে ফুরসতই মেলে না। অন্যদিকে রাত আটটা-ন'টার আগে বিশ্রাম নেই। দুপুরে শুধু একটু গড়িয়ে নেয়। আজ অবশ্য একটু বেলা হলে আপত্তি নেই। বৃষ্টি-বাদলার দিনে, এত তাড়াতাড়ি খদ্দের আসবে না। তাছাড়া দুলাল হোটেলেই থাকে। ভোরে উঠে ঝাঁটা দেয়, জল ছিটায়, ধূপধুনো দেয়। তারপর উনুন জ্বালায়। ময়দা মাখতে বসে। এই উনুন নেভে রাতে। সকালে জলখাবার, দুপুরে ভাত, বিকেলে পুরি-সিঙ্গারা। চা সারাদিনই।

হোটেল শুরুর প্রথম ধাক্কাটা সামলায় দুলাল।

॥ দুই ॥

নন্দর সংসার ছোটো নয়। দুলাল ছাড়াও নন্দর হোটেলে কাজ করে নাসির। নাসির অবশ্য হোটেলে থাকে না, পাশের গাঁয়ে বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকে। ভোরে চলে আসে, সন্ধ্যার পর ফিরে যায় মায়ের কাছে। নাসিরের মা সুফিয়া বেওয়া বলেন, নাসির আসলে নন্দরই ছেলে। দুলালের জন্ম রাস্তার ওধারে দাশপাড়ায়। জন্মের পরপরই মা মারা যায়। বাবা আরেকটা বিয়ে করে। নতুন সংসারে জায়গা হয়নি ছোট্ট শিশুর। মা ছিল নন্দর সই। ছোট শিশু দুলালকে ফেলতে পারেনি নন্দ। কোলে তুলে নেয়। সেই থেকে নন্দর কাছেই থাকে। নাসির ও দুলাল প্রায় সমবয়সি। ১৫/১৬ বছর বা আশপাশে।

নন্দর বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেক হেঁটে ডানদিকে পাকা রাস্তায় উঠলেই মোড়ের মাথায় হোটেল। নন্দর সংসারে একটা বেড়ালও আছে, নন্দর পিছু পিছু হোটেলে আসে, আবার রাতে হোটেল থেকে বাড়ি ফিরে যায়। নন্দর ঘরে থাকে। রাস্তার মোড়ে মাত্র কয়েকটা দোকান ছিল, স্টেশনারি, মুদি, জামা-কাপড়, জুতা, ওষুধ, বেকারি আর মিষ্টির দোকান। এছাড়া রয়েছে স্থায়ী কয়েকটা সবজির দোকান, রেডিয়ো-টেলিভিশন মেরামত, বিকাশ-ফ্লেক্সির দোকান ইত্যাদি। একটা চায়ের দোকান হয়েছিল, কয়েক মাসের মধ্যে উঠে যায়। নন্দর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারেনি। এই মোড়ে এখন বহু দোকানপাট। ব্যস্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে। নন্দ প্রথমে ভেবেছিল চায়ের দোকান দেবে, কিন্তু ধীরে ধীরে কীভাবে চায়ের দোকান থেকে হোটেলে পরিণত হয়ে গেল মনে পড়ছে না। তবে এটা ঠিক খদ্দেররাই এটাকে হোটেলে পরিণত করেছে।

নন্দর দোকানের চা, পরোটা-সবজি, ডিম-পরোটা আর পুরি-সিঙ্গারার স্বাদই আলাদা। দুপুরে ভাত, মাছ, মুরগি। ডাল, তরকারি। সব রান্নাই নিজের হাতে করে নন্দ। চা মাঝে-মধ্যে নিজের হাতে বানায়। অন্য সব দুলাল-নাসির মিলে। এরই মধ্যে ওরা পাকা হয়ে উঠেছে, বয়স কাজে বাধা হয়নি। শেফালি সকালে ও সন্ধ্যেয় যতক্ষণ দোকানে থাকে পয়সাকড়ি সামলায়, হিসাবপত্র ঠিক রাখে। এরই মধ্যে পাকা হিসাবি হয়ে গেছে। নন্দ মুগ্ধ হয়ে দেখে, সুন্দর হাতের লেখায় হিসেব সাজানো। নন্দ এত লেখাপড়া শেখেনি, তবে প্রায় তিন দশক হোটেল চালিয়ে অনেক কিছু শিখেছে। অনেকেই বলেন, নন্দ পাক্কা ব্যবসায়ী।

এই মোড়টার একটা নাম আছে। মুক্তি মোড়। এখানে তিন খানসেনা খতম হয়েছিল একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। কে নামকরণ করেছিল জানা নেই, কিন্তু এখন এই নামই প্রতিষ্ঠিত। এখান থেকে সদর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। বাস চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে। গ্রামের সবাই এখান দিয়েই যাতায়াত করে। রিকশা আছে, টেম্পো আছে। মোটামুটি জমজমাট গোটা এলাকা। বিদ্যুৎ আসায় গুরুত্ব আরও বেড়েছে। যদিও বিদ্যুৎ থাকে আসা-যাওয়ার মধ্যেই। সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে মানুষের। তবে এখানে জেনারেটারের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে বিদ্যুতের অভাবটা সেভাবে কেউ অনুভব করে না।

নন্দ সবকিছু গুছিয়ে হোটেলে চলে আসে আধঘণ্টার মধ্যেই। শেফালি আগেই এসে গেছে। কুকুরের বাচ্চাটাকেও নিয়ে এসেছে। বুধোর মা সকাল-বিকাল দোকানে এসে ধোয়ামোছার কাজ সেরে জলখাবার খেয়ে চলে যায়। আজ এখনো আসেনি। হয়তো বৃষ্টির কারণে, বুধোর মায়ের তেমন কামাই হয় না। এখানে এসে শুধু কাজ নয়, নন্দর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্পও করে। বলে, নন্দদি আমার সঙ্গে তো কেউ কথা কয় না। শুধু কাজের ভুল ধরে। তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে শান্তি পাই। আসলে আমাদের তো কেউ মানুষ মনে করে না।

দুলাল ময়দা মাখছে, নাসির সবজি তৈরি করছে। জোগাড়যন্তর করতে নন্দ এসে পড়ে। নন্দই বাকিটা করে। অন্যদিন এতক্ষণ খদ্দের আসতে শুরু করে, আজ এখনো হোটেল ফাঁকা। অন্য দোকানগুলো খোলে দেরিতে, মুদির দোকান সকালেই। শেফালি এসেই চায়ের কেটলি চাপায়। বুধোর মায়ের আসতে দেরি হলে কাপ-ডিশ ধোয়া-মোছা করে। খদ্দের আসার আগেই নন্দ সবাইকে নিয়ে চা খায়। সে চা তৈরি করে শেফালি। তার আগে বেড়ালটার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে। আজ খাবার দুজনের জন্য। নতুন অতিথিকে অবশ্য দূরে রেখেছে। জানে, এখনো দুজনকে পাশাপাশি রাখা যাবে না। নন্দ চা খাচ্ছে বিস্কুট দিয়ে, দৃষ্টি উনুনে সবজির দিকে। আগুনের

তাতে এরই মধ্যে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নাসিরকে ডাকে, আজ বৃষ্টি-বাদলায় এত সবজি টানবে তো রে? নাসির মাথা নাড়ে, এখন তো বৃষ্টি নেই মাসি।

জলখাবারের কাজ সেরে নাসিরই বাজারে যায়, মাছ-মাংস কেনে, সবজি আনে। বাজার রাস্তার ওপারে, একটু এগিয়ে। নন্দ সবজি রান্নার পর দুপুরের খাবার তৈরি করে। ওই পর্যন্ত চা সামলায় শেফালি।

নিত্যদিনের এই জীবন, এর মধ্যেই নন্দ ডুবে থাকে। আজ হয়তো খাওয়া-পড়ার অভাব নেই, কয়েকজনের রুজিরোজগার তার ওপরেই। ভাবতে ভালো লাগে, ওরা সবাই নন্দকে আপন করে নিয়েছে, নিজের হোটেল মনে করে। সেভাবেই খাটে। নন্দও তাদের বুক দিয়ে আগলে রাখে। এই অবস্থায় আসতে নন্দকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেইসব দিনের কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়, তাই ভাবতে চায় না। ফিরতে চায় না অতীতে। এক দগদগে ঘা তাকে সমাজ ও মানুষ চিনিয়ে দিয়েছে। আজও যুদ্ধ করছে নন্দ, জানে, তার কিছু হলে ছেলে-মেয়েগুলো ভেসে যাবে। বিশেষ করে শেফালি। ছেলেদুটির হয়তো কাজ জুটে যাবে, কিন্তু শেফালি? কোথায় দাঁড়াবে সে? মাঝে মাঝে আঁতকে ওঠে নন্দ।

হঠাৎ ডাক আসে শেফালির, দুই প্লেট পরোটা-ভাজি।

সম্বিৎ ফিরে পায় নন্দ, সবজির গামলাটা নিয়ে আয়, হয়ে গেছে। দুলাল পরোটা তৈরি করছে, সবাই গরম পরোটা চায়। সে গুলি পাকিয়ে রাখে, যাতে অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে বেলে ভেজে দিতে পারে। এক এক করে এখন ভিড় বাড়ছে। দোকানের ভিতরে জনা বারো বসতে পারে টেবিলে, সামনে চেয়ার-টেবিল পেতে আরও আট-দশজনের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ভিড়টা অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের। তারপরও খদ্দের থাকে, তবে হাড্ডাহাড্ডি ভিড় নয়। দুপুরে ভাতের সময় আবার ভিড় বাড়ে। নন্দ নিজের হাতে ভাত তরকারি পাতে তুলে দেয়, অনেকটা ঘরের মতো। হোটেল চলে মাপা ভাতের হিসাবে, তবে এখানে নন্দর হাত লম্বা। সবাইকে বাড়ির মতো করে খাওয়ায়। এ জন্যই নন্দর হোটেল রেস্তোরাঁর নাম-ডাক। নামটাও নন্দ সেরকমই রেখেছে, 'অতিথি'। আসলে সেটা ঠাকুরদা কমলাকান্তর দেয়া। সব শুনে কমলাকান্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করেন, তুই মেয়েমানুষ, পারবি দোকান করতে? আরও ভেবে দ্যাখ।

আসলে নন্দর আর কোনো উপায় ছিল না। একটা কিছু করে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করবে? বাড়িটা আছে, সে একা আর রাস্তার মোড়ে নিজের সামান্য জমি। এই জায়গাটা ধীরে ধীরে জমে উঠছে, সেখানে দোকানপাট হচ্ছে। দুলাল তখন ছোটো। তখনই নন্দর মাথায় চিন্তা আসে, একটা চায়ের দোকান তো করা যায় নিজের জায়গায়। নিজের হাতে বানাবে। এখানে কোনো চায়ের দোকান নেই। সেই শুরু, অবস্থা ধীরে ধীরে পালটেছে। হোটেলের আয়তন বেড়েছে, খাবারের পদ বেড়েছে, দুপুরে ভাত মাছ। মুরগি এসেছে আরও পড়ে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে নন্দ, খাওয়া-থাকার অভাবটা অন্তত নেই। হোটেলটা মনের মতো করে সাজিয়েছে। সবার আস্থা তৈরি হয়েছে। এটাই সান্ত্বনা। গোটা গাঁয়ের মানুষ ছাড়াও পাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে সদরে যাতায়াত করেন এমন মানুষও এখানে ভিড় করেন। বাঁধা খদ্দের হয়ে গেছে অনেকে। কেউ কেউ বলেন, নন্দর সংসারে পা না দিয়ে ভাত হজম হয় না। দোকানটাকে সবাই বলেন নন্দরানির সংসার। 'অতিথি' নামটা হারিয়ে গেছে, সাইনবোর্ডটার রংটাও ফিকে হয়ে এসেছে। নতুন করে রং করানোর তাগিদ অনুভব করে না নন্দ। মনে মনে চায়, নন্দরানির সংসার নামটাই ভালো। সবাই এটাই বলুক। মুরব্বিরা বলেন, যেই আসুক নন্দের সংসারে থেকে গেলেই হয়। আমরাও বুড়ো বয়সে আশ্রয় নিলে ক্ষতি নেই তো।

নন্দ হাসে, আপনারা আশীর্বাদ করেন। আমি যেন আশ্রয় দিতে পারি। নন্দ খুশি হয়। সবার ভালোবাসায় আপ্লুত হয় নন্দ। দোকানের প্রতি আস্থা দেখে ভালো লাগে। কখনো কখনো এমনও হয়, জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। এই কষ্টে কেউ কিছু মনে করেন না।

এর পাশাপাশি গ্রামে কারও বাড়িতে ছোটখাটো অনুষ্ঠান হলে সব খাবার যায় 'নন্দর সংসার' থেকে। নন্দই রান্না করে। সেসব দিনে নন্দ সকাল সকাল দোকানে চলে আসে। খুব ভোরে উঠে পূজার কাজ সারতে হয়। বুধোর মাকে আগে বলে রাখে, সেও সকাল সকাল চলে আসে। সারাদিন থাকে। নন্দর সঙ্গে গল্প করতে করতে কাজ করে।

।। তিন ।।

তিনটা ঘর থাকলেও বড়ো ঘরটাতে রাতে নন্দ খাটে শোয় শেফালিকে নিয়ে। এই ঘরেই শেফালির পড়ার টেবিল বসেছে। নন্দ চায় তার চোখের সামনেই শেফালি পড়াশোনা করুক। রাতের খাওয়ার পাট দোকানেই চুকে যায়। বাড়ি ফিরে শেফালি পড়তে বসে। নন্দ টুকটাক কাজ সেরে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের ক্লান্তি, বয়স তো কম নয়। ঘরে একটা টেলিভিশন আছে, কিন্তু শেফালির পড়ার ক্ষতি হওয়ার ভয়ে টেলিভিশন দেখে না। পড়া শেষ হওয়ার পর টেলিভিশন চালু করে শেফালিই। ঘণ্টাখানেকের জন্য। সিরিয়াল দেখে। নানা অনুষ্ঠান দেখে। আজ টেলিভিশন চালু করেনি শেফালি। পড়ার টেবিল থেকেই দেখতে পায় মাসি কপালের ওপর হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। বাতি নিভিয়ে চুপচাপ গিয়ে মাসির পাশে শুয়ে পড়ে।

ঘরে নিঃসীম অন্ধকার। বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা। ডানপাশে একটা জানালা আছে, সেটা রাতে খোলা হয় না। জানালার পাশেই বাগান। গুমোট গরম, ফ্যান চলছে, কিন্তু গরম দূর করতে পারছে না। গত রাতে টানা বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গরম কমেনি। মশারির ভেতরে বাতাস যেন ঢুকতেই চায় না। তবু মশারি না টাঙিয়ে উপায় নেই, মশার আক্রমণ ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

শেফালি শুয়েই টের পায়, মাসি ঘুমায়নি। কয়েক রাত ধরেই এমন হচ্ছে। কী এমন ঘটেছে, যা মাসির চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে শেফালি মাসির গায়ে হাত রেখে ডাকে, মাসি, মাসি গো। তুমি তো ঘুমোচ্ছ না। নন্দ পাশ ফিরে শেফালিকে টেনে নেয়, ঘুমো।

তুমি তো কয়েক রাত ঘুমোচ্ছ না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। শেষ রাতের দিকে ঘুমাও। সেই জন্যই তো ভোরে ডাকি না। কী হয়েছে তোমার মাসি?

কিছু হয়নি। তুই ঘুমো। স্কুলের পড়াশোনা কেমন চলছে? আমি কিন্তু সব মাস্টারের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই। তোকে তো ভালো করতে হবে মা। আমার আর কে আছে বল?

—আমি জানি মাসি। আমি তো চেষ্টা করি। কিন্তু তোমার মন খারাপ দেখলে, তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমার খারাপ লাগে। আমি পড়াতেও মন বসাতে পারি না।

—ও মা আমার মেয়ে তো বুড়ি হয়ে উঠছে। সব ভাবতে শিখছে। ওসব ভেবে কাজ নেই। তোর কাজ পড়াশোনা। দোকানের কাজ একটু-আধটু করিস ওই যথেষ্ট। আমি না থাকলে এই দোকানতো তোরই। নন্দ টের পায়, এ কথায় কেমন জানি শেফালি কেঁপে ওঠে। আরও কাছে টেনে নেয় শেফালিকে। মেয়েটা অনেক কিছু বোঝে। জানে, তাকে অনেক কিছু বুঝতে হবে। আর কোনো কথা বলে না নন্দ, মেয়েটির মাথায় হাত বোলায়, তুই ঘুমো, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। নন্দের চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। তাও কিন্তু টের পায় শেফালি।

নন্দ কয়েকদিন ধরে সত্যি চিন্তিত। সপ্তাহখানেক ধরে হঠাৎ লক্ষ্য করছে সেই আমজাদ চা খেতে আসছে দোকানে। প্রথমে চিনতে পারেনি। চেহারা ও পোশাকে পরিবর্তন এসেছে, সর্বোপরি বয়স। এক নজরে চেনার কথাও নয়। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর মনে পড়ে যায়। কিন্তু আমজাদ কি নন্দকে চিনেছে? একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সেই আমজাদ উধাও হয়ে যায়। শোনা গিয়েছিল, দুবাই চলে গেছে। কবে ফিরেছে কে জানে? স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর এই প্রথম আমজাদকে দেখলো নন্দ। চেনার পর গায়ের রক্ত শিরশির করে ওঠে। এই কয়েকদিনে তিন-চারবার দোকানে এসেছে আরও কয়েকজনকে নিয়ে। এরই মধ্যে বেশ সাগরেদ জুটে গেছে। কিন্তু গতকালই শোনা গেল, আমজাদ নাকি সরকারি দলে যোগ দিয়েছে। দুবাই থেকে বেশ পয়সাকড়ি নিয়ে ফিরেছে মনে হচ্ছে। পোশাকআশাক, কথাবার্তায় একটা আলাদা ভাব। খাওয়ার সব বিল দিচ্ছে আমজাদই। সরকারি দলের লোকজন সবাইকে চেনে নন্দ। তবে ভাবেসাবে বোঝা যাচ্ছে না, আমজাদ নন্দকে চিনেছে কিনা। না চিনলেই মঙ্গল। প্রথম দিন চা খেয়ে বেশ তারিফ করেছিল আমজাদ, দ্বিতীয় কাপের ফরমায়েশ করেছিল। দ্বিতীয় চাটা পাঠায় নাসিরকে দিয়ে। এভাবে নিয়মিত হোটেলে আসা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে নন্দকে।

সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না নন্দ। তখন নন্দর কতই-বা বয়স, বারো কী তেরো। স্কুলে পড়তো। বাবা স্কুলে হিসাব সহকারীর কাজ করতেন। মা সেলাইয়ের কাজ করতেন। দুজনের রোজগারে কোনোরকমে চলে যেত সংসার। সেই একাত্তর। ডিসেম্বরের সেই নির্বাচনের পর থেকে টের পাওয়া যাচ্ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বাবা প্রতিদিন মাকে সব বলতেন। নন্দ সব শুনতো, ভালো করে বুঝতে পারতো না। বাবা নির্বাচনের সময় বেশ খেটেছিলেন বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামি লিগের পক্ষে। মিছিল করতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'নির্বাচনের কাগজ' বিলি করতেন। ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত। মা কিন্তু কিছু মনে করতেন না। মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞেস করতেন, বঙ্গবন্ধু জিতবেন তো? এলাকা থেকে কে দাঁড়িয়েছেন, নির্বাচন করছেন, তার কথা ভালোভাবে জানতেন না। শুধু জানতেন বঙ্গবন্ধুকে জেতাতে হবে। এলাকার প্রার্থী 'বঙ্গবন্ধু'। গোটা বাংলাদেশে একজনই প্রার্থী 'বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধু জিতলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে। ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না।

এরই মধ্যে নন্দ একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙ্গালিদের ওপর। স্কুলের মাস্টাররা বলেন, ঢাকায় যেখানে সেখানে খান সেনারা গুলি চালাচ্ছে, এরপর পাকিস্তানি সেনারা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। এই গ্রামেও আসতে পারে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। একের পর এক খবর আসতে লাগলো হামলা, হত্যা, লুটপাট ও ধর্ষণের। কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল এই হিন্দুপাড়ার অনেকে রাতের আঁধারে চলে গেছে ভারতে। কেউ কেউ থেকে গেল অবস্থা কোনদিকে গড়ায় দেখার জন্য। নন্দর বাবা-মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। চেনা লোকজন অচেনা হয়ে গেল রাতারাতি। তারা রাতে ঘুমাতে পারতেন না। যেদিন যোগেন্দ্র কাকা পরিবারের সবাইকে নিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেলেন সেদিন রাতে মা-ই বাবার কাছে কথাটা তুললেন। কিন্তু বাবার এক কথা—না, না আমরা যাবো না। বাবার তখনো অটুট

বিশ্বাস, আমাদের কিছু হবে না নন্দর মা। দেখো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। নন্দর মনে পড়ে, মা এর পরও বাবাকে তাগাদা দিয়েছেন কয়েকবার, চল ভারতে চলে যাই। অনেকে তো চলে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে থাকা হবে না। কিন্তু নন্দর বাবা কান দেননি, না না, কিছু হবে না। বাড়িভিটা ফেলে যাবো কোথায়?

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনী বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে, এ খবর তখনো গ্রামে এসে পৌছায়নি। বাবা আওয়ামি লিগ অফিস থেকে খবর নিয়ে এসেছেন, বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতাদের নিয়ে আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

এর মধ্যে গ্রামে তৈরি হলো রাজাকার বাহিনী। আমজাদ তাদের একজন। তারা রাইফেল নিয়ে গ্রামে টহল দিতে লাগলো। হিন্দুদের মধ্যে যারা তখনো গ্রামে থেকে গিয়েছিল, তাদের বাড়িতে বাড়িতে এসে রাজাকাররা হুমকি দিত, টাকাপয়সা, সোনাদানা যা আছে দিয়ে দাও নইলে তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না।

এই আতঙ্কের মধ্যে একদিন পাকিস্তানি সেনারা গ্রামে এল মুক্তিবাহিনীর খোঁজে। রাজাকাররা তাদের সঙ্গে। রাইফেল কাঁধে আমজাদ সবার আগে। হিন্দুপাড়ায় ঢুকেই বাড়ি বাড়ি তল্লাশির নামে পুরুষদের ধরে নিয়ে পুকুরপাড়ে একটি লাইনে দাঁড় করালো। মেশিনগান নিয়ে সামনে দাঁড়ায় পাকিস্তানি সেনারা। ক'জনই-বা তখন গ্রামে ছিল। যুবক কিংবা মাঝারি বয়সের সবাই পালিয়ে গিয়েছিল আগেই। গোটা পাড়ায় কান্নাকাটি, চিৎকার-আতঙ্ক। মহিলারা পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের পা ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলো।

নন্দর মনে আছে, তার বাবা-সহ জনা পনেরো পুরুষকে পুকুরপাড়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। আর লুটপাট চলে গোটা পাড়ায়। সোনাদানার খোঁজে রাজকাররা ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করতে লাগলো। শিশুরা আতঙ্কে চিৎকার করছে। নন্দ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সে একবার বাবার কাছে ছুটে যায়, আর একবার পাক সেনা ও রাজাকারদের কাছে, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। মা বাড়ির বারান্দায় বসে কাঁদছেন, আমাদের যা কিছু আছে সব নিয়ে যাও, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। সবারই একই আর্তি। এর মধ্যে আমজাদের কথাই বেশি মনে আছে। সে একবার পুকুরপাড়ে ছুটে যায়, আবার এখানে দৌড়ে আসে। যেন এক মহোৎসব। পাক সেনাদের কাছে গিয়ে বলে, সব ইন্ডিয়া হ্যায় ছার। মুক্তি হ্যায়।

নন্দ আর কিছু ভাবতে পারছে না। সেদিনের কথা ভাবলে প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এর পর থেকে অনেক ঝড় গেছে। আমজাদকে দেখার পর আবার নতুন করে সামনে চলে এসেছে সেই দুঃসহ স্মৃতি। হঠাৎ পুকুরের দিক থেকে শোনা গেল কয়েকদফা গুলির আওয়াজ। আর অনেক আর্তচিৎকার। তখনও ভাবতে পারেনি, বাবা নেই। সবাই ছুটে গেল পুকুরপাড়ে। লাইন করে যাদের দাঁড় করানো হয়েছিল, তাদের গুলি করা হয়েছে। সবার মৃত্যু হয়নি তখনো। জল জল বলে চিৎকার করছেন, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। নন্দ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর, তুমি যেও না বাবা। তুমি যেও না। মৃতদেহগুলোর ওপর নারী শিশুরা গড়াগড়ি খাচ্ছে। কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পুকুরপাড়। এর মধ্যে সেই আমজাদ আর কয়েকজন রাজাকার রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে লাগলো দেহগুলোকে। যারা বেশি কান্নাকাটি করছে তাদের মাথায় আঘাত করে নির্মমভাবে। যেসব শিশু কান্নাকাটি করছিল তারাও রেহাই পায়নি অত্যাচার থেকে। সেই নারকীয় দৃশ্য স্মরণ করতেও ভয় করে নন্দর। সেই রক্ত, কাতর আর্তনাত, সারি সারি মৃতদেহ। আর রাজাকার, পাকিস্তানি সেনাদের নারকীয় উল্লাস।

মনে আছে, এই কান্নাকাটির মধ্যেই হঠাৎ পাকিস্তানি সেনারা নির্দেশ দিলো গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহগুলোকে মাটি চাপা দিতে।

সবাইকে গুলির ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিল। কেউ আর বেঁচে নেই। দূরে দাঁড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে নন্দও দেখলো। আমজাদদের উল্লাস এখনো মনে আছে, যেন বড়ো এক কাজ সমাধা করেছে তারা। পাকিস্তানি সেনারা রাজাকারদের দিয়েই গর্ত খোঁড়ালো। তারপর মৃতদেহগুলো সেই গর্তে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। নন্দরা কাঁদছিল, তাদের চিৎকার আর কান্না থামাতে কয়েকবার ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে সেনারা। এক সময় মাটি চাপা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা চলে যায়। চলে যায় রাজাকাররাও। এর পর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মাটির ওপর।

মনে আছে নন্দর, গোটা পাড়ার নারী ও শিশুদের রাত কাটে সেই পুকুরপাড়ে। মানুষগুলো কী অন্যায় করেছে যে, তাদের এমনভাবে তাদের হত্যা করা হবে। দেশ ত্যাগ না করে যারা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন তাদের সবাইকে চরম মূল্য দিতে হলো।

তবে আরও সর্বনাশের বাকি ছিল। এই অত্যাচার ও হত্যা করার পর হিন্দুপাড়ায় কারও বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। কান্নার রেশ মিলাতে না মিলাতেই তৃতীয় রাতে আমজাদ আরও কয়েকজনকে নিয়ে হামলে পড়ে হিন্দুপাড়ার ওপর। এবার সোনাদানা আর টাকাপয়সা নয়। রাত ন'টা-দশটা হবে। নিস্তব্ধ চারদিক, শুধু জোনাকিরা আলো জ্বালিয়ে ছোটাছুটি করছে। অন্ধকারে লোকজন ও টর্চের আলোয় গোটা হিন্দুপাড়া আতঙ্কে জেগে ওঠে। প্রায় সব বাড়িতেই ওরা ঢুকে পড়ে দরজা ভেঙে। কেউ যেন পালাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে কয়েকজন রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয়। সেই বীভৎস রাতের কথা কেউ ভুলতে পারেনি। এই আমজাদের হাতে ধর্ষিত হয়েছে মা, মায়ের পর নন্দ। মায়ের সামনেই। মায়ের আকুতি-মিনতি,

পায়ে ধরা কোনো কিছুতেই টলানো যায়নি আমজাদদের। নন্দর আর্তচিৎকারেও রেহাই মেলেনি। গোটা পাড়ার কেউ রেহাই পায়নি। নন্দর কতই-বা বয়স, এগারো, বারো। শুধু আমজাদ নয়, আমজাদের পর অনেক পশু। জ্ঞান হারিয়েছিল নন্দ। জ্ঞান ফেরে পরের দিন। পাড়ায় কোনো ডাক্তার ছিল না। যন্ত্রণায় কাতরে ছিল বেশ কয়েকদিন। ক্ষত শুকাতে অনেকদিন লেগেছিল।

পরে নন্দ শুনেছে, পাড়ার কয়েকটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে আমজাদ ও তাদের সঙ্গীরা, যাদের বয়স আঠারো থেকে পাঁচিশ। ওদের নাকি পাকিস্তানি সেনা শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। তাদের আর হদিস মেলেনি।

গোটা পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের হত্যা করেছে পাক সেনারা, তাদের পারলৌকিক কোনো ক্রিয়াকর্ম করা যায়নি। বাবার ছবির সামনে বসে কেঁদেছিল নন্দ ও তার মা। আর কীই-বা করার ছিল। অনাহারে কেটেছে অনেক দিন। স্কুল বন্ধ, হিন্দু মুসলমান কয়েকজন শিক্ষককেও হত্যার করেছিল নরপশুরা। স্কুল থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। সেই দিনগুলো মনে করতে চায় না নন্দ।

শুধু মনে পড়ে, কী যুদ্ধই না করতে হয়েছিল বেঁচে থাকতে। দেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়লো। গ্রামে খবর পৌঁছালো, বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনারা অত্মসমর্পণ করেছে। গ্রামের মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়লো। রাস্তায় স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে মিছিল বেরোলো। মা যেতে চায়নি ঘর ছেড়ে, কিন্তু নন্দ টেনে নিয়ে গেল রাস্তায়। অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কয়েকটি গাড়ি দেখলো। গাড়িতে স্বাধীন দেশের পতাকা। সবাই ‘জয় বাংলা’

বলে ধ্বনি দিচ্ছে। এর মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের বহরও দেখা গেল। মাকে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল নন্দ। পাড়ার কেউ কেউ ছিলেন। এর মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে আসতে শুরু করেছে। আগের রাতে ফিরেছে পাশের বাড়ির অশোক, গোপালকাকার ছেলে। বাবার সঙ্গে গোপাল কাকাকেও হত্যা করা হয়েছিল। অশোক রাতেই দেখা করতে এসেছিল নন্দদের বাড়িতে। কিন্তু কোনো কথা হয়নি। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থেকে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় কান্না চেপে বলছিল, ভাবিস না নন্দ, আমরা কাউকে ছাড়বো না।

অশোক কলেজে পড়ে। বি এ পরীক্ষা দেয়ার কথা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার খবর পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই অশোক চলে যায়। সঙ্গে আরও কয়েকজন। গোপালকাকা ছেলের চলে যাওয়া কাউকে বলতে নিষেধ করেন। শেষ খবরে জানা গিয়েছিল, অশোক আগরতলায় আছে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এপাড়া থেকে যারা চলে গিয়েছিল, সবাই আগরতলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যায় বলে জানতে পেরেছিল।

রাস্তায় লোকজনের আনন্দ উল্লাস সত্ত্বেও মা দাঁড়াতে চাইছিলেন না। নন্দ জোর করে হাত ধরে রাখে। মা কাঁদছিলেন, কাপড়ের আঁচল দু'হাত দিয়ে চোখে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কান্না আসছিল নন্দরও। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যদের চলাচল দেখতে ভালো লাগছিল। সে বয়সেও বাঁচার কথা ভাবছিল নন্দ। আর ভাবছিল কিছু একটা করার কথা।

প্রতিশোধের আগুন জ্বলতো বুকের ভেতর। কিন্তু কাউকে কখনো বুঝতে দেয়নি নন্দ।

।। চার ।।

রাত কত কে জানে। নন্দ খাট থেকে নেমে চোখে-মুখে জল দেয়। না, আমজাদকে দেখার পর চাপা-পড়া ক্ষত থেকে যেন আরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মেয়েটা বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা সে জানে না। নন্দর মনে পড়ে, স্বাধীনতার খবর আসতেই রাজাকাররা কোথায় পালালো কেউ বুঝে উঠতে পারেনি।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে স্বাভাবিকভাবেই দেরি হলো। শেফালি আগেই উঠে পড়েছে, ঘর ঝাঁট দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে প্রতিদিনের মতোই বারান্দায় বসেছে। এর মধ্যে মনে হয় কুকুরছানা ও বেড়ালের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে, এক সঙ্গেই থাকতে হবে। ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কী। শেফালি আজও স্থির করেছে, মাসিকে ডাকবে না, আরও একটু ঘুমোক। অনেক রাত অবধি জেগেছিল, শেফালি জানে।

বারান্দায় হেলান দিয়ে বসে কুকুর বেড়ালের ভাব দেখছে শেফালি। নতুন বন্ধুত্বের পর ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। সূর্য উঠেছে কিছুক্ষণ আগে, উঠোনে এখনো রোদ পড়েনি। গাছপালা ডিঙিয়ে এ বাড়িতে রোদ উঁকি দিতে আরও কিছুক্ষণ লাগবে। শেফালি এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে দেখে, মাসি ঘুমোচ্ছে। ইংরেজি বইটা নিয়ে শেফালি বাইরে বেরিয়ে আসে। মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করে। শেফালি জানে, পড়ালেখায় খারাপ করলে মাসি ক্ষমা করবে না।

ঘুম ভাঙতেই বারান্দার জানালা দিয়ে চোখে রোদ পড়তে হুড়মুড় করে উঠে বসে নন্দ। আজও বেলা হয়ে গেছে। দরজা খুলেই শেফালির ওপরই রাগটা পড়ে, আজও তুই আমায় ডাকিসনি। শেফালি হাসে, তুমি গত রাতেও অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছ মাসি। পুরো ঘুম না হলে শরীর খারাপ হবে। তাই ডাকিনি। সমস্যা কী। এর উত্তর নেই, তবু নন্দ বলে, অত পাকামো করবি না।

মাসি তুমি চিন্তা করো না। আমি সব কাজ শেষ করে ফেলেছি। এখন তুমি চানটান করে পূজা সেরে তৈরি হয়ে নাও। রোদ উঠলেও এখনো সাতটা বাজেনি। নন্দ শেফালিকে নিয়ে পৌনে আটটার দিকে বেরোয়। ওদিকে দোকানেও কাজ এগিয়ে থাকবে, জানে নন্দ। তাই তেমন চিন্তাও নেই।

নন্দ শেফালিকে বলে, 'আমি চান করে পূজা দিয়ে আজ একটু মন্দিরে যাবো। তুই দোকানে চলে যাস, আমি দেরি করবো না।

* * * *

এখন কমলাকান্ত দাদুর বয়স হয়ে গেছে। তাঁর ছেলে অভিজিৎই এখন পূজা সামলায়। নন্দ তাকে কাকা ডাকে। নন্দ যখন মন্দিরে পৌঁছায় অভিজিৎকাকাই পূজোর কাজে ব্যস্ত। ঠাকুরদা কমলাকান্তকে প্রণাম করতেই ধমক শোনে নন্দ, ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই জানিস না? নন্দ বলে, ঠাকুর তো আছেনই, তুমিও আমার ঠাকুর।

তা হঠাৎ ছুটে এলি যে, কোনো কথা আছে বুঝি?

একটু আছে। কিন্তু নিরিবিলিতে বলতে হবে।

তাহলে আমার ঘরে চল।

ঘরটা মন্দিরের পেছনে। পাশের ঘরে ভোগ রান্না হয়। দিনের বেলা ঠাকুরদা এ ঘরে কাটান। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে যান। নন্দ আস্তে আস্তে অনেক কথা বলে। এক সময় আঁতকে ওঠেন কমলাকান্ত, এ তুই কী করছিস? আরও পরে চিন্তাভাবনা করা যাবে। এত তাড়া কীসের? এসব মাথা থেকে ছাড়।

নন্দ নাছোড়বান্দা, তুমি কাউকে বলো না কিন্তু। আমার

শরীর ভালো যাচ্ছে না। আমি বুঝি, তুমি বাধা দিও না ঠাকুরদা। আমি যা স্থির করেছি তুমি আমাকে করতে দাও। বলেই নন্দ দ্রুত পা বাড়ায়, আরেকবার মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করে—মা আমায় শক্তি দাও। আমি যে একাত্তরকে ভুলতে পারি না মা। তুমি আমার পাশে থেকো মা।

কমলাকান্ত নন্দর পেছন পেছন বেরিয়ে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ান। মেয়েটা কী করতে চায় কে জানে। কালীবাড়ির উঠোনটা পার হয়ে একটু দাঁড়ায়, ঠাকুরদা আমি দু-একদিনের মধ্যে আবার আসছি কিন্তু। কমলাকান্ত কোনো জবাব দেন না। দাঁড়িয়ে নন্দর চলে যাওয়া দেখেন। মেয়েটার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বাবাকে হারায়, নির্যাতিতা হয় মা ও মেয়ে, কতই-বা বয়স তখন নন্দর। স্বাধীনতার পর মাকে কখনো হাসতে দেখেনি, কেমন যেন বোবা পাথর হয়ে গিয়েছিল। ওই বয়সে নন্দই সবকিছু সামলায়। কয়েক বছর পর মাও ছেড়ে চলে যায়। এতসব ঝড় ঝাপটার পর কী করে এতদূর এগিয়ে আসতে পারে, বিস্ময়ে মাঝে মাঝে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন কমলাকান্ত।

মন্দির থেকে দ্রুত পা চালিয়ে নন্দ যখন দোকানে এসে পৌঁছায় তখন মাত্র একজন খদ্দের। সবজি রান্না সেরেছে নাসির। শেফালি বলে ওঠে, চা চাপাচ্ছি মাসি। নন্দ জানে তার অপেক্ষায় কেউ খায়নি। নন্দ নিজেই উনুনের কাছে যায়। একজনের পরোটা সবজির ফরমায়েশ পূরণ হতে না হতেই আরও কয়েকজন ঢোকে। শুরু হয়ে যায় দিনের ব্যস্ততা। এখন এক মুহূর্ত সময় নেই। আজ একটু বসে থাকতে ইচ্ছে করছে নন্দর। সেই অতীত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। একটুও যেন স্বস্তি দিচ্ছে না।

সেই ন' মাসের নরক পার হয়ে স্বাধীনতা এল। মা ছিল, যদিও কথা বলতেন একেবারে কম। তবুও কোনো চিন্তা ছিল না। দুমুঠো খুদ-কুঁড়ো জুটে যেত। কয়েকজন বলেছিল, তোমরা তো বীরাঙ্গনা, সরকারের খাতায় নাম তুলতে হবে। মা-মেয়ের নাম একসঙ্গে, হিন্দুপাড়ার অনেকেই এই তালিকায় থাকতে পারে। কিন্তু কেউ রাজি হয়নি। মা অন্তত এইটুকু বুঝতেন, এই লজ্জা বয়ে বেড়ানোর মতো শক্তি তাদের নেই। নন্দকে বলতেন, আমি আর ক'দিন। তোর জন্যই চিন্তা হয় রে! কী করি বলতো। স্বাধীনতার পর এতো করে বললাম, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিস না। তুই গেলি না।

মা জানে কেন নন্দ যায়নি। সবাই আঙুল তুলবে নন্দের দিকে। ওই বয়সে এতটুকু বুঝে গেছে মেয়েটা। নন্দ শুধু বলতো, তুমি এসব নিয়ে ভেবো না তো মা।

সেই কবেকার কথা। মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, গ্রামে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল নন্দ। ডাক্তার মাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বললো। কিন্তু সেটা নন্দর পক্ষে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন ভুগে ভুগে মা চলে গেলেন। নন্দর কোলেই মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পাড়ার সবারই সহযোগিতা ছিল, শেষ কাজ করতে সমস্যা হয়নি। তাও আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়ে গেল। মায়ের মৃত্যুর পর নন্দ বাঁচার জন্যই যুদ্ধ করতে করতে এই অবস্থায় এসেছে। আজ কি অন্য ভাবনা নন্দকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে?

শেফালি স্কুলে চলে গেছে। এখন ভিড়ও কম। যেখানে টাকা পয়সা নেয়া হয়, ব্যবসার ভাষায় গদি বলে, তার পাশে একটু আড়ালে একটা চৌকি পাতা আছে। নন্দ দুলালকে ডাকে, শোন এখন ভাত শুরু হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। নাসির আর তুই দেখ, সামলা। আমি একটু শুয়ে থাকি।

—তোমার কি শরীর খারাপ মাসি?

—আরে না না এমনি। তোরা যা।

আমজাদকে দেখার পর থেকে নন্দ স্বাভাবিক হতে পারছে না। সেই দিনের স্মৃতি যে ভেতর থেকে হারিয়ে যায়নি তা বুঝতে পারছে। মনে পড়ছে বাবার রক্তমাখা মুখ, মায়ের আর্তি আর জানোয়ারগুলোর উল্লাস। বাবার শেষ কথা ছিল, আমি যাচ্ছি রে মা। মা বারবার পা জড়িয়ে ধরেছিল আমজাদের, নন্দও পা জড়িয়ে ধরেছিল বারবার। বলেছিল, আঙ্কেল আমাদের ছেড়ে দেন। আমাদের বাঁচান। কিন্তু জানোয়ারকে নিবৃত্ত করা যায়নি। নন্দকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল আমজাদ। ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে গিয়ে পড়ে নন্দ। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিল। তারপর নন্দকেও রেহাই দেয়নি পশুরা।

হঠাৎ করে এক প্রচণ্ড প্রতিশোধের স্পৃহা যেন মাথা চেপে ধরেছে। সেই একাত্তর বারবার মাথায় ভিড় করছে। বাবাকে হত্যা, মা ও নিজের ওপর অত্যাচার একসময় নন্দকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে জেদ এনে দিয়েছিল। কিন্তু বয়স বাধা হায়ে দাঁড়ায়। মেয়ের ভেতরে তৈরি হওয়া ঘৃণা ও আগুন টের পাচ্ছিলেন করুণাময়ী, কিন্তু বলেন, এসব মনে আনবে না মা। সময়ই তোকে বলে দেবে কী করতে হবে।

হ্যাঁ, সেই সময়টাই যেন বলে দিচ্ছে, 'হাঁরে নন্দ একাত্তর হাজির। একাত্তর আবার এসে গেছে। কী করতে হবে চিন্তা করে নাও।' ভাবতে ভাবতে এপাশ-ওপাশ করে নন্দ। এক অস্বস্তি শুয়ে থাকতে দিচ্ছে না নন্দকে। নাসির ও দুলাল টের পায়, মাসির শরীর ভালো নেই। এর মধ্যে ভাতের খদ্দেররা এসে গেলে ওরাই খাবার পরিবেশন করে। নন্দ শুয়ে শুয়ে দেখছে, এখন উঠে বসেছে। অন্যদিন হলে নিজেই দৌড়ে যায়, বালতি, হাতা তুলে নেয়। আজ নিজেই দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেকে। বসে বসে দেখছে, দুলাল ও নাসির কীভাবে পরিবেশন করে। না, ছেলে দুটো পারে। সকালটা যেভাবে সামাল দেয়, অন্তর থেকে তাগিদ না থাকলে এটা হয় না। তাদের আন্তরিকতায় গর্ব অনুভব করে নন্দ। পাড়ায় সবাই ঠাট্টা করে, নন্দর দুই ছেলে

এক মেয়ে। নন্দ জবাব দেয়, আমি পেটে ধরিনি গো দিদিরা, কিন্তু ওরা সত্যিই আমারই ছেলে-মেয়ে। ভগবান আমাকে দিয়েছেন। জান তো, সব হারিয়ে ওদের পেয়েছি।

মা করুণাময়ী একসময় বিয়ের চেষ্টা করেছিল নন্দর। কিন্তু সবাই শুনেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, একাত্তরে অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা মেয়েকে কে বিয়ে করবে। শুনে কয়েকদিন কেঁদেছিল নন্দ লুকিয়ে লুকিয়ে। মা যেন টের না পায়। নন্দর কান্না করুণাময়ী জানতে পারলে তিনি আরও কান্নায় ভেঙে পড়বেন। করুণাময়ী নিজেও জানতেন বিয়ে হবে না, তবু চেষ্টা।

আজ বিকেলেও আসে আমজাদ। সঙ্গে সেই দলবল। অনেকক্ষণ হই-হুল্লোড় করে চলে যায়। কথাবার্তায় মনে হয়, সামনে উপজেলা নির্বাচনে সে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছে। কথায় কথায় দলের নেত্রীর প্রশংসা। আর এই সরকার ছাড়া বাংলাদেশ এগুতে পারবে না, বড়ো গলায় বলে। নন্দ তাকিয়ে থাকে। মনে হচ্ছে নন্দকে চিনতে পারেনি। ষাট পেরিয়েছে কয়েক বছর আগে, নন্দকে চেনার কথা নয়।

কয়েকদিন ধরে নন্দ দোকানের ভার শেফালি, দুলাল ও নাসিরের ওপরই দিয়ে রেখেছে। সকালে নিয়ম করে আসে, চাপটা শেষ হওয়ার পরই মন্দিরে যায় ঠাকুরদার কাছে। ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল। শেফালিরা বুঝতে পারছে না, কী এমন কাজ ঠাকুদার কাছে। নন্দ বলে, তোরা চিন্তা করিস না। এই সুরের সঙ্গে শেফালিরা পরিচিত নয়। কেমন যেন ভয় করে।

নন্দ একদিন জানায়, সদরে যেতে হবে। বলেছে, শেফালি এ কদিন স্কুলে যাবে না। বুধোর মাকে একটু বেশি সময় এই ক'দিন থাকতে বলেছি। পারবি না তোরা? আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।

সবাই সমস্বরে জবাব দেয়, আমরা পারবো মাসি। শেফালি বলে, তুমি সাবধানে থেকো, কয়েকদিন ধরে তোমার শরীর খারাপ। শরীর খারাপের কথা দুলাল ও নাসিরকে কেউ বলেনি। তবে ওরা বুঝতে পেরেছে, তাই পারতপক্ষে কাজে হাত লাগাতে দেয়নি মাসিকে। ফিরতে ফিরতে সেই শেষ বিকেল। এসেই বলে, ঠাকুরদা আর আমাকে দুটো ভাত খাওয়াতে পারবি? এমন খুশির খবর এই হোটেলে প্রথম। মাসি নিজেই ভাত খেতে চেয়েছে। সবজি ছিল, ভাত রান্নায় বেশি দেরি হয়নি। দুজনই বেশ ক্ষুধার্ত। খাওয়া দেখে মনে হয়।

নিজে থেকে না বললে, কিছু জানতে চায় না শেফালি। রাতে শুয়ে মাসিকে জড়িয়ে ধরে, মাসি আজ রাত জেগো না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। আজ সারাদিন খুব ধকল গেছে তোমার, আমি বুঝতে পেরেছি।

আরে না, তুই এত চিন্তা করিস না তো। দোকানে আজ কোনো সমস্যা হয়নি তো? দেখিস কিন্তু তোদের ওপরই সবকিছু। আমার তো বয়স হয়েছে মা। তাই তোদের নিয়ে চিন্তা হয়।

শেফালি অন্য রকম সুর পাচ্ছে মাসির গলায়। হলোটা কী মাসির। জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না।

এভাবে কয়েকদিনই সদরে গেল নন্দ ঠাকুরদাকে নিয়ে। সপ্তাহ দুয়েক পর সদর থেকে ফিরে বলে, আর যেতে হবে না রে। একদম নিশ্চিন্তি। বাব্বা যা অবস্থা, সরকারি অফিসের কাজ বলে কথা! সে রাতে নন্দ খিচুড়ির ব্যবস্থা করে। বলে, চল আজ আমরা খিচুড়ি খাই। অনেকদিন খাইনি। তোদের কোনো আপত্তি নেই তো? দুলালই জবাব দেয়, আপত্তি কেন মাসি, সঙ্গে কিন্তু ডিম ভাজা চাই।

সে রাতে বেশ শান্তিতে ঘুমায় নন্দ। শেফালি শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। মাসির এরকম ঘুম দীর্ঘদিন দেখেনি শেফালি। সেও নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

॥ পাঁচ ॥

স্বাভাবিকভাবেই নন্দরানির সংসার চলছে। এ ক'দিন যেন খদ্দেরও বেড়েছে। রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে, সামনে নির্বাচন। নন্দ নতুন খাবারের পদও বাড়িয়েছে। দুপুরের পরিবেশন আবার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে নন্দ। শেফালি, দুলাল ও নাসির লক্ষ্য করছে, মাসির সেই আগের হাসি-খুশি ভাব ফিরে এসেছে। এতে সবাই খুশি। নন্দ নাসিরকে ডেকে বলে, আজ বাজার গেলে পোস্ত আনিস তো, অনেকদিন আলুপোস্ত খাইনি। এরকম প্রায় প্রতিদিন একটা কিছু খাওয়ার কথা বলে। একটা বেশ খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে নন্দ।

রাতে শেফালিকে জড়িয়ে ধরে পড়াশোনার উপদেশ দেয় নন্দ। দোকান কী করে চালাতে হবে সে সম্পর্কে দেয় পরামর্শ। অন্ধকারে শেফালির কান্না আসে। সে তার জন্মের ইতিহাস শুনেছে কিছুদিন আগে। কয়েকদিন খুব মন খারাপ ছিল। পরে যখন বুঝতে পারে, নন্দ মাসিই তো মা। মা থাকলে কি এর চাইতে বেশি ভালোবাসা পেত? তখন আর কোনো ক্ষোভ থাকে না। এখন কান্না পাচ্ছে, কারণ নন্দ মাসির গলায় যেন অন্য রকম সুর। কোথাও যেন একটা কিছু হচ্ছে। ভালো-খারাপ বুঝতে পারছে না। ভগবানকে ডাকে শেফালি— হে ঠাকুর, মাসির যেন কিছু না হয়। সারারাত মাসি শেফালিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। তাই সকালে উঠতে গেলেই ঘুম ভেঙে যায় মাসির। এখন সকালবেলা উঠে চানটান সেরে পুজোয় বসে মাসি, অনেক সময় লাগে। গুন গুন করে গান করে, ঠাকুরের গান। শেফালির ভালো লাগে। কোনোদিন নন্দ এত সময় পূজায় দেয়নি। শেফালিও পাশে বসে থাকে পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত। শেফালি প্রার্থনা করে, ঠাকুর, মাসিকে ভালো রেখো। পুজো শেষ হলে দুজনেই প্রসাদ পায়। এমন তৃপ্তি শেফালি

আগে পায়নি।

দোকানে গিয়ে কখনো হেঁসেল, কখনো খদ্দেরদের পাশে, কখনো দুলাল নাসিরকে কাছে টেনে কথা বলে, বুঝলি, খদ্দের হলো লক্ষ্মী, কখনো অনাদার করতে নেই। আজ সকালে হঠাৎ স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামতনুবাবু আরও কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে দোকানে আসেন। স্কুল বন্ধ। কোথাও গিয়েছিলেন বা যাচ্ছেন হয়তো। এসেই বলেন, আমরা আজ লুচি আর সবজি খাবো। চেয়ার মুছে দিয়ে স্যারদের বসায়। খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন উঠতে যাবেন, নন্দ জিজ্ঞেস করে, আজ তো স্কুল বন্ধ। স্যারেরা কই যান?

রামতনুবাবু বলেন, আমরা একটু সদরে যাবো মা। কাজ আছে আমাদের, স্কুলের কাজ। ফিরবো দুপুরের পরই। নন্দ বলে, তাহলে স্যাররা ফেরার পথে আমার দোকান হয়ে যান। দুপুরের ভাতটা এখানেই রান্না করি। একদিন খেয়েই দেখুন না।

রামতনুবাবু এক কথায় রাজি। নন্দর রান্নার সুখ্যাতি শুনেছি, আজ খেয়ে দেখা যেতে পারে। কী বলেন আপনারা। এখন আসি মা, আশা করছি দুটো আড়াইটার মধ্যে ফিরতে পারবো।

স্যাররা বেরিয়ে যেতেই নাসিরকে বাজারে পাঠায় নন্দ, যা দৌড়ে গিয়ে মুরগি নিয়ে আয়। মাছ যা আছে হয়ে যাবে। বাকিটা আমি দেখছি। দুপুরে স্যারেরা এলেন। বলা যায় খেয়েই তৃপ্তিতে ঢেঁকুর তুললেন। রামতনুবাবু বললেন, শুনেছিলাম তুমি ভালো রাঁধো, আজ বুঝলাম, সত্যিই ভালো তোমার রান্না। তাইতো বুঝতে পারছি, কেন লোকে তোমার দোকানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

প্রশংসায় বুক ভরে ওঠে নন্দর। সে বলে, আপনারা আসবেন, যখন যা পারি করবো। আজ কিছুতেই টাকা নিতে রাজি হলো না নন্দ, স্যারদের তো আমিই নিমন্ত্রণ করেছি। সকালে নিজেরা এসেছেন, খাওয়ার পর দাম দিয়েছেন। এবেলা তো আমি নিতে পারি না।

দুপুরের ভাতের চাপ ছিল আজ বেশি। দুপুরের পাট চুকে যাওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের মতো বিশ্রাম থাকে। আজ সবাইকে কাছে টেনে বলে নন্দ, এভাবেই সবার ভালোবাসা আদায় করবি। ভালোবাসা না পেলে কোনো ব্যবসাই চলে না। আমি লেখাপড়া শিখতে পারিনি। আমার বাবাকে পাকিস্তানি সেনা আর রাজাকাররা হত্যা করেছে। এ পাড়ার অনেককে হত্যা করেছে। আমরা নির্যাতিত হয়েছি। সব জানবি পরে। একেবারে পথে বসেছিলাম, ভগবানের দয়ায় আজ এখানে উঠে এসেছি। তোরা সবাই এখন বিশ্রাম কর। নন্দ চৌকিতেই শুয়ে পড়ে। দুলাল আর নাসির বেঞ্চেই শুয়ে থাকে পাশাপাশি।

যেদিন স্কুল থাকে না শেফালি কখনো দুপুরে শোয় না। সামনে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাস, অটোরিকশা, রিকশা চলাচল দেখে। কখনো চড়েনি এসব যানবাহনে। মাঝে মাঝে নিজেকে বাস-অটো রিকশার যাত্রী কল্পনা করে অনেক দূরে চলে যায়। সেটা গ্রাম কিংবা শহর। গ্রাম দেখেছে, শহর দেখেনি। শুধু বড়ো বড়ো বাড়ি কল্পনা করে। অনেক গাড়ি-ঘোড়া, অনেক মানুষ। শোরগোল। হয়তো সেটাই শহর। এভাবে ধীরে ধীরে বিকেল নামে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে, এসময় পুরো দোকান রোদে ভরে যায়। পর্দা নামিয়ে দিতে হয়। শীতে অবশ্য রোদটা সবাই উপভোগ করে।

দুলাল ও নাসির পাশাপাশি দুই বেঞ্চে শুয়ে ফিসফিস করে, মাসির মুখে এমন কথা তো আগে শুনিনি। কী হয়েছে মাসির।

শেফালি আগে কয়েকবারই বলেছে, মাসি দুপুরে ভাতের পর তুমি বাড়ি গেলেই পারো। আবার বিকেলে চলে আসলে হয়। এই সময় এখানে কাজ থাকে না। আর আমরা তো আছিই। নন্দ রাজি হয় না, দূর পাগলি তোদের একা রেখে কোথায় যাবো? তাই তো এখানেই একটু গড়িয়ে নিই। তোদের সঙ্গে থাকতেই তো ভালো লাগে।

বেশ আনন্দেই কাটছে সময়। সেই গুমোট ভাবটা যেন কেটে গেছে। মাসি প্রায়ই গল্প করে। কুকুরের বাচ্চা আর বিড়ালকে নিজেই খাওয়ায়, কোলে তুলে নেয়। এ যেন অন্য এক মাসি। শেফালি খুশি, দুলাল-নাসিরও খুশি। এর মধ্যেই মাসি বলে, আমাকে ছুটি দে, আমি বিশ্রাম নিতে চাই। তোদের তো তৈরি করেছি, তোরা পারবি না দোকানটা চালাতে? দুলাল নাসির দুজনেই বলে, আমরা পারবো মাসি। কিন্তু শেফালি জবাব দেয় না। সে মাসির এ কথার মানে খোঁজার চেষ্টা করে। এ আবার কী কথা। মাসি এমন করে কথা বলছে কেন?

কয়েকদিন পর সকাল থেকেই প্রচুর ভিড় নন্দরানির সংসারে। সদর থেকে বহু লোক এসেছে। এখানে কোথায় জানি সভা হবে। সন্ধ্যার আগেই অবশ্য ফাঁকা হয়ে গেল। সদর থেকে কয়েকজন নেতা এসেছিলেন, সভা করে এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন। নন্দর দোকানে সবাইকে চা-বিস্কুট খাওয়াল আমজাদ। আমজাদ বেশ হাসি-খুশি। তার উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়া নাকি নিশ্চিত। ওপর থেকে পাকা খবর এসেছে। সন্ধ্যার আগে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে শেষ দফা চা টেবিলে। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরের দিকে উঠছে। সিঙ্গারা ভাজছে দুলাল। গরম গরম সিঙ্গারা চায় ওরা। নাসির এক ফাঁকে উনান ঘুরে গেছে। শেফালি চা বানাচ্ছে।

হঠাৎ আর্তচিৎকার সামনে থেকে। লোকজন দৌড়াচ্ছে। দৌড়াল শেফালি, দুলাল, নাসির। নন্দ মাসি ওকি করছে, পাগল হয়ে গেল নাকি! দোকানে তরিতরকারি কাটার বঁটি মাসির হাতে। রক্তে লাল। আমজাদ রক্তে ভাসছে। মাথা দুফাঁক, গলা কাটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে টেবিল চেয়ার, মেঝে। মাসি তখনো কোপাচ্ছে পাগলের মতো। নন্দর রণমূর্তি দেখে সবাই ভয়ে দূরে সরে গেছে। শেফালিই প্রথম ছুটে গিয়ে মাসিকে ধরে, ও

কী করছো মাসি লোকটা মরে যাবে যে!

মারতেই তো চাই। আমার বাবাকে মেরেছে, মা আর আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। গোটা পাড়ায় হামলা হয়েছে এর নেতৃত্বে। এ পাড়া বিধবা পাড়া হয়েছে ওদের কারণে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ওরাই নিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতার পর ও পালিয়ে গিয়েছিল। এক সঙ্গে এভাবে কথা বলে হাঁফাচ্ছে নন্দরানি। মুখে, শাড়িতে টকটকে লাল রক্ত। কেউ এগুতে সাহস করেনি। শেফালি মাসিকে ধরে এনে ভেতরে বসায়। মাসির পাশে বসে দুলাল, নাসির। দোকান এর মধ্যে ফাঁকা। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখছে। আমজাদ পড়ে আছে মাটিতে। চিৎকার করছে—পানি পানি।

জ্বলে ওঠে নন্দরানি, 'খবরদার, সেদিন জলের জন্য সবাই কাতরাচ্ছিল, এক ফোঁটা জল দিতে দেয়নি হারামজাদা। এও ওইভাবে মরুক। খবরদার জল দিবি না।' মাসির এই রূপ কেউ কখনো দেখেনি। সবাই ঘাবড়ে গেছে। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মেয়েটি এমন ভয়ংকর হয়ে উঠলো কীকরে। এর মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এল, আমজাদকে সদরে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করার তোড়জোড় চলছে। একটা অটো পাওয়া গেল। ধরাধরি করে অটোতে তোলা হলো আমজাদকে। পাড়ার লোকজন ছুটে এসেছে। মন্দিরে খবর পেয়ে ঠাকুরদাও ছুটে এসেছেন। মাসির মাথায় হাত রেখে বলেন, এই ছিল তোর মনে? আমাকে নিয়ে তাই এতো দৌড়ঝাঁপ করলি? এখন আমি কী করি বলতো?

একটা রাজাকার নিকেশ করে দিয়েছি ঠাকুরদা। আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি। আজ আর কোনো দুঃখ নেই। আমি এখন শান্তিতে মরতে পারবো। আর শেফালিদের আমি ব্যবস্থা করেছি, তোদের চিন্তা নেই। ঠাকুরদা যেভাবে বলে সেভাবে তোরা চলবি। ঠাকুরদাই তোদের অভিভাবক। এরই মধ্যে শোনা গেল পুলিশ আসছে। মাসি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। ভিড় আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন মন্তব্য করে, রাজাকার আমজাদ নেতা হতে চায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এলো হুইসিল বাজিয়ে। যেখানে আমজাদের ওপর আক্রমণ হয়, সে জায়গাটা ঘিরে ফেলে। পুলিশ অফিসার বলেন, রক্তের দাগ কেউ পারাইবা না। জিজ্ঞেস করেন, এই মেয়েটি আক্রমণ করেছে? নন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, দারোগা সাহেব। মুক্তিযুদ্ধে আমি যেতে পারিনি, আজ সেই মুক্তিযুদ্ধই করলাম। চলুন কোথায় যেতে হবে।

নন্দরানি পুলিশের গাড়িতে উঠল। তার আগে ঠাকুরদাকে ওদিকে ডেকে নিয়ে কী যেন বলে গেল। দোকানে দুজন পুলিশ বসে থাকে। শেফালি, দুলাল, নাসির কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায় পুলিশের গাড়ির কাছে। নন্দ হাত বাড়িয়ে বলে, তোরা চিন্তা করিস না। সব আমি ঠিক করে রেখেছি। তোদের কাজ হলো আমার অতিথি, আমার এই সংসার বাঁচিয়ে রাখা। তোদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো। সব সময় মনে রাখবি এই আমার সংসার, তোরা আমারই ছেলে-মেয়ে।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে শেফালিরা। কোত্থেকে কী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে গেছে। চারদিক আজ বড্ড বেশি শুনশান। লোকজনের চলাচল কমে গেছে। আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুরদা বসে আছেন দোকানের ভেতরে। তিনজনই ছুটে এল ঠাকুরদার কাছে। ওদের কাছে টেনে নেন ঠাকুরদা।

এই শেফালিকে আমি একদিন নন্দরানির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তোরা সবাই শোন, নন্দ দোকানটা তোদের তিনজনকে দিয়ে গেছে। তবে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আমি তোদের সঙ্গে থাকবো। বাড়িভিটা ও সঙ্গের ফসলি জমি পাবে শেফালি। শেফালি একা নন্দর বাড়িতে থাকতে পারবে না। তাই আমার বাড়িতে থাকবে। সেখানে থেকেই পড়াশোনা করবে আর দোকান চালাবে। নন্দর দোকানটা তোরাই রক্ষা করবি। দুলাল ও নাসিরের উদ্দেশে বলেন ঠাকুরদা, আজ দুজনেই দোকনে থাকিস। পুলিশ থাকবে তো। আর হ্যাঁ দোকানটা কিন্তু তোদের তিনজনের।

ঠাকুরদা শেফালিকে নিয়ে নন্দরানির সংসার থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই শুনলেন, হাসপাতালে নেয়ার পথেই আমজাদের মৃত্যু হয়েছে।

পরিবর্তন

মৌ চৌধুরী

বাড়িটার সামনে এসে কিছুটা যেন থমকে গেল নদী। কত বছর নাকি কত যুগ পার করে আজও এই বাড়ির ভেতরে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন অযত্ন অবহেলায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে বাড়িটা। এক সময় এই বাড়িতে নিজেও কত

অযত্ন অবহেলা সহ্য করেছে। তারই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে যেন এই বাড়িটা।

বাড়িটা দেখতে দেখতে মনের মধ্যে কত কথা ভেসে এলো। এক লহমায় নদীর কাছে যেন গুলিয়ে গেল আজ কত তারিখ, কী বার। মনে হলো দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে। তবে কি এটা বসন্তকাল? কীসের একটা বেশ মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। পাকা কাঁঠালের মতো। নদী ভাবল এখন বসন্তকাল হলে পাকা কাঁঠালের সময় তো নয়। তারপরেই মনে হলো আরে এটা তো কাঁঠালিচাঁপা ফুলের গন্ধ। এই গাছটা তো সেই কবে লাগিয়েছিল ও। সেই গাছটা কী আজও আছে, এখন ফুল ফোটে? প্রথমে খেয়াল করেনি, এখন দেখল মাধবীলতা গাছটাও ছেয়ে আছে ঢোকার মুখে গেটের ওপরে। গাছটা যখন লাগিয়েছিল তখন খুব ছোটো ছিল। এখন কত বড়ো হয়ে গিয়েছে। বর্ষায় ফুল ফুটবে। নদী ভাবল, কলতলায় পাঁচিলের পাশে দোলনচাঁপা ফুলের গাছগুলোর কথা। বর্ষায় থোকায়-থোকায় সাদা ফুলে-ফুলে ভরে থাকতো। সকাল-সন্ধ্যায় মন মাতাল করা গন্ধ ছড়াতো। আর বারান্দার দুপাশে নাইট কুইন গাছগুলোয় মধ্যরাতে ফুল ফুটতো। শোবার ঘরে জানালা দিয়ে কী অপূর্ব গন্ধ আসতো। চাঁদ-ওঠা রাতে জানলার পাশে বসে মন কেমন করা মায়াবী আলোয় গাছগাছালিরা স্নান করতো। জানালা দিয়েই দেখা যেতো দূরে মানসাই নদীর ধু-ধু চর। যেন অন্য জগৎ। মাঝেমাঝে শেয়াল ডেকে উঠতো। তখন একা ঘরে ওর একটু ভয় ভয় করত। অন্ধকার হলে আকাশে কত তারা দেখত পুবের এই জানালাটা দিয়ে। কোনটা কালপুরুষ, কোনটা ধ্রুবতারা, আরও কত তারা ও চেনে।

আজ বাড়িটায় ঢোকার মুখে কেউ বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। প্রায় নিস্তব্ধ জনহীন বাড়িটাতে একাই তো যাওয়ার কথা। নদী ভাবে, এই বাড়িতে বসবাসের দিনগুলোর ভেতর বেশিরভাগই ছিল তিক্ত স্মৃতির। সবটাই বেদনাময়। কেবলমাত্র ওই ফুলের গাছগুলো আর মানসাই নদীটাই মন ভরিয়ে রেখেছিল। বাড়িটা নদীর শ্বশুরবাড়ি।

নদীর বিয়ে হওয়ার সময় ওর বয়েস সদ্য একুশ পেরিয়েছে। গ্র্যাজুয়েশনের শেষ সেমিস্টার দিয়েছে, রেজাল্ট তখনও বের হয়নি। সেই সময় একরকম জোর করেই বাবা এই বিয়েটা দিয়ে দেন। নদীর ঘোরতর আপত্তি, বিয়ে করবে না বলে কান্না। মা, আত্মীয়-স্বজনদের অমত উপেক্ষা করে তাকে অনাহূত সন্তান মনে করে বাবা এই বিয়েটা দিয়েছিল। অথচ কত স্বপ্ন ছিল মাস্টার্স করবে। কিন্তু কিছুই হলো না। নদী মনে করত, বাবা কলকাতা থেকে সেই কতদূরে উত্তরবঙ্গের এই ছোট্টো শহরটায় বিনা অপরাধে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। বাবার এক পরিচিতের মাধ্যমে এই সম্বন্ধটা হয়েছিল। নদীর স্বামী নীহার একটা কলেজে পড়াত। বাবার কাছে এটাই সুপাত্রের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। নীহার ছিল নদীর থেকে অনেকটাই বড়ো। তখনই সে ত্রিশ পার করে ফেলেছে। শ্বশুরবাড়িতে প্রচুর লোকজন। বিয়ের পরদিন থেকেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে শাশুড়ির নির্দেশে সংসারের সমস্ত কাজে হাত লাগাতে হয়েছিল। শাশুড়ি বলত শ্বশুরবাড়িতে খেটে খেতে হয়। কেউ বসে খাওয়াবে না। এত খাটুনি যে অল্পদিনেই হাত-পায়ের নখ খারাপ হয়ে গেল। মাথার চুল উঠে যেতে থাকল। শরীরের কোমলতা, রং নষ্ট হয়ে গেল। সাজগোজের কথা ভুলেই গিয়েছিল। খুব অভিমান হতো বাবার উপর। স্বামী নীহারের কলেজ ছিল নারায়ণপুরে। অনেকটাই দূরে। নারায়ণপুরে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকত সে। মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসত। নদীর ধারণা ছিল হয়তো কিছুদিন পর সেখানে নীহার ওকে নিয়ে যাবে। নিজের সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখত। নীহারের কর্মস্থলে যাওয়ার কথা তুলে তার কাছ থেকে প্রচণ্ড বকা শুনেছি নদী। প্রায় মারতেই গিয়েছিল। নীহার কখনই নদীর অবহেলার দিকগুলি ভাবেইনি, সে এই বিষয়ে নজরও দিত না। নদী ভাবত এই কি বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন! কেবলমাত্র উপেক্ষা। জবাব পায়নি নিজের কাছে।

সদ্য বিবাহিত বলেই কেউ নদীর দিকে আলাদা নজর দিত না। নদী ভাবে এখনকার দিনে এমন শাশুড়ি বা শ্বশুরবাড়ি হয় নাকি! শাশুড়ির নদী নামটা পছন্দ নয়। তাই নাম পালটে হলো সানন্দা। এই নামটা আবার একেবারেই পছন্দের নাম নয় নদীর। তবুও নীহারের কথায় এবং অশান্তি এড়াতে মেনে নিয়েছিল। গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্ট বের হওয়ার বেশ পরে স্বামীকে বলে কোনো লাভ না হওয়ায় শাশুড়িকে মাস্টার্স করার কথা বলেছিল। তাঁর যা মুখের ভাষা ছিল লজ্জার থেকে ঘেন্না পেয়েছিল বেশি। নীহার মনে করত স্ত্রীর একমাত্র কাজ হলো শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা। তাই সে বাবা-মা'র হেফাজতে বউকে রেখে চলে গিয়েছিল। ওর শ্বশুর ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন। স্বামীও অনেক টাকা রোজগার করত, কিন্তু এই বাড়িতে খাবার, পোশাক সবই ছিল অতীব নিম্নমানের। গান শোনা, বই পড়া কল্পনার অতীত। ও বুঝতেই পারে

না এভাবে কী করে থাকা যায়। নীহার কখনই একটিও টাকা ওকে দেয়নি। নীহারের দুই বোন অসম্ভব খারাপ ব্যবহার করত ওর সঙ্গে। মূলত তারাই শাশুড়িকে পরিচালনা করেছে। দুই ননদের ওর প্রতি কেন যে এত হিংসা বুঝতেই পারত না নদী। ও জানে একটা পরিবারে সবাই খারাপ হয় না। যেমন ওর শ্বশুর, তিনি নদীর বেদনার কথা বুঝতেন। কিন্তু তাঁর দজ্জাল স্ত্রী আর মা-মুখো ছেলে আর মুখরা মেয়েদের জন্য কিছুই করতে পারেননি। আর ছিল অপূর্ব। অপূর্ব নদীর সম্পর্কের কাকাশ্বশুরের ছেলে। নীহারের খুড়তুতো ভাই। সে ছিল প্রায় নদীর বয়েসি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। অনেকটা যেন স্নেহময় দাদা। নদীর প্রতি নীহারের খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করত। কিন্তু এমন নোংরা অপবাদ জুটে গেল যে নদীর সঙ্গে লজ্জায় কোনো কথাই বলত না।

মনের গভীর সুখহীনতা নিয়ে একটা বছর কোনোমতে পার করেছে নদী। এরই ভেতর কিছুটা জোর করেই সন্তান এনেছিল ও। ওর ধারণা ছিল হয়তো সন্তান এলে নদীর প্রতি মনোযোগী হবে নীহার। এক রকম

জোর করে সন্তান নেওয়াতে কটূ কথা শুনিয়েছিল নীহার। নদী ভেবেই পেত না কেন নীহার তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে। সন্তানের জন্মের ঠিক আগে যেদিন চরম সত্যিটা জানলো সেদিন আত্মহননের পথটা বেছে নিতে চেয়েছিল নদী। কেবলমাত্র অনাগত সন্তানের কথা ভেবে চরম সিদ্ধান্তটা নিতে পারেনি।

সন্তানসম্ভাবা হওয়ার পরে নীহার আর তার মা একরকম জোর করেই নদীকে কলকাতায় ওর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়। নদী বেশ বুঝতে পারছিল ওর সেবাযত্নের পরিশ্রম আর হয়তো খরচ থেকে বাঁচতেই বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় এসে যেন বাঁচল নদী। অনেক দিন কেটে গেলেও নীহার বা শশুরবাড়ির কেউ একটা খোঁজ খবর করেনি। নদীর বাবা-মা নীহার আর তার মা-বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। নীহারদের দিক থেকে যোগাযোগের উৎসাহ দেখা যায়নি। তবে নদী অপূর্বর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল।

এই অপূর্বই নদীর বাবাকে আসল সত্যটা জানিয়েছিল। কানাঘুষো ছিলই তবুও সঠিকটা হলো নীহার নারায়ণপুরে একজন মহিলার সঙ্গে অনেকদিন থেকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। মায়ের কথায় প্রচুর পণ নিয়ে নদীকে বিয়ে করেছিল। এসব কথা অপূর্ব কিছুদিন আগে বিস্তারিত জেনেছে। তবে প্রথম থেকেই নদীর শাশুড়ি সব জানত। ভেবেছিল ছেলের বিয়ে দিলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে পাহাড় ভেঙে পড়েছিল নদীর মা-বাবার মাথায়। নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল নদী। এতবড়ো প্রতারণা হতে পারে ভাবেইনি। নীহারের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে প্রথম থেকেই বাবার উপর রাগ, অভিমান ছিল। সব শোনার পরে সেই অভিমানটা যেন উবে গেল। বদলে নিজের কপালের কথা ভেবে নিজের প্রতি করুণা হচ্ছিল। ওর সবে বাইশ বছর বয়েস। এরই ভেতর একদম একা এতটা রুক্ষ জীবনের মরুভূমি পার করা সত্যিই কঠিন।

* * * * * *

অনেক বছর পার করে নদী ভাবে এক বছরের শ্বশুর বাড়ির নরকবাস অনেক শক্ত করে দিয়েছে ওকে। তাই সহসা কাউকে ভরসা করে না, বিশ্বাসও করে না। এক বর্ষার সন্ধ্যায় নদীর কোল ভাসিয়ে সন্তান এলো। মেয়ে হয়েছে দেখে খুব খুশি হয়েছিল ও। সেই দিনই মেয়ের নাম রেখে ছিল বৃষ্টি। বর্ষায় জন্ম বলে নয়, নদীর পরিপূরক হিসাবে বৃষ্টি।

এরপর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই নদীর কাছে। মেয়েকে নিয়ে এই বয়েসেই একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ওর জীবনের কঠিন মরুভূমির প্রান্তে মরুদ্যান হয়ে এসেছিলেন নদীর মায়ের একটু দূর সম্পর্কের এক দাদা। তাকেই নদী নিজের মামা বলেই ছোটোবেলা থেকে জেনেছে। তিনি দিল্লিতে থাকেন। নদীর এই মামার একমাত্র সন্তান খুব অল্প বয়েসেই মারা যায়। সেই শোকে মামিও বেশিদিন বাঁচেননি। শেকড় হিসাবে এই মামাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল নদী। ওর মামা নদীর দিল্লি যাওয়া নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন এমনটা নয়। আসলে একার সংসারে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবে পরিস্থিতি, নদীর ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ, জোরাজুরি ওর মনের অবস্থা সব দেখে তিনি রাজী হলেন। নদীর মামা কিন্তু ওকে অবহেলা করেননি। দিল্লি নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মতোই আগলে রেখেছেন। নাতনির জন্য আয়া রেখে দেওয়া, সঠিক চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় খাবার থেকে বড়ো হয়ে শিক্ষা সব দিক সামলেছেন। সবথেকে জরুরি কাজটা করেছিলেন নদীকে জোর করে মাস্টার্সে ভর্তি করে দেওয়া। শুরুতে ফের লেখাপড়া করতে মন চাইছিল না নদীর, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে সায় দিল। আবারও ক্লাসে গিয়ে নতুন সহপাঠী পেয়ে অনেকটাই শক্ত হয়ে উঠল ও। এদিকে অপূর্বর সঙ্গে যোগাযোগটা ছিলই। তার কাছে নদীর শর্ত ছিল নীহারের কথা, শ্বশুরবাড়ির কারও বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। অপূর্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কথা তো আসবেই।

সময় কখনোই থেমে থাকে না। নদী শুনেছে ওর শ্বশুর বার কয়েক নদীর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে নদীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কথা নদী আর ভাবে না। অপূর্বর কাছ থেকে ও শুনেছে নারায়ণপুরের অনেকেই নীহারের অবৈধ সম্পর্কের কথা, বিয়ের কথা জানতে পেরেছে। অপমান সয়ে চাকরিটা করছে কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান আর এখন নেই। নদীর অনেক বিয়ের প্রস্তাব এলেও রাজী হয়নি ও। বাবা-মা-মামা পরে আর জোর করেননি।

নদীর বৃষ্টিকে ঘিরেই জীবন। সবাই জানে ও সিঙ্গল মাদার। মায়ের পরিচয়ে বড়ো হয়েছে ও। মামার জন্য আর্থিক দৈন্য হয়তো খুব একটা নেই নদীর কিন্তু মেয়ে আর মামার জন্য অক্লান্ত

পরিশ্রমটা আছে। মেয়েকে বড়ো করার লড়াইটা চলছেই। তবে এই পরিশ্রমে কোনো কষ্ট নেই, অপমান নেই। খুব ছোটো থেকেই মেয়েকে নিজের কষ্টটা বুঝিয়েছে ও। খুব মেধাবী আর সহিষ্ণু মেয়ে বৃষ্টি। প্রথম থেকেই নদী চেয়েছিল মেয়ে বড়ো হয়ে অন্য কোথাও সেটল করুক। সেভাবেই তৈরি হয়েছে বৃষ্টি। এর পেছনে মামার অবদান সবথেকে বেশি। মামার যোগাযোগের চেষ্টায় বৃষ্টি সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছিল আমেরিকার একটি কলেজে। এই দিনটির জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল নদী। মেয়ে অনেক দূরে চলে যাবে ভেবে মনটা খারাপ হলেও স্বপ্ন পূরণের হাতছানি ছিল। নদী মেয়ের কাছে ওর জীবনের কথা, নীহারের কথা বলেছিল। মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করেনি। নদী দেখেছে বাবা শব্দটার প্রতি বৃষ্টির কোনো টান নেই।

অপূর্বর কাছ থেকে নদী জানতে পেরেছে তার শ্বশুর মৃত্যুর আগে যাবতীয় সম্পত্তি বৃষ্টির নামে লিখে

দিয়ে গিয়েছে। শুনে ঘৃণা হচ্ছিল নদীর। বৃষ্টি ওর একার মেয়ে। শ্বশুরের আর শ্বশুরবাড়ির সকলের নাকি বৃষ্টিকে দেখার খুব আগ্রহ। ওদের একমাত্র বংশধর বৃষ্টি। গোটা পরিবারের প্রায় সবাই একজন অল্প বয়েসি মেয়ের সঙ্গে এমন প্রতারণা করেছে, এত কষ্ট দিয়েছে মনে হলেই নদীর স্বপ্ন দেখার বয়সের স্মৃতিগুলো জীবনের অভিশাপ বলে মনে হয়। পুরনো দিনের কথা, নিজের অপমানের কথা মনে হলেই নদীর মন অস্থির হয়ে উঠত। তখন সেই ছেলেবেলা থেকে বৃষ্টি মায়ের মুখ নিজের বুকে নিয়ে আগলে রাখত। বারবার বলত, মা আমি তোমার মতো হব। আমার মা-বাবা তুমিই। যে লোকটা আমাকে জন্ম দিয়েছে যদি কোনো দিন দেখা হয় বাবা বলে ডাকব না, বাবা বলে মানব না। দেখো আমি মুখ ফিরিয়ে রাখব।

অপূর্বর কাছ থেকে নদী জানতে পেরেছে বৃষ্টি আমেরিকা চলে যাওয়ার পরের বছর নীহারের মা মারা যায়। নীহারকে তার মায়ের শেষ কাজ করতে দেওয়া হয়নি। অপূর্ব বলেছিল, নীহারকে কেউ ক্ষমা করেনি। শ্বশুরের ব্যবসা এখন অন্য কেউ সামলায়। অপূর্ব বলত, নদী তুমি একটুও দুঃখ করো না। নীহার যে কাজ করেছে তার চরম শাস্তি পাচ্ছে। কতটা অন্যায় করেছে তোমার সঙ্গে এখন বুঝতে পারছে। নদী বারবার করে নিষেধ করে এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে। নদী জানে ওর শ্বশুরবাড়ির যাবতীয় সম্পত্তির মালিকানা এখন বৃষ্টির। এসব ভাবলেই শরীর কেমন গুলিয়ে ওঠে নদীর।

* * * * * *

প্রায় দু'বছর পর বৃষ্টি দেশে ফিরছে। এবারে একটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে নদীকে। অপূর্ব জানিয়েছে, নীহার মৃত্যুশয্যায়। সকলের কাছ থেকে একরকম দয়াভিক্ষা করে বাড়িতে এক কোনায় পড়ে আছে। প্রাণটাই কেবল যায়নি। সব হারিয়েছে নীহার। এমনকী তার রিটায়ারমেন্টের পর যাবতীয় টাকা সেই মহিলাকে দিতে হয়েছে। এখন সে বারবার করে নদীকে আসতে বলছে। নদীর কাছে ক্ষমা চাইবে। বৃষ্টিকে একবার দেখতে চাইছে। প্রথমে নদী একদমই না করে দিয়েছিল। কিন্তু মামা বললেন, বৃষ্টি আসুক, তারপর সিদ্ধান্ত নিস।

নদীর এখন মনে হয় বৃষ্টি অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে। কত বুদ্ধি রাখে। মেয়ের কথাতেই ফের একবার শ্বশুরবাড়িতে আসা। মেয়ে বলেই রেখেছে বিষয় সম্পত্তি কোনোও কিছুই ও নেবে না। যার খুশি নিয়ে নিক।

আনন্দহীন বাড়িটায় অপূর্ব আর ওর বউ এসে নদীকে ভেতরে নিয়ে গেল। অপূর্ব বৃষ্টিকে বলল, আয় চল এটা তোদেরই বাড়ি। তোর পায়ের নীচের মাটি, মাথার উপরে ছাদ। তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, একেবারে শেষ সময়ে হলেও এসেছ। হয়তো আর বেশিক্ষণ নেই। পরের দিকে নীহার খুব স্মোক করত, তাই হয়তো লাং ক্যানসারে ভুগছে। কাল থেকেই শ্বাস উঠেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে খবর দেবেন, ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো। কথাটা শুনে কি বুকে ধাক্কা লাগল নদীর। ও তো এমন জীবন চায়নি। নীহারের সঙ্গেই সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। জীবনের শক্তপথে চলা নদীর অনেক অভিমানেই কি চোখ ভিজে হয়ে আসছে?

বৃষ্টি দেখল নীহারকে নীচের একটা ছোটো ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। রোগে ভুগে শরীর কঙ্কালের মতো শীর্ণ। দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝাই যাচ্ছে না। মাথাটা অন্য দিকে হেলানো, তাই মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবে গাল ভর্তি বিশাল সাদা দাড়ি, চুল আর অযত্নের ছাপ সর্বত্র। বিছানায় কোনো তোষক নেই। গায়ের চাদরটা কী ময়লা। শরীরটা কত ছোটো হয়ে এসেছে। বৃষ্টি সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মনের ভেতর কি কোনও তোলপাড় হচ্ছে?

অপূর্ব বলেছিল নদীর কাছে ক্ষমা চাইবে নীহার। কিন্তু ওর আর কি সেই চেতনা আছে? মেয়েকে আকুল হয়ে দেখতে চেয়েছিল সব কি দেরি হয়ে গেল? তাছাড়া নদীর কাছে ক্ষমা চেয়ে কী হবে। নদীর সেই দিনগুলি কি ফিরে আসবে। নীহারের ঘরে না গিয়ে ওপরের নিজের ঘরে গিয়ে থমকে গেল নদী। কত বছর পর এই বাড়িতে এই ঘরে পা রাখল ও। তার হিসেব আর এখন কষতে চায় না। সম্ভবত শেষবারের মতো নিজের ঘরটায় এসেছে। ঘরের আসবাবগুলো অনেকটা আগের মতোই আছে। তবে ধুলো ময়লা পড়ে রং উঠে গিয়ে প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে। তবে ওরা আসবে বলেই হয়তো ঘর কিছুটা পরিষ্কার করা হয়েছে। ভাবছিল ঘরে পাতা এই খাটেই ফুলশয্যার রাতে ওকে ফুলের সজ্জায় ঢেকে বসানো হয়েছিল। সেইরাত মোটেই সুখের ছিল না। কত স্মৃতি ভেসে আসছে। যেন আজ সেই রাতের রজনীগন্ধার গন্ধ অনুভব করছে ও। সেই রাতের মতো ঘরের বাইরে হালকা কোলাহল, সানাইয়ের শব্দ, রান্নার গন্ধ আসছে। রাত বাড়ছে, অতিথিরা বিদায় নিয়েছে, আত্মীয়রা বাসরের তোড়জোড় করছে। বিরক্ত মুখে নীহার বসে রয়েছে।

আজ যেন সেই রজনীগন্ধার গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল। এই ঘরে নীহারকে আপন করে পেতে চেয়েছিল বলে অপমান জুটেছিল। নারায়ণপুর থেকে নীহারের আসার দিন ঘর গুছিয়ে রাখত, তাই নিয়ে শাশুড়ি কত গঞ্জনা দিয়েছে। সাজানো ঘর উলোট পালট করেছে। নীহার নদীর চোখের জলের মূল্য দেয়নি। ওর লাগানো ফুলের কত গাছ পা চাপা দিয়ে মেরেছে। ঘরের ভেতর রাখা ছোটো ছোটো ফুলের টব বাইরে ফেলে দিয়েছে। ঘরের জানালা দিয়ে দূরের মানসাই নদীটার দিকে তাকালো ও। মনে হলো সেই নদীটা একই রকম আছে। কতবার দূর থেকে ওই মানসাই নদীকে মনের কথা বলেছে। এই নদীর চোখের জলে মানসাই নদীর বুক উথলা হয়েছে কিনা জানে না ও। সেই বড়ো স্রোতস্বিনী এই ছোট্টো নদীর বৃষ্টিধারায় হয়তো মিশেছে। ও ভাবছিল কীসের টানে এখানে এল। না এলে ক্ষতি কী ছিল। সেই অনেক দিন আগে হয়তো এমনই দিনে নদী এই বাড়িতে এসেছিল। সারাটা জীবন এই বাড়িতে থাকবে এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল। আজ অনেক দিন পরে যৌবনের প্রান্তে এসে এই প্রত্যাবর্তন শ্বশুরবাড়ির ভিটা নদীকে বরণ করেছে কিনা ও জানে না। নববধূকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করে ষোড়শোপচারে প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করা হয়। হায় রে, লক্ষ্মীহীনা নারী ভাবলেই চোখে জল ভরে যায়!

এসব ভাবনায় জোর ধাক্কা লাগল বৃষ্টির চিৎকারে—ও মা তুমি কোথায় গেলে। শিগগির এসো বাবা আর শ্বাস নিচ্ছে না। বৃষ্টি জোরে জোরে ডাকছিল—বাবা, বাবা ও বাবাগো। বৃষ্টির গলা কি ধরে এলো! নদী সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল সারা জীবন সন্তানের কাছ থেকে বাবা ডাক শুনবে বলে মানুষটা হয়তো আকুল হয়ে অপেক্ষা করেছে। সন্তানকে দেখতে চেয়েছে সেই আশা আর পূরণ হলো কোথায়? বৃষ্টির মুখে এমন বুক ফাটানো বাবা ডাক শুনে প্রথমে নদী চমকে গিয়েছিল। তারপর ভাবল বৃষ্টি নিজেকে পরিবর্তন করে বাবা ডেকে সেই মানুষটাকে অবশেষে স্বীকৃতি দিয়ে গেল। □

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street,
2nd Floor,

Kolkata-700 007

(s) 2272-5487

Mob : 9331105467

With Best Compliments

from -

A

Well Wisher

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনায় :-

A

Well Wisher

(KN3)

বিবেক আলোকে আলোকিত সুভাষ

ড: পঙ্কজ কুমার রায়

১৮৯০ সালে বরাহনগরের এক পোড়োবাড়ি থেকে বারাণসী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, আলমোড়া, খেতড়ি হয়ে ওরিয়েন্ট জাহাজে চেপে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতার উদ্দেশে রওনা দিলেন বিবিদিষানন্দ ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বজা উত্তোলন এবং সনাতন ধর্মের ওজস্বী বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সাত বছর পর ১৫ই জানুয়ারি, ১৮৯৭ বিলেত থেকে ফেরার পথে প্রথমে কলম্বো, সেখান থেকে জাফনা হয়ে রামনাদের ভারত-ভুখণ্ডে পদার্পণ করেন। সঙ্গে বিদেশি শিষ্য, বক্তৃতার অনুলেখক গুডউইন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী, আরও অনেকে। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে জাতীয় পুনর্নির্মাণের জন্য যুব সমাজকে আহ্বান করলেন। 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' ভাষণে তার অভিঘাত লক্ষ্য করা যায়।

চেন্নাইতে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় স্বামীজী বললেন, ''আগামী পঞ্চাশ বৎসর গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত— সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।'' ঠিক ৫০ বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পেলাম। ১৯২৮ সুভাষচন্দ্র ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেছিলেন।

আবার ১৯২৯ সাল। গান্ধীজী পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সমান্তরাল সরকারের দাবি পেশ করেন। যদিও দুটি অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নয়। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে স্বামী বিবেকানন্দ জাফনার 'হিন্দু কলেজ' প্রাঙ্গণে বেদান্ত সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ''প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দই 'হিন্দু' রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীরবাসী সকলকেই 'হিন্দু' বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে;...... অতএব, আমি হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে কোন শব্দ ব্যবহার

করিব? আমরা 'বৈদিক' শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভালো হয়।

যদিও তিনি বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিন-তিনবার সে কথা কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। (২)

১৮৯৭ সালে রামনাদে অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বললেন, ''হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নয়। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ওই দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠো, তাঁহাকে জাগাও—আজ নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। (৩) সুভাষচন্দ্র বসু বলতেন, ''মানব জাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি, এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।''

সুভাষচন্দ্র মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পড়তে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, ''আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর যখন বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করিলেন.....'' সুভাষচন্দ্র প্রথমে আত্মীয়ের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কয়েকটি বই দেখেছিলেন। তিনি সেই বইগুলি চেয়ে এনেছিলেন। বইগুলি তিনি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়া শুরু করেন এবং খুব শীঘ্রই সেই সমস্ত বই পড়া শেষ করেন। তিনি লেখেন, ''সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ধারণা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা আত্মার গান—এই বার্তাটি স্বামীজীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র জাতিকে মোহিত এবং প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল। এই সত্যটি তাঁর রচনা, জীবন, কথোপকথন এবং বক্তৃতাগুলিতে মূর্ত ছিল।[৪] নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। জনসেবার মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির ধারণা নেতাজী স্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায়, ''ধর্মচর্চা বলতে আমি শুধু যোগ অভ্যাসকেই জানতাম, একথা বললে ভুল বলা হয়। অবশ্য কিছুদিন আমি যোগ নিয়ে একটু বেশিরকম মেতে উঠেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। এই ধারণা বিবেকানন্দই আমাকে দিয়েছিলেন। তিনিই জনসেবা, তথা দেশসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন।'' তাইতো তিনি বলতে পারেন,—

''বহুরূপে সম্মুখে, তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।''

সুভাষচন্দ্র ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ভারত ভ্রমণে বের হন। অনেক মন্দির দর্শন ও সাধুসঙ্গ করার পর তিনি বারাণসীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সান্নিধ্যে এসে শান্তি লাভ করেন এবং ঋষিতুল্য জীবনবোধ উপলব্ধি করেন। স্বামীজীর বাণী নেতাজীর ভিতরে কীভাবে অনুরণন ঘটিয়েছিল ২০১৩ সালে প্রকাশিত The Salute সংকলনে উল্লেখ করা হয়। ''I was barely fifteen when Vivekananda entered my life. Then there followed a revolution within and everything was turned upside down. It was of course, a long time before I could appreciate the full significance of his teachings, or the greatness of his personality, but certain impressions were stamped indelibly on my mind from the outset... Many of the questions which vaguely stirred my mind, and of which I was to become conscious later on, found in him a satisfactory solution.''[৫]

ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র গুরু স্বামীজী সম্পর্কে বলেছিলেন, ''বিবেকানন্দের কথা বলতে গেলে হারিয়ে ফেলি নিজেকে। কে বুঝবে তাঁকে, কে বুঝবে তাঁকে? অসম্ভব। সুগভীর তিনি। জটিল, ঋদ্ধমান। ত্যাগে বেহিসেবী। কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, জ্ঞানে সমুদ্রগভীর, সমালোচনায় অগ্নিবর্ষী। আর সারল্যে শিশু—একেবারে শিশু—এ জগতে তাঁর তুল্য নেই, কেউ নয়.......... আমি কে, যে বলব তাঁর কথা?'' ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন, ''একজন তপস্বী হলেও বিবেকানন্দ ছিলেন দেশপ্রেমিকদেরও একজন দেশপ্রেমিক। ভারতের জনগণের মধ্যে সুপ্ত কিন্তু মৃত নয় এমন আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবিত করে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক গৌরব পুনরুদ্ধারের চিন্তাভাবনা সর্বদা তাঁর মনের সবচেয়ে উচ্চতম চিন্তা ছিল........''[৬]

১১ই পৌষ, ১৩৩২ (১৯২৫) 'দেশের ডাক'-এ সুভাষচন্দ্র বলেন, ''বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছো, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে পার তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন।''[৭] ১৯২৯ সালে রংপুরে রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, ''It was Swami Vivekananda who gave a new turn to the history of Bengal as he repeatedly said that man-making was his mission in life.''[৮] ধর্মবোধ নেতাজীর রাজনীতির ভিত্তি তা 'দেশের ডাক', 'তরুণের স্বপ্ন'-এ প্রতিভাত হয় নিজের কথায়ঃ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি।[৯] স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ''Man making is my mission.''

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের আরও অনুমতি প্রার্থনা করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে চিঠি লেখেন। তরুণের স্বপ্নে তার উল্লেখ আছে—

''..... আপনি বাঙ্গলাদেশে স্বদেশ সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্— তাই আপনার কাছে আমি উপস্থিত হয়েছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে, মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার মতো আমার কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

......আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু—কর্মের আদেশ দিন''[১০] একই সঙ্গে Secretary of State for India-কে পত্র লিখে £100 (১০০ শত পাউন্ড) ফেরত দেন ২২শে এপ্রিল, ১৯২১।

রাজনৈতিক ঋষি সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী স্বামীজীর প্রেরণায় এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, বিবেকানন্দ ছিলেন নব ভারতের নবযাত্রী।'' কটক থেকে বাল্যকালে 'মাতা ঠাকুরাণী'কে লেখা পত্রে দেশমাতৃকা ও ধর্ম সাহিত্যের বীজ তাঁর অন্তরে গ্রথিত থেকেছে তার প্রকাশ পাওয়া যায়।

''মা, ভারতবর্ষে ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পরিত্রাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।''

আপনার ছেলে
সুভাষ[১১]

২৫ অক্টোবর, ১৯২৪ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৫ জানুয়ারি, ১৯২৫ বার্মার মান্দালয় জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেই বছর দুর্গাপুজায় সুভাষচন্দ্র বন্দিদের নিয়ে জেলে অনশন করেন দুর্গাপূজা করার দাবিতে। অবশেষে মান্দালয় জেলে ব্রিটিশ সরকার দুর্গাপূজা করার অনুমতি ও অর্থ বরাদ্দ করে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা শুরু করেন। কী আশ্চর্য মিল গুরু-শিষ্যের! সুভাষের মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজার শতবর্ষ আর স্বামীজীর বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার ১২৫ বছর উদ্‌যাপন হবে ২০২৫ সালে।

১৯৪১ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারি রাত্রে নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণ ঘটে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। মহানিষ্ক্রমণের আগে ভাইঝি ইলা বসুকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে ভবতারিণীর পূজা দিয়ে প্রসাদ ও প্রসাদী ফুল আনিয়ে তিনি 'অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য' তিমির রাত্রি পাড়ি দিয়েছিলেন।

স্বামীজী ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত আর নেতাজী রাজনৈতিক। পৃথিবীর বুকে বঙ্গ তথা বাঙ্গালির গুরু-শিষ্য পরম্পরা ভারতকে 'ধর্মে মহান' ও 'কর্মে মহান' হবার প্রেরণা দিয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন—''যদি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জান। তাঁর সবই ইতিবাচক এবং কিছুই নেতিবাচক নয়।'' নেতাজী স্বামীজীর ভাবশিষ্যরূপে তা জেনেছিলেন বলেই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' পার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি। ১৯৫৬ সালে রাজভবনে তৎকালীন গভর্নর স্যার ফণিভূষণ চক্রবর্তী এটলিকে প্রশ্ন করেছিলেন দুশো বছর শাসনের পর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত পরিত্যাগ করল কেন ব্রিটেন? এটলির সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল ঃ সুভাষচন্দ্র।

২৭ শে মাঘ, ১৩৩৫ পাবনা যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন,

''যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নতুন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।''[১২]

পাবনা সম্মেলনে দৃপ্তকণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা সহকারে বলেন—''আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব। আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা (tenacity of purpose) ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব? বনেজঙ্গলে যুগযুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে, অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে, সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না। শক্তিপূজা কথার কথা নয়, যদি কথার কথা হতো তবে চিরদিন ভারত শক্তিপূজা করে শক্তিহীন কভু হতো না।''

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এভাবে ঃ

''পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।/চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।''

''এই কর্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব ভারতের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গনে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মতো চলিতে শিখিব।''[১৩]

মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীমান হরিচরণ বাগচীকে লিখছেন,

''সাধনার একদিক রিপু ধ্বংস করা। অপরদিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে,

শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

সত্য (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাতত স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বইয়ের মধ্যে 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইয়ের মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion', 'Jnan Yoga' বা ওই জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ''শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি এল রায়ের অনেক বই আছে (যেমন 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস') যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর ও রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার।"[১৪]

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, ''If you want to know India, study Vivekananda. In him everything in positive and nothing negative.'' অন্যদিকে ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেন, ''full blooded masculine personality and a fighter to the come of his being.'' সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, স্বামীজী একজন পূর্ণাঙ্গ পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং তার সত্তার মূলে একজন যোদ্ধা বলে অভিহিত করেছিলেন। (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১২)

১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট (২রা ভাদ্র, ১৩৪৬) রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের উদ্বোধনে বলেন ''বাঙ্গলায় যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি" (মহাজাতি সদনের ফলকে আজও যা খোদিত আছে)। সুভাষচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের উদ্বোধন করেছিলেন। বাঙ্গলার জাগ্রত মনীষিতাকে অভ্যর্থনা করেছেন।

মাঘ, ১৩৪৫ কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্রকে তাসের দেশ উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে, তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটকটি উৎসর্গ করলুম।"

রামকৃষ্ণের ১৮৫ তম জন্মজয়ন্তীতে আলোচনায় উঠে আসে সোনার চেয়েও খাঁটি দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সম্পর্ক। সুভাষ বিবেকানন্দের সমগ্র পড়ে অনুপ্রাণিত হন এবং ফলিত বেদান্তের আলোকে দরিদ্র, অসহায় ও আর্ত মানুষের সেবায় মনোনিবেশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসবার আগে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ কথামৃত (The Gospel of Sri Ramakrishna) পাঠ করে মাতা প্রভাবতী দেবীকে লেখেন,'' জীবনের লক্ষ্য হইল ঈশ্বর লাভ।" যদিও তরুণ সুভাষ বিবেকান্দের গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং বিবেকানন্দকে জানবার পর 'কথামৃত' আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। সুভাষচন্দ্রের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান রণিত হয়েছেঃ ''From Vivekananda I turned gradually to his master, Ramakrishna Paramahansa. Vivekananda had made speeches, written letters, and published books which were available to the layman. But Ramakrishna, who was almost an illiterate man, had done nothing of the kind. He had lived his life and had left in to others to explain it. Nevertheless, there were books or diaries published by the discriples which gave the essence of his teachings.... There were nothing new in his teaching, which is as old as Indian civilization itself, the Upanishads having taught thousands abandonment of worldly desires alone can immortal life be attained. Effectiveness of Ramakrishna's appeal lay, however, in the fact that he had practised what he preached and that ..... he had reached the acme of spiritual progress.'' (netajisubhasbose.org; March 21, 2021.)

শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' পুস্তকে লিখলেন, ''মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্র নিছক তাত্ত্বিক মানুষ ছিলেন না। দর্শনের এই উত্তম ছাত্রের তাত্ত্বিক হয়ে ওঠার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তত্ত্বকে বিলাসবস্তু না করে জাতীয় জীবনে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আবার সুভাষচন্দ্র শুধু বিদ্রোহী দেশকর্মী নন, তাঁর সকল কর্ম সুগভীর জীবন দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সেই জীবন দর্শন পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক নানা দর্শনের সমাহার এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে সংগঠিত হয়েছে।" (জেনোরিক, ২০২৩)

১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের CEO হবার পর তাঁর সেবাকার্য আরও ব্যাপ্ত হয়। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যায় ত্রাণবণ্টন সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৪ সালে Ramkrishna Mission Student's Home পরিদর্শন করে স্বামী নির্বেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লেখেন, '' I visited the Ramakrishna Mission Students' Home a few days ago and was exceedingly pleased with what I now.....the fact that a serious attempt is made here to impart moral and religion instruction as also to make students live a good and pure life, is a further reason why I am interested in the success of this institution.''[১৫]

সুভাষচন্দ্র বেলুড়মঠে যেতেন কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হরিবিষ্ণু কামাথ যিনিও ICS ত্যাগ করেছিলেন তিনি দু'মাস সুভাষের সঙ্গে কলকাতায় ছিলেন। তিনি দেখতেন মধ্যরাতে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যেতেন

ধ্যান করতে। তিনি বেদান্ত আন্দোলনের কাণ্ডারি স্বামী অভেদানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং অভেদানন্দ আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করে বলেন 'be thou victorious'.(বিজয়ী হও)। সুভাষচন্দ্র বুদ্ধ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর সাক্ষাৎ করতে যান সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। তিনি মধ্যরাত্রে ধ্যান করতে যেতেন, সারদাদেবীর তিথিপূজায় অংশগ্রহণ করতেন। ব্রিটিশরা পুনরায় সিঙ্গাপুর অধিকার করলে বুদ্ধ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী কৈলাশমকে সুভাষের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সাংস্কৃতিক সন্ন্যাসী আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। সমকালে এই যুগল-বন্ধন বড়ো বিরল। একদিকে, বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতবাসীর মন, বুদ্ধি, বিবেক ও চরিত্র গঠনের কাণ্ডারি। অন্যদিকে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই আদর্শকে রাষ্ট্রহিত ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রচেতনাকে জাগ্রত করে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণের কারিগর।

স্বামীজীর স্বরচিত কবিতা 'ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়'-এর প্রথম স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা যাক,

''সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ
যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়,
জয় তব জেনো সুনিশ্চিত।''

স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ 'সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে স্বামীজীর প্রভাব' প্রবন্ধে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

''পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।''

নেতাজীর জীবনে বিবেকানন্দ এই অনশ্বর, অবিচল চিরসারথি যিনি সেদিনের ধূলিধূমসমাকীর্ণ সভ্যতার বিবর্ণ বন্ধুর রাজবীথিপথে লক্ষ কোটি মানবজাতির মিছিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদেরই যাত্রার অধিনায়করূপে। অনাগত বিশ্বসংসারের দুর্গম পথে, সহস্র–সহস্র শোক-তাপ-বিরহ- দহনের বহ্নিশুদ্ধি আত্মীকৃত করে বিবেকানন্দই সুভাষকে তাঁর অমোঘ কিন্তু অদৃশ্য আকর্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন নবযুগের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে 'লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে'র সামনে।[১৬]

শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্লোকে বিবেক-বাণীর জয়যাত্রা' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, ''সুভাষ জানতেন অনেক মরণ পেরিয়ে তাঁকে হাঁটতে হবে, অনেক শত্রুর ফাঁদ পায়ে-পায়ে ছিঁড়তে হবে, ডাক দিতে হবে ভারতের বীর্যকে, নাশ করতে হবে ভারতের ক্লৈব্যকে—সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী হতে হবে—সঙ্গে স্বামীজী আছেন যে। সত্যই তাই, ভারত ইতিহাসের বহু শতাব্দীর মৃত্যু-নদীর উপর বিবেকানন্দ একটি সহস্রদল রক্তপদ্ম ভাসিয়ে দিয়েছিলেন— সেই পদ্মটিই সুভাষচন্দ্র— মৃত্যুর স্থানে ভারতভূমির জীবনকে শুচি ও অমৃত করে তুলতে এসেছিলেন।[১৭] বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা উদ্ভাসিত।

(৭ মে, ২০২৫ ওমেন্স কলেজ,বাগবাজারে এই প্রতিবেদকের প্রদত্ত ভাষণ)।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫৩।

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১১–১২।

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৯, খৃঃ ৩৫।

৪। বিবেকানন্দ ও লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৯৬, পৃঃ ২০৯–২১২।

৫। The Patriot and His Inspiration, A Salute. EMTA, Coal Limited, 2013

৬। বিবেকানন্দ ও লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৯৬, পৃঃ ২২২–২২৩।

৭। দেশের ডাক, তরুণের স্বপ্ন, ১১ই পৌষ ১৩৩২ (১৯২৫) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪৫, আনন্দ, ষড়বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২৩, পৃ. ১২ ISBN 9788170666578.

৮। Important Speeches and Writings of Subhas Bose, Edited by J. S. Bright, Lahore, 1946.

৯। তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আনন্দ, ষড়বিংশ মুদ্রণ মে, ২০২৩, পৃঃ ১১।

১০। তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪৫ আনন্দ, কলকাতা প্রবাহ ষড়বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২৩, পৃঃ ২ এবং ৩ ISBN 9788170666578

১১। Letter to his mother as a boy in Cuttack, describing India as ''God's beloved land'', A Salute, EMTA Coal Limited, 2013

১২। যুব আন্দোলন, তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আনন্দ ষড়বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২৩, পৃ. ১১৪।

১৩। তদেব, পৃ. ১১৯

১৪। তদেব, পৃ. ৩১

১৫। netajisubhasbose.org, March 4, 2021

১৬। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে স্বামীজীর প্রভাব, স্বামী সুধীরানন্দ, বিবেক-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সুভাষচন্দ্র, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রকাশ ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ পৃঃ ১৩।

১৭। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্লোকে বিবেকবাণীর জয়যাত্রা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তদেব, পৃঃ ৭।

(লেখক অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ)

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

With Best Compliments From-

S. K. KAMANI

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)
2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® **BRAND**

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable,
PVC Tape, Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles, Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

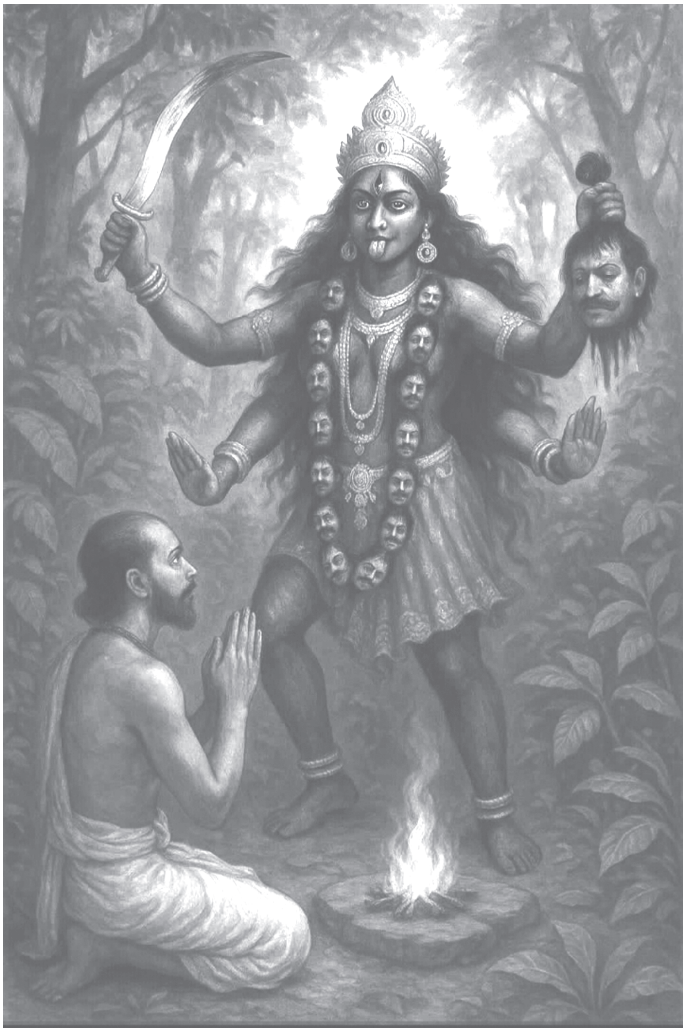

বঙ্গদেশে শক্তি সাধনায় অগ্রগণ্য সাধক পূর্ণানন্দ গিরি

প্রবীর ভট্টাচার্য

বহুদিন আগের কথা। কামাখ্যার পথে চলেছেন এক বঙ্গ তনয়। ক্ষীণকায় কিন্তু অসীম সাহসী। গুরুকে শাপমুক্ত করতে দুর্গম পথ পেরিয়ে চলেছেন কামাখ্যা মন্দির সংস্কারের কাজে। কামাখ্যা মহাপীঠ ছিল সেযুগে দুর্গম ও জঙ্গলাকীর্ণ। পীঠস্থানটির অবস্থান সাধারণের কাছে ছিল অগম্য। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে দেবীপূজা বন্ধ। কালাপাহাড় নামে এক দস্যু গোমাংস নিক্ষেপ করে এই মন্দিরকে অপবিত্র করে। এখন উপায়! পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন সারা ভারতবর্ষ থেকে মাতৃ

সাধকদের এনে যাগযজ্ঞ করে দেবীকে জাগ্রত করতে হবে। বড়ো কঠিন এই কাজ। সেই শুদ্ধীকরণ যজ্ঞেই চলেছেন এই বঙ্গবাসী ব্রহ্মচারী জগদানন্দ। গুরুপ্রদত্ত নাম পূর্ণানন্দ। ভবিষ্যতে এই যুবকের প্রভাবেই বঙ্গদেশে শক্তিপূজার প্রাবল্য আসবে। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

একান্ন শক্তিপীঠের অন্তত পনেরো-ষোলটি শক্তিপীঠ বঙ্গদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে। এছাড়াও আছে অনেকগুলি সিদ্ধপীঠ। সতীর দেহাংশ সত্যই এই অঞ্চলে পড়েছিল কিনা সে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করে এমন ভাবাই যেতে পারে যে দীর্ঘ সময় ধরে বঙ্গদেশের মাটি শাক্তসাধকদের সাধনক্ষেত্র। বঙ্গদেশের ধূলিকণায় এমন শক্তি আছে যা সাধকদের যুগ যুগ ধরে উদ্দীপ্ত করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেখানে বঙ্গদেশের মাটির নাম জড়িয়ে আছে, এর ৮১—৯৩ অধ্যায়ের 'শ্রী শ্রী চণ্ডী' অংশটি হলো দেবী আরাধনার অন্যতম অংশ। অন্যদিকে এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের সঙ্গে ব্যাসদেবের নাম জড়িয়ে থাকায় কেউ কেউ মনে করেন এর রচনাকাল মহাভারতের সময়কালেও হতে পারে। 'বেদ' আগে না 'তন্ত্র' আগে এ বিষয়েও বিতর্ক রয়েছে। তবে বেদের ভাষ্যকারেরা ঋগ্বেদ (১০/৭১/৯) এবং অথর্ববেদে (১০/৭/৪২) তন্ত্রজাতীয় শব্দের উল্লেখ আছে বলে স্বীকার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদি ছটি ভাগের একটি হলো 'আগম'। 'আগম'-এর তিনটি ভাগ। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। আগমের অপর নামই তন্ত্র।

মার্কণ্ড পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী আসলে রাজ্যচ্যুত রাজা সুরথ, সমাধি বৈশ্য এবং মেধস মুনির মধ্যে কথোপকথন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও বিদ্রোহে এই রাজ্যহারা নৃপতি পালিয়ে আসেন এবং একই সময়ে গৃহবিবাদে জেরবার হয়ে সমাধি বৈশ্যও পালিয়ে আসেন। হঠাৎই অরণ্য মধ্যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় মেধস মুনির। মুনিবরকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন সব হারিয়েও তারা কেন রাজ্য, পরিবার ও পরিজনদের ভুলতে পারছেন না! মেধস মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, এই জগৎ মায়া ও মোহ দ্বারা আবৃত এবং মহামায়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'কে এই মহামায়া', এই প্রশ্ন করলে মেধস মুনি যা বলেন তাই-ই হলো 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'। বরিশালের সাধক স্বামী বেদানন্দের মতে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গল হলো সেই স্থান যেখানে কর্ণফুলি নদীর তীরে রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যের দেখা হয়েছিল। পুষ্পভদ্রা নদী পার হয়ে তারা মেধস মুনির আশ্রমে যান। তবে এবিষয়ে মতান্তর আছে।

চট্টগ্রাম একান্ন পীঠের এক পীঠস্থান। বেদানন্দের মতে এই সেই স্থান যেখানে মেধস মুনি 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' তত্ত্ব রাজ্যচ্যুত রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকে জানিয়েছিলেন। যার থেকে মার্কেণ্ডেয় পুরাণে সেই অংশ রচিত হয়। এর থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে বহু প্রাচীনকাল থেকে এই বঙ্গের মাটিতে শক্তি সাধনার ধারার প্রচলন রয়েছে। শোনা যায়, কলকাতার পার্কস্ট্রিট অঞ্চল, যার পুরানো নাম 'চৌরঙ্গী', তা চৌরঙ্গীনাথ নামে এক মহাসাধকের নাম থেকে সৃষ্ট। ইংরেজরা কলকাতা স্থাপনের বহু পূর্বে ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ কালীঘাট অঞ্চলে এই সাধক বসবাস করতেন। সেই রকম বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র-সহ নানা পৌরাণিক মুনির নাম তারাপীঠ, বক্রেশ্বরের মতো শক্তিপীঠগুলির লোককথায় যুক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু এই চর্চা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আপাতত কামাখ্যা পীঠ সংস্কারে এর ভূমিকার কথা বলা প্রয়োজন। একান্ন সতীপীঠের অন্যতম এই কামাখ্যা তীর্থ। গুয়াহাটি শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবহিমালয়ের নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এই মন্দির।

কথিত, হিমালয় নরেশ দক্ষ রাজার যজ্ঞে মহাদেব আমন্ত্রিত ছিলেন না। শিবহীন যজ্ঞ কী করে সম্পাদন হয় এ নিয়ে দক্ষকন্যা শিবজায়া সতী পিতাকে প্রশ্ন করলে মহাদেবের প্রতি দক্ষরাজের অসম্মানসূচক মন্তব্যে তীব্র অপমানে দগ্ধ হয়ে দক্ষরাজ কন্যা সতী দেহত্যাগ করেন। আকস্মিক এই ঘটনায় শোকে উন্মত্ত হয়ে মহাদেব নিজের স্কন্ধে সতীর মৃতদেহ নিয়ে ত্রিলোকে প্রলয় নৃত্য শুরু করলেন। সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে নারায়ণ সুদর্শনকে নির্দেশ দেন সতীর দেহ ছিন্ন করার। সুদর্শনের আঘাতে দেবীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভূতলে। যেখানে যেখানে তাঁর দেহাংশ পড়ে সেখানেই এক একটি পীঠস্থান বা শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি হয়। নীলগিরি পর্বতের এই অংশে দেবীর যোনির অংশ পড়ে এক মহাশক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি হয়। কথিত, সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব অনন্ত সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। মহাদেবের মনে কাম ও প্রেম জাগ্রত করার জন্য দেবতারা কামদেবের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। স্ত্রী রতিকে সঙ্গে নিয়ে কামদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার প্রয়াস নিলে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে যান। কামদেবের স্ত্রী রতি কাতর হয়ে মহাদেবের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলে মহাদেব বলেন দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণের পুত্র হয়ে কামদেব মদন আবার দেহ ফিরে পাবেন। এদিকে শিবাগ্নিতে মদনদেবের দেহ বিকৃত ও কদাকার হয়ে উঠেছিল। কামের দেহ বিকৃত হলে নর-নারীর জীবনে অনুরাগ সৃষ্টি হবে কী করে? সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে মদন ও রতি আবার মহাদেবের চরণে পড়লেন, তার পূর্ব চেহারা ফিরিয়ে দেবার জন্য। শিবশম্ভু দুজনের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন— হিমালয়ের নীলগিরি পর্বতে মহামায়ার আরাধনা করে দেবীকে সন্তুষ্ট করলেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ভোলানাথের পরামর্শমতো কামদেব নীলপর্বতে এসে আদিশক্তির স্তবস্তুতি, পূজা শুরু করলেন। তাঁর কঠোর সাধনায় একদিন মহাদেবী প্রসন্না হয়ে দর্শন দিলেন। কামদেবের প্রার্থনা অনুযায়ী দেবী তাঁকে পূর্ব সৌন্দর্যরূপ ফিরিয়ে দিলেন। এই স্থানে কামদেব তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেয়েছিলেন, তাই নীলগিরি পর্বতে এই স্থানের নাম হয় কামরূপ এবং আরাধ্যা দেবীর নাম হয় কামাখ্যা। কামদেবের ইচ্ছায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করলেন। মন্দিরগাত্রে

চৌষট্টি যোগিনী মূর্তি-সহ অষ্টাদশ ভৈরবের মূর্তিও নির্মাণ করলেন।

কালিকা পুরাণ এবং রুদ্রায়মালাতন্ত্রে এই স্থানটিকে শক্তি উপাসনার জন্য নিবেদিত একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষি বাৎস্যায়ন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে নেপালের রাজার দ্বারস্থ হয়ে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে সনাতনীয় প্রথায় ফিরিয়ে আনা এবং তাদের নরবলি প্রথার গ্রহণযোগ্য বিকল্প চালু করার জন্য অনুরোধ করেন। বাৎস্যায়নের মতে পূর্ব হিমালয়ের গারো পাহাড়ে তারা দেবীর তান্ত্রিক পূজার প্রচলন ছিল। সেখানে জনজাতিরা দেবীর যোনিকে 'কামাকি' নামে পূজা করত। সেই হিসেবে কামাখ্যাও মহাশক্তির অংশ হিসেবে পূজিত হন। সপ্তম শতকে গৌড়বঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শশাঙ্ক দ্বারা এই মন্দির পুনর্নির্মাণের কথা শোনা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কালের প্রভাবে মন্দির ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও শক্তি আরাধনা থেকে সনাতনীদের কখনও বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫৭২ সনে দস্যু কালাপাহাড় বিশাল সৈন্যবাহিনী এনে এই মন্দির ধ্বংস করে ফেলে। গোমাংস নিক্ষেপ করে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে। প্রাচীনকালে এতদ্‌ঞ্চলে যতগুলি হিন্দুমন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র হয়েছে, অবধারিতভাবেই এই অপকর্মের মূলে উঠে এসেছে কালাপাহাড়ের নাম। বঙ্গ বা কলিঙ্গ দেশেও অসংখ্য হিন্দুমন্দির বা দেবমূর্তি ধ্বংস করেছে এই উন্মাদ।

প্রথম জীবনে এই দস্যু ছিল বারেন্দ্র বংশীয় এক ব্রাহ্মণ সন্তান, কালাচাঁদ রায় বা রাজীবলোচন রায় ভাদুড়ি। সেন যুগে রাজা বল্লাল সেন কনৌজ থেকে আগত ব্রাহ্মণদের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রায় শতাধিক গ্রাম দান করেছিলেন যাতে বৌদ্ধ প্রধান বঙ্গভূমিতে হিন্দুধর্মের বিস্তার হয়। এদের উত্তরপুরুষেরাই বংশপরম্পরায় বঙ্গদেশে জমিদারি ভোগ করে আসছিলেন।

কালাচাঁদ রায়ের পিতার নাম ছিল নয়ানচাঁদ রায়, গৌড় বাদশাহের ফৌজদার। এদের জমিদারি বংশের ইতিহাস একটু জানা দরকার। সে প্রায় সাতশো বছর আগের কথা। তখন বঙ্গদেশ শাসন করছেন দিল্লির বাদশা ফিরোজ শাহ তুঘলক। এদিকে বাঙ্গলার মাটিতে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফন্দি আঁটছে। কিন্তু সমস্যা হলো বাঙ্গলার মুসলিম সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে দিল্লির সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব ছিল না। বঙ্গ-বিহার মিলিয়ে সামসুদ্দিনের সৈন্য ছিল মাত্র চৌত্রিশ হাজার। অথচ দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে বাঙ্গলার প্রভাবশালী ভূস্বামীদের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। সামসুদ্দিন সরাসরি প্রার্থনা করেন বারেন্দ্র ভূমির এই জমিদারদের কাছে। সামসুদ্দিন ইলিয়াসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন শিখীবাহন সান্ন্যাল ও কৃষ্ণ ভাদুড়ির তিন ছেলে—সুবুদ্ধিরাম, কেশবরাম ও জগদানন্দ। একাদশ শতক থেকে এরা বঙ্গভূমে নিষ্কর জমির অধিকার ভোগ করে আসছিলেন। সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রভাব খাটিয়ে এরা সামসুদ্দিনকে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু সেনা জোগাড় করে দিলেন। পরবর্তীতে দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলে ইলিয়াশ শাহ রাজশাহী অঞ্চলে ভাদুড়ীদের এক বিশাল জমিদারি প্রদান করেন। সেযুগে সুলতানের অধীনে করবিহীন হিন্দু রাজ্যের পত্তন সম্ভব ছিল না। তাই এই পরিবারকে বাৎসরিক মাত্র এক টাকা কর দিতে হতো বাঙ্গলার সুলতানকে। সেই থেকে গৌড়ের দরবারে এরা একটাকিয়া ভাদুড়ী নামে পরিচিত ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাদুড়ীদের জমিদারি দক্ষিণে চলনবিল থেকে উত্তরে দিনাজপুর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং রাজ্যের নাম হয় ভাদুড়িয়া। মুঘল আমলের আগে বারো ভুইয়াঁ বা বারো ভৌমিকদের মধ্যে এরা ছিলেন অন্যতম। খ্রিস্টীয় ১৩৫০ থেকে ১৫৫০ পর্যন্ত এই দুশো বছর এরা রাজত্ব করেন। এই বংশের দুজনের নাম ক্ষণিকের জন্য হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন গণেশনারায়ণ বা রাজা গণেশ, যিনি সুলতান প্রথম আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় যে মানুষটার উল্লেখ প্রয়োজন তিনি হলেন কুখ্যাত কালাপাহাড় বা রাজীবলোচন রায় (ডাকনাম কালাচাঁদ)। পিতা নয়নচাঁদ রায় ছিলেন সুলতানের একজন ফৌজদার। সে সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন সুমায়মান কররানি। তাঁর কন্যা দুলারী বিবির সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্কে বাঁধা পড়ে রাজীবলোচন। নবাবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যার জেদের কারণে সুলতান এই বিবাহে রাজি হয়ে যান। ইসলাম মতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় রাজীবলোচনকে ধর্ম ত্যাগ করতে হয়, তিনি সমাজচ্যুত হন। এরপর তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প নিলে তাকে এবং তার স্ত্রীকে মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহায় খ্রিস্টীয় ১৫৬৭-৬৮ সনে রাজীবলোচন ওরফে কালাচাঁদ রায় জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করে। কথিত, প্রভু বলভদ্র, জগন্নাথ ও দেবী সুভদ্রার দারুনির্মিত মূর্তি তিনি পুড়িয়ে দেন। বালেশ্বরের গোপীনাথমন্দির, ভুবনেশ্বরের কাছে কোণার্ক, মেদিনীপুর, ময়ুরভঞ্জ, কটক, পুরীর অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসলীলা কাঁলাচাদকে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত করে। খ্রিস্টীয় ১৫৭২ সনে কালাপাহাড় আক্রমণ করে কামরূপ কামাখ্যা দেবীর মন্দির। কালাপাহাড়ের মন্দির আক্রমণের প্রক্রিয়া একটু অভিনব ছিল। গোরুর চামড়ার বিশাল আকৃতির ঢোল এবং পেতলের বিশাল আকৃতির ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দিরের ভিতরে অনুরণনের সৃষ্টি করায় মৃত্তিকা নির্মিত দেবমূর্তিগুলো ভঙ্গুর হয়ে যেত, হাত পা খসে যেত। এসব দেখে উপস্থিত লোকজন হতভম্ব হয়ে পড়লে প্রতিমাকে উপড়ে ফেলা হতো। গোমাংস নিক্ষেপ করে মন্দিরের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট করে দেওয়া হতো।

কিন্তু, আমরা তো অবস্থান করছিলাম মাতৃসাধক জগদানন্দকে নিয়ে। দীপান্বিতার নিশীথে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত শবসাধনায় বসেছেন তিনি। তন্ত্রসাধনার সবচেয়ে কঠিন পথ শবসাধনা। উত্তরসাধক গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং। বড়ো কঠিন এই সাধনা। গুরুর আদেশে জগদানন্দ শবসাধনায় বসেন, উত্তরসাধক হন গুরুদেব নিজেই। গুরুদেবের কাছে জগদানন্দ শুনেছেন তন্ত্রসাধনা হলো

আসলে শক্তির অনুসন্ধান। তন্ত্রে শক্তির দুটি রূপ— শিব ও শক্তি। শিব হলেন শব অবস্থায় নিশ্চল প্রাণহীন পদার্থ। কালী হলেন শক্তি। তিনি যখন শিবের সঙ্গে যুক্ত হন শিব তখন চেতনা প্রাপ্ত হন। তিনি তখন গতিশীল হন, কর্মক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানে যেমন বলা হয়ে থাকে শক্তি কোনো পদার্থকে আশ্রয় না করে নিজ সত্তা প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই পদার্থ ও শক্তি ছাড়া সত্তা প্রয়োগ করতে পারে না। শিব এবং শক্তিও তাই, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। সাধক জগদানন্দ একসময় সেই অচেতন সত্তায় চেতন অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শিবশক্তি জাগ্রত হয়েছে। তন্ত্রোক্ত শবসাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। সিদ্ধিলাভের পর গুরু ব্রহ্মানন্দ তাঁকে পূর্ণানন্দ নামে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মানন্দ গিরি সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন। পূর্ণানন্দ তাই হলেন পূর্ণানন্দ গিরি। সিদ্ধিলাভকালে জগদানন্দ ইষ্টদেবীকে বললেন, মা আজ দীপান্বিতা কালীপূজা। জগৎসংসার তোমার পূজায় ব্যস্ত। আমি হতভাগ্য, তোমার বাহ্যিক পূজার ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারলাম না। উত্তর পেলেন—'তোর বাহ্যিক পূজার আয়োজনের প্রয়োজন নাই। তোর বংশেও যেন কেউ ইহা না করে'। এরপর দেবী একবার তাঁকে বাম কোলে নিলেন—'এই গণপতি তোকে বসাইলাম'। আবার ডান কোলে নিয়ে বললেন—'এই কার্তিকেয় তোকে ডান কোলে বসাইলাম'। জগদানন্দ এর অর্থ কিছুই বুঝলেন না। দেবী বললেন—'এখন থেকে তুই ও তোর বংশধরেরা আমার বামে গণেশ ও দক্ষিণে কার্তিকেয়কে স্থান দিয়ে একতত্ত্বে আমার পূজা করবি'। একতত্ত্বরূপ হলো মহাদেবীর সঙ্গেই মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর পূজা। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর আলাদা মূর্তির প্রয়োজন নেই।

এরপর গুরু সিদ্ধিলাভের বাসনায় বসেন শবসাধনায়, উত্তরসাধক শিষ্য পূর্ণানন্দ। এদিকে পূর্ণানন্দের ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি ও সাধন প্রক্রিয়ায় কিছু বিচ্যুতি ঘটায় শব সাধককে নিয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়। জগদানন্দ তখনো জানতেন না গুরুর অভিশাপের বৃত্তান্ত। জানতেন না শাপগ্রস্ত সাধক ব্রহ্মানন্দ শাপ মুক্তির জন্য পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছেন উপযুক্ত শিষ্যের।

ব্রহ্মানন্দের গুরু ছিলেন তান্ত্রিকাচার্য সিদ্ধ মহাসাধক ত্রিপুরানন্দ। ব্রহ্মানন্দের গার্হস্থ্য নাম ছিল ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কাছে ভাগীরথী নদীর তীরে জৈন বণিকদের আদি বাসস্থান, বালুচরি রেশম শাড়ির জন্য বিখ্যাত বালুচর (আজ জিয়াগঞ্জ) ছিল তাঁর আদি নিবাস। শিশুকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মেধাবী, সংস্কৃতজ্ঞ ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ। 'তারা' বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি ত্রিপুরানন্দ নামে এক তন্ত্র সাধকের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিপুরানন্দের ন্যূনতা বিবেচনা করে গুরুভ্রাতাদের কাছে নিজের মত প্রকাশ করেন। ঘটনাচক্রে এই উক্তি ত্রিপুরানন্দের গোচরে এলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি শাস্ত্রাভিমানী শিষ্য ব্রহ্মানন্দকে অভিসম্পাত করেন, 'তোর সিদ্ধিলাভ হবে না।' ক্রুদ্ধ গুরুর অভিসম্পাত অখণ্ডনীয় জেনে ব্রহ্মানন্দ গুরুর চরণ ধরে অনুগ্রহ ভিক্ষা চান। গুরুভ্রাতারাও ক্রোধ সংবরণ করে ব্রহ্মানন্দের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য বারংবার গুরুর কাছে অনুরোধ জানাতে থাকেন। সকলের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে ত্রিপুরানন্দ বলেন, ''উপযুক্ত শিষ্যের মাধ্যমে কামাখ্যা মহাতীর্থের সংস্কার এবং মহাদেবীকে তুষ্ট করতে পারলেই শাপমুক্ত হতে পারা যাবে।'' শাপমুক্তির অভিলাষে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ অন্বেষণ শুরু করলেন উপযুক্ত শিষ্যের। নানা তীর্থ পরিক্রমা করে দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যের। এদিকে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মানন্দ একদিন উপস্থিত হলেন মৈয়মনসিংহের কাটিহালী গ্রামে, গুরুভ্রাতা পুরন্দরের সন্ধানে। মহামায়ার কী অদ্ভুত লীলা! গ্রামে দ্বাদশবর্ষীয় এক বালক সাধকলক্ষণযুক্ত হওয়ায় কৌতূহলী হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন জগদানন্দ নামে ওই বালক তাঁর বাল্যবন্ধু পুরন্দরের পুত্র। পুত্রের জন্মের কিছুদিন পরেই পুরন্দরের মৃত্যু হয়। পুরন্দরের কাহিনি একটু সবিস্তারে বলা দরকার। এঁরা ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এঁদের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন বেদবিদ সর্বতন্ত্রবিশারদ শ্রীশ্রী অনন্তচার্য্য। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান অত্যাচারে ভাগীরথী তীরে বড়নগর এলাকায় (অতীতের ব্রহ্মপুর আজকের মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) হিন্দু পরিবারগুলির বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অল্পবয়সী ও যুবতী কন্যা রাখা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কথিত, অনন্তাচার্যের অযোধ্যানাথ নামে এক শিষ্য নবাবের অত্যাচারে বড়নগর এলাকা পরিত্যাগ করে মৈয়মনসিংহ জেলার খাগুরিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সেই এলাকায় অচিরেই গণ্যমান্য হয়ে ওঠেন। নতুন এলাকায় তিনি হংসদাস নামে পরিচিত হন। কোথাও কোথাও এই ব্যক্তির নাম হংসাদিত্য নামেও উল্লেখ আছে। প্রতিবছর তিনি খাগুরিয়া গ্রাম থেকে গুপ্তভাবে বড়নগরে শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করতে আসতেন। অনন্তাচার্য্যের রূপবতী ভগিনী যাতে কোনোভাবেই মুসলমান শাসকের কোপদৃষ্টিতে না পড়ে সে নিয়ে চরম দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। অযোধ্যানাথ গুরুদেবের ভগিনীকে মৈয়মনসিংহ জেলার খাগুড়িয়া গ্রামে নিয়ে আসেন এবং নিজের পুরোহিত পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। খাগুড়িয়া গ্রামের পাশেই 'কাষ্ঠদ্বীপ'। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সম্প্রদায়ের হিন্দুদের গ্রাম। ক্রমে জনবসতি বৃদ্ধি পেয়ে খুব বড়ো ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হয়। এই গ্রামই কাটিহালী নামে পরিচিত হয়। অনন্তাচার্য্য মুসলমান অত্যাচারে ভাগীরথী তীর ছেড়ে শিষ্য হংসাদিত্যের আশ্রয়ে কাটিহালী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অনন্তাচার্যের ছয় পুত্রের জ্যেষ্ঠ আচার্য পুরন্দর। নবদ্বীপ থেকে শিক্ষালাভ করে গ্রামে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুদিন পর চতুষ্পাঠীর দায়িত্ব তৃতীয় ভ্রাতা লোকনাথ গুণার্ণবের

হাতে ন্যস্ত করে নিজে ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। এরমধ্যে জগদানন্দের জন্ম হয়। কিন্তু অকস্মাৎ আচার্য্য পুরন্দরের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর অভীষ্ট সাধনলোকে গমন করলে আচার্যপত্নী ইচ্ছাময়ী (মতান্তরে অপর্ণা) সংসারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। পুত্র জগদানন্দের প্রতি তাঁর তেমন খেয়াল থাকত না। প্রচণ্ড দুরন্ত বালক জগদানন্দ নিজের মতন দুরন্তপনায় শৈশব অতিবাহিত করছিলেন। সেই সময়েই গ্রামে একেবারে নাটকীয়ভাবে ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।

জগদানন্দের জন্মের পর থেকেই নানা অলৌকিক ঘটনার কথা গ্রামের সকলেরই জানা ছিল। যতদূর জানা যায় ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে (১৪২৩ শকাব্দ) পুণ্য ভীমাষ্টমী তিথির মধ্যরাতে জগদানন্দ আবির্ভূত হন। জন্মের পর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সূতিকাগৃহে সকলে খেয়াল করলেন জন্মের পর জাতকের ক্রন্দন শোনা যায়নি। বরং সদ্যোজাত শিশুর কচি কচি দুটি হাত বদ্ধাঞ্জলিপূর্বক এবং চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। জাতকের উজ্জ্বল গৌর মুখমণ্ডল এবং এক অপূর্ব জ্যোতি শিশুর চারপাশ বেষ্টন করে আছে এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে সূতিকাগৃহের চতুর্দিকে। এমন অপূর্ব ঘটনার সাক্ষী আর কখনো না হওয়ায় ধাত্রী এবং প্রসূতি ভয়ে ও বিস্ময়ে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সম্বিত ফিরলে দেখেন সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হয়েছে এবং জাতক হাত পা ছুঁড়ে ক্রন্দন করছে। জগদানন্দের বয়স যখন দুই বছর। এক গ্রীষ্মের দিনে মাতা অপর্ণা দেবী সুপ্ত বালককে ঘরের বারান্দায় শুইয়ে রেখে গৃহকর্মে ঘরের অভ্যন্তরে। বাইরে সূর্যের প্রখর আলোক শিশুর মুখের ওপর। এই সময় একটি সাপ ধীরে ধীরে ফণা বিস্তার করে বালকের মুখের কাছে উঠে এলে একটি অপরিচিত কালো মেয়ে 'সাপ সাপ' বলে চিৎকার করে ওঠায় মাতা অপর্ণা দেবী ও বাটীর অন্যান্যেরা গৃহের ভিতর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলে চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজে সাপটি দ্রুত পলায়ন করে এবং ওই কৃষ্ণবর্ণের মেয়েটিরও কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বংশ পরম্পরায় আগত শ্রুত কাহিনি এবং স্বগ্রামস্থ ও চতুর্পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রাচীন প্রাচীনাদের নিকট প্রাপ্ত ঘটনায় জানা যায় যে জগদানন্দের পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিদ্রিত অবস্থায় বালকের শয্যা নানা বর্ণের অপূর্ব সুগন্ধী পুষ্পে ভরে থাকত। কিন্তু সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই ওই সব পুষ্প অন্তর্হিত হয়ে যেত।

পিতৃব্য লোকনাথ গুণার্ণবের চতুষ্পাঠীতে জগদানন্দের লেখাপড়ায় কোনো উৎসাহই ছিল না। এইসব বৈদিক অধ্যয়ন, সংস্কৃত, ব্যাকরণের প্রতি বালকের কোনো আগ্রহ ছিল না। যে শাস্ত্রে ঈশ্বর দর্শন হয় না, তা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই—এই মতে বিশ্বাসী বালক জগদানন্দ গ্রামে ঝোঁপ জঙ্গলে দস্যিপনা সহকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এই সময়েই বালকের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ। ব্রহ্মানন্দের জহুরি চোখ প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেলেছিল যে এতদিন ধরে তিনি যাঁর অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, জগদম্বা তাঁরই সন্ধান দিয়েছেন। পরমাত্মার সন্ধান পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব্রহ্মানন্দ জগদানন্দের গৃহের খোঁজ করলেন। পরিচয়ে জানা গেল, বালক তাঁর গুরুভ্রাতা পুরন্দের একমাত্র পুত্র। তিনি বন্ধুপত্নী অপর্ণা দেবীর কাছে পুত্র ভিক্ষা চাইলেন। একমাত্র পুত্র জগদানন্দের বিদ্যাচর্চায় আকর্ষণ না থাকায় অপর্ণা দেবীও মনকষ্টে ছিলেন। অকস্মাৎ পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান মেলায় তিনিও যেন তৃপ্ত হলেন। ব্রহ্মানন্দ জগদানন্দের মাতাকে পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার কথা বলায় বালক জগদানন্দ আপত্তি তুলে বলেন— এই শাস্ত্র শিক্ষা করে কী হবে? এতো শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশের উপায়। আমি চাই সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে আমার সামনের সৃষ্ট পদার্থের রহস্য উন্মোচিত হবে। স্রষ্টার সাক্ষাৎকার পাব। ব্রহ্মানন্দ বালক জগদানন্দকে বোঝালেন, স্রষ্টার সাক্ষাৎকার লাভের জন্যই শাস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞানের দরকার। জ্ঞান ব্যতীত স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না।

জগদানন্দ সম্মত হলে তিনি তাঁকে নিয়ে মৈয়মনসিংহ অঞ্চল ছেড়ে আবার গৌড় অভিমুখে যাত্রা করলেন। বালুচরের (জিয়াগঞ্জের) কৃতী অধ্যাপক ও সতীর্থ হরিহর ভট্টাচার্যের কাছে জগদানন্দকে নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য কন্যা সর্বাণীকে নিয়ে বালুচরে বসবাস করতেন। হরিহর দীর্ঘদিন পর গুরুভ্রাতা ভবানীপ্রসাদকে দেখে অবাক হয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করায় বুঝতে পারলেন তাঁকে জগদানন্দের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। হরিহরের কাছে জগদানন্দের দায়িত্ব অর্পণ করে ব্রহ্মানন্দ পুনর্বার তীর্থ পরিক্রমায় যান। অধ্যাপকগৃহে জগদানন্দ বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন। অচিরেই তন্ত্র, বেদান্ত, দর্শন, যোগ অনুশীলন ইত্যাদিতে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত। ব্রহ্মানন্দ বালুচরে পুনর্বার এসে অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে এসে ছাত্রের শিক্ষার অগ্রগতি জিজ্ঞাসা করলেন। হরিহর উত্তর দিলেন তাঁর দীর্ঘ তিনদশকের শিক্ষকতায় এমন শ্রুতিধর ছাত্রের তিনি সন্ধান পাননি। এজন্য তিনি নিজের জীবনকে ও বন্ধুকে ধন্যবাদ জানালেন। এরপর নিজের একমাত্র কন্যা সর্বাণীর সঙ্গে জগদান্দের বিবাহ দেওয়ার জন্য ভবানীপ্রসাদের কাছে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা এই ছাত্রের সঙ্গে মাতৃহারা একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়ে সংসার জীবন থেকে তিনি মুক্তি নেবেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর হরিহরের স্ত্রী শোকাতুর হয়ে পরলোকগমন করেন। এরপর মাতৃহারা কন্যাকে নিয়ে অত্যন্ত বিষাদাবস্থায় তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। সেই সময়েই জগদানন্দের আগমন। কন্যা সর্বাণীকে জগদানন্দের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি উভয়কেই সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলেছেন। ব্রহ্মানন্দ অনুমান করলেন জগদানন্দকে সংসারী করা প্রয়োজন। সর্বাণীর কথা তিনি জগদানন্দের মাতা ইচ্ছাময়ীর কাছে জানালে ইচ্ছাময়ী তাতে সম্মতি দেন। এদিকে জগদানন্দ তখন চান তন্ত্রশাস্ত্রে

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

• BOSCH LTD. • BOSCH, GMBH-GERMANY,

• DEUTZ, A. G., GERMANY

• LOMBARDINI - ITALY, • V. M. MOTORI - ITALY

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry

Govt. of India

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

সিদ্ধি। তাই গুরুকন্যা বা অন্য কারও সঙ্গে পাণিগ্রহণে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলে ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বোঝালেন যে সর্বাণী গুরুকন্যা নয়, অধ্যাপক কন্যা এবং তাঁর মায়েরও সেইরূপ ইচ্ছা। তিনি বলেন 'তন্ত্রসাধনা শক্তি ব্যতীত বিড়ম্বনামাত্র। বাল্য কৈশোরের পর প্রথম শ্রেষ্ঠ আশ্রম গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন না করলে এই শিক্ষা সম্ভব নয়। এরপর তোমায় আমি তন্ত্রমতে অভিষিক্ত করব। মায়ের ইচ্ছা ও আদেশের কথা ও ব্রহ্মানন্দের কাছে তন্ত্রোক্ত শিক্ষা পাওয়ার আনন্দে অধীর হয়ে ওঠায় জগদানন্দ বিবাহে সম্মতি দেন। ব্রহ্মানন্দ পুনর্বার তীর্থে গমন করলেন।

বিবাহ সম্পন্ন হলে জগদানন্দ স্ত্রী সর্বাণীকে নিয়ে কাটীহালী গ্রামে বসবাস শুরু করলেন। জগদানন্দ এখন ঘোরতর সংসারী। পৈতৃক সামান্য সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মাতা ও স্ত্রী-সহ সুখে বসবাস এবং শাস্ত্র আলোচনা ও পুরাণাদি গ্রন্থ নকল করার কাজ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়। আটাশ বছর বয়সে আনুমানিক ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে (১৪৪৮ শকাব্দ) তিনি বিষ্ণুপুরাণ নকল করেন। এর দুবছর পর আনুমানিক ১৪৫০ শকাব্দে ব্রহ্মানন্দ কাটিহালী গ্রামে এসে জগদানন্দকে দীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা অভিপ্রায় প্রকাশ করলে ইচ্ছাময়ী সর্বান্তঃকরণে তাতে সম্মতি দেন। দীক্ষালাভের পর জগদানন্দ প্রথমে কিছুদিন বাড়িতে এবং তারপরে নিকটবর্তী ঘণ্টাবতী নদীর তীরে তারাবনে ইষ্টদেবীর সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁকে তন্ত্র শাস্ত্রের পাঠ দান করেন। এরপর তিনি বীরাচারমতে ইষ্টদেবীর সাধনা শুরু করেন। সময়ে সময়ে তিনি গুরুগৃহে থেকেও শিক্ষালাভ করতেন।

তন্ত্রশিক্ষা লাভের পাশাপাশি জগদানন্দ গুরুর সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। ১৪৬০ শকাব্দে জগদানন্দর নিজ গ্রামের পূর্বদিকে গাজরা নদীর তীরে দীপান্বিতা নিশীথে শবসাধনার আয়োজন হয়। ব্রহ্মানন্দ তখনও গুরুর অভিশাপের কথা জগদানন্দকে জানায়নি। স্থির হয়েছিল শবসাধনায় ব্রহ্মানন্দ প্রথমে উত্তরসাধক হবেন এবং পরে জগদানন্দ উত্তরসাধক হবেন। গুরুদেব সাধনকার্য সম্পূর্ণ না করেই শব সমেত অন্তর্হিত হওয়ায় কিশোর পূর্ণানন্দ কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। তিনি অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে গুরুদেবের সন্ধান শুরু করেন। ইতিমধ্যেই রাত্রি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গুরুদেবের কোনো সন্ধান না পেয়ে বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। জগদানন্দ যোগ সাধনায় সিদ্ধ হলেও গুরুস্থান লঙ্ঘন করতে পারেননি। এরপর ইষ্টদেবীর কাছে সবিস্তারে সব বর্ণনা করে মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি গুরুসন্ধানে বের হলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? কোনো অনুমান নাই!

কাহিনি এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। দুর্গম পথ ধরে পূর্ণানন্দ চলেছেন গুরুর সন্ধানে, কিন্তু কোথায় যাবেন তা তিনি জানেন না। পথিমধ্যে তিনি দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হলে উপলব্ধি করলেন এক অদৃশ্য মায়াবীশক্তি তাঁকে রক্ষা করেছেন। রাতে স্বপ্নাবিষ্ট হলেন, দেবী আদেশ দিয়েছেন কামাখ্যা মন্দিরের সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হতে এবং গুরু সহযোগে কামাখ্যাতন্ত্রে সিদ্ধ হতে। কিন্তু গুরুদেব কোথায়? এমনিভাবেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন অসম অঞ্চলের মণিপুরে উপস্থিত হলেন। গুরুদেব মণিপুরে থাকতে পারেন দেবীর কাছে এমন ইঙ্গিত পেতে পারেন পূর্ণানন্দ। তিনি মণিপুরে শ্রীগুরুর সন্ধান শুরু করলেন। স্থানীয়দের কাছে কোনো বিদেশি এখানে অবস্থান করছেন কিনা তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলে সংবাদ পেলেন এক ব্যক্তি চণ্ডাল কন্যাকে বিবাহ করে চাষাবাদ করে সুখে দিনযাপন করছেন। পূর্ণানন্দ গোপনে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান চালাতেই বুঝলেন ইনিই তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে চণ্ডালগৃহে অবস্থান করছেন। একদিন চণ্ডালগৃহের বারান্দায় গুরুদেবের দিবানিদ্রার সময়ে পূর্ণানন্দ একটি বটপাতায় একজটা দেবীর বীজমন্ত্র লিখে ব্রহ্মানন্দের সামনে রেখে অদূরে আত্মগোপন করে রইলেন। এদিকে, নিদ্রাভঙ্গ হলে ব্রহ্মানন্দ বটপাতা দেখে একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে বটপাতাটি তুলে নিজের বীজমন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে রইলেন। অচিরেই তাঁর সমস্ত স্মৃতি ফিরে এলে 'পূর্ণানন্দ! পূর্ণানন্দ!' বলে চিৎকার করতে করতে বাইরে বের হয়ে এলেন। অদূরেই পূর্ণানন্দকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিশপ্ত জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। শ্রীগুরুর অভিশাপের ফলেই তাঁর শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়নি এবং উপযুক্ত শিষ্যের মাধ্যমে কামাখ্যা তীর্থ সংস্কার এবং কামাখ্যা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই অভিশাপ খণ্ডন হবে।

গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়, পূর্ণানন্দও স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন কামাখ্যা সংস্কারের। অচিরেই মহানন্দে ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ কামাখ্যাধামে পৌঁছে পীঠ সংস্কারের কাজে সাধনাকার্য শুরু করেন। জনশ্রুতি, একদিন ব্রহ্মপুত্র নদে কামাখ্যা অঞ্চলের দস্যু নীলাম্বরের একমাত্র পুত্র জলের তীব্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। পূর্ণানন্দ তখন নদীতে স্নান করতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে স্রোতের জলে ভেসে যাওয়া বালককে নদী থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। নদীতীরের সকলেই তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

কামাখ্যা অবস্থান কালেই পূর্ণানন্দ ১৪৬৬ শকাব্দে আশ্বিন মাসে 'শক্তিক্রম' গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ৪৩ বছর। নিত্যমুক্তস্বভাব বিশিষ্ট সাধকের জন্যই এই শাস্ত্রগ্রন্থ। এরপর 'তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী', 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী', 'যোগসার', 'কালীককার কূট সহস্রনাম' প্রভৃতি তন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই গুরুদেব ব্রহ্মানন্দের পাদবন্দনা করেছেন। গিরি, যতি, পরিব্রাজক, পরমহংস এই উপাধিগুলি গ্রন্থগুলিতে তাঁর নামের শেষে পাওয়া যায়। 'শক্তিক্রম' রচনার তেত্রিশ বছর পর জীবনের ৭৬ বছরে ১৪৯৯ শকাব্দে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' রচনা করেন। এরই ষষ্ঠ প্রকাশ 'ষটচক্রনিরুপণ'— যা ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার জন উড্রফ 'The Serpent Power' নামে ইংরেজি

ভাষায় এর অনুবাদ করে সমগ্র বিশ্বকে ভারতবর্ষের শক্তি সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছেন। সম্ভবত 'শ্যামারহস্য' তাঁর রচিত গ্রন্থ।

কামাখ্যা অবস্থানকালে এবং এইসব গ্রন্থ রচনার মাঝেই তিনি নানা তীর্থে এবং বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের ও তাঁদের গুরুদের নিকট তন্ত্র সম্পর্কে আচার পদ্ধতি ও মতামত জানার চেষ্টা করতেন। নিজ গ্রন্থে তিনি তা উল্লেখও করেছেন।

তাঁর কাশ্মীর যাত্রা প্রসঙ্গে জানা যায় যে কাশ্মীর রাজ্যে একবার শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ দেখা দেয়। রাজ্যে প্রবল অশান্তি সৃষ্টি হয়। কাশ্মীররাজ পূর্ণানন্দকে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসাকল্পে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানালে পূর্ণানন্দ গুরু ব্রহ্মানন্দের ইচ্ছায় এবং বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। সেখানে রাজ আহূত ধর্মসভায় পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বরাশির ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত শাক্ত, শৈব উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, সাধক ও জনসাধারণ সকলেই পরম সন্তুষ্ট হলেন। বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝির অবসান হলো এবং পারস্পরিক প্রীতি প্রণয় সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হলো। কাশ্মীরবাসী ও রাজার আগ্রহে পূর্ণানন্দ কিছুদিন কাশ্মীর রাজ্যে বসবাস করেন। সেই সময় কাশ্মীর রাজমহিষী কর্ণরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রবণশক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজা গভীর মনঃকষ্টে একদিন তা পূর্ণানন্দের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করেন। সেই রাত্রি পোহালেই মহিষী রাজাকে প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ! বাইরে পাখিরা ডাকিতেছে কি? রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন, হ্যাঁ! তুমি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ কি?' এইভাবে সাধক পূর্ণানন্দের অনুগ্রহে রাজমহিষী শ্রবণশক্তি পুনর্বার ফিরে পান।

দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ রুদ্রাক্ষবক্ষশোভিত সদানন্দময় সর্বদা যোগযুক্ত জগতের আনন্দদানকারী পূর্ণানন্দ সমস্ত সাধক সমাজকে বর ও অভয় প্রদান করেছেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের অন্তরায় বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ সাধককে অবহিত করিয়েছেন। পশুভাবে সাধনা আরম্ভ করে বীরভাবে অতিক্রম করে কীভাবে দিব্যভাবের সাধনায় মগ্ন থাকতে হয় উত্তরসাধককে তাই শিখিয়ে গেছেন পূর্ণানন্দ। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর পূর্ণানন্দ মাতা ইচ্ছাময়ীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে অন্তিম সময়ে তিনি মাতৃদেবীকে ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎ করাবেন।

কামাখ্যাধাম ত্যাগ করার পর পূর্ণানন্দ বেশ কিছুদিন কাটিহালী গ্রামে বসবাস করলেও মাঝেমাঝেই ভাগীরথী তীরে গুরুগৃহে চলে আসতেন। সেখানেই তিনি 'শ্যামা রহস্যম' রচনা করেছেন। শোনা যায় গুরুগৃহে অবস্থানকালে সংবাদ আসে যে তাঁর মাতৃদেবী শয্যাশায়ী। গুরুগৃহে যাওয়ার আগে তিনি অসুস্থ মাতৃদেবীকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর শেষ অবস্থায় তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবেন। মাতৃদেবীর অসুস্থতার সংবাদে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কালবিলম্ব না করে পূর্ণানন্দ যোগবলে আকাশপথে এক রাত্রিতে স্বগ্রাম কাটিহালীতে মৃত্যুশয্যায় জননীর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো ইষ্টমূর্তি দর্শন করিয়েছিলেন। মাতা ইচ্ছাময়ী পরমেশ্বরীর কোলে চিরতরে স্থান লাভ করেন।

এদিকে পূর্ণানন্দের মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে ব্রহ্মানন্দও সেখানে উপস্থিত হন। শ্রাদ্ধকার্যের দিন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হতে না দেখে প্রশ্ন করলে জানা যায় যে পূর্ণানন্দকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কারণ তিনি নিজ গুরুকন্যাকে বিবাহ করে ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছেন। আবার বীরাচারে মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চ ম-কারের সাধনা করে মহাপাপে লিপ্ত হয়ে পশুসুলভ আচরণ করেছেন। মদ্যপান অতি গর্হিত অপরাধ, স্মৃতিশাস্ত্রে তা উল্লিখিত আছে।

ব্রহ্মানন্দ, মাধবাচার্য ও পূর্ণানন্দের খুল্লতাত অধ্যাপক লোকনাথ গুণার্ণব সকলেই গ্রামের পণ্ডিতদের কথা শুনলেন। বৈষ্ণব মাধবাচার্য পূর্ণানন্দের পিসতুতো ভাই। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ। তিনি পূর্ণানন্দের হয়ে কিছু বলতে গেলে তাঁকেও কুলাচারী, পাপী পাপিষ্ঠ প্রভৃতি বলে তিরস্কার করা হলো। অধ্যাপক গুণার্ণব সে সময় শতবর্ষ উত্তীর্ণ। গ্রামে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সকলেই তাঁকে মান্যতা দেন। পূর্ণানন্দ তাঁর লিখিত গ্রন্থ প্রবন্ধাদি খুল্লতাতকে গোপনে দেখাতেন। সর্বশেষে 'শ্যামারহস্যম'-এর পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখিয়েছেন। গুণার্ণব মহাশয় গ্রামবাসীদের সমস্ত বক্তব্য শুনে বললেন, আপনারা যে প্রেতাত্মার মুক্তির জন্য ক্রিয়া করার জন্য এখানে এসেছেন তিনি পূর্বেই মুক্ত। মহামায়া অন্তিম সময়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে নিজের চরণে স্থান দিয়েছেন। পূর্ণানন্দের তপস্যাপ্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। সে ব্রহ্মজ্ঞানী, নিজের বংশে পূর্বপুরুষ এবং অধঃস্তন পুরুষদের উদ্ধার কাজেই সে ক্রিয়াকর্ম করেছে। সে সিদ্ধসাধক। এই বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনার নিবন্ধ রচনা প্রভৃতিতে পথিকৃৎ। আচার্য ব্রহ্মানন্দ রচিত 'তারা রহস্য' এবং পূর্ণানন্দ বিরচিত 'শক্তিক্রম, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শ্যামারহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত শাস্ত্র এবং শাক্ত দর্শনের এক অক্ষয় সম্পদ। ইহাদের পূর্বে বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রীয় অন্য কোনো ব্রাহ্মণ এইরূপ কর্মে নিবিষ্ট হন নাই। আপনারা পণ্ডিতগণ এখানে ত্রিবেণী তীর্থে উপস্থিত হয়েছেন। তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যায় সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর; কালী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যায় সিদ্ধ পূর্ণানন্দ, সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য মাধবাচার্য এই স্থানে উপস্থিত। আমাদের এই গৃহ আজ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্ণানন্দ শুধুমাত্র তন্ত্রসিদ্ধ কালীসাধক নন, তিনি স্মৃতি, দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি নানা বিদ্যায় ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। শ্রাদ্ধ ও শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই শ্রাদ্ধকার্যে হয় অংশ নিন নতুবা বিদায় গ্রহণ করুন। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তখন আর কালবিলম্ব না করে শ্রাদ্ধকার্যে অংশ নিতে শুরু করেন।

মাতৃবিয়োগের পর কয়েক বৎসর পূর্ণানন্দ স্ত্রী সর্বাণী এবং

পুত্র মধুরেশ শিরোমণি ও শিষ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে সঙ্গে নিয়ে সংসার যাপন করেন। এরপর গুরু ব্রহ্মানন্দ গ্রামে এলে তিনি সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে সাধকগণের হিতের জন্য বাকি জীবন দিব্যভাবের সাধনায় অতিবাহিত করার লক্ষ্যে হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

হিমালয় যাত্রার পর বঙ্গদেশের এই দুই কালীসাধকের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে অনেকের মতে হিমালয়ের স্কন্দগুহায় তাঁরা সমাধিমগ্ন আছেন। পূর্ণানন্দবংশের সাধক প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্যামারহস্যম-এর টীকাকার শ্যামানন্দ তীর্থনাদকে জানিয়েছিলেন যে একবার কুম্ভমেলায় আগত দুই মহাসাধকের মুখে তিনি শুনেছেন যে হিমালয়ের স্কন্দগুহায় পূর্ণানন্দ এখনও অবস্থান করছেন এবং মানবকল্যাণে সমাধিমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন।

অসম, বঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণানন্দের অগণিত শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। পূর্ণানন্দ গিরির অন্তরঙ্গ শক্তিধর শিষ্যদের মধ্যে নবদ্বীপ নিবাসী 'তন্ত্রসার' প্রণেতা সাধকাগ্রগণ্য তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ অন্যতম। সমগ্র বঙ্গদেশ তথা বাঙ্গালি সমাজে বর্তমান সময়ে শক্তিপূজার এই প্রাবল্যের উৎস আচার্য পূর্ণানন্দ এবং তাঁর শিষ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। সহস্র বৎসর বৌদ্ধ আচারের প্রভাবে সনাতনীয় প্রথা এবং বৈদিক সমসাময়িক তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য প্রায় লুপ্ত হওয়ায়র পথে ছিল। ভগবান শিবের অবতার পুরুষ আদি শঙ্করাচার্য এইসব শাস্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন। তান্ত্রিকাচার্য ব্রহ্মানন্দ এবং পূর্ণানন্দ বঙ্গদেশে ইসলামি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মহাশক্তির এই নিগূঢ় রহস্যকে পুনরুদ্ধার করেন এবং চৈতন্য ও সমসাময়িক বৈষ্ণব সাধকদের বৈষ্ণবীয়ধারার পাশাপাশি বঙ্গদেশে শক্তিপূজার প্রাবল্যের মূল চালিকাশক্তি তাঁরাই। শক্তিসাধকদের প্রচারবিমুখতায় এঁদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র গাইকোয়ার ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন অধিকর্তা ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র'র প্রথম খণ্ড (কালী খণ্ড)-র প্রাক কথনে তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং তাঁর গুরু পূর্ণানন্দ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন আপাতত তাই প্রামাণ্য।

দেশভাগের পর পূর্ণানন্দের বংশধরেরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাদের এলাকার নাম হয় পূর্ণানন্দ পল্লী। অদ্যাবধি প্রতি বৎসর ভীমাষ্টমী তিথিতে আত্মীয় ও অগণিত ভক্তপরিবৃত হয়ে তাঁরা মহাপরিব্রাজক তান্ত্রিকাচার্য পূর্ণানন্দের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন করে আসছেন।

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.	FULBARI T.E.
SHYAMGURI T.E.	URRUNABUND T.E.
MONMOHINIPUR T.E.	MAKAIBARI T.E.
MANOBAG T.E.	KENDUGURI T.E.
BHUYANKHAT T.E.	MORAN T.E.
MANU VALLEY T.E.	SEPON T.E.
GOLOKPUR T.E.	ATTABARIE T.E.
PEARACHERRA T.E.	LEPTKATTA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.	ADDABARI T.E.
SAROJINI T.E.	DIRAI T.E.
	MAHAKALI T.E.

With Best Compliments from :

PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

(Stock Broker and Portfolio Manager Service)

LAURELMF FINMART PRIVATE LIMITED
(Member of Association of Mutual Funds in India)
MUTUAL FUND DISTRIBUTOR

JAIN BAID & CO.
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

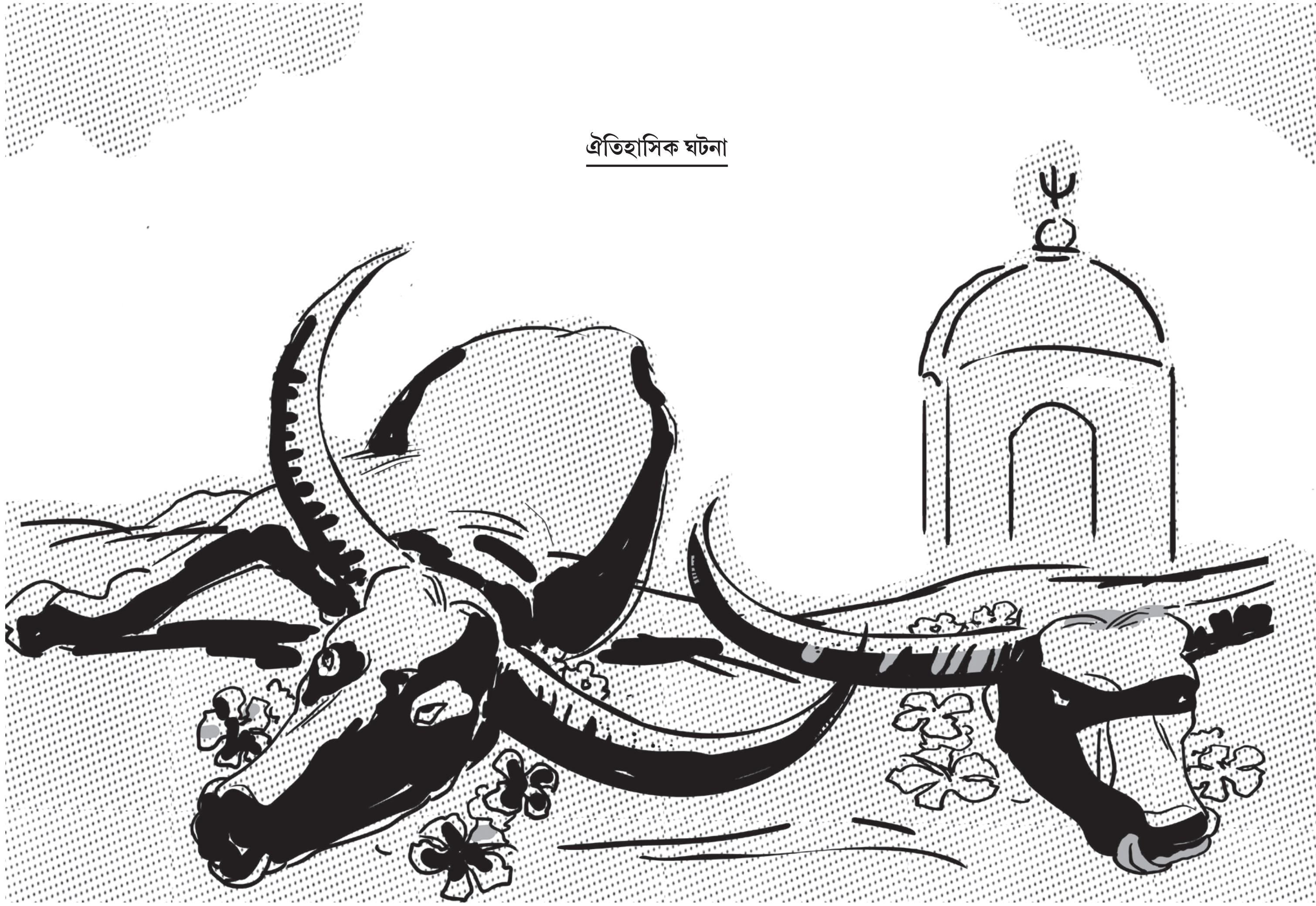

অনির্বাণ হোমশিখা

রায়বাঘিনী

নন্দলাল ভট্টচার্য

।। এক ।।

তরঙ্গ বিভঙ্গে বয়ে চলেছে দামোদর নদ আর স্রোতস্বিনী রণ নদী। তারই মাঝখানে সমৃদ্ধ জনপদ রাজবলহাট। ভূভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজরাজেশ্বরী রাজবল্লভী। যোড়শ শতকের সে এক স্মরণীয় দিন। মন্দিরে দামোদরের বন্যার মতোই জনস্রোত। মনে হয় ভুরশুট রাজ্যের সব প্রজারই একমাত্র ঠিকানা এই রাজবল্লভীর মন্দির।

সেখানে চলছে দেবীর মহাপূজা। রাজার পূজা। তাই তান্ত্রিক পূজাতেও রাজসিক ব্যবস্থা। ভুরশুট-রাজ রুদ্রনারায়ণের এক বিশেষ কামনা পূরণের জন্য এই পূজা। অর্চকের আসনে বসেছেন রাজগুরু আগমাচার্য হরিদেব

ভট্টাচার্য। মহাসাধক—বহু শাস্ত্রবিদ। রাজার এই কাম্য পূজায় কোনোদিক থেকে যাতে কোনো বিঘ্ন না হয় তারজন্য চারিদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

বেলা দ্বিপ্রহর। মাথার উপরে গনগনে সূর্য। মায়ের জয়ধ্বনিতে মুখর সকলে। মন্দিরে বাজছে শঙ্খ-ঘণ্টা, কাঁসর-ঝাঝর, ভেরি-দামামা, ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকড়া ইত্যাদি কত না বাজনা। সঙ্গে সানাইয়ের সুর। মা-মা রবে উচ্চকিত চারিদিক। এমন সময় সব কিছু ছাপিয়ে গেল সহকারী পুরোহিতের কণ্ঠ—সময় হয়েছে বলির। প্রস্তুত করো সবকিছু।

মুহূর্তে স্তব্ধ কলরব। এগিয়ে আসে জনা বারো তাগড়াই জোয়ান। টেনে নিয়ে যায় অদূরে বাঁধা চারটি মোষ আর দু'টি মেষকে মন্দিরের লাগোয়া জলাশয়ে। সেখানেই স্নান করায় তারা ওই ছ'টি পশুকে।

স্নান করিয়ে বলির পশুগুলিকে নিয়ে আসে তারা। পুরোহিত এগিয়ে আসেন। বলির পশুদের মাথায় পরিয়ে দেন সিঁদুরের ফোঁটা। পরানো হয় রক্তজবার মালা। তারপর মন্দিরের সামনে প্রোথিত দুটি যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করা হয় দু'টি করে মহিষ আর একটি করে মেষকে। তীব্রস্বরে বেজে ওঠে ঢাক। আসে বলির চরমক্ষণ।

বলি দেবার জন্য সেদিন প্রথামতো আসে না কোনো কর্মকার। পরিবর্তে দুই যূপকাষ্ঠের সামনে খঙ্গা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দু'জন। এক পুরুষ ও এক নারী। পুরুষ আর কেউ নয়, রাজা রুদ্রনারায়ণ স্বয়ং। দীর্ঘ সুঠাম দেহ। গৌরবর্ণ, গলায় দুলছে মণিময় কনকহার। মিলে গেছে তা যেন রাজার ওই সুবর্ণগৌর তনুতে। কপালে তিলক। বয়সের সূর্য তাঁর মধ্যাহ্নরেখা পরে হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু কলেবরে পড়েনি তার কোনো ছায়া। এখনও তিনি মধ্যাহ্নের দীপ্ত মার্তণ্ড।

অন্যদিকে সে নারী এক সদ্য তরুণী। রাজারই এক দুর্গাধিপতির সেনাপতি কন্যা। তখনও সারা দেহে পূর্বাহ্নের সূর্যের আলো। অপরূপ, দীপ্ত নয়না। রক্তম্বরা তরুণীর কপালে সিঁদুর বিন্দু—রক্তরঙে বড়ো উজ্জ্বল। গলায় দুলছে একটি লাল জবার মালা। দেখে সকলেরই ভ্রম দেবী রুদ্রাণী বলে।

পুরোহিত এসে তাঁদের হাতে দেন আচমনের জল। পূজা করেন তাঁদের হাতের খঙ্গাদুটিকে। তারপরই বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ—এবার হোক বলি।

মা—মা—আরবে পূর্ণ চারিদিক। তাণ্ডবের সুর নানা বাদ্যে। মুহূর্তে ঝলসে ওঠে দুটি খঙ্গা—একই সঙ্গে। সামনে পড়ে তখন চারটি ছিন্নশির মহিষ আর দুটি মেষ।

নির্বিঘ্ন বলিতে হৃষ্ট সকলে। স্বস্তির শ্বাস ফেলেন রাজগুরু হরিদেব। এগিয়ে আসেন তিনি। তখনও খঙ্গা হাতেই দাঁড়িয়ে আছেন রাজা। কিছুটা-বা ভাবের ঘোরে। বলির রক্তের ঝিলিক লেগেছে গায়। সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর। তিনি তখন স্থির অচঞ্চল।

একই অবস্থা তরুণীরও। সাময়িক বিহ্বলতা বুঝি গ্রাস করেছে তাকেও। একসময় নামিয়ে রাখে তরুণী তার খঙ্গাখানি। এগিয়ে যায় একটু। নীচু হয়ে সদ্য ছিন্ন মহিষের মাথার রক্তে রঞ্জিত করে মধ্যমা। তারপর এগিয়ে যায় রাজার দিকে।

রুদ্রনারায়ণ তখনও অচঞ্চল। চকিতে তরুণী তার কপালে ছোঁয়ায় রক্তরাঙা মধ্যমা। এঁকে দেয় তিলক। কেউ কিছু বোঝার আগেই গলার জবার মালাটি খুলে পরিয়ে দেয় রাজার গলায়। ঠোঁটের কোনায় বুঝিবা ছিল বিজলি চমকের মতোই এক চিলতে হাসি।

তারপর দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কাউকে কিছু বলার আগেই অশ্বারোহিণী তরুণী। অশ্বের গায়ে মৃদু আঘাত। তীব্র বেগে ছুটতে থাকে অশ্ব। হাজার হাজার চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে যায় তরুণী।

ঘটনার আকস্মিকতায় মূক সকলে। উথলে ওঠা দুধে জলের ছিটায় যেমন স্তিমিত হয় তা তেমনি যেন জনতার অবস্থা। পুরো ঘটনাটাই রহস্যময় মনে হয় তাদের। রহস্যটা যে কী তা বুঝতে না-পারার কারণেই নীরব তারা।

কথা বলেন না রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। স্মিত হাস্যে তাকিয়ে আছেন রাজার দিকে। তাকিয়ে আছেন রাজা রুদ্রনারায়ণও—সবিস্ময়ে—কামনা পূরণের মৌন-মুখর ইঙ্গিতের অভিঘাতে। তাকিয়ে আছেন ঠিক সেদিনের মতোই।

।। দুই ।।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি রাজা রুদ্রনারায়ণের। রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন দিন কয়েক আগের ঘটনার ছায়াছবি।

যৌবনমদমত্ত দামোদরের বুক বেয়ে ছুটে চলেছে তাঁর ছিপ নৌকা তীব্রগতিতেই। দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দামোদরের দু' পাড়ের গাছপালা—গ্রাম। রাজার কিন্তু খেয়াল নেই কোনো দিকে। উদাস এক বাউলের মতোই তাকিয়ে আছেন রুদ্রনারায়ণ।

রাজা তিনি। ভুরশুট রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। ধীবররাজা শনিভাঙ্গরকে পরাজিত ও নিহত করে ভুরশুটের সিংহাসনে বসেছিলেন গড়ভবানীপুরের চতুরানল নেওগি বা নিয়োগী। আপন বাহুবলে এবং বুদ্ধির সুস্থ প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভুরশুটের এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের।

চতুরানন ছিলেন অপুত্রক। একটি মাত্র কন্যা। বিয়ে দেন তিনি তাঁর ফুলিয়ার মুখোটি বংশে। বঙ্গের আদিকবি কৃত্তিবাসের বংশধর সদানন্দ মুখোপাধ্যায়। যেমন দেহসৌন্দর্য তেমনই বলবীর্য। তিনি হলেন চতুরাননের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। নিজের হাতেই তাকে গড়ে তুলেছিলেন চতুরানন।

রাজ্যশাসনের সবরকম কূটবিদ্যাই শেখান তিনি জামাতাকে।

ভুরশুটের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে সদানন্দ নেন রায় উপাধি। নাম হয় সদানন্দ রায় মুখোটি। ভুরশুটকে গড়ে তোলেন তিনি গৌড়ের শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজ্য হিসেবে।

দক্ষিণ রাঢ়ের হুগলি-হাওড়া–মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল হয় ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত। দামোদর এবং তার শাখানদী রণ, নাম যার এখন রোগের খাল—তখনকার সেই মাদারের খালের মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল অরণ্যময়। সেই বন কেটে বসত বসান সদানন্দ। গড়ে তোলেন অপ্রতিরোধ্য সেনাবাহিনী। পদাতিক বাহিনী ছাড়াও ছিল তাঁর শক্তিশালী হস্তি ও অশ্ববাহিনী। আর ছিল সুসংগঠিত এক নৌবহরও। তারই সাহায্যে তিনি হয়ে ওঠেন প্রায় অপ্রতিরোধ্য।

সদানন্দের পর তাঁর ছেলে শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ সর্বার্থেই ভুরশুটকে পরিণত করেন এক শক্তিশালী রাজ্যে। বঙ্গের সুলতান অথবা দিল্লির বাদশা—কারও প্রতি আনুগত্য না দেখিয়েই গড়ে তোলেন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট। তাঁকেই বলা হয় ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এতদিন যা ছিল কেবলই কথা তাকে বাস্তবে পরিণত করেন তিনি। তাঁর শক্তি ও বুদ্ধিকে ভয় পেতেন সকলে।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণের মৃত্যুর পর ভুরশুটের সিংহাসনে একে একে বসেন তাঁর ছেলে দেবনারায়ণ ও নাতি দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের পর তাঁর ছেলে উদয়নারায়ণ বা নাতি সত্যনারায়ণ এবং তাঁর ছেলে শিবনারায়ণ সিংহাসনে বসলেও ভুরশুটকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার জন্য নাম করতে হয় তাঁর ছেলে রুদ্রনারায়ণের। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণনারায়ণের পর রায়মুখোটি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন রুদ্রনারায়ণ। বঙ্গের পাঠানদের ত্রাস হয়ে ওঠেন তিনি। মিত্র হিসেবে বেছে নেন তিনি মুঘলদের। কিন্তু আশঙ্কার একটা কালো মেঘের ছায়া গাঢ় হচ্ছে তাঁর মুখে। তাঁর পরেই কি শেষ হয়ে যাবে রামমুখোটি বংশের ধারা?

তাঁর আশঙ্কার কারণ, যৌবন তাঁর অতিক্রান্ত অথচ এখনো তিনি নিঃসন্তান। অপুত্রক, রানি অসুস্থ। সন্তান ধারণের কোনো ক্ষমতাই আর নেই তাঁর। রাজা তাঁকে ভালোবাসেন। তাই অন্য বিয়ের কথা ভাবতেই পারেন না। পারেন না বলেই শঙ্কাটা তাঁকে বিক্ষত করে চলেছে। এই শঙ্কা বা হৃদয়বেদনার কথা বলতে পারেননি কাউকেই। পারেন না বলেই রাজ্যশাসনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধন-ভজনেও মন দেন। আর তারই জন্য রাজধানীর অদূরে কাট্‌শাকড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন শিবমন্দির। সেই শিবমন্দিরেই মানসিক শান্তির খোঁজে তিনি কাটান অনেকটা সময়ই। এটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনযাপনের একটি ধারা।

সেই ধারাই উত্তলা হলো সেদিন। মন্দিরে সাধনায় রত ছিলেন তিনি। এমন সময় এক সন্ন্যাসীর কণ্ঠ দিয়ে যেন ধ্বনিত হলো দৈববাণী—আবার দারগ্রহণ করো। তুমি হবে সুপুত্রের পিতা।

সন্ন্যাসীর ওই কথাতেও ভরসা করতে পারেন না রুদ্রনারায়ণ। বয়স হয়েছে তাঁর। এসময় বিয়ে করা কি উচিত? করলেও কেই-বা মেয়ে দেবে তাঁকে? আজ এসব চিন্তাই অস্থির করে তোলে রুদ্রনারায়ণকে। মনের সেই অস্থির মুহূর্তে তাঁর একমাত্র আশ্রয় এই শিবমন্দির আর গুরু হরিদেব ভট্টাচার্য।

রাজগুরুই আশ্বস্ত করেন তাঁকে। বলেন, অযথা চিন্তা করো না। ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার। স্বয়ং বিশ্বনাথই হয়তো সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তাঁর ইচ্ছার কথা। তাই বৃথা চিন্তা না করে আস্থা রাখো তাঁর কথায়। হৃদয় দিয়ে ডাকো দেবতাকে। দেখবে যা হবার তা ঘটবেই।

সেদিন ছিপে কাট্‌শাঁক্‌ড়া যাওয়ার পথে এসবই ভাবছিলেন রুদ্রনারায়ণ। তাই আশপাশের কোনো কিছুই নজরে পড়ছিল না তাঁর। অকস্মাৎ এক আর্ত চিৎকার আর বন্যপশুর তীব্র গর্জনে ভেঙে গেল তাঁর ঘোর। তিনি চোখ ফেরালেন নদীর পাড়ের দিকে। যা দেখলেন তাতে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল তাঁর। চার চারটি বন্যমোষ তাড়া করেছে এক নারী ও তার সন্তানকে। সেই নারীর চিৎকার আর বুনো মোষের গর্জনে সচকিত রাজা রুদ্রনারায়ণ। 'রক্ষা করতে হবে'—নিজের মনেই বলেন রাজা। নির্দেশ দেন, দ্রুত পাড়ে নৌকা ভেড়াতে।

তারই মধ্যে ঘটে আরেক অবাক কাণ্ড। কানে আসে দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরধ্বনি। তীব্র হ্রেষারর। রাজা দেখেন অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র এক তরুণী। চোখের পলকে বর্শা ছুড়ে বিদ্ধ করে সামনে আগুয়ান মোষটিকে। লুটিয়ে পড়ে মোষ। এক আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে তার।

তরুণী নামে ঘোড়ার পিঠ থেকে। ত্বরিতে মোষের মাথার বিদ্ধ বর্শা তুলে নিয়ে একে একে হত্যা করে বাকি তিনটিকে। প্রায় অবলীলায়। তারপর ওঠে পড়ে নিজের অশ্বে।

রাজা রুদ্রনারায়ণ অবাক হয়ে দেখছিলেন তরুণীর কাণ্ড। নৌকা থেকে নেমে এগিয়ে আসেন তিনি তরুণীর দিকে। জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি? তুমি কি কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা? অস্ত্রবিদ্যায় এমন পারদর্শী হলে কীভাবে? আর একা একা এই বিপদসংকুল অরণ্যে এসেছো কী জন্য?

কপালের ঘাম মোছে তরুণী। রাজার ওই এক ঝাঁক প্রশ্নের মুখে ঘোড়ার পিঠেই বসে থাকে। একজন অপরিচিতের এমন প্রশ্নে বুঝিবা বিরক্ত। বিব্রতও বোধ হয়।

রাজা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তাই বেশ শান্ত গলায় বলেন, একজন অজানা লোকের এমন প্রশ্নে তুমি বোধহয় বিরক্ত হয়েছো। কিন্তু যে মেয়ে একা অসম সাহসে এমন অস্ত্র চালাতে পারে— তার তো এমন ইতস্তত করা সাজে না।

তরুণী ততক্ষণে স্বাভাবিক। সোজাসুজি তাকায় রাজার

দিকে। তাকিয়ে যেমন যেন লজ্জারাঙা। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে বিনম্র কণ্ঠে বলে, ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি। বছর চার আগে কাটশাঁকড়ার শিবমন্দিরে দেখেছিলাম আমাদের মহারাজকে। আপনি তো তিনিই।

হাসির ঝিলিক রুদ্রনারায়ণের মুখে। তরুণী বলেই চলে, উত্তেজনার বশে আপনাকে চিনতে পারিনি। তারজন্য আবারও ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। কিছু মনে করিনি আমি। বরং আমার রাজ্যে যে এমন সাহসী শস্ত্রবিদ কোনো মেয়ে রয়েছে তা জেনে আনন্দই হচ্ছে। যাইহোক, এবার নিশ্চয় তোমার পরিচয় দিতে কোনো অসুবিধা নেই।

আবারও প্রণাম জানিয়ে বলে তরুণী, না মহারাজ। নাম আমার ভবশঙ্করী। আমার বাবা দীননাথ চৌধুরী আপনারই রাজ্যের পেড়ো দুর্গের অধ্যক্ষর একজন বরিষ্ঠ নায়ক। বুঝতেই পারছেন আমি কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা নই। আমরা ব্রাহ্মণ। আমার যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা সবই বাবার কাছে। তিনি আমাকে দিয়েছেন নানা শাস্ত্রে দীক্ষা, একই সঙ্গে শিক্ষিত করেছেন নানা শস্ত্রেও।

আশা করি, আপনার সব জিজ্ঞাসারই উত্তর আমি দিয়েছি। এরপর নিশ্চয় আমাকে এস্থান ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। আর যাওয়ার আগে স্বীকার করছি, এভাবে একলা এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে আসা আমার উচিত হয়নি। তারজন্য আবারও আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

রাজা ইঙ্গিতেই যাওয়ার অনুমতি দেন। ভবশঙ্করী ধীর পায়েই এগিয়ে ওঠে তার ঘোড়ায়। এখন আর তার চেহারায় কিছু আগের সাহসী এক যোদ্ধার দৃপ্তভাব নেই। বরং নারীর স্বাভাবিক ব্রীড়ার অনুরাগ ছড়িয়ে আছে সারা দেহে।

রাজা অনুরাগ নয়নেই দেখেন ভবশঙ্করীর সেই চলে যাওয়া। বোঝেন, এ মেয়ে কেবল সাহসী বা অস্ত্রসঞ্চালনাতেই কুশলী নয়, এ মেয়ে শিষ্টাচারেও সমান সুশিক্ষিতা।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রাজা রুদ্রনারায়ণ আবার ওঠেন ছিপ নৌকায়। এখন আর তাঁর সেই উদ্দামভাব নেই। বরং ভিন্নতর এক চিন্তায় চঞ্চল তিনি। তিনি চান অবিলম্বে কাট্‌শাঁকড়ায় তাঁর সাধনপীঠ সেই শিবমন্দিরে পৌঁছাতে। তাঁর মনে হয়, অনেক—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তাঁর। এখুনি শেষ করতে হবে সব। তাই তাড়া দেন মল্লাদের।

কাট্‌শাঁকড়ার শিবালয়ে যথারীতি শেষ হয় রাজা রুদ্রনারায়ণের শিবার্চনা। শেষ হয় অর্ঘ্য দান। কিন্তু দূর হয় না হৃদ্‌চাঞ্চল্য। বারবারই মনের পর্দায় স্পষ্ট হয় ভবশঙ্করীর মুখ। বরানার সার্বিক লাবণ্য চঞ্চল করে তোলে রাজাকে।

ভাবসংশ্লেষে চোখ বোজেন রাজা। আর ওই মুহূর্তে রাজার হৃদয়বীণায় বেজে আজানা সেই সন্ন্যাসীর কথা—আবার দার পরিগ্রহ করো তুমি। তাহলেই তুমি হবে সুপুত্রের জনক। অব্যাহত থাকবে তোমার বংশ।

বারবার মনে হয় রুদ্রনারায়ণের, তাহলে ভবশঙ্করীই কি সেই নারী? এরই সঙ্গে কি জড়িয়ে রয়েছে ভুরশুটের ভবিষ্যৎ? কিন্তু—হ্যাঁ এই কিন্তুটাই বিচলিত করে রাজাকে। তিনি চাইলেও ভবশঙ্করীও কি চাইবে? দুজনের বয়সের বিরাট ফারাকটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো মিলনের পথে?

।। তিন ।।

মনের সেই অস্থির মুহূর্তেই রাজা রুদ্রনারায়ণ খবর পাঠালেন দীননাথ চৌধুরীর কাছে। অবিলম্বে ওই সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন তিনি।

নির্দেশ পেয়ে এতটুকু দেরি করলেন না দীননাথ। দু'জন দেহরক্ষী নিয়ে রণবেশে তিনি হাজির হলেন সেই শিবমন্দিরে। দেবতা ও রুদ্রনারায়ণকে প্রণাম করে বলেন, আমাকে ডেকেছেন মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ হাত ধরে তাঁকে বসালেন পাশে। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলেন পেড়ো এবং সন্নিহিত অঞ্চলের খবরাখবর। দীননাথও সব জানান তাঁকে। প্রজারা যে সুখে ও শান্তিতে রয়েছে একথাই নানাভাবে বলেন তিনি রুদ্রনারায়ণকে।

সব কিছু জানলেও দীননাথ কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত। মহারাজ যে অঞ্চলের খবরাখবর জানার জন্য তাঁকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠাননি এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তাই প্রকৃত কথাটা জানার জন্য বেশ উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণ আসল কথাটা বলার আগে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালান বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় আসেন আসল প্রসঙ্গে। বলেন কিছু মনে করবেন না। একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।

দীননাথ কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকেন রাজার দিকে। একটু সময় নিয়ে রুদ্রনারায়ণ বলেন, আজ দুপুরে এখানে আসার সময় কুল-আকাশের কাছে নদীপাড়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল। ঘটনাটা আমাকে বড়ই কৌতূহলী করে তুলেছে। চিত্তও তাই বড়ো অস্থির। আপনি কি আমার এই চিত্ত চাঞ্চল্যকে দূর করতে একটু সাহায্য করবেন!

রাজা তখন যেন তৃষ্ণার্ত চাতক। তাকিয়ে আছেন 'ফটিক জল' দীননাথ চৌধুরীর দিকে। আর ঘটনার আকস্মিকতায় দীননাথও কিছুটা হতভম্ব। বুঝতে পারেন না এই মুহূর্তে তিনি ঠিক কী বলবেন। কেমন ভাবেই-বা রাজার অস্থির মনকে করবেন সুস্থির? বুঝতে পারেন না বলে তিনিও নীরব।

সাময়িক নীরবতা ভেঙে দীননাথই বলেন, কী হয়েছে মহারাজ? কী দেখেছেন আপনি?

দেখলাম এক তরুণীকে। অশ্বপৃষ্ঠে অস্ত্রধারী। যেন সাক্ষাৎ দেবী। একাই নিধন করল চার চারটি বন্য মহিষকে। জিজ্ঞেস করলাম পরিচয়। লাজুক কণ্ঠে বলল, ওর নাম ভবশঙ্করী। আচ্ছা ও কি আপনার মেয়ে? বিয়ে হয়নি ওর এখনো?

দীননাথ বলেন, হ্যাঁ ও আমারই মেয়ে ভবশঙ্করী। ওর যখন বছর চার বয়স, সেই সময় পুত্রের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় আমার স্ত্রী। তারপর থেকে ও সবসময় থাকে আমারই সঙ্গে। নানা শাস্ত্র ওর অধিগত। অস্ত্রবিদ্যাতেও সুনিপুণ। ও যে সুরূপা—তা তো আপনিও দেখেছেন।

—ও কি বিবাহিত?

—না মহারাজ। ওর বিয়ে হয়নি এখনও।

—কিন্তু বয়স তো হয়েছে।

—হ্যাঁ মহারাজ। সেটা আমিও জানি। তাই সময়েই বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মেয়ে আমার অদ্ভুত এক শর্ত রেখেছে।

—কী রকম?

—বলেছে, অসি যুদ্ধে যে ওকে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই ও বিয়ে করবে। আপনিই বলুন, ব্রাহ্মণের মধ্যে কি অমন পাত্র পাওয়া সহজ। তাই আমিও ভাবলুম—থাক ও আমার কাছে এই ভাবেই।

রুদ্রনারায়ণ বলেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেওয়াতো বাবার কর্তব্য। শাস্ত্রে তো সে কথাই বলে।

—জানি মহারাজ। কিন্তু বললাম যে মেয়ের পণের কথা।

—বুঝেছি। আপনি চিন্তা করবেন না। আমিই চেষ্টা করবো আপনার মেয়ের পাত্রের জন্য। খোঁজ পেলেই জানাবো আপনাকে। আপনি নিশ্চিন্ত মনেই এবার যেতে পারেন।

রাজাকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে দীননাথ চৌধুরী ফিরে আসেন বাড়িতে। রাজার এই হঠাৎ করে ডেকে পাঠানো, ভবশঙ্করীর বিয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা, এসবের কোনো অর্থই খুঁজে পান না দীননাথ। পান না বলেই তাঁর মনের মধ্যেই চলতে থাকে নানা প্রশ্ন–উত্তরের কাটাকাটি খেলা।

ওদিকে শিবমন্দিরে রাজা রুদ্রনারায়ণের মনের আকাশে তখন সাদা-কালো নানা মেঘের ঘনঘটা। সেই আলো-আঁধারি মানসিক অবস্থায় তিনি একটু উদ্‌ভ্রান্ত। বুঝি বারবারই পথ হারান। কিছুতেই খুঁজে পান না জীবনের সঠিক ঠিকানা। মনের সেই অস্থির অবস্থার মধ্যেই মনে হয় রুদ্রনারায়ণের—গুরুদেব—গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্যই তাঁকে দিতে পারবেন সঠিক পথের সন্ধান। আর এটা মনে হতেই রুদ্রনারায়ণ শান্ত। শান্ত মনেই তিনি যান গুরুদেবের কাছে।

রাজগুরু হরিদেবের কাছে অকপট রাজা রুদ্রনারায়ণ।

বলেন তাঁকে সব ঘটনাই—এতটুকু ফাঁক না রেখেই। তরুণী ভবশঙ্করী যে তাঁর মনে ঝড় তুলেছে সে কথাও গোপন রাখেন না তিনি।

রাজগুরুকে সব কথা বলে একটু যেন হালকা হন রাজা রুদ্রনারায়ণ। তারপর তাঁর সংশয় ভরা প্রশ্ন, এবার আপনিই বলুন, আমি কী করব? এই মেয়েকে দেখে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা আমি প্রায় নিয়েই ফেলেছি। কিন্তু ওই কন্যা যে পণ করেছে, তার আমি কী করব? রাজা আমি। আমার কি সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করা মানায়? আমি জানি, ওই মেয়ে অসি চালনায় কুশলী হলেও আমাকে পরাজিত করা ওর পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। কিন্তু দৈবের কথা তো বলা যায় না, যদি আমি হেরে যাই, তাহলে সে যে বড়ো কলঙ্কের ব্যাপার হবে। আপনিই বলুন গুরুদেব এখন আমার কী কর্তব্য।

শান্ত গলাতেই বলেন হরিদেব, অত উতলা হচ্ছো কেন? আমায় তো বললে সব কথা। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, তাতে বলতে পারি, ভবশঙ্করী হবে ভুরশুট রাজ্যের পরবর্তী রানি। সেই হবে তোমার পুত্রের জননী। কিন্তু সব কিছুর জন্যই তো একটু সময়ের প্রয়োজন। দরকার একটু ধৈর্যের। তাই বলছি শান্ত হও। আমি দেখছি কী করতে পারি। যাতে ওই মেয়ের ধনুকভাঙা পণ রক্ষা হয় আর তোমাকেও ওর সঙ্গে অসিযুদ্ধে নামতে না হয় তার একটা ব্যবস্থা আমি করছি।

বিদায় নেন রাজা। হরিদেবও তাঁর পরবর্তী কর্তব্য হিসেবেই রওনা হন দীননাথ চৌধুরীর বাড়ির দিকে। অসময়ে রাজগুরুকে আসতে দেখে দীননাথ একটু চিন্তায় পড়েন। প্রণাম করে তাঁর বসার জন্য যোগ্য আসন দিয়ে বলেন, আপনার পায়ের ধুলো পড়ায় পবিত্র হলো আমার গৃহ। কিন্তু আপনি কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন? বললে আমিতো যেতে পারতাম আপনার কাছে।

হেসে বলেন হরিদেব, অত ব্যস্ত হয়ো না। একটা বিশেষ কাজে এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম এই ফাঁকে তোমার বাড়িও একটু ঘুরে যাই।

দীননাথ বলেন সে তো আমার পরমসৌভাগ্য। বলুন, এখন আপনার সেবার জন্য কী করতে পারি।

অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি এসেছি এমনিই। তা তোমার সব কুশল তো। ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?

—হ্যাঁ গুরুদেব, এখানে সবই কুশল। ছেলে-মেয়েরাও ভালোই আছে।

—বেশ, বেশ। তা তোমার মেয়েকে দেখছি না! ও কোথায়?

—ও আছে বাড়ির ভিতরেই। শুনে হরিদেব বলেন, দেখো তোমাকে একটা কথা বলি। মেয়ে বড়ো হয়েছে। এখন ওর বিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি সৎ ও ধার্মিক মানুষ। তোমার তো এভাবে মেয়েকে ঘরে রাখা উচিত নয়। মেয়ের বিয়ের জন্য উদ্যোগ নাও এবার।

কুণ্ঠিত ভাবেই দীননাথ বলেন, আপনি তো সবই জানেন। ওর পণের কথাও অজানা নয় আপনার। মা-মরা মেয়ে—এই নিয়ে আমি তো জোর করতে পারি না। মুশকিল হচ্ছে, ব্রাহ্মণের মধ্যে অমন উপযুক্ত পাত্র তো একটিও পাচ্ছি না।

হরিদেব হেসে বলেন, সে কী কথা। পাত্র তো তোমার হাতের কাছেই রয়েছে।

গুরুদেবের কথায় বিভ্রান্ত দীননাথ বলেন, ঠিক বুঝলাম না। কোথায় রয়েছে অমন পাত্র?

হরিদেব একইভাবে বলেন, কেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। এতদিনে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে রাজি হয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হতে পারে তোমার মেয়ে ভবশঙ্করীর।

—রাজা রুদ্রনারায়ণ! আমাদের মহারাজা। একী কথা বল্‌ছেন আপনি। তিনি গ্রহণ করবেন আমার মেয়েকে। তাও কখনো হয়!

—হয় বলেই তো তোমার কাছে এলাম। তুমি আর তোমার মেয়ে রাজি থাকলেই হয়ে যেতে পারে বিয়েটা।

দীননাথ বলেন, এ তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো ব্যাপার! কিন্তু—

—আবার কিন্তু কীসের?

—আপনি তো জানেন, মেয়ের আমার পণের কথা। তাছাড়া ও সুশিক্ষিতা। বড়ো হয়েছে। ওর নিজের একটা মতামত রয়েছে। তাই—

হরিদেব বলেন সে তোমাকে ভাবতে হবে না। মেয়ে তো তোমার ঘরেই আছে, ডাকো তাকে। আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।

দীননাথ ডেকে আনেন ভবশঙ্করীকে। গুরুদেবকে প্রণাম করে নতমুখে একপাশে দাঁড়ায় ভবশঙ্করী। হরিদেব বলেন মা, আজ তোমাকে একটা কথা বলি। রাজা রুদ্রনারায়ণ আবার বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা হোক। আশা করি এতে তোমার কোনো আপত্তি নেই।

নতমুখেই ভবশঙ্করী জানায়, স্বামী হিসেবে যে কোনো মেয়েই রাজা রুদ্রনারায়ণকে কামনা করবেন। কিন্তু আমি পণ করেছিলাম—

—জানি মা। সবই শুনেছি তোমার বাবার কাছে। শুনে ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। বিয়ের আগে প্রতিটি মেয়েরই তো জানা উচিত, জীবনসঙ্গী বলবীর্যে তার চেয়ে কতটা উন্নত। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ভেবে দেখো, রাজা রুদ্রনারায়ণ যে মহাবীর একথা সকলেই জানে। অসি চালনায় তাঁর চেয়ে দক্ষ অন্তত এই বঙ্গদেশে আর কেউ নেই। এহেন ব্যক্তির পক্ষে তোমার সঙ্গে অসিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় নামা একটু অপমানজনক নয় কি? তুমিই বলো।

রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের একথার কোনো উত্তর দিতে

পারে না ভবশঙ্করী। তাই মাথা নীচু করেই থাকে সে। তার ওই অবস্থা দেখে হরিদেব ভট্টাচার্য আবারও বলেন, রাজার শক্তি এবং অসি চালানার দক্ষতা সম্পর্কে আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। একবার রাজপ্রসাদে অসি চালনা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকেও এসেছিলেন বহু কুশলী অসি চালনাকারী। তোমার বাবাও ছিলেন একজন প্রতিযোগী। সে প্রতিযোগিতায় সকলেই হার মেনেছিল রাজা রুদ্রনারায়ণের কাছে। আমার কথায় কোনো অতিরঞ্জন আছে কিনা সেটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবে।

এসবের পর আর কিছুই বলার থাকে না ভবশঙ্করীর। তাই বিয়ের কথায় সম্মতি জানায়। কিন্তু করে একটা অনুরোধ। বলে বিয়ের আগে রাজবল্লভীর মন্দিরে এক বিশেষ পূজার আয়োজন করা হোক। সেখানে বলির জন্য দু'জায়গায় রাখা হোক দুটি করে মহিষ ও একটি করে মেষ। আমরা দু'জনে বলি দেব সে পশু। তারপর সেখানেই মহামায়ার সামনে পতিত্বে বরণ করব রাজা রুদ্রনারায়ণকে।

ভবশঙ্করীর একথায় রাজি হন হরিদেব ভট্টাচার্য। আর তাই নির্দিষ্ট দিনেই হয় ওই পূজা। এবং হয়ে যায় শুভবিবাহ।

॥ চার ॥

এ এক পর্বান্তর। সবকিছু ওলটপালট করে দেওয়া। সব মানুষের জীবনেই কোনো না কোনোভাবে এটা ঘটে। কিন্তু ভারতের নারীদের জীবনে এটা অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে নারীজীবনে সবকিছু টালমাটাল করা একটা ব্যবস্থা হলো বিবাহ। রাতারাতি সবকিছু বদলে যায়। যা ছিল তার একান্ত আপন এবং পরম ভরসার জায়গা, সেই নিরাপদ নীড় ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় নারীকে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে। ভবশঙ্করীর জীবনেও ঘটল তাই।

ভবশঙ্করী ছিলেন বাবার নয়নমণি। শৈশবে মা-কে হারিয়ে বাবা দীননাথের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন একই সঙ্গে বাবা ও মাকে। স্বাধীন বনবালার মতোই যাপন করছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ জীবন। বিদ্যা ও অস্ত্র, দু'য়ের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভবশঙ্করী অরণ্যের মধ্যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন জীবনের নানা পরমধন। কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল সব কিছু।

ভবশঙ্করী ছিলেন একজন সেনানায়ক বা সর্দারের মেয়ে। সমৃদ্ধি থাকলেও ছিল একটা সীমা। কিন্তু রাজা রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে বিয়ের মুহূর্ত থেকে তিনি হলেন রানি ভবশঙ্করী। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রানি থেকে হলেন রানিমা। প্রজাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশে তিনি হলেন মা জগদ্ধাত্রী। প্রচলিত শান বাঁধানো সড়ক ছেড়ে মেঠো রাস্তায় নেমে ভবশঙ্করী তৈরি করে ফেলেন নিজস্ব এক ভাবমূর্তি—অতি দ্রুতই।

রাজা রুদ্রনারায়ণ সত্যিই বড়ো বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁর এই দ্বিতীয়াকে। সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় রীতিমতো বেশি বয়সেই রুদ্রনারায়ণ বিয়ে করেছিলেন ভবশঙ্করীকে। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি বিদ্ধ হন কামশরে। বিয়ের পরে পরেই তিনি ভবশঙ্করীর জন্য ভবানীপুরের গড়ের বাইরে দামোদরের তীরে তৈরি করেন এক বিরাট প্রাসাদ। সেখানেই ভবশঙ্করী থাকেন প্রায় স্বাধীনভাবে। সেখানেই রুদ্রনারায়ণ তাঁর সঙ্গে খেলেন নিত্য মদনোৎসবে।

ভবশঙ্করী কেবল রূপসী, সাহসী, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণই ছিলেন না, বিভিন্ন শাস্ত্রেও ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। তিনি ছিলেন এককথায় বিদ্যাবতী সরস্বতী। দর্শনশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ভবশঙ্করী জানতেন, এ জীবন হলো পদ্মপাতার জল। তাই যা করবার তা করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। কোনোমতেই আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়। তাই বিয়ের পর কেবলই প্রেমের জোয়ারে ভাসা নয়, সেই সঙ্গে স্বামীকে সমস্তকাজে সবরকমভাবে সাহায্য করার জন্য সতত সক্রিয় থাকতেন।

ভবশঙ্করী তাঁর দাম্পত্য জীবনের আদর্শ যেন খুঁজে পেয়েছিলেন কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যে। 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'—অর্থাৎ 'গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম, ললিতকলায় ছিল যে শিষ্যসম' নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বিয়ের পর থেকে ভবশঙ্করীই হয়ে ওঠেন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা।

এমনিতেই রাজা রুদ্রনারায়ণের সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও নৌবহর—এই চার বাহিনীর শক্তিতে তিনি ছিলেন প্রায় অপরাজেয়। এই বাহিনীর কারণেই তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করতেন। ভবশঙ্করী সেই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার দিকে নজর দিলেন। একইসঙ্গে নিজের প্রাসাদেই আলাদাভাবে গড়ে তোলেন এক নারী বাহিনী। সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে এই বাহিনী ছিল অতি পারদর্শী। শুধু যে নারীবাহিনী গঠন করেন তা নয়, সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ ছাড়া সব বর্ণের সক্ষম যুবকদের সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে তিনি এক অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সেনা সংগঠন ছাড়া রাজ্যের নানা জায়গায় দুর্গ তৈরির যে পরিকল্পনা তিনি নেন, রুদ্রনারায়ণ দ্রুত সেগুলির বাস্তবায়ন ঘটান। এই পরিকল্পনাতেই তারকেশ্বরের কাছে ছাউনাপুর নামে খ্যাত জায়গায় যে ভূগর্ভস্থ দুর্গ তৈরি করান, তা রানির দূরদর্শিতার একটি বড়ো পরিচয়।

ছাউনাপুরে এই দুর্গ ছাড়াও গড়ের বাইরে রানি ভবশঙ্করী এক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নামে মন্দির হলেও মন্দিরের

ভিতরে ছিল নানা গুপ্ত জায়গা—যা একরকম দুর্ভেদ্য দুর্গেরই প্রতিরূপ। প্রয়োজনে রানি এই মন্দিরকেই তাঁর সাময়িক বাসস্থান হিসেবেও ব্যবহার করতেন।

রানি ভবশঙ্করীর আরাধ্যা ছিলেন দেবী ভবানী। বাশুড়ী গ্রামে তিনি তাঁর ইষ্টদেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন ওই ভবানী মন্দির।

কেবল দুর্গ বা দেবালয় নয়, রানি ভবশঙ্করী নিজে ঘোড়ায় চড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত যেতেন। সাধারণ মানুষের কাছে শুনতেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা। শুনেই কর্তব্য শেষ হতো না তাঁর। বরং সে সব অভিযোগের প্রতিকার করতেন তিনি। তাঁর এইসব চেষ্টার ফলেই রাজ্যে কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও ধাতুপাত্র ইত্যাদি শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে। আর এসবের ফলেই সারা রাজ্যই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দূর হয় দুঃখদারিদ্র। প্রজারাও দিন কাটাতে থাকেন সুখেই। শিল্প সমৃদ্ধির কারণেই ভুরশুট হয়ে ওঠে সারা দেশের মধ্যে এক আদর্শ রাজ্য।

।। পাঁচ ।।

ভবশঙ্করীর জীবনকালকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব তাঁর কুমারী কাল, দ্বিতীয় পর্ব বিয়ের পর থেকে রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু পর্যন্ত সময়, তৃতীয় পর্ব রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে প্রতাপনারায়ণের অভিষেক কাল পর্যন্ত এবং চতুর্থ পর্বের বিস্তৃতি রানি ভবশঙ্করীর কাশীবাস থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

রানি ভবশঙ্করীর দাম্পত্যজীবন মোটেই দীর্ঘ নয়। পুত্র প্রতাপনারায়ণের বয়স যখন বছর পাঁচেক, সেইসময় হঠাৎই মারা যান রাজা রুদ্রনারায়ণ। রুদ্রনারাণের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন রানি ভবশঙ্করী মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। ওইসময় রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তিনি একবারেই উদাসীন ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ভবশঙ্করী সহমরণে পর্যন্ত যেতে চান।

রানি ভবশঙ্করীর শোকের সময় সবদিক থেকে রানির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে শক্তি জোগান রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। ওইসময় তাঁর ভূমিকা দেখে বোঝা যায়, রাজগুরু কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিরই অধিকারী ছিলেন না, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ভুরশুট রাজ্যে রায় রাজবংশের শাসনকেই কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেননি। সেইসঙ্গে বঙ্গদেশে পাঠান শাসনের অবসানের ভিত্তিটাও তৈরি করে দেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রানি ভবশঙ্করী যখন মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, সেসময় হরিদেব নানাভাবেই তাঁকে সান্তনা দিয়ে সক্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

প্রাথমিকভাবে, গুরুদেবের সেসব কথায় কোনো সাড়া দেননি ভবশঙ্করী। হরিদেব তাঁকে বোঝান, রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে কেবল ভুরশুটে নয়, সমগ্র বঙ্গদেশেই মহাসংকট দেখা দিয়েছে। বলেন, তুমি তো জানো, বঙ্গদেশের অধিকার নিয়ে এখন মুঘল ও পাঠানদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। পাঠানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমার স্বামী রুদ্রনারায়ণের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু রুদ্রনারাণ পাঠানদের সেই আহ্বানে সাড়া দেননি। নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলেও তাঁর সমর্থন ছিল মুঘলদের প্রতিই। তাদের সাহায্য করে নানাভাবে।

রুদ্রনারায়ণকে পাশে না পেয়ে পাঠানরা খুবই ক্ষিপ্ত। তারা বিভিন্ন সময়ে ভুরশুট রাজ্য আক্রমণও করে। কিন্তু প্রতিবারই ভুরশুট তথা রুদ্রনারায়ণের বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়।

পরাজিত হলেও এই রাজ্যের প্রতি পাঠানদের রাগ এতটুকু কমেনি। তাই তারা যদি শোনে রুদ্রনারায়ণশূন্য ভুরশুটের রানিও রাজ্য শাসন সম্পর্কে উদাসীন এবং তাঁর ছেলেও মাত্র বছর পাঁচেকের শাসক মাত্র, তাহলে তারা এই রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। তুমি যদি তৎপর না থাকো অথবা সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব না দাও তাহলে ভুরশুটের ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে ডুবে যাবে। মুছে যাবে তোমার স্বামীর সব স্মৃতি। প্রতাপও সিংহাসনে বসার কোনো সুযোগই পাবে না। সবমিলিয়ে বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাজ্য ধ্বংস হবে। বিপন্ন হবে অসহায় প্রজারা। এখন ভেবে দেখো, তুমি কী করবে? শোকের সাগরে ভেসে তোমার স্বামীর সব কীর্তিকে ধ্বংস হতে দেখবে নাকি তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শাসন দণ্ডটা হাতে তুলে নেবে?

রানি বিচলিত। তার আগের সিদ্ধান্ত টলমল। আর সেটা বুঝতে পেরেই রাজগুরু হরিদেব আরও আবেগভরা কণ্ঠে বলতে থাকেন, মা, তুমি তো সব শাস্ত্রই পড়েছো। তুমি তো জানো, এই শরীর নশ্বর কিন্তু এই শরীরস্থিত আত্মা অবিনশ্বর। স্বামীর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হয়েছে বলে তুমি তোমার স্বামীর অবিনশ্বর আত্মার অমর্যাদা করবে? যার প্রতি ভালোবাসা তুমি এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছো, এতে যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবে সেই অবিনশ্বর আত্মাই। তুমি তাই চাও?

রাজগুরু হরিদেবের অকাট্যযুক্তি এবং সপ্রণয় শাসন বাক্যে ভবশঙ্করী চোখের জল মুছে বলেন, আপনি তাহলে আমাকে কী করতে বলছেন?

হরিদেব এখন শান্ত। রানির ওপর তাঁর কথা যে প্রভাব ফেলতে ফেরেছে তা বুঝতে পেরেই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, ওঠো, জাগো, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। প্রতাপ যতদিন না উপযুক্ত হচ্ছে ততদিন এই রাজ্যরজ্জু শক্ত হাতে ধরো। রাজা নেই কিন্তু তুমি আছো— এই কথাটাই জানিয়ে দাও সকলকে।

রাজগুরুকে প্রণাম করে ভবশঙ্করী বলেন, তাই হবে। আপনার আদেশই মেনে নিচ্ছি। তবে একটা কথা, এখন থেকে আমি থাকবো কাট্‌শাঁকড়ায় আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে। জীবনযাপন করবো ব্রহ্মচারিণীর। রাজ্যের শাসনভার আপাতত থাকবে মন্ত্রী দুর্লভ চন্দ্র দত্ত এবং সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর উপর।

ভবশঙ্করীর এই কথায় আবার আঁধার রাজগুরুর মুখ। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বলেন, সবই তোমার জানা। এইমুহূর্তে হয়তো বিস্মরণ হয়েছো তা। মানুষের তৃতীয় রিপু লোভ বড়ো সাংঘাতিক। সামনে সাজানো নানা ধরনের মিষ্টি দেখে অতিবড়ো সংযমীর চিত্ত হয় চঞ্চল। কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে এসে ভিড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি। এভাবে অন্যকে বিশ্বাস করে অতীতে বিপর্যস্ত হয়েছেন অনেকেই। অন্যসব লোভের মধ্যে রাজ্যলোভ বড়ো ভয়ানক। জানো তো, রাজ্যলোভী কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্রের নানা হীন চক্রান্তের ফলে পরাজিত হন রাজা পৃথ্বীরাজ। আর তাতেই আগলহীন হয় এদেশে মুসলমান আগ্রাসনের সদর দরজাটা। এইভাবে পরনির্ভর ও যুক্তিহীন বিশ্বাসের কারণেই বঙ্গাধীশ লক্ষ্মণ সেনকে অনায়াসে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজির মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী। তাই বলছি, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কারও ওপর শর্তহীন নির্ভর হতে নেই। বিশ্বাসও করতে নেই।

ভবশঙ্করী এবার কিছুটা ধ্বস্ত কণ্ঠেই বলেন, তাহলে এ সংস্কারে বিশ্বাসের কি কোনো দাম নেই? অবিশ্বাসের খাদ না মেশানো কি শক্তপোক্ত বা উজ্জ্বল হবে না বিশ্বাসের সোনা।

হরিদেব বলেন, ঠিকই বুঝেছো মা। এবার তুমি পরম কর্তব্যের ডাকে সাড়া দাও।

—বেশ, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে এই শোক নিরসনে মাস তিনেক আমি কাটশাঁকড়ার ওই শিবমন্দিরে একা থাকতে চাই। মাত্র তিনমাস। ওইটুকু সময় আমাকে রাজপ্রসাদের বাইরে থাকার অনুমতি দিন। তারপর আপনার কথামতোই হবে সব কাজ।

কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই রাজগুরু বলেন, আবারও বলছি, এ কাজে আমার মানসিক সায় নেই। তবুও তুমি যখন একান্তই চাইছো, তাই হোক। তবে খুব সাবধান। আত্মরক্ষার ব্যাপারে এতটুকু উদাসীন হবে না। সবসময় নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে। কাউকেই অতিবিশ্বাস করবে না—সে যেই-ই হোক। আমিও লক্ষ্য রাখবো। কোনো বিপদের গন্ধ পেলেই জানাবো তোমাকে। তখন কিন্তু বাঘিনির মতোই রুখে দাঁড়াবে। বলতে পারো এটা আমার নির্দেশ।

রাজগুরুর চরণ বন্দনা করে ভবশঙ্করী বলেন, আপনার কথার কোনো অন্যথা হবে না। সব দিকেই নজর রাখবো আমি। আপনি আর কোনো চিন্তা করবেন না।

‘বেশ মা, তাই হোক। শুভ হোক তোমার এই যাত্রা।’ রানিকে আবার আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নেন রাজগুরু।

মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত আর সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীকেই তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য চালানোর নির্দেশ দিয়ে রানি ভবশঙ্করী রওনা হন কাট্‌শাঁকড়ায়। সঙ্গে নিলেন তাঁর নারী বাহিনীর অতি বিশ্বস্ত ও রণনিপুণ জনা কুড়ি সহচরীকে। আর নিলেন রাজবংশের কুলদেবী জয়দুর্গার আশীর্বাদী সেই দিব্য তরবারি।

বিয়ের কিছুদিন পরের ঘটনা। ভবশঙ্করী ধরনা দিলেন কুলদেবী জয়দুর্গার অষ্টধাতুর প্রতিমার সামনে। অনাহারে—বিনিদ্রভাবে ডেকে চলেছেন তিনি দেবীকে। একটা প্রার্থনা, কোনো বীরপুরুষ যেন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারেন।

কেটে যায় দুটি দিন। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন পূজার পর পেলেন দেবীর নির্দেশ, রাজবাড়ির পূর্বদিকের সরোবরে আছে একটি তরবারি। সরোবরে ডুব দিলেই সেটি আসবে তোর হাতে। সেই তরবারি যতক্ষণ থাকবে তোর হাতে, কেউ তোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

দেবীর নির্দেশ মতোই সেই মধ্যাহ্নে সরোবরে ডুব দেন রানি। আর অলৌকিকভাবেই তার হাতে আসে এক মণিময় তরবারি। সেটি নিয়ে ভবশঙ্করী যান কাট্‌শাঁকড়ার শিবালয়ে নিভৃত সাধনায়।

।। ছয় ।।

রাজগুরুর আশঙ্কাই সত্যি হলো। চক্রান্তের জাল বোনার কাজ শুরু করেছিল ওড়িশার পাঠান অধিপতি ওসমান খাঁ। রাজা রুদ্রনারায়ণের জন্যই যে বঙ্গদেশে পাঠানরা ক্ষমতা হারাচ্ছে, এ দুঃখ ভুলতে পারে না ওসমান খাঁ। কতলু খাঁর পরাজয় ও নিধনের জন্যও রুদ্রনারায়ণ দায়ী বলে মনে করে সে। তাই রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর খবর পেয়েই তৎপর হলো ওসমান খাঁ।

ওসমান খবর পেয়েছে ভুরশুটির রাজ্যপাট সামলাচ্ছেন এখন সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী। মাথার ওপর মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত থাকলেও ক্ষমতার আসন চাবিকাঠি রয়েছে চতুর্ভুজেরই হাতে। রাজ্যের উত্তরাধিকারী প্রতাপনারায়ণ নেহাতই বালক। রানি ভবশঙ্করী এই মুহূর্তে পতিশোকে রয়েছেন রাজধানী থেকে দূরে এক শিবালয়ে। এই মুহূর্ত ভুর্‌শুট আক্রমণ করলে যে তার পতন হবেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত ওসমান। তবুও প্রথমেই আক্রমণের রাস্তায় গেল না সে। বরং রাজনীতির কুটকৌশল হিসেবে বিশ্বাসঘাতক খোঁজার কাজে মন দিল।

ওড়িশা শাসক জানে ভুরশুটের সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী বীর। খবর পেয়েছে, সংশয়াতীত বীরত্বের অধিকারী হলেও নিঃশর্ত আনুগত্য নেই তাঁর রাজার প্রতি। এক ধরনের লোভ

তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে চলেছে রাজার অজান্তেই। তাই টোপ ফেলে চতুর্ভুজের কাছে। রণনীতিতে অভিজ্ঞ ওসমান জানে প্রতিপক্ষের শিবিরে যদি বিশ্বাসঘাতক থাকে তাহলে যুদ্ধজয়টা অনেক অনায়াস হয়। তাই এক হিন্দু দূতকে পাঠালো চতুর্ভুজের কাছে।

গোপন কক্ষে শুরু হলো আলোচনা। দূত শুরুতেই চতুর্ভুজের সামনে মেলে ধরে প্রলোভনের তাসগুলি। দূত জানায়, ওসমান খাঁ বলেছেন, চতুর্ভুজ যদি তাঁর অধীনস্থ সেনাদের নিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন তাহলে প্রতিদানে তিনিও তাঁকেই ভুরশুটের রাজপদে অভিষিক্ত করবেন।

ওসমান খাঁর এই আকস্মিক প্রস্তাব চঞ্চল করে তোলে চতুর্ভুজকে। এটা যে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। গোপনে নানা চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি। এবার বোধহয় ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। তাই তিনিই বোধহয় ওসমান খাঁকে দিয়ে প্রস্তাবটা পাঠিয়েছেন।

চতুর্ভুজ ভেবে বলেন, অবস্থা এখন অনেক অনুকূল। রাজা রুদ্রনারায়ণ প্রয়াত। রানি ভবশঙ্করী বীরাঙ্গনা, রাজনৈতিক জ্ঞানও প্রখর। কিন্তু স্বামীশোকে পার্থিব সবকিছু সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে রাজধানী থেকে দূরে ধর্মকর্ম করছেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রতাপনারায়ণ নেহাতই বালক। এরকম অবস্থায় ওসমান খাঁর এই বার্তা চতুর্ভুজকে সিংহের ভুক্তাবশেষ দেখে লালায়িত শিয়ালের মতোই চঞ্চল করে তোলে।

লোভ তীব্র হলেও চতুর্ভুজ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন না। তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁকে বলে, হুট করে কোনো কথায় হ্যাঁ বলতে নেই। প্রস্তাবটা কতটা খাঁটি তা ভালো করে যাচাই করে দেখা দরকার। এই মুহূর্তে ওসমান খাঁর বঙ্গদেশ আক্রমণের সম্ভাবনাটাও খতিয়ে দেখা উচিত। তাই একটু সময় নেন তিনি।

ওসমান খাঁর দূতও কুশলী কূটনীতিজ্ঞ। তাই চতুর্ভুজের ভাবনাচিন্তাগুলি পড়তে পারে সে তাঁর মুখ দেখেই। তাই আশ্রয় নেয় বাকচাতুর্যের। বলে, মান্দারণের যে যুদ্ধে পাঠান অধিপতি কতলু খাঁ পরাজিত ও নিহত হয়, তার আসল নায়ক ছিলেন চতুর্ভুজই। তাঁরই অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলে পরাজিত হয় পাঠানরা। অথচ সে যুদ্ধের পুরো কৃতিত্বটাই নেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। চতুর্ভুজকে স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, যোগ্য মর্যাদাটাও দেন না। তাই প্রশ্ন, কতদিন—আর কতদিন জীবনপণ যুদ্ধ করেও চতুর্ভুজ এভাবে থাকবেন বঞ্চিতদের দলে—সেটাই জানতে চায় ওসমান খাঁর দূত। বলে, এখনই সঠিক সময়। এখনও যদি তিনি এগিয়ে না আসেন তাহলে আর কোনোদিনই তাঁর পক্ষে ভুরশুটের সিংহাসনে বসা সম্ভব হবে না। তাই এগিয়ে আসুন। যোগ দিন পাঠানদের সঙ্গে এটাই চায় ওসমান খাঁ।

দূতের এসব কথায় চতুর্ভুজ আর তাঁর মনের ইচ্ছাটা গোপন করতে পারেন না। জানতে চান, সত্যি সত্যিই ওসমান একথা বলেছে তো? আমাকেই ভুরশুটের রাজা করবে তো?

দূত বলে, এর মধ্যে ছলাকলার কোনো জায়গা নেই। আল্লাহের নামে কসম খেয়েই কথাটা বলেছেন ওসমান খাঁ। আপনি সাহায্য করবেন তাঁকে আর তিনিও রাজপদে বসাবেন আপনাকে।

এমন স্পষ্ট আশ্বাস পেয়ে চতুর্ভুজ আর নিজের মনের ভাবটা চেপে রাখতে পারেন না। তিনি রাজি হয়ে যান। কারণ তিনি যতটা বোঝেন, তাতে রানি ভবশঙ্করী কখনই তাঁর স্বামীর পথ থেকে সরে আসবেন না। আর তাই সবচেয়ে আগে তাঁকে বন্দি করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর সেটা করার একটা রাস্তা জানা আছে তাঁর। এখন ওসমান খাঁ রাজি থাকলে সে পথটা করতে পারেন তিনি।

দূত জানতে চান পথটা। উত্তরে চতুর্ভুজ বলেন, রানি ভবশঙ্করী এখন অল্প কয়েকজন মাত্র দেহরক্ষী নিয়ে কাট্‌শাকড়ার শিবমন্দিরে দিন কাটাচ্ছেন। তাই ওসমান খাঁ যদি রাতের অন্ধকারে অল্পকিছু সেনা নিয়ে হানা দেয় তাহলে সহজেই বন্দি করতে পারবে রানিকে। আর এতে যে তাঁর কোনো ভূমিকা রয়েছে এককথাও কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

দূত বলেন, হিন্দু হয়ে হিন্দুর এতবড়ো সর্বনাশ আপনি সত্যিই করবেন?

হাসেন চতুর্ভুজ। বলেন, ব্যক্তিস্বার্থে সবকিছুই করা যায়। এতে কোনো পাপ হয় না।

চতুর্ভুজের কথায় চোখ মটকে নিঃশব্দে একটা ফিচেল হাসি হাসে দূত। তারপর হাত মেলান দুজনে। বলেন, তাহলে বাত পাক্কা। এখুনি ওড়িশায় ফিরে সবকথা জানাবে ওসমান খাঁকে। আপনার কথামতোই করা হবে সব। তবে হুঁশিয়ার, শেষ মুহূর্তে বেইমানি করলে জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হবে। কথাটা মনে রাখবেন।

দ্রুতই ওড়িশায় ফেরে দূত। তার মুখে সব শুনে ওসমান খাঁ বিড়বিড় করে বলে, কমবখত্। দোজাখের কীট। শয়তান লোকটার এতটুকু ধর্মভয় নেই। রাজি হয়ে গেল এক কথায়। না—না, এমন বেইমানকে পুরো বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে আপাতত সেটা বলেছে, সেটা সত্যি, ভেবে দেখার মতো। এভাবে সহজেই কাবু করা যাবে রানি ভবশঙ্করীকে। বেইমান হলেও চতুর্ভুজ যে বুদ্ধিমান সেটা স্বীকার করতেই হবে। নিজের স্বার্থেই তার দেখানো পথেই এগোতে হবে।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আর দেরি করে না ওসমান খাঁ। বিশ্বস্ত বেশ কিছু সৈনিককে বেছে নেয় সে। ছদ্মবেশে তারা থাকবে তাঁর সঙ্গে। আর একজন সেনা আসবে পেছন পেছন। দরকার পড়লে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারাও।

ওসমান খাঁ এইভাবে সব ব্যবস্থা পাকা করে দ্রুতগামী অশ্বে চতুর্ভুজের কাছে পাঠায় এক বার্তাবাহককে। জানিয়ে দেয়, কথা মতো কাজ না করলে অথবা কোনোরকম বেইমানির চেষ্টা করলে কিন্তু মৃত্যুই হবে একমাত্র শাস্তি।

।। সাত ।।

হরিদেব ভট্টাচার্য। অতি প্রাজ্ঞ মানুষ। মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞ এবং আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করলেও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে উদাসীন নন তিনি মোটেই। ভুরশুটের এই রায়-মুখোটি রাজবংশ সম্পর্কে রয়েছে তাঁর একটা বিশেষ টান। তাই রানিকে শিবালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েও রাজধানীতে মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রতিটি কাজের ওপর রাখেন তীক্ষ্ণ নজর।

এব্যাপারে তাঁর একটা সুবিধা আছে। রাজগুরু হিসেবে রাজ্যের সকলেরই প্রণম্য তিনি। নিজের চরিত্রগুণেই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রজারা জানে, স্বার্থশূন্য মানুষটি রাজার প্রকৃত হিতৈষী। তাই সকলেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় তাঁর প্রতিটি নির্দেশ। প্রজাদের এই বিশ্বাসের কারণেই, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন তিনি সব খবর। প্রয়োজনে তাদের কাউকে কাউকে চর হিসেবেও কাজে লাগান। তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি নিয়ে থাকেন উপযুক্ত ব্যবস্থা। সেটা বহুদিন আগে থেকেই। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না তার।

রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকেই সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর বেশ কিছু আচরণ বিসদৃশ্য লাগছে তাঁর। একটা সন্দেহ ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। অথচ হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ করা যায়। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

অপেক্ষা মানে সব কিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া—এই নীতিতে বিশ্বাসী নন তিনি। আর তাই নজর তাঁর খোলা থাকে সবসময়। রাজ্যের সীমান্তে ও অভ্যন্তরের ব্যতিক্রমী বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে থাকায় রাজগুরু অত্যন্ত সতর্কভাবে সব কিছু পর্যালোচনা করে মন্ত্রী ও সেনাপতির অগোচরে নিতে থাকেন বেশ কিছু ব্যবস্থা।

বিভিন্ন দুর্গের অধ্যক্ষদের তিনি অজানা এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতে বলেন। সেই সঙ্গে রানি যেখানে রয়েছেন তার চারিদিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বেশ কিছু বিশ্বস্ত সুশিক্ষিত অস্ত্রধারীকে নিয়োগ করেন তিনি।

এইসব ব্যবস্থা নেওয়ার পর রানি ভবশঙ্করীকেও সাবধান

করে দেন। বলেন অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।

চতুর্ভুজ কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেন না। আসলে ভবিষ্যতের অলীক কল্পনায় তিনি তখন এক স্বপ্নলোকের অধিবাসী। তাই না জানলেন নিজে, না জানাতে পারলেন ওসমান খাঁকে।

রানি যে মন্দিরে রয়েছেন তার আশপাশে যে সশস্ত্র রক্ষীরা লুকিয়ে আছে একথা না-জেনেই ওসমান খাঁ অল্প কিছু সেনা নিয়ে হানা দেয় মন্দিরে। কিন্তু মন্দির চত্বরে প্রবেশের আগেই প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। রানির নারী বাহিনীর হাতে পাঠানরা যখন পর্যুদস্ত হচ্ছে, সে সময় ভবশঙ্করী ব্যস্ত ছিলেন শিব পূজায়। বাইরে গোলমালের আওয়াজ পেয়েই রণরঙ্গিনী বেশে মন্দিরের বাইরে আসেন তিনি।

ওসমান খাঁ আক্রমণ করবে কী, রানির এই রূপ দেখে কামনার আগুনে জ্বলতে থাকে। কীভাবে রানিকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবে এই ভাবনাতেই ডুবে থাকে সে।

ওদিকে নারীবাহিণীর অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে ওসমান খাঁর সঙ্গী পাঠানের দল। প্রাণ বাঁচাতে পিছু হটে অনেকেই। কিন্তু রানির সুরক্ষায় রাজগুরু হরিদেবের নির্দেশ মতো বিভিন্ন দুর্গ থেকে আসা সৈন্যরা সেই পলায়নরত পাঠানদের একবারে কচুকাটা করতে থাকে।

তাই-বা কেন, ওসমান খাঁর পৃষ্ঠরক্ষায় যেসব সৈন্য এসেছিল তারাও বনের মধ্যে নিহত হতে থাকে রানির সেনাদের হাতে। সব মিলিয়ে সেই মন্দির এবং তার আশপাশের বনভূমি হঠাৎ-ই হতাহতের আর্ত চিৎকার আর রানির সেনাদের বিজয় উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সেই চিৎকারেই সচকিত হয় পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ। বুঝতে পারে ওই আর্তচিৎকার তাঁরই পরাজিত ও আহত সেনাদের। বুঝতে পারে গোপনে হানা দিলেও সেই গোপন কথাটি গোপন থাকেনি রানির কাছে। তাই পালটা আক্রমণে ছিন্নভিন্ন তাঁর বাহিনী। আরও বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে না পালালে তাকেও প্রাণ দিতে হবে এখানে। আর সেটা হলে ভুরশুট বা বঙ্গবিজয় আর কখনই সম্ভব হবে না। বঙ্গে আবারও পাঠান অধিপত্যের সূর্যোদয়ও হয়ে যাবে কেবলই কল্পনার বিরিয়ানি।

এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে বীরপুঙ্গব ওসমান খাঁ দ্রুত ঘন বনানীর মধ্যে মিলিয়ে যায়। যাওয়ার আগে অস্ফুটে বলে, আসবো আবার আসবো। রানিকে আমার চাই—চাই-ই—তা যেমন করেই হোক।

অবস্থা একটু শান্ত হতে বিভিন্ন দুর্গের সেনানায়করা অভিবাদন জানান রানি ভবশঙ্করীকে। এতজন সেনানায়ককে দেখে একটু বিস্মিত হন রানি ভবশঙ্করী। জিজ্ঞেস করেন, আপনারা এখানে এলেন কী করে? কে আপনাদের আসার নির্দেশ দিল?

রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। তিনি আগাম এক বিপদের আশঙ্কা করে আমাদের দ্রুত এখানে আসার নির্দেশ দেন। এবং সেনাপতির কোনো অনুমতি ছাড়াই এখানে এসে দেখলাম এই পাঠান বাহিনীকে। ওই বাহিনীকে আমরা পুরোপুরি নিকেশ করেছি।

ভবশঙ্করী সবই বুঝতে পারেন। এই যে রাজধানী থেকে দূরে বাস করছেন, এটা যে প্রজাদের জন্য কতটা বিপদের কারণ হতে পারে, একথা ভেবে তাঁর মধ্যে এক ধরনের ক্রোধ যেন টগবগিয়ে ওঠে। বুঝতে পারেন, রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কারও ওপর চোখ বুজে বিশ্বাস করতে নেই। তাতে যেমন নিজের নয়, রাজ্য ও প্রজারও সর্বনাশ হয়।

পতিশোক নিরসনে তিনি চলে এসেছিলেন এই নির্জন আবাসে। সে শোক তাঁর দূর হলো ভীষণ এক প্রতিজ্ঞায়। যে স্বামীকে তিনি এত ভালোবাসেন, যে না-থাকায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই স্বেচ্ছা-অবসর বা নির্বাসন, তাতে তো সবার আগে ধ্বংস হতে যাচ্ছিল স্বামীরই সব কীর্তি। এতো ভালোবাসার নামে স্বামীকেই অবজ্ঞা করা। এ তো অন্যায়, অপরাধ। না, আর নয়। এবার তিনি রাজধানীতেই ফিরে যাবেন। নিজের হাতে তুলে নেবেন শাসনদণ্ড। নেবেন স্বামীকুলের সম্মান ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য। নেবেন নাবালক পুত্রের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে। তাকে যোগ্যভাবে গড়ে ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে।

।। আট ।।

শিবার্চনা শেষে রানি রানি ভবশঙ্করী রওনা হলেন রাজধানীর পথে। প্রথমেই অবশ্য তিনি গেলেন রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের বাড়ি। গেলেন কেবল গুরুপ্রণাম করতে নয়, গেলেন চরম সংকটের মুহূর্তে যেভাবে তিনি সবকিছু প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তারজন্য তাঁকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

হরিদেব অবশ্য নির্বিকার। তিনি বললেন, রাজার গুরু ও হিতৈষী হিসেবে যা করা উচিত তাই করা হয়েছে। সেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা। বললেন, রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সেনাবাহিনীকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে সব দিক থেকে। রাজা নিশ্চিতভাবেই বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। তবে কেবল বাইরের শত্রু নয়, তাঁকে ঘরের শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে মন্ত্রী, পদস্থ রাজকর্মচারী, নিজের পরিজন এবং সেনা-প্রধানদের সম্পর্কে তাঁকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। ঘরের শত্রুরাই

যে মারাত্মক একথাটা মনে রাখতে হবে সবসময়। সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় তাদের ওপর। কোনোসময়ই তাদের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। সেটা হবে ঘরে সাপ পুষে রাখার মতো ভয়ানক শখ। তাই এবার রাজ্যশাসনে বিশেষভাবে মন দাও। সেইসঙ্গে যে কথাগুলি বললাম সেটা সবসময় মনে রাখবে। মন্ত্রের মতোই জপ করবে তা। যাও এগিয়ে যাও —ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। জয় হোক তোমার সবসময়।

রাজগুরুকে প্রণাম করে রানি ভবশঙ্করী রাজধানী ভবানীপুরের পথে চলেন। যাওয়ার সময় বারবার ভাবতে থাকেন পাঠানদের এই অতর্কিত হামলা আর গুরুদেবের সতর্কবাণীর কথা।

বারবারই রানির মনে হয়, কেন পাঠানরা মন্দিরে তাঁকে আক্রমণ করতে গেল। এটা কি তাদের হঠকারিতা নাকি এ এক গভীর চক্রান্ত? আর সেই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ঘরেরই কেউ। যদি তাই হয়, তাহলে কে বা কারা এই ঘরশত্রু? গুরুদেব তো স্পষ্টই আঙুল তুলেছেন মন্ত্রী আর সেনাপতির দিকে।

রানির ভাবনা, সত্যিই ওই দু'জনই দায়ী। যদি হন তাহলে তিনি কি দু'জনের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবেন? নাকি দু'জনের মধ্যে যিনি কম ক্ষতিকারক বা দুর্বল তাঁকে ছেড়ে রেখে অন্যজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। আর তাতেই তো ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটা হয়ে যাবে। এই বিভেদনীতি নিলে দুর্বল হবে চক্রান্তকারীরা। তখন সহজেই দমন করা যাবে দু'জনকেই।

এইসব ভাবনায় ভবশঙ্করী দোলাচল। সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী অবশ্যই সবচেয়ে মারাত্মক। তাঁর বিরুদ্ধেই আগে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু তিনি যে চক্রান্ত করেছেন তার কোনো প্রমাণ তো তাঁর কাছে নেই। সেনাবাহিনী তো এখনও তাঁরই হাতে রয়েছে। এ অবস্থায় সেনাপতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে সেনা-বিদ্রোহ হবে না তো? এটাই ভাবাচ্ছে ভবশঙ্করীকে।

গড় ভবানীপুরে ফিরে এলেন রানি। এসেই কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। এমনকী এব্যাপারে সেনাপতি চতুর্ভুজকে যে সন্দেহ করছেন সেটাও প্রকাশ করলেন না কোনোভাবে। বরং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে নিতে থাকে বেশ কিছু ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে জোর দেন সেনাবাহিনীকে আরও জোরদার করার দিকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই নিলেন বাহিনীর বহর বাড়ানোর উদ্যোগ। পদাতিক থেকে শুরু করে সব বাহিনী পুনর্গঠন করতে থাকেন। শুরু হয় নতুন নিয়োগ। এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিলেন রানি ভবশঙ্করী নিজে।

কেবল নতুন সেনা নিয়োগ নয়, তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন নিজেই। ফলে বাহিনীর বিশেষ করে নতুন সেনানীদের সঙ্গে গড়ে উঠল রানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর প্রতি আনুগত্যও আরও ঘন হতে থাকল। কেবল নতুন নয়, পুরনো সেনাদেরও নিয়মিত তালিম, তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তার প্রতিকারে সচেষ্ট হয়ে রানি ভবশঙ্করী সর্বার্থেই হয়ে উঠলেন সর্বাধিনায়িকা।

সেনাবাহিনীতে নিজের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার পরই ভবশঙ্করী সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুললেন না। বরং নিঃশব্দেই সেনাপতির ক্ষমতার ডানা ছাঁটতে থাকলেন।

প্রথমেই চতুর্ভুজকে গড় ভবানীপুর দুর্গ থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁর জায়গায় রাজধানীর দুর্গে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করলেন রাজবংশেরই সন্তান বীর রণকুশল ভূপতিকৃষ্ণ রায়কে। পেঁড়ো দুর্গ থেকে তাঁকে নিয়ে এলেন রাজধানীতে।

আরও একটি কাজ করলেন রানি ভবশঙ্করী। অবশ্যই রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতোই। অবশ্য কাজটা শুরু করেছিলেন রাজগুরু বহু আগে থেকেই। সমাজের এক অবহেলিত অংশকে সংগঠিত করেন তিনি। অঞ্চলের চণ্ডাল ও বাগদিরা স্বভাব-শক্তির অধিকারী। প্রত্যেকেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। অত্যন্ত পরিশ্রমী। দেশীয় যুদ্ধরীতিতেও অতি দক্ষ। কিন্তু অন্ত্যজকুলে জন্ম বলে তারা বাস করে জনপদের বাইরে। সামাজিক দিক থেকেও উপেক্ষিত তারা। সেই উপেক্ষিতের মাঝখানে দাঁড়ান হরিদেব। তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসায় মুগ্ধ ওই চণ্ডাল ও বাগদিরা তাঁকে বরণ করেছিলেন বড়ঠাকুর হিসেবে।

সেই বড়ঠাকুর হরিদেবের নির্দেশেই রানি ভবশঙ্করী এই চণ্ডাল ও বাগদিদের দিলেন উপযুক্ত মর্যাদা। নিয়মিত বাহিনীর বাইরে তাদের নিয়ে গঠন করলেন এক অতিরিক্ত বাহিনী। সেইসঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যও নিলেন বেশ কিছু ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে রানি হলেন তাদের মা। এই মায়ের জন্য জীবনের সর্বস্ব ত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো তারা। রানিও মাতৃভাবেই তাদের সবদিক থেকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। আর এইভাবে চণ্ডাল ও বাগদিদের এই অতিরিক্ত বাহিনীও হয়ে উঠল রানি ভবশঙ্করীর শক্তির অন্যতম উৎস। আর এসবই হল সেনাপতি চতুর্ভুজকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

এইভাবে রাজগুরুর পরামর্শ মতো নিজেকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত করেও চতুর্ভুজের বিরুদ্ধে কিন্তু সরাসরি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেন না ভবশঙ্করী। কৌশলগত কারণেই। কিন্তু দেওয়ান তথা মন্ত্রী দুর্লভ দত্তকে রেয়াত করলেন না। চতুর্ভুজের সঙ্গে দুর্লভ সত্তর যোগসাজস আছে কিনা সে সম্পর্কে রানি তখনও নিশ্চিত নন। কিন্তু তিনি যে রানির উদাসীনতা ও অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজের আর্থিক অবস্থা

বদলে ফেলেছেন সে সম্পর্কে হলেন নিঃসন্দেহ। আর তাই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করলেন না।

দুর্লভ দত্তকে ডেকে রানি ভবশঙ্করী বেশ কড়া সুরেই বলেন, সেরেস্তার খাতাপত্র দেখে বুঝতে পারছি তাতে গরমিল রয়েছে প্রচুর। আর সব কিছুর জন্যই দায়ী আপনি। রাজকোষকে বঞ্চিত করে আপনি নিজের কোষাগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এটা শুধু অন্যায় নয়, গুরুতর অপরাধ।

দুর্লভ দত্ত কুচক্রী, লোভীও, কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন। তাছাড়া চতুর্ভুজের মতো সিংহাসনের প্রতিও তাঁর কোনো লোভ নেই। তাই রানি ভবশঙ্করীর ভর্ৎসনার মুখে তিনি ভেঙে ফেললেন। সব কিছু স্বীকার করে নিয়েই দুর্লভ দত্ত বলেন, যার করেছি সেটা সাময়িক লোভের বশে। তারসঙ্গে আর কোনো অভিসন্ধি ছিল না। সব কিছুর জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি তো মা, দয়া করে আমার পদটা কেড়ে নেবেন না।

রানি বলেন, বেশ, আপাতত পদেই থাকুন। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ এদিক ওদিক করেছেন তার সবটা রাজকোষে জমা করুন অবিলম্বে। অন্যথায় শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে।

দুর্লভ দত্ত তাতেই রাজি হয়ে নিজের মান খোয়ানো থেকে রেহাই পেলেন।

।। নয় ।।

অপদস্থ হয়ে চতুর্ভুজ বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতোই ফুঁসতে থাকেন। দুর্লভ দত্তর অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন তিনি। তাঁকেও সহজে রেহাই দেবেন না রানি ভবশঙ্করী। তবে তিনি যা করেছেন তার কোনো প্রমাণ নেই। দুর্লভ দত্তর সঙ্গে তার একটা আঁতাত ছিল সত্যি—কিন্তু সেটা কেবল আর্থিক লেন-দেন নিয়ে। পাঠানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিন্দুবিসর্গও জানেন না দুর্লভ। তাই তাঁর ওদিক থেকে বিপদ আসার ভয় নেই বললেই হয়।

কিন্তু রানি কেবল রণকুশলী নন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। রানির কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁর পাঠান যোগের ব্যাপারটা যে গোপন থাকবে না—তা তিনি নিশ্চিত। এখন কী করবেন, সেটা সেই মুহূর্তে বুঝতে পারেন না তিনি। রাজধানী থেকে দূরে বসে তাই তিনি কেবল ছটফট করতে থাকেন। হারানো পদ কেবল নয়, পুরো রাজ্যটাকেই কীভাবে পাওয়া যায়, তার ছক কষতে কষতেই কাটে তাঁর দিন।

একবার ভাবেন, যা পেয়েছেন তা অবশ্যই আশার অতিরিক্ত। এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর কোনো ষড়যন্ত্র না করাই ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এই রাজ্যের জন্য কম রক্ত তো ঝরাননি তিনি। এতদিন ধরে সাজিয়েছেন দাবার ঘুঁটি। এ অবস্থায় সব ছেড়ে দেবেন? পর মুহূর্তেই প্রশ্ন, ছেড়ে না দিয়ে করবেন কী? পাঠান-অধিপতি ওসমান খাঁ আপাতত ওড়িশাতে শক্তিসংগ্রহ করছেন। তাঁর সঙ্গে কি এবার তিনিই যোগাযোগ করবেন। কিন্তু যদি সব কিছু ঠিকমতো না হয়। যদি ধরা পড়ে যান—তাহলে?

এই তাহলেটাই এখন তাঁর ভাবনার পথে সবচেয়ে বড়ো কাঁটা। সেই কাঁটাই অনবরত রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে তাঁর হৃদয়ে। আর তাতেই নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হয় চতুর্ভুজের।

ওদিকে ওড়িশায় ওসমান খাঁরও তখন একই অবস্থা। বঙ্গ বিজয় তাকে করতেই হবে। মুঘলদের কাছ থেকে আবার ছিনিয়ে নিতে হবে বঙ্গের অধিকার। আর তার জন্যই ভুরশুট রাজ্যকে নিতে হবে সঙ্গে। তাঁর প্রস্তাবে যদি ভুরশুট রাজি হতো তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু অদূর অতীতে রুদ্রনারায়ণ কিছুতেই রাজি হননি তাদের কথায়। রানি ভবশঙ্করীও যে তাঁর কথা শুনবেন না, তা নিশ্চিত। তাই যুদ্ধ করেই জয় করতে হবে ভুরশুট। কিন্তু এক্ষেত্রে যে রক্তক্ষয় হবে তাতে বঙ্গদেশ নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে লড়াইটা হয়ে যাবে আরও কঠিন। তাই কৌশলের পথ নেওয়ার কথাই ভাবে সে।

অবশ্য কেবল এটাই নয়, ওসমান প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হচ্ছে কামনার আগুনে। রানি ভবশঙ্করীর রূপ দেখার পর থেকেই তাঁকে অঙ্কশায়িনীর করার উদগ্র কামশরে বিদ্ধ হচ্ছে সে অহরহ। বঙ্গজয়ের চেয়েও রানি ভবশঙ্করীকে নিজের হারেমে আনার বাসনাটাই বড়ো তীব্র এখন ওসমান খাঁর কাছে। তাই সে কেবল ভাবছে।

ভাবছে, ভুরশুটের সেনাপতি চতুর্ভুজ সেবার ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনো ভুরশুটের সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশই রয়েছে তাঁর অধীনে। তাঁকে দলে টানতে পারলে ভবশঙ্করীকে লাভ করাটা অনেকটাই সহজ হবে। আর সেই চেষ্টায় এবার চতুর্ভুজের কাছে পাঠায় নতুন এক চর—সঙ্গে পাঠায় নানা মণিরত্ন, স্বর্ণলংকার ভরা নজরানার ডালি।

চতুর্ভুজ স্বভাবলোভী। তাই ওই রত্নরাজি যে তাঁকে প্রলোভিত করবে একথা জানতো ওসমান খাঁ। তাই প্রথমেই নিজের স্বার্থের কথা না বলে চতুর্ভুজকে প্রলোভনের নাগপাশে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিল সে দূতকে। অত্যন্ত ধূর্ত দূতও সেই কাজটিই করল। প্রথমেই ওসমান খাঁর প্রীতির নিদর্শন হিসেবে একপেটি মণিমুক্তা ও নানা রত্নসহ বিপুল পরিমাণ সোনার ভরা ডালাটি এগিয়ে দিল। চতুর্ভুজও প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডালাটি নিজের দিকে টেনে নেন। তাঁর এই ব্যগ্রতাই বলে দেয় ওসমান খাঁর টোপ গিলেছে চতুর্ভুজ।

এরপর বঁড়শি গাঁথা মাছকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলার মতোই বাক্যজালে চতুর্ভুজকে জড়িয়ে ফেলতে উদ্যোগী হলো ওই ব্রাহ্মণ। ধীরে ধীরে আসে আসল কথায়।

বলে, এ তো সামান্য, ওসমান খাঁ আরও ধনরত্ন দিতে চেয়েছেন আপনাকে। কথা দিয়েছেন রানি ভবশঙ্করীকে তাঁর হাতে তুলে দিলে তিনি দেবেন আরও-আরও বহু ধনরত্ন। তাই-বা কেন, ও আপনাকেই তো বসাবেন তিনি ভুরশুটের সিংহাসনে। এখন আপনি বলুন, এব্যাপারে ওসমান খাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে চান কিনা? রাজি না হলে বলুন। আমিও বিদায় নিই তাহলে।

ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠেন চতুর্ভুজ, না-না তা যাবেন কেন। আমি তো না বলিনি। তবে ওসমান খাঁকে যত বড়ো বীর বলে জানতাম, কাট শাঁকড়ার ওই যুদ্ধে তাঁর ওই পালিয়ে যাওয়া দেখে আমার সব বিশ্বাসই চলে গেছে।

দূত বলে, ওসমান খাঁ ওই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য নিজেও লজ্জিত। কিন্তু এবার আর সেটা হবে না। এবার তিনি সব দিকে আটঘাট বেঁধেই আসবেন। এখন দেখুন আপনি কী করবেন?

কিছুটা নিরাসক্ত ভাবেই কথাগুলি বলে দূত। ওসমান খাঁ এবার চতুর্ভুজকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না এমনই একটা ভাব দূতের কথায়।

দূতের ভাব দেখে চতুর্ভুজ চঞ্চল। তবে কি তাঁর সাহায্য ছাড়াই আক্রমণ করবে ওসমান? সেটা হলে তো ফাঁকে পড়বেন তিনিই। তাহলে—

চতুর্ভুজের এই দোনামনার অর্থটা বুঝতে দেরি হল না দূতের। তবে হঠাৎ মনে পড়েছে এমন একটা ভান করে দূত বলে, ও হ্যাঁ, ওসমান খাঁ আপনার জন্য এটাও উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন।

উপহারের নামে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন চতুর্ভুজ। কিন্তু পেটিটা খুলেই আঁতকে বলেন, এ তো ছুরি।

—হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, ভুরশুট তিনি আক্রমণ করবেনই। রানিকে তাঁর চাই-ই। দরবারে আপনার সাহায্য ছাড়াই।

চতুর্ভুজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, আমি সাহায্য করব না, তাতো বলিনি। তবে রানিকে ধরা বড় সহজ নয়। তাঁকে ধরতে হলে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

—তার জন্যই তো আপনার কাছে আসা।

—রানি এখন প্রাসাদ ছেড়ে প্রায়ই চলে যান তারকেশ্বরের কাছে ছাওনাপুর দুর্গে। পাশেই বাশুড়ি গ্রামে রয়েছে ভবানীমন্দির। সেখানেই করেন সাধনা—একাই। সেটাই তাঁকে হরণ করার সবচেয়ে ভালো সময়।

—তা তো বোঝা গেল, কিন্তু আপনার সাহায্যটা পাওয়া যাবে তো।

চতুর্ভুজ বলেন, অবশ্যই পাওয়া যাবে, তবে গোপনে। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সামনে আসা সম্ভব নয়। তাই কৌশলে কাজটা সারতে হবে।

কৌতূহলী দূতের প্রশ্ন, কৌশলটা কী?

চতুর্ভুজ বলেন, পাঠান বাহিনী ভুরশুটে এলে আমি তাদের ধরার জন্য ধাওয়া করবো। পাঠানরাও ভয় পাওয়ার ভান করে উত্তর দিকে যাবে। ওরা ছাওনাপুরের কাছাকাছি পৌঁছালে

রাজধানীকে রক্ষার অজুহাতে আমি সেনাদের নিয়ে ফিরে যাব। তারপরের কাজটা করতে হবে ওসমান খাঁকেই।

দূত বলে, সবই তো বোঝা গেল। কিন্তু কবে কবে করতে হবে ওই অভিযান।

সেটা পরে ওসমান খাঁকে জানিয়ে দেবেন চতুর্ভুজ। এমনই ঠিক হয়।

॥ দশ ॥

দূতের মুখে সব শুনে ভাবে ওসমান, পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। ওই ভাবেই কবজা করবে রানিকে। সিদ্ধান্তে স্থির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের জন্য পাঁচশোরও বেশি সৈনিককে তৈরি থাকতে বলে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে চতুর্ভুজের বার্তার জন্য।

কয়েক দিনের মধ্যেই আসে বার্তা। চতুর্ভুজ জানিয়েছেন এই বৈশাখী অমাবস্যায় বাশুলি গ্রামের ভবানীমন্দিরে এক বিশেষ পূজো করবেন রানি ভবশঙ্করী। তাই আগের রাতে পৌঁছতে হবে মন্দিরে। তিনি এদিকে সেনাদের রাখবেন মন্দির থেকে অনেক দূরে। এতে কাজটা সহজে সারা যাবে বলে বিশ্বাস।

পরিকল্পনা মতোই ওসমান খাঁ ভুরশুটে পৌঁছে যায় তার বাছাই বাহিনী নিয়ে। তারপরে রাতের অন্ধকারে চলে আসে খানাকুলের কাছে এক গভীর বনে। দিন শুরু আগেই বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় শিবির ফেলে পাঠানরা। দিনটা ওখানেই কাটাবে তারা।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছে সকলে। ওসমান খাঁ পুরো ব্যাপারটা আবারও ভালো করে ছকে নেওয়ার জন্য ফৌজদারদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। বলে এই অভিযানটা সফল করতেই হবে। চতুর্ভুজের মতো বিশ্বাসঘতক আমাদের সঙ্গে থাকায় কাজটা অনেক সহজ হবে বলেই বিশ্বাস। আশা করছি, কাক পক্ষিতেও জানে না এই ষড়যন্ত্রের কথা।

ওসমানের আশা কিন্তু সফল হলো না। ঠিক ওই সময় কালু নামে এক ব্যাধ শিকারের জন্যই হাজির হয় ওই বনে। একসঙ্গে অত ঘোড়া ও সশস্ত্র লোক দেখে ভয় পায় কালু। সন্দেহও হয়। তাই সোজা চলে যায় খানাকুলের কোতোয়ালের কাছে। খুলে বসে সব। শুনে কোতোয়ালও বুঝতে পারেন ভয়ংকর একটা কিছু ঘটতে চলেছে। সেই আশঙ্কা থেকেই কোতোয়াল সবকিছু লিখে এক অশ্বারোহীকে পাঠান রাজধানী গড় ভবানীপুরে। চিঠিটা রানির নামে লেখা। তিনি না থাকলে সেটা সর্বাধিনায়ক বা দুর্গের উপস্থিত উচ্চপদস্থ কাউকে দিতে নির্দেশ দেয় কোতোয়াল।

দুর্গে সেসময় রানি ভবশঙ্করীর থাকার কথা নয়। ছিলেনও না। সর্বাধিনায়কও বিশেষ কাজে অন্যত্র ছিলেন। তাই চিঠিটা নিলেন চতুর্ভুজ চক্রবর্তীই।

চিঠি পেয়ে চতুর্ভুজ ভাবেন, সর্বনাশ। চিঠির কথা মতো ব্যবস্থা নিলে তো বিপদে পড়বে ওসমান খাঁ। আর ওসমানের বিপদ মানে তো তাঁরও বিপদ। তাই কোতোয়ালকে লেখেন, চিন্তা করার কিছু নেই। হয়তো দস্যু বা ডাকাতরা জড়ো হয়েছে বনে। কালু ভয় পেয়ে এসব উলটাপালটা বলছে। যাই হোক, আমি দেখছি পুরো ব্যাপারটা।

চিঠিতে কোতোয়াল কিছু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা বলছে, এটা উপেক্ষা করার মতো কোনো ঘটনা নয়। আর তাই পেড়ো দুর্গে সর্বাধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণকে পুরো ব্যাপারটা জানান।

ওদিকে অবস্থা সামাল দিতে চতুর্ভুজও তৎপর হন। তাঁর সেনাদের নিয়ে সোজা চলে আসেন খানাকুলে। সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভয় নেই, আমি এসে গেছি। সকাল হোক, ওই জঙ্গলে তন্নতন্ন তল্লাশি চালাবো। ধরতে পারলে সব ক'টাকে কঠিন শাস্তি দেবো।

চতুর্ভুজের কথায় সকলে আশ্বস্ত হয়। কোতোয়ালের সন্দেহটা যায় না। বরং চতুর্ভুজের কথাবার্তা সবই কেমন অভিনয় বলে মনে হয়। তাই রাতেই তল্লাশি করার অনুরোধ জানান। চতুর্ভুজ সেকথায় কান দেন না। আর নিজে গোপনে খবর পাঠান ওসমান খাঁর কাছে। বলেন দেরি নয়, আজ এখনই বাশুড়ি গ্রামের মন্দিরে হামলা করুন।

।। এগারো ।।

কেবল খবর পাঠানো নয়, ওসমানের পাঠান বাহিনীকে ওই রাতে বাশুড়ির পথ দেখানোর জন্য লোকও পাঠান চতুর্ভুজ। তাঁর আশ্বাস, ওসমান খাঁ বাশুড়ি অবরোধে এগিয়ে যাওয়ার ঘণ্টা তিন চারের মধ্যেই তিনিও তাঁর বাহিনী নিয়ে যোগ দেবেন তাঁর সঙ্গে।

এহেন বার্তায় চতুর্ভুজের ওপর ওসমান খাঁর বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের জন্য তৈরি হয়। চতুর্ভুজের পাঠানো পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করে রওনা হয় সে বাশুড়ির পথে।

গ্রীষ্ম কাল। দামোদর সে সময় থাকে প্রায় জলশূন্য। পুরশুড়ায় সেই মরা দামোদর পার হয়ে পাঠান বাহিনী এগিয়ে চলে।

খানাকুলের কোতোয়ালের তৎপরতা এবং তারপর সর্বাধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণ রায়ের দূরদর্শিতার কারণে বাশুড়ির ভবানী মন্দির অঞ্চল আর তখন সেনাশূন্য অবস্থায় রইল না। বরং ভুরশুটের নির্ভীক দেশপ্রেমী সেনা প্রচ্ছন্নভাবে বাশুড়িকে প্রায় ঘিরে রইল। বস্তুত পাঠান বাহিনীর প্রতিরোধে রানি

ভবশঙ্করীর বাহিনী তখনও ক্ষুধার্ত বাঘ।

রানির বাহিনী যে এভাবে চারিদিকে সতর্ক ভাবে শত্রুর প্রতীক্ষা করবে এটা ছিল চতুর্ভুজের কল্পনার বাইরে। অথচ এটা তাঁর জানা উচিত ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণেই প্রকৃত অবস্থাটা বোধহয় বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি। চতুর্ভুজের হাত থেকে সেনাবাহিনীর ভার নেওয়ার পরই রানি সব সৈন্যকে রাজধানীতে না রেখে রাজ্যের নানা জায়গার দুর্গে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন থেকে ভুরশুটের বাহিনী আর রাজধানী-কেন্দ্রিক ছিল না। বিপদের সংকেত পেয়ে মুহূর্তে হড়পা বানের মতোই সেখানে আছড়ে পড়ার জন্য তৈরি থাকত সেনারা। রাজ্যের কোনো জায়গাই তার ফলে আর সেভাবে অরক্ষিত ছিল না। এই পরিকল্পনারই সুযোগ পাওয়া গেল বাশুড়িতে।

অমানিশায় পূর্ব ব্যবস্থা মতোই বাশুড়ির ভবানী মন্দিরে শুরু হয়েছিল দেবীর বিশেষ পূজা। সেকালের বিশিষ্ট তান্ত্রিক গোলোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই পূজাবাসরে তন্ত্রমতে রানিকে অভিষিক্ত করার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বেশ ভালোভাবেই।

সে কাজ শেষ হওয়ার প্রায় পরে পরেই রানির হাতে এল সর্বাধিনায়কের বার্তা। পাঠান বাহিনী এগিয়ে আসছে বাশুড়ি আক্রমণে। শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর বাহিনীও। বিষয়টা উদ্বেগজনক। তবে রানির বাহিনীও প্রস্তুত। যে কোনো আক্রমণ শুধু প্রতিহত করা না, শত্রুদের নির্মূল করার জন্যও কৃতসংকল্প এখন রাজ্যের বাহিনী। সব ব্যবস্থা নিয়েও সর্বাধিনায়ক কিছু সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছেন রানিকেও।

দেবীপূজার দিন এমন উৎপাতে রানি ভবশঙ্করী একটু বিচলিত। কিন্তু রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য রানিকে শত্রুনিধনে উজ্জীবিত করে বলেন, চিন্তার কিছু নেই। দেবী ভবানীর কৃপায় ধ্বংস হবে শত্রু।

রানিকে তৈরি থাকতে বলে রাজগুরু চণ্ডাল ও বাগদি বাহিনীর অনিয়মিত সেনাদেরও শত্রুকে বাধা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

।। বার ।।

একই অঙ্গে বহুরূপ দেবী ভবানীর। কখনও আনন্দে নৃত্যপরা সন্তান পালনে। কখনও ভয়ংকরী পাষণ্ডদলনে। বৈশাখের সেই অমানিশায় দেখা গেল দেবীলীলার সেই বিচিত্র রূপ।

সেদিনের বৈশাখী অমাবস্যা রাত্রি তথা ভুরশুটের সৌভাগ্য গগনে বিম্বিত হলো রাকা পূর্ণিমার স্নিগ্ধ রূপে। একই সঙ্গে ওই দিনটিই চতুর্ভুজ ও পাঠানবাহিনীর কাছে দেখা দিল কাল রাত্রি রূপে। ভীষণা রক্তবদনা দেবী তখন রক্তদন্তিকা—শত্রুর শোনিত পানে আরক্ত নয়না।

পাঠানদের প্রতিহত করার জন্য একশো গজারোহী, পাঁচশো করে অশ্বারোহী এবং পদাতিক তখন উন্মুক্ত উদ্যত অস্ত্রহস্ত। সে বাহিনীর নেতৃত্বে স্বয়ং রানিও গজাসনা—শূলধারিণী।

পাঠানরা এগিয়ে আসতেই রানির নির্দেশে নিভে গেল সব মশালের আলো। তিনদিক পরিখা ঘেরা এক প্রান্তরে অবরুদ্ধ হলো পাঠান সেনা।

প্রথমটায় তাদের গ্রাস করেছিল এক ধরনের ভ্রান্তি। রানির বাহিনীকে তারা ভেবেছিল চতুর্ভুজের সেনা। তাই উল্লসিত পাঠান-কণ্ঠে উঠেছিল জয়ধ্বনি।

কিন্তু সে উল্লাস ক্ষণিকের। রানির ইঙ্গিতে মশালগুলি জ্বলতেই পাঠানরা দেখে তারা দাঁড়িয়ে আছে খাদের কিনারায়—মহিষধ্বজ মৃত্যুর দেবতা যমের সামনে। অথবা তারা যেন তখন ভবানী মন্দিরে উৎসর্গীকৃত বলির পশু। রানির সেনার উদ্যত কৃপাণের সামনে বড়ো অসহায় তখন তারা।

রানি ভবশঙ্করীর নেতৃত্বে ভুরশুটের বাহিনী অবরুদ্ধ পাঠানদের তিন দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে থাকে। রানির বাহিনীর সেই প্রতিরোধ অথবা পালটা আক্রমণের মুখে পাঠানরা তখন ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মতোই ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

পাঠান অধিপতি ওসমান খাঁ মরিয়া চেষ্টা চালিয়েও পালটা প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হলো। রানি ভবশঙ্করী তখন দেবী ভয়ংকরী। তাঁর বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পাঠানরা নিতান্ত অসহায় ভাবে নিহত হতে থাকে। তারা তখন সত্যিই যেন দেবী ভবানীর সামনে প্রদত্ত বলির পশু।

ক্ষুরধার বুদ্ধি, কৌশলগত সুবিধা এবং উচ্চতর রণদক্ষতায় রানির বাহিনী সেদিন পাঠানদের নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত করে। সেই যুদ্ধে ওসমান খাঁ নিজেও গুরুতর আহত হয়। যুদ্ধের রূপ ও পরিণতি বুঝে ওসমান খাঁ তখন পালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলো। তাই তার বাহিনীর অবশিষ্টদের কথা না ভেবে ঘোড়ায় চেপে রাতের অন্ধকারে একাই বনপথ ধরে সে।

সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে এক নিরাপদ জায়গায় পোশাক বদলায় সে। সর্দার বা সেনানীর বেশ ছেড়ে সাজে ফকির। ভিক্ষাই তখন তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। ওই অবস্থায় বহু কষ্টে সে ফেরে ওড়িশায়। কেউ কেউ বলেন, ওই যুদ্ধে নিহত হয় ওসমান খাঁও।

বস্তুত বাশুড়ির মাঠের ওই যুদ্ধের ফলে পাঠানদের আবার বঙ্গবিজয়ের স্বপ্ন আলেয়ার মতোই মিলিয়ে যায়। বাশুড়ির মাঠের এই যুদ্ধে রানি ভবশঙ্করী যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন এক কথায় তার কোনো পূর্বনজির নেই। পাঠান সেনাদের বিরুদ্ধে রানি যেরকম নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়ান এবং যে রণনৈতিক দক্ষতায় যুদ্ধ পরিচালনা করে ওসমান খাঁর বাহিনীকে

পরাজিত করেন তাতে প্রজাদের কাছে তিনি দেবীরূপে উন্নীত হন। তাই-বা কেন, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের প্রায় দুই শতক আগে বঙ্গের রানি যে বীরত্বের পরিচয় দেন তা তাঁকে বিশ্বের যে কোনো দেশের বীরাঙ্গনার তালিকায় প্রথম সারিতে এক গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করে।

এই যুদ্ধের সময়ই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীকে কৌশলে আটক করেন সর্বাধিনায়ক। রানি ভবশঙ্করী রাজধানীতে ফিরে কার্যত এক গণআদালতে চতুর্ভুজের সমস্ত কুকীর্তির কথা প্রকাশ করে জনতাকেই চতুর্ভুজের শাস্তিবিধান করতে বলেন। সমবেত জনতা চতুর্ভুজের প্রাণদণ্ড চাইলেও রানি তাকে আজীবন কারারুদ্ধ রাখার এবং নিয়মিত বেত্রাঘাতের মতো শাস্তির কথা ঘোষণা করেন। চতুর্ভুজের এই শাস্তির মধ্য দিয়ে ভুরশুটে এক বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। বঙ্গে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের।

।। তের ।।

বঙ্গজীবনে সত্যিই শুরু হলো এক নতুন যুগের। গড়ভবানীপুরে দুর্গের সামনের বিরাট ময়দানটি সেদিন সব অর্থেই পরিণত এক লোকার্ণবে। তরঙ্গ মুখরিত মহাসাগরের মতোই সেই লোকসাগর থেকে শোনা যাচ্ছিল এক বিরামহীন গর্জন। জয় ধর্মের জয় / জয় সত্যের জয় / জয় দেশমাতার জয় / জয় রাজলক্ষ্মী ভবশঙ্করীর জয়।

বঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে সে জয়ধ্বনি এক সময় পৌঁছলো দিল্লিতেও। রানির ওই পাঠান বিজয়ের কথা শুনলেন মুঘল বাদশা আকবর। আকবর বিস্মিত হলেন সব শুনে। এক সময় মনে হচ্ছিল তাঁর, এও কী সম্ভব! তার মুঘল বাহিনী এখনও বঙ্গদেশ থেকে নির্মূল করতে পারেনি যে পাঠান শক্তিকে তাকে কিনা এক বাঙ্গালি—তাও এক নারী! এ কি বিশ্বাযোগ্য?

এই জিজ্ঞাসার মুখেই বাদশা আকবর বঙ্গদেশে মুঘল প্রতিনিধিকে দ্রুত প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁকে জানাতে নির্দেশ দিলেন।

অচিরেই এল বার্তা। সব সত্যি। সত্যিই বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করী—ভুরশুট রাজ্যের মহারানি অপূর্ব রণকুশলতায় পরাজিত করেছেন পাঠান বাহিনীকে। বলতে কী, বঙ্গদেশে পাঠান শক্তি এখন এতটাই দুর্বল যে সে দেশ পাঠানশূন্য বললেও অতুক্তি হবে না।

সব শুনলেন বাদশা আকবর। ভুরশুট রাজ রুদ্রনারায়ণ মুঘলদের মিত্রই ছিলেন। প্রকৃত সুহৃদের মতোই বঙ্গদেশে পাঠানদের বিরুদ্ধে মুঘল রাজশক্তির অভিযানকে সাহায্য করেছেন তিনি সবরকম ভাবে। তাঁর বীরত্ব, রণকুশলতা ও আনুগত্যের পরিচয় তিনি পেয়েছেন বহুবার—বহুভাবে। কিন্তু তাঁর অর্ধাঙ্গিনীও যে একইরকম শক্তির অধিকারিণী তা জানা ছিল না তাঁর। এই অজ্ঞতার জন্য বাদশা নিজেকেই দায়ী করেন। সেইসঙ্গে ওই বীর রমণীকে যোগ্য সম্মান জানিয়ে, ভুরশুটের স্বাধীনতা অব্যাহত রেখে তদের আনুগত্য যাতে একইভাবে রয়ে যায় তা সুনিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথার প্রায় বাইরে গিয়েই তিনি অম্বর অধিপতি মানসিংহকে পাঠালেন বঙ্গদেশে বাদশাহের সনদ এবং বাদশাহী নজরানা দিয়ে।

মানসিংহ আসছেন, এই সংবাদে প্রথমটায় রানি ভবশঙ্করী অথবা মহাপাত্র সর্বাধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণ এবং রাজসভার অন্যান্যরা আহ্লাদিত হতে পারেননি। বরং দেখা দিয়েছিল এক ধরনের শঙ্কা। রাজ্য দখলে মুঘল বাদশার এ কোনো নতুন কৌশল নয় তো!

এই ভাবনা থেকেই প্রথমটায় বাদশাহের প্রতিনিধি রাজা মানসিংহকে স্বাগত জানাতে নয়, রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সেনাদলকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেন রানি। কিন্তু তাঁকে আশ্বস্ত করেন রাজগুরু। বলেন, 'সেরকম বিপদের আশঙ্কা করছি না আমি। বাদশাহ সত্যিই খুশি হয়েছেন রানির রণকুশলতায়। তাই দুশ্চিন্তা নয়। রাজা মানসিংহর যোগ্য সংবর্ধনার আয়োজন করো। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য নাও উপযুক্ত ব্যবস্থা।'

রাজগুরুর অভয়বাক্যেই সেজে উঠল রাজধানী। রাজা মানসিংহর আসার পথে তৈরি হলো নানা সুদৃশ্য তোরণ। আমন্ত্রিত হলেন বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজা, নায়ক ও বিশিষ্টজন। রাজধানী হয়ে উঠল যেন দেবরাজের নন্দনকানন।

গড়ভবানীপুর দুর্গ সংলগ্ন বিস্তৃত চত্বরে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপের নীচে সুসজ্জিত সভা মণ্ডপে বিষ্ণুপুর রাজ, বলাগড়রাজ, বর্ধমান রাজ, বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজ ইত্যাদি বিশিষ্টদের জন্য রাখা হলো বিশেষ ব্যবস্থা। সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট জন এবং আপামর প্রজাসাধারণের জন্যও রাখা হলো উপযুক্ত আসন।

একদিকে সুপরিকল্পিত নির্মিত সুদৃশ্য মঞ্চে রাজা মানসিংহের জন্য রাখা এক সিংহাসন। সিংহাসনের একদিকে রাখা হলো রাজগুরুর জন্য বিশেষ আসন। অন্যদিকে রানি এবং রাজপুত্র প্রতাপনারায়ণের বসার জন্যও রাখা হলো উপযুক্ত সিংহাসন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজা মানসিংহ ভুরশুট রাজ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল নানা মঙ্গলবাদ্য। পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে শ্বেত অশ্বে সমাসীন মানসিংহ প্রবেশ করলেন মণ্ডপে। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে বেদমন্ত্র। সব মিলিয়ে সে এক অপার্থিব পরিবেশ। যেভাবে রাজা মানসিংহকে স্বাগত সংবর্ধনা জানানো হয় তাতে অভিভূত তিনি।

প্রাথমিক পর্বের পর উঠে দাঁড়ালেন রাজা মানসিংহ। বললেন, আজ তিনি এখানে এসেছেন বাদশাহের প্রতিনিধি হিসেবে। রাজ্যবাসী তাঁকে যেভাবে সম্মান জানালো সেটা

প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ আকবরের প্রতিই নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। এর মধ্য দিয়ে ভুরশুট ও দিল্লির মধ্যে সম্পর্কটা আরও সুদৃঢ় হলো।

এইরকম ভাষণ প্রতিভাষণের মধ্য দিয়েই রাজা মানসিংহ বলেন, রানি ভবশঙ্করীর বীরত্ব, বিচক্ষণতা ও প্রাজ্ঞতায় মুগ্ধ বাদশাহ তাঁর জন্য মণিমুক্তামণ্ডিত এই উপহার পাঠিয়েছেন। বাদশাহি সনদে তিনি রানি ভবশঙ্করীকে 'মহারানি রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

রাজা মানসিংহের হাত থেকে বাদশাহি ওই সনদটি নিয়ে রানি বলেন, 'শাহেনশাহকে আমার শত সহস্রকোটি প্রণাম। তাঁর দেওয়া এই সম্মানই আজ থেকে হবে আমার পরিচয়। মহারানি ভবশঙ্করী আজ থেকে তাঁর নামের সঙ্গে নবগৌরবের 'রায়বাঘিনী' উপাধিই বহন করবেন।'

রাজগুরু হরিদেবও উৎফুল্ল বদনে বলে উঠেন—'এই রায়বাঘিনী নামেই তুমি হবে চির প্রসিদ্ধা'। তোমার এই সম্মান প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বলছি—জয়তু মহারানি ভবশঙ্করী রায়বাঘিনী।'

রাজগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই জনসমুদ্রে উঠল গর্জন—'জয় মহারানি ভবশঙ্করী রায়বাঘিনীর জয়।'

বঙ্গের নারীর এ এক বিরল সম্মান। তাঁর আগে আর কেউ পাননি এমন সম্মান। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি হয়ে উঠলেন বঙ্গের নারীশক্তির প্রতীক—দুর্জয় শক্তির মূর্তপ্রতিমা। বাঘের রাজা সুন্দরবনের বাঘের মতোই তিনিও হলেন—সাহস-শক্তি-বীর্যের এক সম্মিলিত প্রতিমূর্তি। বঙ্গ জননীর ললাটের তিলকরেখা।

॥ চোদ্দ ॥

রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী এবার সমস্ত দিক থেকে ভুরশুট রাজ্য সংগঠনে মন দিলেন। বীর্যময়ী রানি দেখা দিলেন কল্যাণময়ী রূপে। প্রজাকল্যাণে তিনি রূপায়ণ করতে থাকেন একের পর এক ব্যবস্থা। জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদির ফলে বাড়তে থাকে রাজ্যের উৎপাদন শক্তি। একইসঙ্গে প্রজারাও হয়ে ওঠেন সমৃদ্ধ। ফলে ঘটে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

রাজ্যের জন্য নানা উন্নয়নমূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রকল্প নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষার প্রসারেও দিলেন সমান নজর। দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে নতুন নতুন টোল-চতুষ্পাঠী। রাজ্যের পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনরা হতে থাকেন সংবর্ধিত। সব মিলিয়ে ভুরশুট সব অর্থেই হয়ে ওঠে বঙ্গের এক আদর্শ রাজ্য।

রাজ্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়ে তুলতে থাকেন তাঁর

একমাত্র অবলম্বন রাজ্যর ভাবী অধীশ্বর প্রতাপনারায়ণকেও। সব দিক থেকেই সুশিক্ষিত করে তিনি দেন পুত্রের বিবাহ। তারপর উপযুক্ত সময়ে তাকে করেন রাজ সিংহাসনের অভিষিক্ত।

রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী এখন পূর্ণকাম। ঘরে এসেছে নতুন বংশধর—প্রতাপপুত্র নরনারায়ণ। আর কোনো পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর। সকলকে সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষিত করে এবার তিনি অবসর নেন সংসার থেকে। হন কাশীবাসিনী। সেখানেই তাঁর নশ্বর জীবনের হয় অবসান। কিন্তু বঙ্গজীবনে হন অবিনশ্বর এক সত্তার অনির্বাণ হোমশিখা।

তথ্যঋণ ঃ

১। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ঃ রায়বাঘিণী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিণী
২। গৌরচন্দ্র ভড় ঃ রাণী ভবশঙ্করী
৩। বিনয় ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | AN ISO 9002 COMPANY JINDAL ALUMINIUM LIMITED | NALCO Aluminium Sheet Coil | DALOM Aluminiuam Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

রেনেসাঁসের বঙ্গে হিন্দুত্বের চেতনা

অর্ণব নাগ

বঙ্গে রেনেসাঁসের কাল হিসাবে মোটামুটি সমগ্র উনিশ শতকই অর্থাৎ ১৮০০ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত চিহ্নিত হয়ে আছে। এই রেনেসাঁসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বাঙ্গালির হিন্দুত্ব বোধের দর্শন। চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ, এমনকী অবাঙ্গালি হলেও সখারাম গণেশ দেউস্কর, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী– উনিশ শতকের মনীষীরা বাঙ্গালির মধ্যে হিন্দুত্বের চেতনা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কালক্রমে ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায়।

ভারতকে 'মা' হিসাবে চিত্রায়ন ও দেখার সূত্রপাত ১৮৬০-এর দশকে। 'ভারতমাতা' শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত, একটি ব্যঙ্গাত্মক বাংলা গ্রন্থ 'উনবিংশ পুরাণ'-এ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ছদ্মনামে এটি প্রকাশিত হলেও তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট চিন্তক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই যে এর লেখক তা বিভিন্ন সূত্র মারফত বোঝা যায়।

এই সময় বঙ্গের সাহিত্য-আসরে বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর মনে হিন্দুত্ব তথা জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। চার্লস হেইমস্যাথ তাঁর 'দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম অ্যান্ড হিন্দু সোশ্যাল রিফর্ম' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতির মধ্যেই চরমপন্থী রাজনীতির উৎস লুকিয়ে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, বিদেশ থেকে আমদানি করা কোনো তত্ত্ব নয়, এ দেশের আবহাওয়া, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যই তার মূলগত ভিত্তি হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা কীভাবে হিন্দুত্ববোধী চেতনার রঙে

জারিত হয়ে জাতীয়তাবোধের আদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন হিন্দুমাত্রেরই আদর্শপুরুষ। বঙ্কিমের কৃষ্ণ হলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ। যিনি বলেন :

''যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।।"

এই শ্রীকৃষ্ণ নির্লিপ্ত ঈশ্বর নন। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে সদা জাগ্রত। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব দানের প্রতিভা এবং সামরিক জ্ঞান ও রাষ্ট্র-সংগঠনী কুশলতার ওপর। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের, আর এই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়ে এক সুবিশাল, সংহত ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর তা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ ঘটায়। তিলক রচনা করলেন গীতার মরাঠি ভাষ্য। অরবিন্দ লিখলেন গীতার দীর্ঘ ভূমিকা। লাজপত রায় উর্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী প্রণয়ন করলেন। ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা লিখলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে 'ভারত-আত্মা' হিসাবে অভিহিত করলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখলেন— 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব'। এমনই ছিল বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' (অনুশীলন) গ্রন্থের আদর্শে এবং এর নাম অনুসারে বঙ্গের সবথেকে খ্যাতনামা বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমান্বিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বন্দেমাতরম্ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশে বিরাট অবদান রেখেছিল। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ভবানন্দ সর্বপ্রথম মহেন্দ্রকে 'বন্দে মাতরম্' গেয়ে শোনান। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আনন্দমঠ লেখা হয়েছিল। দেশকে দেশমাতৃকা রূপে দেখানো এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সবথেকে বড়ো কৃতিত্ব।

প্রসঙ্গত, ১৮৭০ দশকের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' লিখলেন। এই গানটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী সাহিত্যকর্ম 'আনন্দমঠ'-এর অংশ হয়ে যায়। 'আনন্দমঠ' তার সাহিত্যমূল্য ও সামাজিক প্রভাবের কারণে যুগান্তকারী হয়েছে। পরবর্তীকালে অনেকে 'আনন্দমঠ'কে মুসলমান-বিদ্বেষী প্রতিপন্ন করে ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে বন্দেমাতরমের গুরুত্ব লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের এই অপলাপের প্রতিবাদ খোদ মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে।

বিশেষ করে, দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় মুসলিম লিগের প্ররোচনায় কলকাতার রাস্তায় শত শত কপি 'আনন্দমঠ' পোড়ানোর প্রতিবাদ করে বিশিষ্ট মুসলমান-চিন্তক রেজাউল করীম লেখেন, 'আনন্দমঠকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ইহারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তাহা অতীব জঘন্য। স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহা ইসলামকে উদ্ধার করিবে না। ইহা লইয়া যাইবে মুসলমানকে অধঃপতনের দিকে।..... ভূলুণ্ঠিত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি....।' আনন্দমঠ প্রসঙ্গে রেজাউল করিমের মনোভাব, 'আজ আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার মূল কারণ মুসলমান যাহাতে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার দুরভিসন্ধি।' বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'অন্যান্য দেশের মুসলমানরা এরূপ গান ব্যবহার করিবার মতো পরিস্থিতি পাইলে ধন্য হইয়া যাইতেন'। তাই তাঁর মতে, বঙ্কিমের নিকট যদি বাঙ্গালি ঋণী হয়, বাংলাভাষা ঋণী হয়, তবে বাঙ্গালি মুসলমানও সমভাবে তাঁহার নিকট ঋণী, সর্বাংশে ঋণী।

রেজাউল আবদুল করীমের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরমকে ইসলামবিরোধী সাজানোর মুসলিম লিগের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছেন।

ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনোই সৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমান শাসকবর্গ। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা চলত যদি তিনি আকবর বা হুসেন শাহের মতো কোনো সুশাসকের কুৎসা করতেন।

একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক হলেও ইতিহাসের গুণাগ্রাহী ছিলেন। তিনি সাহিত্যকে আশ্রয় করে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশঅস্মিতা জাগাতে আগ্রহী হলেও তার ঐতিহাসিকতাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান শাসকদের ইতিহাসকে বাঙ্গলার ইতিহাসের অংশ বলে মেনে নিতে তাই অস্বীকার করেন। তিনি লিখেছিলেন : 'আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম-মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালি এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালি নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী

মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালি নয়।"

তিনি এই প্রবন্ধেই বাঙ্গলার নির্মোহ ইতিহাস খুঁজে তা লেখার জন্য বাঙ্গালিদের প্রতি আহ্বান জানান। বাঙ্গালি নামের দ্বারা তিনি আসলে বাংলাভাষাভাষী হিন্দুদেরই চিহ্নিত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের জন্য আবশ্যক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার শৈশবাবস্থা এবং বঙ্গে যখন ইতিহাসচর্চা প্রায় শুরুই হয়নি বলা চলে, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজ উদ্দিনের 'তবকাত-ই-নাসিরী'-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খিলজির সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গবিজয়ের কাহিনিকে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।' তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার যে বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণায় বঙ্কিমের দাবি যে ঐতিহাসিকভাবে সত্য তা উঠে এসেছে। বখতিয়ার শুধু কয়েক বছরের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ দখলে রাখতে পেরেছিলেন। বাকি উভয় বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন-সহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহুবছর যাবৎ শাসন করেন। মৃণালিনী উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ার-সংক্রান্ত কিংবদন্তীটির বিরোধিতা করেছেন।

আনন্দমঠ উপন্যাসে দেখা যায়, ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বিভিন্ন যুগে দেশমাতৃকার নানা রূপ দেখাচ্ছেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না, সর্বাঙ্গবরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী

বিপিন চন্দ্র পাল

নবগোপাল মিত্র

চন্দ্রনাথ বসু

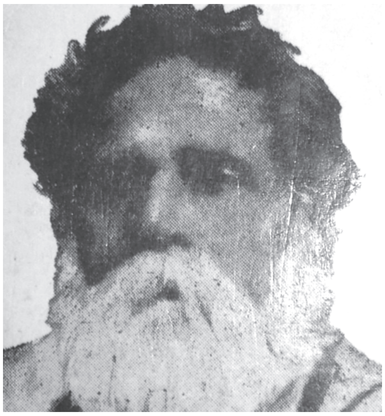

রাজনারায়ণ বসু

মূর্তি। মহেন্দ্র তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ বললেন, 'মা যা ছিলেন'। তারপর ব্রহ্মচারী কক্ষান্তরে মহেন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন মা কালীর মূর্তি। বললেন দেখ, মা যা হইয়াছেন। .... কালী-অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী।' তারপর ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দেখালেন মর্ম্মর প্রস্তর নির্মিত একটি মন্দিরের মধ্যে সোনার তৈরি দশভুজা দুর্গা-প্রতিমা। ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বললেন, 'এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত, দিগভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী-বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরুপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।' মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মায়ের এই মূর্তি কবে দেখতে পাব? উত্তরে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ বললেন, ''যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন তিনি প্রসন্ন হইবেন।'

এখানে বিভিন্ন দেবীমূর্তির কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথমে স্বর্ণালংকারভূষিতা জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের প্রতীক। তারপর নগ্নিকা, হৃতসর্বস্বা, শ্মশানচারিণী মা কালী মুসলিম ও ব্রিটিশ আমালে অত্যাচারিতা, লুণ্ঠিতা, পরাধীন দেশমাতৃকার প্রতীক। এরপর লক্ষ্মী- সরস্বতী-গণেশ-কার্তিক সহ স্বর্ণনির্মিত দশভুজা দুর্গামূর্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের এক প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন সাহিত্য-সম্রাট।

ঋষি অরবিন্দের কথায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি এক নতুন ধর্মের জন্ম দিল, যা হলো দেশপ্রেমের ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'একদিন দেখিবে এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।' বাস্তবে হয়েছিলও তাই। ১৯০৫ থেকেই

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বঙ্গসমেত সারা ভারতবর্ষে 'বন্দেমাতরম্' দেশপ্রেমের মন্ত্র, জাতীয়তাবোধের ও স্বাদেশিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। অনুশীলন সমিতির আদর্শের অন্যতম উৎসও হয়ে দাঁড়ায় 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম।' আনন্দমঠ হিন্দু জাতীয়তাবোধ, মুসলমানদের সঙ্গে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনেনি। বইটির প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াই থেকে মুসলমানদের একেবারেই বাদ ওেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে যদিও শত্রু গোরা, ব্রিটিশও সেনা থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'নেড়ে' ও 'যবন' হয়ে যায়। এই দুই শব্দ মূলত বাংলার মুসলমানদেরকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা'র মতে, বঙ্কিমের মতন আর কেউ বাঙ্গলার সমাজ ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেননি। ফ্রান্সে রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের যে প্রভাব তার সঙ্গে কেবল তুলনা করা যেতে পারে বঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে আনন্দমঠের প্রভাব। 'শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থে বঙ্কিমের সাহিত্যমানকে স্বীকার করে নিয়ে ছফা জোর দেন যে, বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা তাঁকে একটা স্বতন্ত্র জায়গা করে দিয়েছে। ছফা বলেন, 'বঙ্কিম ক্ষমতাবান লেখকের চেয়েও অধিক কিছু ছিলেন।' এও বলেন যে, 'তিনি সর্বপ্রথম একটি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।'

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থার উদ্ভবেও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান ছিল। কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থার উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে 'পলিটিকস্' রচনায় তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নরমপন্থীদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ''জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই আমাদের পলিটিকস্।'' তিনি এই প্রবন্ধে কলুর পুত্র সংক্রান্ত একটি গল্পে নরমপন্থীদের রাজনীতিকে কুক্কুর জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করেন এবং এর পরিবর্তে 'বৃষ জাতীয় রাজনীতি' গ্রহণ করার কথা বলেন।

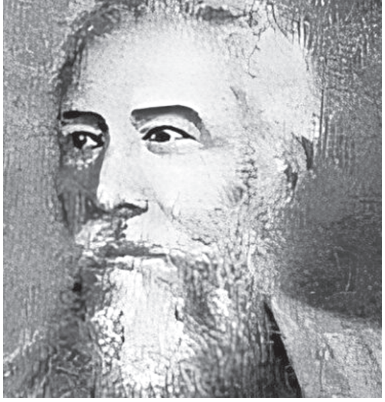
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

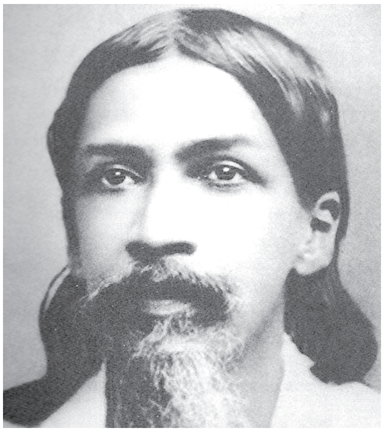
ঋষি অরবিন্দ

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

এহেন বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি শুধু সাহিত্যসম্রাট এবং বাংলা সাহিত্যের ভগীরথই নন, তাঁর রচনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পিছনে তাঁর রচনাগুলি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এইভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও তার পরবর্তীসময়ে মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখের সহযোগিতায় যখন বাঙ্গালির মনে হিন্দুত্বের চেতনা জাগ্রত করছেন, তখন এরই সূত্রে বাঙ্গালির সামনে হিন্দুত্বের ক্রিয়াকলাপ চালানোর পথও ক্রমে প্রশস্ত হচ্ছিল। সৌজন্যে রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার আয়োজন।

দেশাত্মবোধ এবং হিন্দু জাতীয়তা-বোধী চিন্তায় আগাগোড়া নিমজ্জিত রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' এবং বেশ কয়েক বছর পরে কলকাতায় সঞ্জীবনী সভা নামে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, হিন্দুত্বের চেতনার উন্মেষে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। রাজনারায়ণ তাঁর 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করেছেন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্যবিবরণী থেকে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা আয়োজন করার অনুপ্রেরণা পান। বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে রাজনারায়ণ তাঁর শ্রোতাদের অনেককেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনারায়ণের অন্যতম কৃতিত্ব তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক বক্তৃতায়, তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। সেই বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। বাঙ্গলার ছোটলাট লিটনের দেশীয় ভাষা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকাও গ্রহণ করেন।

১৮৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনারায়ণ 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে

থাকে যদি ডাটা, জমে যায় রান্নাটা
শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ◆ পাঁপড়
DUTA MASALA PAPAD
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
DUTA TURMERIC POWDER
50g
DUTA CORIANDER POWDER
50g
207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007
Email : dutaspice@gmail.com, Website : www.dutaspices.com
Facebook : www.facebook.com/duta.rannaghar
Youtube : www.youtube.com/c/duta rannagharbengalirecipe
For trade enquiry, call 98366 72200
/ 033 2259 4112 / 98363 74300
স্বাদে আর সাধে, আহ্লাদে ... ডাটা
কেনার সময় অবশ্যই 'কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড'
নাম দেখে তবেই কিনবেন

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের একত্রিত করে একটি সংগঠনের অধীনে আনার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এই প্রতিষ্ঠান গঠিত না হলেও, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাঁর মৃত্যুর পরে মোটামুটি একই উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেছিলেন।

বাঙ্গলায় যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'হিন্দুমেলা'। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্রসংক্রান্তির দিন কলকাতায় 'হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মেলার প্রাণপুরুষ ছিলেন নবগোপাল মিত্র এবং বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা, যেমন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, এছাড়াও ছিলেন মনোমোহন বসু। হিন্দুমেলার সদস্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর, পিয়ারিচরণ সরকার, কৃষ্টদাস পাল প্রমুখ হিন্দুসমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাল্যকথায়'য় লিখেছেন—

'কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোনো একটি উদ্যানে বৎসরে তিন-চার দিন ধরে এই মেলা চলত। সেখানে দেশি জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা হত।'

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার হিন্দুমেলার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো—(এক) জাতীয় ভাবের প্রসার ঘটানো। (দুই) দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করা , এবং (তিন) হিন্দুদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব গঠন করা। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন , 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনো বিষয় সুখের জন্য নহে, কোনো আমোদপ্রমোদের জন্যও নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত ভূমির জন্য।' মেলার দ্বিতীয় বর্ষে মনোমোহন বসু প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে ' ...কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধমাত্র নাই এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে তাহাও স্বদেশীয় জনগণের হস্ত সম্ভূত স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য'।

গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' রচনায় মেলার প্রথম অধিবেশনের এক বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, হিন্দু মেলার উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ছয়টি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কমিটির কাজ ছিল হিন্দুদের মধ্যেকার বিদ্বেষভাব দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় কমিটির কাজ ছিল এক বছরে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণী তৈরি করা। তৃতীয় কমিটির কাজ ছিল দেশীয় বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে নিয়োজিত স্বদেশিদের সম্মান জানানো। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কমিটিগুলির কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পজাত পণ্য সংগ্রহ করে সেগুলি মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

জাতীয়তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলিকে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য নবগোপাল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে 'ন্যাশনাল পেপার' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকার ছাপাখানার নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল প্রেস'। দ্বিতীয় বছরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান / একতান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' পরিবেশন করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে জীবনের প্রথম কবিতা 'জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী। / জাগ জাগ ভারতসন্তান' পাঠ করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি পার্শিবাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে চতুর্দশীয় বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র' প্রবন্ধে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

'তখনও অস্ত্র আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক ছোঁড়া বা তরোয়াল খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু মেলার বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পাখি শিকারের ভান করিয়া বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন'।

হিন্দু মেলার চতুর্থ অধিবেশনের পর নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল সোসাইটি' বা 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনগুলিতে দেশবাসীর হিতসাধন মূলক শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা হতো।

রেনেসাঁসের কালজুড়ে বঙ্গে হিন্দুত্বের হাওয়া বইলেও 'হিন্দুত্ব' শব্দের লিখিত প্রয়োগ দেখা যায় উনিশ শতকের একেবারে শেষপ্রান্তে। চন্দ্রনাথ বসুর বই 'হিন্দুত্ব' ১৮৯২ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ছাপার হরফে হিন্দুত্ব শব্দ ব্যবহারের প্রথম নজির এই বইয়েই পাওয়া যায়। 'কলকাতা রিভিউ' জুলাই, ১৮৯৪-এর সংখ্যাতে আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা করা হয়। চন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে হিন্দুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দু কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়—এই অভিমত তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। সাধারণভাবে ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটির স্রষ্টা হিসেবে সাভারকারকেই কৃতিত্ব দেওয়া হয়। যদিও এই কৃতিত্বের সম্পূর্ণ দাবিদার এক বাঙ্গালি, তাঁর নাম চন্দ্রনাথ বসু। উত্তর ভারতের সুচতুর একদল মানুষ বঙ্গপ্রদেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার আবাসভূমি ও মহারাষ্ট্রকে হিন্দুত্বের বিচরণভূমি হিসেবে চিত্রিত করে থাকেন। অথচ হিন্দুত্বের সৃষ্টি ও আবাসভূমি যে এই বঙ্গ, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সাভারকর 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি লেখেন ১৯২৩ সালে, অথচ চন্দ্রনাথ বসু প্রায় ৩১ বছর আগে (১৮৯২) তাঁর 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও সাভারকর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ায় এবং ইংরেজি ভাষায় তাঁর গ্রন্থটি লিখিত হওয়ায় সর্বভারতীয় স্তরে বেশি করে তা প্রচারের আলোয় এসে পড়ে। রেনেসাঁসের বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ছিলেন এর উদ্গাতা। হিন্দু জাতীয়তাবোধী হলেও তিনি হিন্দুধর্মকে সংস্কারের উর্ধ্বে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভূদেব

মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনি উদার দৃষ্টি নিয়ে ধর্মকে দেখেছেন। দেশের সকল মানুষকে উদার হিন্দুত্বের পতাকাতলে সমবেত হতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নিহিত।

চন্দ্রনাথ বসু উনিশ শতকের রেনেসাঁসের আলোয় স্নাত হয়েও পাশ্চাত্যের অনুকরণের স্রোতে গা না ভাসিয়ে বিপরীত স্রোতের যাত্রী হয়েছিলেন। নিজের ধর্ম ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকালেন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। এক তীব্র জাতীয়তাবোধ তাঁকে পরিচালিত করলো। তাঁর সৃষ্টি বিশ্বে সেই জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তাঁর মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার মূলে আছে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাব। উনিশ শতকের হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের অন্যতম এই নেতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ছাত্রজীবন থেকেই চন্দ্রনাথের মানস-সংকট চলছিল। একসময় দার্শনিক কোঁতের পজিটিভিজম তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোঁতের মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই দেখে তাঁর অন্তরে অতৃপ্তি থেকে যায়। একসময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বাস কিছুটা শিথিল হয়েছিল চন্দ্রনাথের। দীর্ঘদিনের সেই অতৃপ্তির অন্বেষণ এক মুহূর্তে চূড়ামণি মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে দূরীভূত হল। 'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম, অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। বিশ্বে যা কিছু আছে তা বিশ্বনাথ থেকে স্বতন্ত্র রাখলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না। কারণ বিশ্ব তাহলে আমাদেরকে রক্ষা না করে বিনাশই করে। এই তত্ত্বের আলো চন্দ্রনাথ বসুর জীবনকে এক অন্য খাতে প্রবাহিত করে। তাঁর কাছে ধর্ম ও দেশ এক ও অভিন্ন হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই সময় থেকেই চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতী হন। চন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'যারা শিক্ষা অর্জন করে হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করতে শিখেছে, তাদের মনে ঘৃণার পরিবর্তে অনুরাগ সঞ্চার করে দেওয়া এবং যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছে তাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় ঘটানো ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এমনকী শিথিল সমাজ বন্ধনকে তিনি দৃঢ় করতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করা তথা হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রনাথ বসুর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধের স্বরূপ মূলত 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১), 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২) ও 'সাবিত্রী তত্ত্ব' (১৯০০) নামক গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কালিদাসের নাট্যকাব্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' বিশ্লেষণ করে চন্দ্রনাথ কয়েকটি সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। যার মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং এক সামগ্রিক চেতনায় সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, যা জাতীয়তাবোধেরই নামান্তর।

চন্দ্রনাথ বসু সমালোচনামূলক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যদি 'শকুন্তলাতত্ত্ব' হয় তাহলে সমাজতত্ত্বমূলক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থ। 'বাঙ্গালির ইতিহাস না থাকলে বাঙ্গালি মানুষ হবে না' বঙ্কিমচন্দ্রের এমনই আক্ষেপের জবাব পাওয়া যায় 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় – 'ইউরোপ যাহাকে ইতিহাস বলে আমাদের তাহা নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ আমাদের পূর্ণমাত্রায় আছে।' জাতির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানের লক্ষ্যেই চন্দ্রনাথ 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি বহু বিষয়কে একত্রিত করে 'হিন্দুত্ব'-কে আকার দিতে চেয়েছেন। এই সমস্ত কিছুর জন্য হিন্দু কারও কাছে বিন্দুমাত্র ঋণী নয় বরং হিন্দুর যা আছে সবই তার নিজস্ব। প্রাচীন বৈভবের গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব—এই ধারণার পূর্ণ প্রতিফলন 'হিন্দুত্ব'-তে লক্ষ্য করা যায়। 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে চন্দ্রনাথ মূলত অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্ব এবং কতগুলি মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বিষয়গুলি হলো—সোহহং, লয়, নিষ্কাম ধর্ম, তুষানল, কড়াক্রান্তি, পুত্র, আহার, ব্রহ্মচর্য, বিবাহ, তেত্রিশ কোটি দেবতা, মূর্তিপূজা, মৈত্রী। চন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থের প্রকাশ একটি বিষয় স্পষ্ট করে, যে হিন্দু জাতীয়তাবোধ এদেশে মাথা তুলেছে তার গর্ভগৃহ আসলে এই বঙ্গপ্রদেশ। এমনকী সুমিত সরকারের মতো জাতীয়তা-বিরোধী বামপন্থী ইতিহাসবিদও তাঁর 'বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)' গ্রন্থে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

'....দেখা গেলো, বাঙালি ভদ্রলোকের জাগ্রত জাতীয় গর্ব প্রাচীন হিন্দুর গৌরব ও মধ্যযুগে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিরোধের চিত্রের মধ্যে শক্তি খুঁজে নিলো।..... দেশপ্রেমকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের সাথে মিলিয়ে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা গেলো। 'হিন্দু' ও 'জাতীয়' সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলো।'

উনিশ শতক জুড়ে হিন্দুত্বের যে ধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হচ্ছিল, তার উৎকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল উনিশ শতকে শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের মাধ্যমে। বস্তুত, স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রা একদিকে যেমন হিন্দুত্বের বিজয়কেতন উড়িয়েছিল, তেমনই হিন্দুত্বই যে খাঁটি ভারতীয়ত্ব, তাকেও সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিল। শিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজী হিন্দুদের উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, গোঁড়ামিমুক্ত চিন্তাধারা তুলে ধরে প্রথমে আমেরিকা, পরে ইউরোপ জুড়ে বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। সারা বিশ্ব সেদিন অনুধাবন করতে পেরেছিল, ভারতবর্ষ তথা হিন্দুদের ধর্মীয় দর্শন কোন উচ্চাসনে আসীন। এর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন নামে আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে পরিচিত; অন্যদিকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কালপর্বে হিন্দুত্বের চেতনাকে আপামর বাঙ্গালির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা বাঙ্গালি আজও বহন কে চলেছে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আজও মূলত কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা হিন্দু ও জাতীয় শব্দকে আলাদা করে ঐতিহাসিকতাকেই অস্বীকার করতে চান।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

পায়ের তলায় মাটি

এষা দে

কাল রাতে আবার সেই স্বপ্নটা দেখল। আধো অন্ধকার, সব কেমন ছায়া। সেই লোকটা যাকে বার বার দেখে। পরনে ধুতি, গায়ে কী, না পাঞ্জাবি তো নয়, শার্ট মনে হচ্ছে। পিছন থেকে দেখছে তো, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। হেঁট হয়ে কী যেন করছে। বেশ কষ্ট করে। সামনে ঝুঁকে দুটো হাতে কী একটা ধরে মাথার ওপরে তুলল, আবার নামিয়ে আনল। আবার তুলল, নামিয়ে আনল। কী ওটা ধরে আছে? লম্বা হাতল লাগানো চৌকো মতো একটা পাত। কোদাল নাকি। ও, লোকটা মাটি কোপাচ্ছে। কতগুলো ছায়া যেন লোকটাকে ঘিরে রয়েছে। চারিদিকে

ঘন কালো ওগুলো কী? ঝোপঝাড় বোধ হয়। হ্যাঁ, মাঝখানে একফালি খালি জায়গা, যেখানে ছায়াগুলো দাঁড়িয়ে। ওগুলো মানুষ।

অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। প্রতিবার ঠিক এইখানে ঘুমটা ভেঙে যায়। আশ্চর্য! কেন যে বিদঘুটে স্বপ্নটা বার বার দেখে। কবে সেই ছেলেবেলায় প্রথম দেখেছিল। তারপর অনেক দিন দেখেনি। ইদানীং প্রায়ই দেখছে। যেন শুধু একটা ছবি, দুটো ঘরের মধ্যে প্যাসেজের দেওয়ালে টাঙানো। অতীত আর বর্তমানের মধ্যে যাতায়াতে বার-বার এক ঝলক চোখে পড়ে। রয়ে সয়ে পুরোটা দেখা কখনোই হয়ে ওঠে না। উফ, বেশ ঘেমে গিয়েছে। একেই তো আদ্দিকালের পাখায় বেশি স্পিড হয় না, তার ওপর যেটুকু হয় মশারির ভিতর দিয়ে তার কীই-বা পৌঁছয়। জল খাওয়ার জন্য ওঠে। ঘরের ওপাশের তক্তপোশে মশারির মধ্যে মা ঘুমোচ্ছেন। মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষা বেঁটে আলমারির মাথায় ঢাকা দেওয়া এক গেলাস জল। প্রতিদিনই নিজের জন্য এনে রাখে। সকালে উঠে জলটা খেয়েই তার অফিসের জন্য রেডি হওয়ার পালা শুরু। পশ্চিমবঙ্গে চাকরির যা বাজার। পার্টির কৃপায় কাজটা পেয়েছে। তার মতো রিফিউজি ছেলে-মেয়েদের পার্টিই তো ভরসা।

মা অরুণা দেবী যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এলেন তখন তার বয়স তিন, বড়দির বারো, ছোড়দির নয়। উঠলেন শ্যামবাজারে তাঁর সবচেয়ে বড় দাদার কাছে। অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে তাদের মামাবাড়িতে। বড়মামা পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। শখ করে দাদামশাই ঢাকায় নয়, একেবারে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন কলেজে পড়তে। কিন্তু ছেলে পড়া শেষ করতে না করতে তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি। বড়মামা কিন্তু কলকাতায় থেকে গেলেন। বিলিতি মালিকানার একটা সওদাগরি আপিসে কেরানির চাকরি নিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে সংসারে সাহায্য করলেন। ছোট ভাই দুজনের পড়াশোনা, বোনের বিয়ে তো শুধু ক'বিঘে জমির ফসলে হয়নি। তারপর মামা নিজে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আস্তে আস্তে শেষে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে প্রমোশন পেয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন নিজের সংসারটিও। সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, তাঁর মতে, 'সাহেবরাই আমাদের মানুষ করেছে, কী ছিলাম আমরা? ছেলেদের পড়াশোনার দৌড় ক'বছর পাঠশালায় নাম লিখিয়ে শেষ, তারপর ঘরের দু'ফালি জমির অন্নে কোনোক্রমে টিকে থাকা, জায়গিরদার তালুকদারদের মোসাহেবি করে বেড়ানো, মেয়েগুলোকে ঘরে বসিয়ে রেখে ক'বছর শুধু দুবেলা দুমুঠো খেতে দিয়ে যাকে তাকে ধরে পার। ব্যাস, কর্তব্য শেষ। এখন চণ্ডীমণ্ডপে পরনিন্দা-পরচর্চা করে, তার পর 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হলো পার কর আমারে।' এটা কি একটা মানুষের মতো মানুষের জীবন! তিনি নিজে যেমন ইংরেজের করা স্কুল-কলেজে পড়ে জীবনে দাঁড়িয়েছেন ছেলে-মেয়েদেরও সেই রাস্তায় চালিত করেছেন। হ্যাঁ, মেয়েকেও পড়িয়েছেন। বিয়েও দিয়েছেন শিক্ষিত এবং চাকুরে দেখে।

কলকাতার বাড়িতে কথাবার্তার ওপর খুব কড়া শাসন চালু ছিল, যা প্রাণ চায় বলবে, একেবারে চলবে না। মামার ভাষায় 'স্পিকটি নট রুলস'। জ্ঞান হতে না হতে অসীম শুনেছে এবং আর সকলের সঙ্গে নিজেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে। যেমন রুল নম্বর ওয়ান, 'দেশ' বা ইস্ট পাকিস্তান সম্পর্কে স্পিকটি নট। তাদের জমিজমা ঘরদোর কী ছিল না ছিল, সেগুলো কী হলো, এ সব সম্পর্কে স্পিকটি নট। দুই, পাকিস্তানে মুসলমান পাড়াপ্রতিবেশীর ব্যবহার সম্পর্কে কোনো কথা নয়, স্পিকটি নট। রুল নং থ্রি, কেন কীভাবে ভারতে এল সে সম্বন্ধে মুখ খোলা একেবারে পুরো নিষেধ, স্পিকটি নট।

বড়ো মামিদের পরিবার পাকিস্তান হওয়ার অনেক আগে থেকে কলকাতায় এসে পড়াশুনো, চাকরিবাকরি, বসবাস করে পুরো এ দেশি হয়ে গিয়েছে। মামাও অনেকটা সেই কারণেই সেখানে বিয়ে করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই কলকাতাতেই স্থায়ী হবেন স্বপ্ন ছিল। চাকরিতে পাকাপাকি হয়ে বসে শ্যামবাজারের আরও উত্তরে বি টি রোডে, সেই যাকে বলে ডানলপ ব্রিজ সেটা ছাড়িয়েই বড়ো রাস্তা থেকে একটু ভিতরে নেমে গিয়ে বেশ খানিকটা জমি সস্তায় কিনে রেখেছিলেন। এত কাল পরে ইদানীং বাড়ি তুলছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে শেষ হলে সবাইকে নিয়ে সেখানেই স্থিতু হলেন। তাদের আগমনে মামি আহ্লাদে উথলে ওঠেননি। নিজের বড়ো ছেলেদুটি তত দিনে অবশ্য চাকরিবাকরি- বিয়েথা করে যাকে বলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু বাকি ছোটো ছেলেটা, এখনো কলেজে। এমন সময়ে বাড়তি চার-চারটি মুখের অন্ন জোগানো, আরও তিন জনকে পড়াশোনা শিখিয়ে বড়ো করা, দুটো মেয়ের বিয়েথা দেবার দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে কেই-বা গদগদ হয়।

মা ম্যাট্রিক পাশ হলেও পূর্ববঙ্গের গ্রামের বউ, কলকাতার শহুরে চালে ঝি চাকর নিয়ে সংসারে অভ্যস্ত ছিলেন না। ঘরের সব কাজ বরাবর নিজের হাতেই করে এসেছেন। মামার বাড়িতে পা দিয়েই তাঁর আলাদা নিরামিষ হেঁশেলে বাড়ির বেশিরভাগ রান্নাই করতে থাকেন। চা জলখাবারও। ক'দিন যেতে না যেতেই মামি বললেন, 'ঠাকুরঝি, কলকাতা শহরে অত আমিষ নিরামিষ আলাদা কেউ মানে না। একসঙ্গেই হয়। সবই তো করছ, সঙ্গে একটু মাছের ঝোলটা করে দিতে খুব কি অসুবিধা হবে?' বলাবাহুল্য মা হাসি মুখে বলেছেন, 'না, না সবই করে দেবো খন।' বউদি তুমি নিশ্চিন্ত থাক। শুধু তাই নয়, ঠিকে ঝি কামাই করলে মোটা কাজের ভারটাও মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। 'এত কামাই, একে রাখার কোনো মানে নেই'। পটলার মায়ের ছুটি হয়ে গেল। ঠোঁটকাটা ছোড়দা বলতে থাকে, 'পিসি আসায়

মাকে আর কুটোটি নাড়তে হয় না। তার ওপর পটলার মায়ের মাইনেটা বেঁচে গেছে। তার গজগজানিটাও শুনতে হয় না। নিট লাভ। 'মামি হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে কুটনোটা কুটতে কুটতে চোখ পাকিয়ে শাসন', তুই কে রে, পুরুষমানুষ সংসারের কাজ নিয়ে ফোঁড়ন কাটতে এসেছিস। যা, নিজের চরকায় তেল দে গে যা।' সকাল থেকে রাত মুখ বুজে মায়ের কাজ। অবশ্য মুখ বুজে থাকাটা যেন তাঁর স্বভাবই। নিজে থেকে বড়ো একটা কথা তাঁকে বলতে অসীম কখনো শোনেইনি। তাঁর নীরবতার ছোঁয়াচ যেন মেয়েদেরও লেগেছিল। বাড়িতে উঠতি বয়সের দুদুটো মেয়ে আছে কেউ টের পেত না। গলায় তাদের আওয়াজই যেন ফোটে না। স্কুলে পড়াশোনা, বাড়িতে বাকি সময় বাসন মাজা থেকে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, মায়ের সঙ্গে ঘরের যাবতীয় কাজে পুরোদমে হাত লাগানো, ব্যাস, এর বাইরে তাদের আর কিছু নেই। এমনকী একটা মাত্র ভাই, এত ছোটো, তার সঙ্গেও যে তেমন গল্পগুজব খেলাধুলো খুনসুটি কোথায়? আচ্ছা, স্কুলে আর পাঁচটা মেয়েদের দেখে না? তারা নিশ্চয়ই কথাটথা বলে।

যেমন অসীমের স্কুলের সঙ্গীসাথীরা। প্রথমেই তো প্রশ্ন, 'হ্যাঁরে, তোদের দেশ কোথায় রে? তখন কি মিথ্যে বলবে নাকি? বাধ্য হয়ে বলে 'খুলনা, পাকিস্তান।' 'ও তোরাও রিফিউজি বুঝি? আমরাও।' সমীরের পাবনা, জ্যোতির যশোর, মনোজের ময়মনসিং, পরিতোষের ঢাকা, বরেনের সিলেট। বাব্বা, কত জায়গা পাকিস্তানে, কত্ত বড়ো দেশটা। 'কবে এসেছিস', 'তোরা ক'জন এলি', 'এখানে কেউ নিজের লোক ছিল' ইত্যাদি। নিট রেজাল্ট, বড়ো মামার কঠোর স্পিকটি নট রুল সত্ত্বেও অসীম আট ন' বছর বয়সের মধ্যেই জানতে পেরে গেল 'দেশ' মানে চোদ্দপুরুষের ভিটে থেকে তারা উৎখাত, বিতাড়িত। স্কুলে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে না লেখা থাকলেও বোঝে তারা শুধু নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মতো ছিন্নমূল। তবে বেশিরভাগেরই তাদের মতো কলকাতায় মামা কী জ্যেঠার বাড়ি ছিল না। খুব কষ্টে ছিল তারা। রিফিউজি কলোনিতে এমনকী শিয়ালদহ স্টেশনে পর্যন্ত দিনের পর দিন কুকুর-বেড়ালের মতো কোনোক্রমে বাঁচতে হয়েছিল। সবাই এক সঙ্গে বা এক সময়েও আসেনি। আশ্চর্য ব্যাপার হলো স্কুলের সমীর, জ্যোতি, মনোজ, পরিতোষ, বরেন, সকলেই বলে পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা বারণ। সব বাড়িতেই কম-বেশি স্পিকটি নট রুল চালু। খালি মুশকিল করে বুড়িগুলো। ঠাকুমা, দিদিমাদের কথায় কথায় ফেলে আসা ভিটের শোক উথলে ওঠে। নাতিপুতিরা জানতে পেরে যায় তারা বাধ্য হয়ে চলে এসেছে। দাঙ্গাফাঙ্গা আরও কত কী হয়েছে। পাকিস্তান মানেই যেন একটা গরগরে মারকাটারি রক্ত বয়ে যাওয়া হিন্দি ফিল্ম, যেগুলো দেখা বাড়ি থেকে বারণ এবং তাই সেগুলো দেখার উদগ্র বাসনা সকলের মনে।

আচ্ছা, তার নাহয় বয়স ছিল মাত্র তিন বছর, কিছু মনে নেই, কিন্তু বড়দি ছোড়দি তো বেশ কিছুট বড়ো ছিল, তাদের তো অনেক কিছু দেখা, তার ওপর মা, তাঁর তো সব জানার কথা। কতবার জিজ্ঞাসা করেছে 'মা, আমরা দেশ কেন ছাড়লাম?' মায়ের সেই এক উত্তর, 'তোদের বাবা চলে গেলেন। শ্বশুরবাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না। একলা বিধবা তিনটে ছেলে-মেয়ে পাকিস্তানের গ্রামে কী করে মানুষ করব? বাপের বাড়িতে বাকি দাদা দুজনেরই কাজ আসামে—তিনসুকিয়া আর করিমগঞ্জে। তাদের ছেলে-মেয়েরা ছোটে ছোটো, কারও তেমন আহামরি অবস্থা নয়। বড়দা বরাবর পরিবারকে দেখেছেন। তাই কলকাতায় তাঁর কাছেই এসে উঠলাম।'

বড়দি, ছোড়দি মাথা নীচু করে থাকে। মায়ের মুখের দিকে তাকায় না, মা ওদের চোখে চোখ রাখে না। কী রকম অদ্ভুত লাগত অসীমের। প্রথম প্রথম অস্থির হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করত। সেই এক জবাব, এমন কী এক ভাষা পর্যন্ত, একটুও এদিক ওদিক হয় না, যেন মুখস্ত করা পরীক্ষার উত্তর। পাথরে কোঁদা মায়ের মুখ, ভাবলেশহীন। বড়দি ছোড়দি ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে যেত। কখনো কখনো অসীম দিদিদের ধরে পড়ত, 'এই' তোরা তো দেখেছিস পাকিস্তানে দাঙ্গা না কী হয়েছিল, বল না, বল না।' বেশিবার বললে দিদিরা কোরাস গান গাওয়ার মতো এক ভাবে বলত, 'মায়ের কাছে তো শুনলি।' মামার স্পিকটি নট রুলে ওদের যেন মুখে বরাবরের মতো তালা চাবি পড়ে গেছে।

অসীম ক্লাস ফোরে উঠতে না উঠতে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেল বাংলাদেশ। পাড়ায় দাদাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ক'মাস ধরে কী উৎসাহ, উদ্দীপনা। যেন একটা লম্বা ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। রেডিয়োতে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' প্রোগ্রাম সবাই হাঁ করে শুনল। মা একদিন মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, এখন কি আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব? জমিজায়গা সব ফেরত পেয়ে সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যাবে?'

মামা উত্তর দিলেন, 'না রে না। একজন হিন্দুকেও ওরা ফিরতে দেবে না। শুধু নামটাই বদল হয়েছে। লোকগুলো তো সব এক। এই যে মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কলকাতায় সব মাথায় তুলে নাচছে, এ তো ছিল বাঙ্গলার কসাই সুরাবর্দির নাম্বার ওয়ান চেলা, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় খাস কলকাতায় মুসলিম লিগের লড়াকু মেম্বার। তখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' জিগির হেঁকে ভারত ভাগ করেছিল এখন 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে পাকিস্তান ভাগ করছে। সব ক্ষমতার খেলা, আর কিস্যু নয়।'

স্কুলে ক্রমেই পড়ার চাপ বাড়ে, আর অত পাকিস্তান/ বাংলাদেশ নিয়ে ভাবা টাবার সময় থাকে না। রোজ হোমওয়ার্ক

কী দেওয়া হয়েছে, ঠিক মতো করল কিনা, মামার তদারকি করা চাই। অফিস থেকে ফিরেই তাঁর কাজ হলো তিন ভাগনে-ভাগনি এবং ছোটো ছেলেকে নিয়ে বসা। 'কলেজে হোমওয়ার্ক দেয় না', বলে ছোড়দা রেহাই পায় না। 'কেমন ক্লাস করেছিস, কী ক্লাস নোট নিয়েছিস দেখি।' বড়ো মামার জন্যেই বড়দির মতো ফাঁকিবাজ মেয়েও পাশ করে গেল আর ছোড়দির সেকেন্ড ডিভিশন প্রাপ্তি। ততদিনে কবে ছোড়দা বি-কম পাশ করে গেছে। কিন্তু মামার বড়ো আশা সত্ত্বেও তাঁর নিজের কোম্পানিতে কাজ হলো না। আসলে সাহেবরা তো স্বাধীনতার পরে দেশে ফিরে গেছে, মালিক এখন মাড়োয়ারি। বাপ সারাজীবন এই কোম্পানিতে কাজ করেছে বলে ছেলেকে সুযোগ দেবে, সে গুড়ে বালি। সখেদে বার বার বলেন, 'আগেকার দিন হলে, সাহেবরা থাকলে ঠিক আমার ছেলেকে চাকরি দিতেন। ওরা লয়াল্টি, সিইন্সয়ারিটি ও সবের মূল্য বুঝত।' বেশ কিছু দিন অ্যাপ্লাই করে করে, ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে শেষমেশ ছোড়দা একটা নুঁয়ে পড়া কোম্পানির অ্যাকাউন্টস অফিসার হয়েছে, আসলে স্রেফ খাতা লেখা বাবু। মামার সাফ কথা, পুরুষ মানুষ বসে থাকা চলবে না। আরও ভালো কিছু পেলে না হয় ছেড়ে দেবে। বসিয়ে তিনি মেয়েদেরও রাখবেন না। বড়দি সেই বিএ ফেল করল, পড়তে চাইল না, অমনি মামা তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছোড়দি গ্র্যাজুয়েট হলে একটু বেশি ভালো পাত্র জুটল। হ্যাঁ, দু' দুটো বিয়েতে খরচ তো হবেই। মামির গজগজ, 'যা কিছু বুড়ো বয়সের সংস্থান ছিল, সব গেল।' মা আরও সংকুচিত আরও অপরাধী হয়ে গেলেন। এদিকে মেয়েরা আর না থাকায় সংসারের কাজের চাপটা পুরো পড়ল তাঁর একার ঘাড়ে।

অসহ্য লাগে অসীমের। থলি হাতে বাজার-দোকান-হাট করে বটে কিন্তু মায়ের জন্য কিছুই করতে পারে না। যথাসম্ভব বাড়ির বাইরে সময় কাটায়। স্কুলের একেবারে নীচু ক্লাসের ক'টা ছেলেকে পড়িয়ে পকেট খরচটা চলে। কলেজে উঠেই এসএফআইতে যোগ দিয়েছে, দেখনাদেখ সক্রিয় সদস্য। বড়ো মামার চক্ষুশূল এসএফআই, 'ওটা তো কমিউনিস্টদের নার্সারি ক্লাস। যত্ত সব এই দাবি সেই দাবি, ধর্মঘট আর বনধ্। একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে দেশটা।' তাঁর মতে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। পড়াশোনা করতে আবার ইউনিয়ন লাগে নাকি! ভাগ্যে অসীম বাড়িতে এত কম সময় থাকে যে মামার মতো সেকেলে পা-চাটা মোসাহেবমার্কা লোকের জ্ঞানদানের এখন বিশেষ সুযোগ মেলে না। ছোড়দা তো চাকুরে মেয়ে বিয়ে করে বাড়িতে এখন দাপিয়ে থাকে, বাবার কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। অতঃপর মামার কর্মজীবনের সমাপ্তি। সরকারি হিসেবে অবসরের বয়স অনেক বছর আগেই হয়ে গিয়েছিল। বেসরকারি সংস্থা বলেই এতকাল পুরো মাইনে দিয়ে কাজে রেখেছিল। আবার সেই বেসরকারি সংস্থা বলেই পেনশন নেই। এইবার লোকটা যেন পথ চলতে হোঁচট খেল। আর কর্তাসুলভ তেজ নেই, হঠাৎ যেন অন্য মানুষ।

অসীম তখন সদ্য বিএ পাশ করেছে। ইচ্ছা বিএড করে শিক্ষকতা। একদিন বড়ো মামা ডেকে বললেন, 'বাবা অসীম, তোমরা সবাই জানো আমি পড়াশোনার ভক্ত, চাই ছেলে-মেয়েরা সবাই অনেক পড়ুক। কিন্তু আমার ক্ষমতা তো আর নেই, অমিতা আর অনিতার বিয়েতে বেশ কিছু খরচও হয়ে গেছে। উপার্জন এখন শুধু প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটির অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে রেখে সুদ। মিহিররা নিজে থেকে যেটুকু করে, ব্যস। বাকি দুজন তো জানো দূরে থাকে, নিজেদের ছেলেপুলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সেই কুড়ি বছর বয়স থেকে আমি সংসার চালিয়েছি, আজ ছেলেদের কাছে হাত পাতবো তা কি হয়? তবে যা দিন কাল পড়েছে, বাজার তো আগুন। এ অবস্থায় তোমাকে যে বাবা আমি আর পড়াতে পারছি না। কাজকর্মে লাগতে হবে।'

বিএ ডিগ্রিওলা বঙ্গসন্তান ঘরে ঘরে। ওটা কোনো কোয়ালিফিকেশনই নয়। কোথায় চাকরি। ছোটো জামাইবাবুর মেজকাকা সিপিএম করেন, ঘাগু এম এল এ। পাকিস্তানে তাদের পাশের গ্রামেই নাকি ওঁদের বাড়ি ছিল। জামাইবাবু নিয়ে গেলেন ওঁর কাছে। শহরতলিতে সাধারণ একটা ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরে কাগজপত্র ফাইল বোঝাই টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসা আধ ময়লা পাঞ্জাবি-পায়জামা পড়া সাদামাঠা প্রবীণ এক ভদ্রলোক।

'তুমি শ্যামলের শালা, সেটা বড়ো কথা নয়, আমার কাছে তুমি অমূল্য স্যারের ছেলে। কী লোক ছিলেন তোমার বাবা, আমাদের স্যার। অত অল্প বয়সে কী তেজ ছিল, কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করেননি। তোমার জন্য ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।'

এই প্রথম অসীম বাবাকে নিয়ে কাউকে কিছু বলতে শুনল। না, ভুল বলল, বড়দির স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হলে এক বার মামা বলেছিলেন, 'তুই অমূল্যর মেয়ে হয়ে কী করে লেখাপড়ায় এমন হলি? তোর বাবা জানিস কী ভালো ছাত্র ছিল? কত বার বলেছিলাম কলকাতায় চলে আসতে। বলত 'লেখাপড়া শিখলেই যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই, তাহলে দেশটা তো শুধু অশিক্ষিতের হাতেই তুলে দিতে হয়।' অত অল্প বয়সেই হাই

স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে গিয়েছিল। কী সম্মান ছিল পাঁচটা গাঁয়ে। আর তুই কিনা ফেল করছিস।' ব্যস, ওই এক দিনই। আর কখনো কারোর মুখে বাবার কথা শোনেনি। কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ কনিষ্ঠ কেরানির চাকরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, জামাইবাবুর মেজকাকার পরামর্শে সব নিয়মকানুন মেনে ১০ টাকার পোস্টাল অর্ডার সহ আবেদন করেছে, লিখিত পরীক্ষায় বসেছে। রেজাল্ট বের হলে আর পাঁচ জনের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়েছে। উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ সুবিধাদান তো সরকারি নীতি। সোজা নিয়োগের চিঠিপ্রাপ্তি।

কাজে জয়েন করল। দেখা গেল ডিপার্টমেন্টে অসীম বয়সে সকলের ছোটো। প্রবীণ বড়বাবু কংগ্রেস আমলের। সস্নেহে বললেন, 'একেই তো খোকন সোনা, তার ওপর কমরেড এমএলএ-র ক্যান্ডিডেট। কোনো চাপ নেই, বুঝলে। তবে প্রতিদিন দয়া করে একটু দাঁড়ে বস। তাহলেই আমার চোদ্দ পুরুষ কেতাত্থ হবেন। ওরে, ভজা নতুন বাবুকে চা বিস্কুট দে। 'অসীম তাড়াতাড়ি বলে, 'না না' চায়ের কোনো দরকার নেই। বাড়ি থেকে এইতো ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। বরং কাজ কী করতে হবে একটু যদি দেখিয়ে দেন।'

'বাহ, খুব ভালো কথা। জয়ন্ত, একে একটু হাতে খড়ি করাও তো ভাই।'

জয়ন্ত ডিপার্টমেন্টের তালেবর কর্মী, বছর ৩৬/৩৭ বয়স। বড় বাবু, চাকরির সিনিয়ারিটিতে অনেক এগিয়ে এবং সেই হিসেবে মান্য। আসলে সেকশানটা চলে জয়ন্তেরই অঙ্গুলি হেলনে।

'এসো এসো, 'তুমি' বলছি কিছু মনে কর না। আজ থেকে তুমি আমার পাশে এই টেবিলে বসবে, আর এই দ্যাখো ফাইলে কী আছে। আমাদের এই আন্ডারটেকিঙের কাজ সারা বেঙ্গলে। তুমি লাকি, কলকাতায় পোস্টিং পেয়েছ।'

দেখতে না দেখতে অসীমের ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড জয়ন্তদা। কেন সে এত অল্প বয়সে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে থেকে শুরু করে তাদের পাকিস্তান থেকে আসা, মায়ের সংসারে খাটাখাটুনি ইত্যাদি কাহিনি দুদিনেই জানানো হয়ে গেল। শুনে জয়ন্তদা একটু হেসে শুধু বলেছিল, 'এতো আজ-কাল-পরশুর গল্প। ওটা ভুলে যাও। কাজের কথায় এসো। কলেজ জীবনে এসএফআই করতে নিশ্চয়ই। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলে। বাঃ, খুব ভালো। তাহলে তো তাহলে মানসিক ভাবে প্রস্তুত।'

কীসের জন্য প্রস্তুত জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে যায়। ক্যান্টিনে জয়ন্তদার সঙ্গে তার মতো আরও ক'জন চেলা বসে। জমিয়ে আড্ডা কাম লেকচার। না, অফিসের কথা হয় না। কথা হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, চায়নার উন্নতি নিয়ে। সে সব দেশে সাধারণ মানুষ দারিদ্র থেকে মুক্তি লাভ করেছে, তাদের খাওয়া-পরা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সব কিছুর ব্যবস্থা সরকার করে, কারণ দুটো দেশই হচ্ছে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক।

'বুঝলে অসীম, আর মার্ক্সবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি।'

জয়ন্তার হাত ধরে চলতে চলতে কবে কখন অজান্তেই বাঙ্গালি মার্কা মার্ক্সবাদে হাতে খড়ি হয়ে যায়। তার জন্যে অবশ্য তাকে মার্ক্সের লেখা বইটই পড়তে হয়নি, জয়ন্তদাও পড়েনি। তারই মতো কয়েকটা প্যাম্পফ্লেটে চোখ বুলিয়েছে। আসল কথা পার্টির নেতাদের বক্তৃতা শোনা আর পার্টির যাবতীয় প্রোগ্রাম কার্যকর করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই মার্ক্সবাদী হওয়া যায়। বাড়িতে কাউকে অসীম বলেনি, কত নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে জয়ন্তদা অনায়াসে আলোচনা চালায়। যেমন ক্যান্টিনে টিফিন খাওয়ার সময় জয়ন্তদা সমানে বোঝান', পাকিস্তান থেকে তারা বেশিরভাগ ভিটেমাটি হারিয়ে এদেশে এসেছিস, সেখানে প্রচুর দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে, অনেক বীভৎস কাণ্ডকারখানাও। কিন্তু কেন এ সব হয় কেউ বলে না। সব সাম্রাজ্যবাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির পরিণাম। আর এই পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি হলো ধনতন্ত্র। আরে, মুসলমানরা অত্যাচারী নয়, তারাও হিন্দুদের মতোই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার। আমরা তো শত শত বছর হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে বসবাস করে এসেছি, কখনো পার্টিশন হয়েছে, দাঙ্গা হয়েছে, রিফিউজি হয়েছে কোনো জাত?'

পাশের টেবিলে প্রতিদিনের মতো টিফিনে বাঁধাধরা ডিমের ডেভিল খেতে খেতে অ্যাকাউন্টসের হেড অর্ধেন্দুবাবু গলা বাড়িয়ে বলেন,' তখন দাঙ্গার দরকার হতো না। শতশত বছর তো বাইরে থেকে এসে হামলা চালিয়ে পাঠান মোগলরা রাজত্ব করেছে। মুসলমানদেরই জমানা ছিল। তুর্কি, উজবেক, আফগান যে যার প্রাণ চায় করেছে, হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গেছে, রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, গলায় গামছা দিয়ে হাজার রকমের ট্যাক্স আদায় করেছে, হিন্দুর মেয়ে কত তুলে নিয়ে গেছে সে কথা তো ছেড়েই দিলাম। বাধা দেবার বুকের পাটা ক'টা হিন্দুর ছিল। ওই তো সবেধন নীলমণি রাণা প্রতাপ আর শিবাজী। আমরা বাঙ্গালিরা তো কস্মিনকালেও ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারিনি।'

জয়ন্তদা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার মধ্যে অর্ধেন্দুবাবু খাওয়া শেষ করে দাঁড়িয়েছেন, হাত নেড়ে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে চলেন, ইংরেজ এসে আমাদের জান-মান-ধন সব বাঁচালো, আমরা বাঙ্গালিরা দুটো ইংরেজি পড়ে পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন কাজকর্ম করে সুদিনের মুখ দেখলুম। হতচ্ছাড়া জাতের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সাহেবের পিছনে লেগে গেলুম। ইংরেজের সঙ্গে চালাকি। তারাও যাবার আগে ওই কমিউনিজমের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। স্বদেশিদের সব জেলে পুরে মার্ক্স এঙ্গেলস পড়িয়ে কমিউনিস্ট বানিয়ে ন্যাশনালিজমের দফা রফা। বিলেতে পড়তে যাওয়া ইয়ং ছেলে ছোকরাদের

কমিউনিস্ট করে দেশে ফেরাল। ব্যাস, কেল্লা ফতে। দেশ স্বাধীন করবি, কর, দেখ কী ঘণ্টা পাবি। বার্ন্ট আর্থ পলিসি, বুঝলে, যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় সব সম্পত্তি পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যাওয়া, যাতে শত্রুরা জয়লাভ করলেও ভোগ করার কিস্যু পাবে না। ব্রিটিশ রেখে গেল কমিউনিস্টদের। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সব কলকারখানা বন্ধ, স্টেটের অর্থনৈতিক ভিত্তিটা ভেঙে চুরমার। দেখ, জয়ন্ত, আর যাই কর, পার্টির হয়ে তোতা পাখির মতো বুলি কপচিও না। 'অর্ধেন্দুদা, আপনার সঙ্গে আমি আর এক দিন বসব। এখন আমি এদের সঙ্গে কথা বলছি।'

'সে তো বলবেই। তোমাদের শিকার ধরার ধান্দাবাজি জানতে কারও আর বাকি নেই।' রাগে গরগর করতে করতে অর্ধেন্দুবাবু চলে যান। জয়ন্তদা গলা নামিয়ে বলে, লোকটা এক নম্বরের রিঅ্যাকশানারি, প্রো-ক্যাপিটালিস্ট, খুব ডেঞ্জারাস। তোমরা এক দম ওর কথায় কান দেবে না। ধারে কাছেই ঘেঁষবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। হিন্দু মুসলমান উভয়েই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার। পূর্ববঙ্গে কী হলো, হিন্দু মুসলমান দুটো ভিন্ন শ্রেণী হয়ে গেল। হিন্দুরা মাইনরিটি, কিন্তু ধনী— জমিদারি, দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য সব হিন্দুর, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া ক্লাস পুরো হিন্দু, যেমন স্কুলের টিচার হিন্দু, কলেজের প্রফেসর হিন্দু, কোর্টকাছারির উকিল হিন্দু, ডাক্তার বদ্যি সব হিন্দু। আর মুসলমান হচ্ছে গরিব অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া, গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মেজরিটি। এমন অবস্থা কতদিন চলতে পারে? যাকে দাঙ্গা বলা হয় সেটাতো আসলে শ্রেণী সংগ্রাম। আর শ্রেণী সংগ্রামের উদ্দেশ্য কী? সামগ্রিক ধনের পুনর্বণ্টন, ভারসাম্য আনা। 'বর্ধমানের সুবোধ মিন মিন করে বলে,' কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও তো জমিদার হিন্দু ছিল আর ব্যবসাদার মাস্টার, উকিল, ডাক্তার, ফাক্তার, কেরানি, অফিসার সবাই এখানেও হিন্দু। কই, দাঙ্গা তেমন হয়নি। তাছাড়া হিন্দু গরিবও তো প্রচুর, এই তপশিলি জাতের বেশিরভাগ গরিব, নমশূদ্র, হাড়ি, বাগদি, ডোম টোমরা—।'

জয়ন্তদা বাধা দিয়ে বলেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা আলাদা। এখন আমরা শুধু ইস্ট বেঙ্গলের কথা আলোচনা করছি।'

অসীমের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি থেকে আসা সহকর্মীদের পালটা খুচখাচ সমালোচনায় মাথা ঘামায় না। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে আসলে শ্রেণীসংগ্রাম সে সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল। বাংলাদেশ থেকে এখন আকচার মুসলমানরাও ভারতে ঢুকছে, তো কী হয়েছে। এই পার্টিশনটাইতো ইংরেজদের বজ্জাতি। আমরা তো এক দেশ, এক জাতি (যদিও পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ এত ভিন্ন)। তাছাড়া কারা আসছে দেখ, বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি কি? না, সব ওদেশের গরিবগুর্বো মানুষ, যাদের ওখানে দুবেলা দুমুঠো খাদ্য জোটে না। সর্বহারার আবার বর্ডার কী? পেটের ধান্দায় মানুষ যেখানে পারবে যাবে। পার্টি মুখে না বললেও ক্যাডার দিয়ে যারা আসছে তাদের ঢুকতে, সেট্‌ল করতে সাহায্য করছে। করাই তো উচিত। সত্যি, অসীম জয়ন্তদার সঙ্গে একেবারে এক মত। বাঁকুড়ার নিখিলের আবার সরল মন, বলে ফেলে, 'তাছাড়া এরা সব ভোটার হয়ে আমাদের পার্টিকে ভোট দেয়, তাই না জয়ন্তদা?'

একটু যেন থতমত খেয়ে যায় জয়ন্ত। বিরক্ত মুখে বলে, 'এখানে আবার ভোটের কথা আসে কী করে। গরিবের বেসিক প্রবলেমের কথা হচ্ছে।' শ্রেণী সংগ্রামের প্রসঙ্গে চলে যায় জয়ন্ত। খেটে খাওয়া মানুষের শ্রেণীশত্রু সব পুঁজিপতি এবং খুব সুবিধাজনকভাবে বেশিরভাগই অবাঙ্গালি। বাঙ্গালি তো এখন রাজনীতি, শোষিতের মুক্তি আন্দোলন আর সাহিত্য সংস্কৃতিতেই নিবেদিতপ্রাণ জাতি, কলকারখানা, ব্যবসাট্যাবসা করার মতো তার আর মানসিকতাই নেই। কাজেই মুখে না বললেও, শ্রমিক প্রচুর হিন্দিভাষী হলেও, স্লোগান সব হিন্দিতে হাঁকা হলেও, যেন বাঙ্গালি শ্রেণীশত্রু তেমন না থাকায় বাঙ্গালি নেতাদের ঠিক গায়ে লাগে না। কোনো না কোনো কারখানায় ধর্মঘট প্রতি দিনের ঘটনা। পুঁজিপতি মাত্রেরই কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার উন্মুক্ত আহ্বান জারি। ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালিদের গড়ে তোলা পুরনো স্বদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও বাদ যায় না।

বাড়িতে মামার খেদ, আরও একটা ইন্ডাস্ট্রি লালবাতি জ্বালল। কাস্তে হাতুড়ি মানেই সব কাটো ভাঙ্গো ভাঙ্গো, এই তোদের সিটুর ছব্বা। হাওড়া ছিল ভারতের শেফিল্ড, এখন শিল্পের মরুভূমি। ওরে, তোদের ছেলেপুলেরা খাবে কী, কোথায় কাজ করে বাঁচবে, একবার ভেবে দেখেছিস? এই পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের মানুষকে কাজ দিত, মুখের অন্ন জোগাত, অমিতাভ বচ্চন পর্যন্ত কলকাতায় চাকরি করে গেছে। আজ নিজেদের ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত এ রাজ্যে চাকরি নেই, অসহ্য। অসীমের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এখন শুধু সকালে বাজারটা রান্নাঘরে নামিয়ে রেখে স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া আর রাতে ফিরে দুটো মুখে দিয়ে শোওয়া।

বেশ কয়েক বছর সিটুর কর্মকাণ্ডে নিবেদিত একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে কাজ করার পর অবশেষে সেই পরম লগন এল, তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্মানলাভ। মার্ক্সবাদী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেল। জয়ন্ত তাকে ডেকে নিয়ে বলে, 'আজ ক্যান্টিনে নয়, চল একটু বাইরে কোথাও বসি।

একটু হেঁটে এগিয়ে পুরনো নিউ দেশবন্ধু কেবিনে দুজনে বসে।

কী খাবে? আমি খাওয়াবো আজ। ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলি? আর চা, কী বল।

মাথা হেলায় অসীম। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেলে জয়ন্ত বলে, অসীম এই যে তুমি পার্টির মেম্বার হলে এর পুরো অর্থটা কী, বুঝলে?

কী জয়ন্তদা?

লেফ্‌ট ফ্রন্ট।

লেফট ফ্রন্ট কারা চালায়?

সিপিআইএম।

আর এই সিপিআইএম পার্টির সত্তর শতাংশ সদস্য পূর্ব বঙ্গের, মোটে তিরিশ শতাংশ পশ্চিমের। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল, আমরা বাঙালরা কার্যত পশ্চিমবঙ্গের হর্তাকর্তাবিধাতা। এই যে সিটুর সব ট্রেড ইউনিয়নগুলো, কারা লিডার? বেশির ভাগ পূর্ববঙ্গের এবং তোমার মতো উদ্বাস্তু। হ্যাঁ, তারা তোমার চেয়ে আগে এসেছে, তুমি ১৯৬৪তে এসেছ, ওঁরা ১৯৫০ কী ১৯৪৭-এ। বয়সে খানিকটা বড়ো। ব্যস, ওইটুকুই তফাত। ক্যাবিনেটে কতজন মন্ত্রী ওপার থেকে আসা, জানো তো? তাদের প্রতিপত্তি দেখছ? কেমন লাগছে শুনতে? এতকাল উদ্বাস্তু হয়ে মামার বাড়িতে বলতে গেলে আশ্রিতের জীবন, তোমার মায়ের সকাল থেকে সন্ধ্যে বিনামাইনের দাসিবৃত্তি। কেন, কারণ তোমারা ছিন্নমূল, তোমাদের পায়ের তলায় মাটি ছিল না। আজ সেই মাটি পেতে চলেছে, বুঝলে?

কৃতজ্ঞতায়, আবেগে গলা দিয়ে স্বর বেরয় না অসীমের, মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়।

সেই গানটা মনে কর, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, 'জাগো, সর্বহারা অনশনবন্দি ক্রীতদাস—'

মনটা আজ তার শান্ত, পরিপূর্ণ। কাকে বলবে তার এই সাফল্যের কথা। একজনই তো বুঝবে, মা। অসীম তাড়াতাড়ি আজ বাড়ি ফেরে। মায়ের অবশ্য তখনো হেঁশেল সারা হয়নি। ছোড়দার বিয়ের পর মায়ের খাটুনি আরও বেড়ে গেছে। দুজনের অফিসের ভাত, এখন আবার টিফিন করে দিতে হয়, বিকেলে জলখাবার লাগে। আগে ছোড়দা বাইরে যা হোক খেয়ে নিত, বাড়ি ফিরে চা বিস্কুট, বড়োজোর এক বাটি মুড়ি মাখা। বিয়ের পর রুটিন পালটে গেছে। ফিগার সচেতন রিসেপশনিস্ট বউ বাড়ির রান্না ছাড়া কিছু মুখে দেয় না। তার নিজের তো সংসারে হাত লাগাবার প্রশ্ন ওঠে না, সে তো ছেলেদের মতো চাকুরে, ছেলেরা কী সংসারে কুটোটি নাড়ে! যাই হোক, এত কথার কোনো প্রয়োজন হয়নি। বউমাকে মামি 'একটু রান্নাঘরে হাত লাগাও না', বলতে না বলতে 'না না থাক, ওর আপিস আছে,' বলে মা-ই আগ বাড়িয়ে টিফিন তৈরিতে লেগেছেন। ক'দিন যেতে না যেতেই বউদি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছোড়দাকে বেশ উঁচু গলায় বলে, 'তোমাদের বাঙালদের মতো হাড়কিপটে জন্মে দেখিনি। মোটা কাজের লোকও একটা রাখতে পার না, সব ওই বয়স্ক মানুষটার ঘাড়ে। চোখের চামড়াও নেই, ধন্যি বাবা!'

দুদিনের মধ্যে রবির মা নিয়োগ, ছোড়দার উদার ভঙ্গিতে ঘোষণা', ওর মাইনেটা আমিই দেব। মামি তো এত বছর শুয়েবসে প্রচুর মেদ এবং বাতের ব্যথা সঞ্চয় করেছেন। ভারী শরীরে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটু চেপে ধরে মন্তব্য করেন, 'তবু যা হোক পিসির জন্য দরদ দেখালি, মায়ের বেলা তো অষ্টরম্ভা।'

ছোড়দা ছাড়বার পাত্র নয়, সটান জবাব দেয় 'মাকে পিসির মতো খাটতে দেখি, তখন দরদ দেখাব।'

বউদি চালাক মেয়ে, কথা বাড়তে দেয় না, 'ঠিকে কাজের লোক একটা থাকলে সংসারে সুবিধা, মা'।

তবুও অসীম চাকরিতে যোগ দেবার পর প্রথম মাসের মাইনে থেকে মায়ের জন্য কালো ফিতে পাড় সাদা শাড়ি কিনে নিয়ে প্রণাম করলে তিনি কেঁদে ফেলে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, 'এবারে আলাদা বাসা কর, আমি আর কত কাল দাসীবৃত্তি করে যাব।'

হ্যাঁ, সে কথাও জয়ন্তদার সঙ্গে হয়েছে। ভাড়া বাড়িটাড়ি নয়, সুবিধে মতো একটা কোনো নতুন হাউসিং-এ ফ্ল্যাট পাইয়ে দেবেন। তার আগে হাউস লোনটোনের বন্দোবস্ত করতে হবে। স্যাংশান হয়ে যাবে, সে আশ্বাসও পেয়ে গেছে। ওই ফ্ল্যাট হয়ে গেলেই তোমার পায়ের তলায় মাটি এক্কেবারে পাকা, বুঝলে অসীম।

খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। মা, জানো, আজ একটা দারুণ খবর আছে।

কী দারুণ খবর রে? ভালো খবর নিশ্চয়ই। মায়ের রোগা মুখে হাসির ছোঁয়া। আলতো করে ছেলের মাথায় পিঠে হাত বোলান।

আমি পার্টির মেম্বার হয়ে গিয়েছি।

পার্টি! কী পার্টি রে?

মা, বেঙ্গলে তো একটাই পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি, না, যাকে বলে ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। আমাকে তার সদস্য করে নিয়েছে।

মায়ের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। অসীমের পিঠে রাখা হাতটা নামিয়ে নেন। রক্তহীন সাদা মুখ।

তুই কমিউনিস্ট! কমিউনিস্ট হয়েছিস! কী বলছিস কী?

হ্যাঁ, হয়েছি। তাতে তুমি এমন করছ কেন? কী হলো?'

'ওরে' তোর বাবা যে ওই কমিউনিস্টদের ভীষণ বিরুদ্ধে

ছিলেন, বলতেন, বিশ্বাসঘাতকের দল, আগাগোড়া ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, ওরাই সবচেয়ে আগে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ সমর্থন করেছে। যে দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে কুকুর বেড়ালের মতো খেদানো হচ্ছে, অসংখ্য ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা ঘটছে। দেশভাগের জন্যই আজ পূর্ববঙ্গে আমাদের এই অবস্থা। আর তুই কি না—

দেখ মা, সে অনেক কথা। তুমি হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপারটা বল তো? পার্টিশন তো পুরো ইংরেজদের বজ্জাতি ছিল, আমি এক দিন তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব, ওটা ধর্মটর্মের ব্যাপারই নয়, স্রেফ শ্রেণী সংগ্রাম।

শ্রেণী! কীসের শ্রেণী! ওগুলো সব পুঁথি পড়া বুলি। আমার কী শ্রেণী? আমিতো ঢাকার ভদ্র ঘরের মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ, শুদ্ধ বাংলা বলতে লিখতে শিখেছিলাম, তোর বাবা থাকার সময় কত পড়তাম, শ্বশুর মশাইয়ের কেনা সব বাংলা বই, বাঁধানো পুরনো মাসিক পত্রিকা, রোজকার খবরের কাগজ, সব পড়তাম। সংসারের যাবতীয় কাজ, উঠোন নিকোনো থেকে রান্নাবান্না, সব কিছু করেও। তোদের বাবা, ঠাকুরদা চাইতেন আমি পড়ি। আর কলকাতায় এ বাড়িতে? আজ আমি কোন শ্রেণী বলতে পারিস? শ্রেণী দিয়ে মানুষের বিচার হয়। তাছাড়া আসলে ওখানে কী ঘটেছিল, কী ঘটে, তুই তো কিছু জানিসই না।

কী জানি না, মা? সবাই সব কিছু জানে, কত আলোচনা করি আমরা। তোমাকে সব বোঝাবো।

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলেন, রাত অনেক হলো, কাল আবার সকলের আপিসকাছারি আছে, সকাল সকাল ভাত চাই। আমি শুয়ে পড়ছি।

গলার স্বরে সেই পরিচিত কাঠিন্য যা তাঁর ক্রোধের বরাবর একমাত্র প্রকাশ, অসীমরা তিন ভাই-বোন বিলক্ষণ জানে।

আনন্দ অনেকটাই মাটি। কী করবে। জয়ন্তদার পরামর্শ নেবে? হঠাৎ মনে হলো মায়ের সম্বন্ধে বাইরের কারোকে কিছু বলা যায় না। ঠিক করে দিদিদের সঙ্গে কথা বলবে। বড়দি তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে আকণ্ঠ সংসারে ডুবে আছে। সারাক্ষণ ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে রাখে। সিরিয়াস কথাবার্তার অযোগ্য। বড়ো জামাইবাবুও খালি কোনোক্রমে দু' পয়সা রোজগারের তালে থাকেন, পুরো পাতি বুর্জোয়া। ছোড়দি তবু একটা মিল্ক বুথে কাজ করে। একটু বাইরের জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া ছোটোজামাই বাবু লেফটেইন্ডেড, উনিও সিটু করেন।

কাজেই পরের রোববারই সকালে ছোড়দিদের ফ্ল্যাটে সন্দেশের বাক্স হাতে হাজির হয়, পাঁচ বছরের ভাগ্নে রাজার জন্য একটা ক্যাডবেরিও নিয়েছে। হাজার হলেও কুটুম বাড়ি, লৌকিকতা করাটা দরকার। ছোড়দির বাড়িতে ঢুকে আগে তার শ্বশুর-শাশুড়ির ঘরে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করে। তাঁরা নাতির সঙ্গে গল্প করছিলেন। মিষ্টির বাক্সটা শাশুড়ির হাতে ধরিয়ে রাজার হাতে ক্যাডবেরিটা দেয়। না না, ভদ্রতা নয়, অনেক দিন পরে এল, তাই। মা, মামার বাড়ির সব কেমন আছে ইত্যাদি ফালতু আদানপ্রদানের পর মাঝে মাঝে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপরই জামাইবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে। তার পার্টির মেম্বার হওয়ার সংবাদটা দেয়। 'বাহঃ, শালাবাবু, তুমি তো একটা কাজের মতো কাজ করে ফেলেছো। মেজকাকাকে বলব, খুব খুশি হবেন। আমার আবার মেম্বারটেম্বার হওয়ার মতো অত এস্থু নেই, সংসারে অনেক সময় দিতে হয়, তোমার দিদিও তো বাইরে কাজ করে কিনা, ছেলের স্কুল আছে। বাবা-মা বয়স্ক মানুষ, এটা সেটা শারীরিক সমস্যা লেগেই আছে। ডাক্তার-ওষুধপত্র সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হয়। অনিতা, অনিতা, শোনো তোমার ভাইটির কীর্তি। আর শালাবাবু, একেবারে দুপুরে খেয়ে যাবে, রোববার বলে বাজার থেকে খাসির মাংস এনেছিলাম, বেশ সেলিব্রেশান হবে।'

অতঃপর দেশের আর পাঁচটা অ-বামপন্থী রাজ্যের করুণ দশা ও কেন্দ্র সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের জোর আলোচনায় দুজনে মেতে যায়।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর জামাইবাবু বিশ্রাম করতে শোয়ার ঘরে। দিদি ভাই একান্তে বসে বৈঠকখানায়। 'মা কেমন আছে রে? তোর খবরে খুশি?'

'না, একেবারেই না। তাইতো তোর কাছে এসেছি জিজ্ঞাসা করতে, বাবা নাকি কমিউনিস্টদের খুব বিরোধী ছিল?'

বাবার নাম করতেই ছোড়দির মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

'তোর কিছু মনে আছে পাকিস্তানের কথা?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ছোড়দি নীরবে মাথা নাড়ে, না।

তোর তো তখন ন' বছর বয়স, বড়দির বারো। তোদের তো কিছু না কিছু মনে থাকার কথা।

কতদিন আগের কথা। তারপর আমরা দেশ থেকে চলে এসেছি। কোনো যোগাযোগও আর নেই, অত কি মনে থাকে?

আরে, সব খটনার কথা বলছি না। মোটামুটি অন্তত একটা আভাস তো দিতে পারিস বাবা পার্টিশান সম্পর্কে, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কী বলত। তাছাড়া হিন্দুদের তো ওখানে সব ভালো অবস্থা ছিল, আমরা বাড়িঘর জমিজায়গা, এত সম্পত্তি সব ছেড়ে হঠাৎ এরকমভাবে বলতে গেলে এক বস্ত্রে একদিন চলে এলাম কেন?

কোথায় সব হিন্দুদের ভালো অবস্থা। কত গরিব হিন্দু ছিল। ওসব জমিজায়গা সম্পত্তি ফম্পত্তির কথা রাখ। ভারি তো সম্পত্তি। জমির কী হ্যাপা, তার ওপর ফসলের গতি কী হতো তোর কি ধারণা আছে? আরে বসত বাড়িতেই তো আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, বলেই ছোড়দি ডান হাত দিয়ে নিজের মুখ

চেপে ধরে।

কারা কারা আগুন দিল? আমরা কী করলাম, বাবা তখন কোথায়—

চুপ চুপ। আর কথা নয়।

ছোড়দি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অসীম একা বসে থাকে। স্তম্ভিত। বেশ খানিকক্ষণ। বেলা পড়ে আসে। জামাইবাবু রবিবারের নিটোল দিবানিদ্রা সেরে বসার ঘরে এসে অসীমকে বসে থাকতে দেখে বলেন, 'শালাবাবু, তুমি কি ঠায় বসে আছো নাকি? তোমার দিদি ওইযে তক্তপোশটাকে ডিভান বানিয়েছে। ওখানে একটু গড়িয়ে নিলে পারতে।'

না, না, আমার তো দুপুরে শোয়া অভ্যাস নেই। ছোড়দির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

বেশ বেশ। অনিতা, একটু চা-টা দাও ছোটো ভাইটাকে। তার আনা সন্দেশের সদ্ব্যবহার করা যাক। দুপুরে তো বাক্সটা খোলাই হলো না। কী বললে, বাবা মা খেয়েছেন? ও হ্যাঁ, ওঁরা তো আবার খাসির মাংস খান না।

জল বসিয়েছি। এখুনি হয়ে যাবে।

অতঃপর সন্দেশ, চানাচুর আর চা খেয়ে অসীম উঠে পড়ে। ছোটো জামাইবাবু তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে পিঠে হাত রেখে বলেন, 'তুমি এলে, দিনটা চমৎকার কাটল।

এরকম ছুটিছাটায় এসে যাবে। বুঝলে?'

ছোড়দির কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খায়। পাকিস্তানে অনেক গরিব হিন্দু ছিল, তাদের নিজেদেরও এমন কিছু সম্পত্তি বা জমিজায়গা ছিল না। চাষবাস ফসলের কী গতি হচ্ছিল, সেটা না হয় তার তিন বছর বয়সে জানাবোঝার কথা নয়। কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগাটা তো বোঝার কথা। আচ্ছা, কী রকম বাড়ি ছিল তাদের? নিশ্চয় গরিবগুর্বোর মতো খড়ের চাল নয় যে একটা কিছু জ্বেলে ছুড়ে দিলেই আগুন ধরে যাবে, যেমন সিনেমায় দেখায় গরিব চাষিরা খাজনা না দিতে পারলে বা মহাজনের ধার না শুধতে পারলে, কী কোনো রকম বেগড়বাই করলে তাদের ঘরবাড়ি জমিদার জোতদার মহাজন আগুন ধরিয়ে অসহায় খেটে খাওয়া লোকগুলোকে পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অসীম হাঁটে। সমানে হাঁটে। মনটা আরও অস্থির হয়ে গেছে। এতদিন সমানে মন্ত্র জপের মতো শোনা পূর্ববঙ্গে ধনী হিন্দু আর গরিব মুসলমানের সরল হিসেবটায় এখন গরমিল কেন?

শেষে যখন বাড়ি পৌঁছায় তখন রাত দশটা প্রায় বাজে। ছোড়দারা শ্বশুরবাড়িতে উইকএন্ড সেরে একদম সোমবার অফিস করে ফেরে। মামি নিজেদের শোয়ার ঘরে টিভির বাংলা সিরিয়েলে মগ্ন। মামা একফালি বৈঠকখানায় সেকেলে লম্বা পা মেলা চেয়ারে আধশোয়া। এক পাশে রোববারের সাময়িকীটা খোলা পড়ে আছে।

কীরে, এতক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়ল, সেই কখন বেরিয়েছিস? তা, অনিতারা সব ভালো আছে? বেশ বেশ। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। যা ভেতরে যা, তোর মা তোর জন্য বসে আছে নিশ্চয়। যাই, আমিও একটু টিভি দেখেটেখে শুয়ে পড়ি। মামা উঠে পড়েন।

কেন যে মা এটা করে। কতবার বলেছি, খেয়ে শুয়ে পড়বে। আমি ঠিক বেড়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে থালাবাটি কলতলায় রেখে দেব।

বলতে বলতে অসীম হাত মুখ ধুতে যায়।

মা, তুমি আবার আমার খাওয়ার জন্য বসে আছো।

অনুযোগের স্বর অসীমের। ঘরের ভেতর থেকে জবাব আসে, না, ঠিক তোমার খাওয়ার জন্য নয়। তোমাকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল, দিনের বেলা তো সময় হয় না।

একটু থমকে যায় অসীম, মা তখনই 'তুই' থেকে 'তুমি'তে চলে যান তার মানে পরিস্থিতি সঙ্গিন। ঘরে ঢুকে দেখে তক্তপোশের তলা থেকে মায়ের সেই আদ্দিকালের ছোটো টিনের ফুলকাটা সুটকেসটা বেরিয়েছে, একমাত্র যেটা নিয়েই তারা দেশ ছেড়েছিল। সকলের দু'চারটে মামুলি জামাকাপড় নাকি ছিল। পরে মা তার পোশাকি শাড়ি-ব্লাউজের সেট আর শীতে গায়ে দেওয়ার চাদরখানা রাখেন। এখন সেটা থেকে মা কী বের করছেন? একটা মলাট দেওয়া খাতা।

তোমাদের বাবা শেষের দিকে মাঝে মাঝে লিখতেন। কী লিখছ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ''যা লিখছি সবই তোমার জানা। যারা কোনোদিন হয়তো জানতে পারবে না তাদের জন্য লিখে যাচ্ছি। যত্ন করে রেখো। কিছুতেই হাতছাড়া করো না। আমাদের জন্য পূর্বপুরুষ, জমিজায়গা, পড়াশোনার ঐতিহ্য, সনাতন মূল্যবোধ, সব রেখে গিয়েছিলেন। আমি হয়তো ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারবো না। তাই লিখছি।'' আর আমি, অন্যেরা গয়নাগাটি, দলিলটলিল যেমন ভাবে লুকোত, তেমনই ভাবে খাতাটাকে বিস্কুটের টিনে পুরে এঁটে বন্ধ করে মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। বহু কষ্টে নিয়ে এসেছি। তুমি বাবার উত্তরাধিকারী। এখন সাবালক, স্বাবলম্বী। বাবার কথাগুলো তোমার জানা দরকার। এই নাও।

খবরের কাগজের মলাট দেওয়া একটা চটি এক্সারসাইজ বুক। পুরনো অতি মলিন জীর্ণ চেহারা, কালের অমোঘ ছাপ। বাবা আমার জন্য কী লিখে রেখে গেছে। অসীমের মনে প্রবল কৌতূহল, আবার কেমন যেন একটা প্রচণ্ড ভয়ভয় বোধ।

আমি তো অনেক দিনই সাবালক। তুমি তো আগেই আমাকে খাতাটা দিতে পারতে। আর দিদিরা—

যত্ন করে তুলে রাখো— তাকে বাধা দিয়ে মা বলেন, পুরনো বাতিল খাতা ভেবে রবির মা আবার যেন ফেলে না দেয়। রান্না ঘরের দিকে চলে যান।

সত্যি, কোথায় রাখবে খাতাটা। ঘরে যে ছোটো আলমারিতে তাদের দুজনের যাবতীয় জিনিসপত্র থাকে, সেখানেই তার পরীক্ষার সার্টিফিকেট, চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইত্যাদি দরকারি দলিলের বড়ো খামটায় ঢুকিয়ে রাখে। খাওয়াদাওয়া সেরে মা ও ছেলে শুয়ে পড়ে। ঘুম নেই অসীমের চোখে। মনে উদগ্র কৌতূহল, কী আছে খাতাটায়, কখন কীভাবে পড়ে জানবে। আলো জ্বাললে মায়ের পাতলা ঘুম ভেঙে যাবে। কোথায় পড়বে? হ্যাঁ, বৈঠকখানায়, সেখানে মামার লম্বা আরামকেদারা ছাড়া গোটা চারেক কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিলও আছে। আসলে এটা একদা তাদের পড়ার ঘরও ছিল। অসীম পা টিপে টিপে উঠে আস্তে করে আলমারি খুলে সেখান থেকে খাতাটা বের করে নিয়ে ঘর থেকে বেরয়। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় যায়। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে। খাতাটা টেবিলে রেখে খোলে। ছাত্রাবস্থায় যেমন করত। আজও কি কোনো পরীক্ষার জন্য অসীম তৈরি হচ্ছে?

''৭ই আগস্ট ১৯৬১। আমি অমূল্য কুমর দত্ত, পিতা অতুল্য কুমার দত্ত, মাতা সুকুমারী দেবী। আমার স্ত্রী রমা, দুই কন্যা, অমিতা, অনিতা ও শিশুপুত্র অসীম। নিবাস পিতৃপুরুষের ভিটায়, গ্রাম কুলদলি, জেলা খুলনা, অধুনা পূর্ব পাকিস্তান।

কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে চারিদিকে যা যা ঘটছে সেগুলি নথিভুক্তীকরণ প্রয়োজন। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে যে ভারতীয় সভ্যতার অংশ তার প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বমানের সাহিত্য ছিল, দর্শন ছিল, ছিল গণিত জ্যোতির্বিদ্যা আরও কত কী। ছিল না ইতিহাস। এই দেশের মাটিতে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, বার বার বর্বর বিদেশিরা আক্রমণ করেছে, শেষে স্বাধীনতা হারিয়েছি। সে সব বৃত্তান্ত কেউ লিখে রাখেনি। সব কালের করাল গ্রাসে বিলুপ্ত।

এমনকি আমরা কেউ নিপীড়নের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করে রাখিনি, রাখি না। ইহুদিরা যেটা করে। আমার ক্ষমতা অতি সীমিত, উদ্দেশ্য অতি সীমিত। একটি বিশেষ সময়ে একটি স্থানের ঘটনাবলী। যাতে স্মৃতি অন্তত যেন থাকে, সময়ের সঙ্গে বাস্তবের সব কিছু নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর শিকড় ছিঁড়ে পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস হলো পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস। সদস্যরা দেশ ভাগের বিরোধী হলেও পাকিস্তান হবার পর মেনে নিয়ে রয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের আদর্শ সেই গান্ধীবাদ, সেকুলারিজম আর সমাজতন্ত্র। তাঁরাই স্বাধীনতার পর পর ধীরেন দত্তের নেতৃত্বে পাকিস্তানের কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লিগের সদস্যরা বিরোধিতা করে শুধু উর্দু আর ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব পাশ করলো। বাবা ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য। যদিও পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কিরণ শঙ্কর রায় নিজেই পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, তবু অনেক কংগ্রেসির মতো বাবাও দেশের মাটিতে থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুর সসম্মান অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। কার্যত ৪০-এর দশকের শুরু থেকে, বিশেষ করে '৪৬-এর নোয়াখালি হিন্দু উৎসাদনের পর থেকে পূর্ববঙ্গের এখানে-ওখানে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছিল। পূর্ণ শান্তি কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫০ সালে জেহাদি মুসলমানদের আক্রমণ এত ভয়ঙ্কর হলো যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত এবং সাড়ে চার মিলিয়ন হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। মুসলিম লিগের হিন্দু সদস্য বিশ্বাসঘাতক যোগেন মণ্ডল পর্যন্ত তার মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে ভারতে পালিয়েছিল। কিন্তু বাবা দেশ ছাড়েননি। পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগের প্রশ্নই মনে আসেনি। আর একটি কারণ, খুলনা হিন্দুপ্রধান জেলা, তাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ ছিল। পাকিস্তানে তো এ জেলার আসারই কথা নয়। নেহাত মুসলমানপ্রধান মালদা ও মুর্শিদাবাদকে ভারতে রাখতে খুলনা আর চট্টগ্রাম পাকিস্তানে এসেছে। তবে কতদিন এই নিরাপত্তা? জীবনের শেষের দিকে বাবা নিজেই আমার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। মরার আগে বললেন, 'অমূল্য, কথা দে, বাপঠাকুরদার মাটির জন্য লড়াই করবি, প্রাণ থাকতে দেশ ছাড়বি না।'

'না ছাড়ব না, কথা দিলাম।' উত্তর দিয়েছি। তারপর এক দশক কেটে গেছে।'

অধীর হয়ে অসীম চোখ বোলায়, সব ধরাবাঁধা সেন্টিমেন্ট, যেন সিনেমার পরিচিত ডায়লগ, সব জানা কথা, কয়েকটা তারিখ, কয়েকটা জায়গার নাম, কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা, সব হিন্দুদের সঙ্গে অবিচার, তাদের ব্যবসাবাণিজ্যে হামলা, তাদের জমির ফসল কী গাছের ফল কেটে নেওয়া, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, জোর করে মুসলমান বানিয়ে নিকে করা, অতঃপর পরিবারের বাকিদের অবধারিত দেশত্যাগের বৃত্তান্ত। টিপিক্যাল কংগ্রেস মার্কা লেখা। খবরের কাগজের নিউজের মতো সংক্ষিপ্ত। এ সব সম্পর্কে তো অসীমের মোটামুটি ধারণা আছে। জয়ন্তদা'র কাছ থেকে কত শুনেছে। জমিদার, বানিয়া আর বুর্জোয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে সর্বহারা খেটেখাওয়া মুসলমানদের আক্রোশের প্রকাশ। কিন্তু তাদের পরিবারের সঙ্গে কী ঘটল, বা আদৌ কিছু ঘটেছিল কি?

হ্যাঁ, এই বার লাগাতার ক'টা বড়ো এন্ট্রি।

''১২/৭/৬৩ আমার স্কুলে বেশ কয়েকটা গ্রাম থেকে ছেলেরা পড়তে আসে, হাই স্কুল, তার ওপর সুনাম আছে। ছাত্র ও ছাত্রদের অভিভাবকরা আমাকে সম্মান করে। আমি আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার, আগের হেড রিটায়ার করলে আমি অ্যাক্টিং হেড হই এবং সেই অবস্থাই বছরের পর বছর চলে আসছে। লোকের কাছে আমিই হেড মাস্টার হয়ে গিয়েছি। মনে প্রাণে আমি একজন শিক্ষক, পরের প্রজন্মকে এই সমস্যা কণ্টকিত দেশের বাস্তবে টিকে থাকতে একমাত্র মেধাই সম্বল, এটা বোঝানো আমার ব্রত। বাবার রাজনীতির পথ আমার নয়। পেশা আর পরিবার। ব্যস, এই নিয়েই থাকি। একদিন স্কুলের অফিসে কাজ করছি। একজন অভিভাবক, বলাই চাঁদ বিশ্বাস হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, ''মাস্টার মশাই আপনার কি একটু সময় হইব, ইস্কুলের পর কথা কইতে চাই।''

ভাবলাম তাঁর ছেলেরা কেউ বোধ হয় কোনো কুকীর্তি করে ফেলেছে, সেটা ধামা চাপা দেবার অনুরোধ করবেন। এরকম ক্ষেত্রে আমি একেবারে ব্যক্তিগত ধরাধরি প্রশ্রয় দিই না।

''কেন, ছেলেদের কারও সমস্যা—''

''না না। অদের কিসু ব্যাপার নাই। অ্যাকটু পার্সোনাল ম্যাটার, তাই আপনের বাড়ি গিয়া কইতে চাই।''

অবাক হই। একটু বিরক্তও লাগে। বিশ্বাস মশাইদের অবস্থা ভালো, জমিজমা আছে, চাষবাস প্রচুর, পাটের না কীসের ব্যবসাটাবসাও করেন। এমন পাটোয়ারি লোকের আমার মতো বইখাতা নিয়ে থাকা মানুষ গড়ার কারিগরের সঙ্গে কীবা কথা থাকতে পারে।

কেন, এখানেই বলুন না?

বিশ্বাস মশাই সন্তর্পণে চারিদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন। প্রায় ফিসফিস করে বলেন, না না হেইডা আপনের আমার কারও লগেই বালো হইব না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর আগমন। বাবার সময় থেকেই একটা বাইরের ঘরের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে দুটি বইয়ের আলমারি, একটি কাগজপত্র ফাইলের তাক, একটা টেবিল, কটা চেয়ার রাখা। তাঁর দলীয় কাজের জায়গা, জমিবাড়ির কাগজপত্র, বই সব থাকত। আমারও থাকে। তাঁকে নিয়ে বসাই।

বলুন কী ব্যাপার?

পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ৫০ বিঘা জমি বরাবর প্রয়োজনমত বিশ্বাস মশাই চাষ আবাদ করে আসছিলেন, যেমন তাঁর বাপ ঠাকুর্দা করতেন। আমি কি জানি মন্ত্রী এম এল এ, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মেম্বার প্রত্যেকে কিছু না কিছু ছুতোনাতায় কীভাবে হিন্দুদের জমি দখল করে চলেছে? ওই যে রহিম, মইনুদ্দিন, দিব্যি রসেবসে থাকে, তার ছেলে জিয়াউল হাসান, যে ক'বছর আগেও ছিল পুরো এলাকার হেড মস্তান, সে তাঁর জমির উত্তর সীমানার মধ্যে ঢুকে বিঘা বিশেক জমি দখল করে তাতে চাষবাস থেকে শুরু করে একেবারে তিনতলা বাড়ি পর্যন্ত বানিয়ে বসেছে। স্রেফ গায়ের জোরে। তিনি আপত্তি করলে, জিয়াউল বলে কী, 'এত জমি লইয়া কী করবেন? বাপে তো মেলা রাইখ্যা গেসে। আমি আর কয় বিঘা লইসি। আপনেই কন মাস্টার মশাই, হেইডা ক্যামুন কথা?

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, ''এ তো দিনে দুপুরে ডাকাতি! আপনি কোর্ট কাছারি করলেন না কেন?''

আরে হেই কথাই তো কইতে আইসি। কেস করসিলাম, কেসে আমার ফেভারে ডিক্রি হইসে।

বাঃ, এতো খুব ভালো কথা। দেশে এখনো আইন আদালত কাজ করে। তাহলে আর চিন্তা কী?

আরে হেডমাস্টার হইয়া আপনে দেহি পোলাপানের লাখান কথা কয়েন। হেই মামলা মোকদ্দমা শ্যাষ হইয়া রায় বাইর হইতে হইতে কত বৎসর লাইগ্যা গেল, জানেন? হেই দিকে জিয়াউল তো মস্তান থিক্কা মন্ত্রী হইয়া মাথায় চইড়া বইসে। সে তো আমাগো অঞ্চলের এম এল এ। কোর্ট বলসে, এই কয় বৎসর যে জিয়াউল আমার জমি জবর দখল কইরা রাখসে, কোটা তুইল্যা ভোগ করসে সেই বাবদ এক লক্ষ যাইট হাজার পাঁইচশত ট্যাহা তেনার আমারে দিতে হইব। হেইডা লইয়া জিয়াউল এহন আমারে উপর চাইপ ফ্যালতাসে। হরবখত শাসানি চলতাসে। টাহাটা ছাইড়া দিয়া লিখ্যা দিতে হইব, ট্যাহা পাইলাম। হক্কলে আমারে বলতাসে জলে বাস কইরা কুমিরের সাথে বিবাদ কর না, ট্যাহাটা ছাইড়া দে। আপনে বলেন, এইডা আমার হকের ট্যাহা, নয়? আমি তো বেশি কিসুই চাই নাই, শুধু ন্যাইয্য বিচার চাই। কোর্ট দিসে, আমি কী করুম। আপনে জ্ঞানী, ল্যাহাপড়া জানা মানুষ, আপনের উপর পাঁইচ জনের ভরসা। আপনে বলেন আমার কী করা উচিত।

জনাব জিয়াউল হাসান সাহেবের মাস্তানির বহু কীর্তির কথাই কানে এসেছে। তার বাপের জমিজিরেত ছাড়াও পাটের ব্যবসা আছে। সম্ভবত সেখানেই বিশ্বাস মশাইয়ের সঙ্গে রেষারেষির উৎস। জিয়াউলের কাজকারবারে মন ছিল না। কিন্তু পরিবারের স্বার্থে দিব্যি নজর। খাটাখাটনি করে ব্যবসা বাড়ানোর চেয়ে বিশ্বাসের জমি জবরদখল সহজ। গণতন্ত্রের এই এক দুর্বল দিক, খারাপ লোকের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। ভোটদাতা আমজনতার শিক্ষাদীক্ষা নেই, বিচার বিবেচনা নেই। বিশ্বাস মশাইকে বলি, ''আপনি নিজের অধিকার ছাড়বেন না। কোর্ট আপনার পক্ষে, সেটাইতো আপনার মস্ত জোর। অটল থাকুন। আর ব্যাপারটা পাঁচ জনকে বলুন, যেন সবাই জানতে পারে কী চলছে। যাকে বলে সামাজিক চাপ তৈরি করা। জিয়াউলের মন্ত্রিত্ব তো তার বাপের সম্পত্তি নয়, তাকে তো আবার ভোটে দাঁড়াতে হবে।''

২৭/৭/৬৩ আমার লড়াইয়ের পরামর্শের ফল হলো আশপাশের পাঁচ গ্রামে বিশ্বাসমশাই এবং মন্ত্রী জিয়াউলের দ্বৈরথের কাহিনি মুখে মুখে রটনা হয়ে গেল। এবং ঘরের মধ্যে নয়, প্রকাশ্যে মাঠে ঘাটে সদরে কাছারিতে চায়ের দোকানে। সাধারণত আমি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র ও পড়াশোনার বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করি না। সামাজিক পারিবারিক ঘনিষ্ঠতাও প্রশ্রয় দিই না। একটু দূরত্ব রেখে চলি। শিক্ষকরা বেশিরভাগ হিন্দু হলেও মুসলমান দুজন আছে, এক বয়স্ক মৌলবি সাহেবও আছেন। সকলেই জানে আমার পরিবার পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের ঘরের লোক। তাদের এখন কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, আমি নিজে কোনো রাজনীতি করি না, তবু কংগ্রেসি বাপের পরিচয়টা তো আছে। বিশ্বাসমশাই যতই গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে থাকুন না কেন আমিই যে তাঁর পরামর্শদাতা এমন একটা গুজব দেখতে দেখতে পাঁচটা গ্রামে রটে গেল। স্কুলের ছুটির পর শিক্ষকরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে বেরয়। সার সার সাইকেল রাখা। যে যার সাইকেলের তালা খুলে রওনা দেয়। আমিও সঙ্গে আছি। একদিন বাংলার প্রতাপ গুহ তালা খুলতে খুলতে মৃদু

স্বরে বলে, ‘‘আপনি বিশ্বাসকে ভালোই পরামর্শটা দিয়েছেন। আমাদের একটা স্ট্যান্ড নেওয়া দরকার। নইলে দেশটা একেবারে মগের মুলুক হয়ে যাচ্ছে।’’

‘‘মন্ত্রী হয়ে যেন নবাব বাদশা বনে গেছে,’’ অঙ্কের বয়স্ক বারীনবাবুর সাইকেল ম্যানেজ করতে একটু সময় লাগে, তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে যোগ দেন, সব জমির মালিক এনারা আর আমরা যারা চোদ্দ পুরুষ এ মাটিতে জন্মেছি, বসবাস করেছি, আমরা সব যেন এদের প্রজা। বিজ্ঞানের সত্যেন সেন চটপট সাইকেলে উঠে প্যাডেল করতে করতে মত দিয়ে যায়, ‘‘হিন্দু ঐক্য খুব দরকার, সবাই যেন বিশ্বাসের পাশে থাকি।’’

৫/০৮/৬৩ ফল হলো এই, মন্ত্রীমশাই টাকাফাকা কিছু তো দিলেনই না, উপরন্তু বিশ্বাসের মজুত করা ধানের মরাইয়ে

একদিন রাতে আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল। সদরে তাদের পারিবারিক মুদিখানার দোকানে এক রাতে কে বা কারা ভাঙচুর চালিয়ে কত মাল সরিয়ে ফেলল, বাকি ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে রেখে গেল। পুলিশ কোনো ঘটনারই কোনো কিনারা করা দূরস্থান, কাউকে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারল না। কাজের মধ্যে পাঁচটা গ্রামে হিন্দুরা বেশিরভাগ ভয়ে কাঁটা। তাদের মনোভাব ফিসফাসে প্রকাশ, কী দরকার ঝামেলায়। খানিকটা জমি বই তো নয়, বিশ্বাস ছেড়ে দিলেই তো পারে। তার তো ভগবানের কৃপায় অভাব নেই। সকলে তো অমূল্য দত্তর মতো হেভি ওয়েট নয়, বাপ কংগ্রেস করা লোক, এখনো এক ডাকে সবাই চেনে। তাছাড়া নিজে মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার বলে কথা। দাস, দেবনাথ, প্রামাণিক, সরকারদের মতো সাধারণ হিন্দুদের কে বাঁচাবে। তাদের ওপরই তো চোটটা পড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

১০/০৮/৬৩ সদরে ছুটির দিনে গিয়েছিলাম বাড়ির কিছু দরকারি কেনাকাটা করতে। মুখচেনা যার সঙ্গেই দেখা তারই মুখে বিশ্বাস বনাম মন্ত্রীর ডুয়েলের আলোচনা, আমার নেপথ্য ভূমিকার প্রশংসা এবং নাটকের পরবর্তী দৃশ্যের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষার আভাস। যেন নাটক চলছে। অস্বস্তি লাগে। কাজ সেরে চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেতে বসি। হঠাৎ উদয় হলো এ তল্লাটের উঠতি মস্তান, জিয়াউলের কী রকম যেন চাচার ছেলে বদরুদ্দিন উমর। মুসলমানদের এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, পরিবারের পদবির কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আমি অমূল্য দত্ত, আমার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো সব দাদা ভাইয়ের পদবি দত্ত হতে বাধ্য। এদের তেমন কোনো প্রথা বোধহয় নেই। ''এই যে মাস্টার মশাই, চা খাইতাসেন?'' আমার চিন্তায় বাধা পড়ে, ''বাজারহাট করল্যান বুজি? বালো বালো।''

সামনের বেঞ্চিটায় গ্যাঁট হয়ে বসে। অস্বস্তি বোধ করি। মস্তানরা আমার কাছে অন্য গ্রহের জীব। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, এভাবে গায়ে পড়া কেন।

''শোনেন, আপনার লগে দুইটা কথা আসে। আপনে জ্ঞানী গুণী লোক, কইলকাতা থিক্যা এম এ পাশ কইরা আইসেন। আমাগো গৌরব। আপনে পোলাপানদের পড়াইবেন, শিখাইবেন, পাশ করাইবেন। তারা উন্নতি করব, কামকাজ পাইব। খুব বালো কথা। করেন, নিজের কাম করেন। হঠাৎ ন্যাতা হইতে চাইলেন ক্যান? বাপ কংগ্রেস করত তাই? আপনে কি ইলেকশানে খাড়া হইবেন নাকি? কী, মতলবটা কী?''

''দেখুন নেতা হবার কোনো প্রশ্নই নেই। আমি শিক্ষক, ছাত্রদের নিয়েই থাকি। মতলব কিছুই নেই। আপনারা ভুল বুঝছেন।''

''তাইলে ভাইজানের কোঠা আর জমিটা বাবদ বিশ্বাসরে ট্যাহা আদায়ের কুপরামর্শ ক্যান দ্যান?''

''কী আশ্চর্য, কোর্টে আপনার ভাইজানের বিরুদ্ধে কেস করে বিশ্বাস জিতেছে, কোর্টই টাকাপয়সার কথা ঠিক করেছে, আদায়ের হুকুম দিয়েছে। আমি এর মধ্যে কোথায়? আমি বিশ্বাসের উকিল নই, তার পক্ষে সাক্ষীও হইনি। আমি তো শুধু কোর্টেরই কথা বিশ্বাসকে মানতে বলেছি। দেখুন, আমি তো একজন শিক্ষক, মাস্টার। মাস্টার হয়ে আমি কি লোকজনদের আইন না মানার শিক্ষা দিতে পারি? আমার কর্তব্য মানুষকে সুনাগরিক করে তোলা, আইন মানতে শেখানো। আমার কাজ আমি করেছি মাত্র। এতে নেতাগিরির কী হলো।''

''শোনেন হেইডা হইল মুসলমানগো দ্যাশ, হেইখানে সব জমিজায়গা খালবিল পুষ্করিণীতে আমাগো হক। বোজল্যান?''

''এ তো অদ্ভুত কথা। মুসলমান মেজরিটি দেশ বলে আমাদের হিন্দুদের কোনো হক নেই, এমন কথা কি দেশের আইনে বলে? কোর্টে তো মুসলমানই জজ, সরকারি উকিলও তো মুসলমান। তারাই তো ফয়সালা করেছে—''

''আরে রাখেন আপনার কোর্ট আর উকিল। ইংরেজের করা আইন আর ইংরাজি পড়া সব উকিল। আমরা হেই আইন মানি না, এই রায় মানি না। আপনারে সাবধান কইরা দিতাসি। নিজের কাম করেন। বিশ্বাসরে আমাগো হাতে ছাইড়া দ্যান।''

চায়ের দোকানের মালিক আর চা খেতে আসা পাঁচজন দেখল, শুনল।

২০/০৮/৬৩ বদরুদ্দিনের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি চারিদিকের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। আমারও জেদ চেপে গেল। বিশ্বাস আর তার উকিল গঙ্গাপ্রসাদ বোসের সঙ্গে আলোচনায় বসি। জিয়াউল রায় হাতে পেয়েও এত মাস ধরে এক পয়সাও না দেওয়ায় তার নামে আবার নালিশ কীভাবে করা যায়। ক'দিন বাদে বাড়ি ফিরতেই রমা উদ্বিগ্ন মুখে এসে বলে, ''জানো, বসাক মাসিমা এসেছিলেন, বললেন বিশ্বাস বাড়ির মেয়েরা ইস্কুল থেকে ফিরছিল, এক দল মুসলমান ছেলে নাকি রাস্তা আটকে যা তা অসভ্য কথা বলেছে, আবার ভয় দেখিয়েছে, তুলে নিয়ে যাবে। তারা তো কাঁদতে কাঁদতে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরেছে। বসাক মাসিমা তার নাতনিদের ইস্কুলে যাওয়া কিছুদিন বন্ধ করে দেবেন, ঠিক করেছেন। আমি ভাবছি অনি অমিকে কাল থেকে ক'দিন ইস্কুলে পাঠাবো না। দেখ, সাবধানের মার নেই। বলা তো যায় না—''

আমি বাধা দিয়ে বলি, ''দ্যাখো ভয়ের কোনো শেষ নেই। স্কুলে যেতে ভয়, বাড়ির বাইরে যেতে ভয়, এভাবে তো বাস করা যায় না। ভয়কে জয় করতেই হবে। সব সময় রবি ঠাকুরের সেই গানটা মনে রাখ, 'আমি ভয় করব না ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না—'' এবার রমা আমাকে থামিয়ে দেয়, ''দেখ রবিঠাকুর পাকিস্তানে মুসলমান ঘিরে রাখা এক হিন্দু ছিলেন না। তাঁর ১০/১২ বছরের মেয়ে ছিল না। তাঁর সময়

অন্য, দেশ অন্য, সেটা ব্রিটিশ ভারত। এটা ভারতই নয়, অন্য দেশ, সেটা ভুলে যাও কী করে। আমি ওদের ইস্কুলে পাঠাবো না। তুমিই না হয় পড়াবে।”

‘‘দ্যাখো, সেটা খুব খারাপ দেখাবে। যে সব মেয়েদের বাবারা শিক্ষক নয়, তারা ইস্কুলে না গেলে পড়াশোনা শিখবে কী করে?”

‘‘আর আমাদের মেয়েদের মুসলমানেরা তুলে নিয়ে গেলে? এরকম তো আকছার হচ্ছে। তখন কী করব, তোমার রবি ঠাকুর কিছু বলেছেন? নাকি সে বিষয়ে কোনো গান লিখে গেছেন?”

১/৯/৬৩ প্রতিবেশী পাঁচ জনের সঙ্গে কথা বলি। কোন মুসলমান ছেলেরা বদমায়েশি করছে তাদের নামধাম, পিতৃপরিচয় জোগাড় হয়, সবাই তো চেনাজানার চৌহদ্দির মধ্যে, কেউ করাচি বা লাহোর থেকে উড়ে আসেনি। তাদের বাপচাচাদের ধরা হলো। বেশিরভাগই গায়েগতরে এখানে সেখানে টুকটাক কাজ করা, বড়জোর সদরে ঘরামির মুনিষ অথবা আমাদেরই জমিতে খেত মজুর বা ভাগচাষি। সকলের এক উত্তর, ‘‘কর্তা কী কমু, আমাগো কথা হেই সব ছ্যামড়ারা শোনে কই? দল অ্যাকটা করসে, কামকাজে মন নাই, খালি বজ্জাতি কইরা বেড়ায়। মাইরা মাইরা পিঠের ছাল তুইল্যা দিতাসি, তাতেও হুঁশ নাই। আপনেরা যা মর্জি করেন, য্যামুন ইসসা শাসন করেন। আমাগো কিস্যু আপত্তি নাই। অদের পালের গোদা হইতাসে ওই মিনিস্টার জিয়াউলের চাচার পোলা বদরুদ্দিনের চ্যালা রহিম।”

১৫/৯/৬৩ ছেলেছোকরাদের বজ্জাতির সঙ্গেও রাজনীতি জড়িয়ে গেছে। কী শাস্তি দেওয়া যায় সেই নিয়ে তর্কাতর্কি আলোচনাই সার। কারণ সবাই জানি মুখে এদের বাপচাচারা আমাদের কর্তা হুজুর করলেও আসলে দিব্যি সেয়ানা। জমি চাষ করে যেন আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে এমন ভাবভঙ্গি, ফসলের এখন যা ইচ্ছে ভাগ নেয়, তেভাগা বলে ওদিক থাক। কোনোক্রমে আমরা মালিকরা বছরের খোরাকটা পাই, জমি থেকে কোনো আয় নেই। মাঝখান থেকে কতদিন মেয়েগুলোর স্কুলে কামাই। তারপর আবার যেইকে সেই।

৩০/১০/৬৩ নমোনমো করে নিয়ম রক্ষার দুর্গাপূজা। পূজার আচার অনুষ্ঠানই সার। তেমনই কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। প্রত্যেকটি পূজা যেন এখন দায় হয়ে উঠেছে। আমরা হিন্দু তাই ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা। আর আনন্দ নেই, উৎসবের সমারোহ নেই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরাগের ঘন কালো ছায়া সংখ্যালঘুর জীবনচর্যার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অথচ এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শাসনকেই তো আমরা গণতন্ত্র বলি, আদর্শ মনে করি।

১০/১২/৬৩ গণতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে এসে গেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশন। জিয়াউলের চাচাতো ভাই সেই বদরুদ্দিন ইলেকশানে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের সব পরিবার কেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে অবস্থা ভালো এমন কেউ নেতা হয়। অমনি তার গরিব আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব যে যেখানে আছে সব তার চেলা হয়ে যায়। যেমন, বদরুদ্দিন। জিয়াউলের নিজের নয়, দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই, না পড়াশোনা করছে না কোনো কাজের কাজ। এখন ভাইজান হচ্ছে ভরসা। প্রচার করা হয়েছে মন্ত্রী জনাব জিয়াউলের নামে, তারই তো ক্যান্ডিডেট বদরুদ্দিন। মনে মনে আশা করেছিলাম হিন্দুরা অন্তত এক জোট হয়ে এবার ভোট দিয়ে অসন্তোষটা প্রকাশ করুক। করবে কী? সন্দেহ, আমরা তো মূলত ভীরুর জাত। কী আশ্চর্য, ইলেকশনে বদরুদ্দিন হেরে গেল। সদরে মাসকাবারি বাজার করতে গিয়ে রাস্তায় দেখা তার সঙ্গে।

মাস্টার, তুমি নিজেরে কী ভাবতাস? হিন্দু ভোটগুলা এক কইরা হালার পো নাসির শেখকে জিতাইলা। কামডা কি ঠিক করলা? আমারে হারাইয়া, ভাইজানের মুহে লাথ মাইরা পার পাইবা?’

তার সম্বোধন ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’তে নেমে এসেছে।

দেখুন, ঠিকভাবে কথা বলুন। আমি একটা হাই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আপনার বা নাসির শেখ, কারও হার-জিতে আমার কী আসে যায়? আমি কি পার্টিফার্টি করি? না কি ইলেকশনে প্রচারে রাস্তায় কখনো নেমেছি, বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি? আপনাদের তো লোক চারিদিকে, কেউ কখনো দেখেছে আমাকে এসব করতে? আগেও বলেছি, আবার আপনাকে সাফ কথা বলছি, রাজনীতি আমি করি না।

তোমারে শিক্ষা দিয়া তোমার বেবাক জাতভাইরে শিক্ষা দিমু।

মিছিমিছি ভয় দেখাতে আসবেন না। দেশে আইনকানুন আছে।

আর বেশিদিন থাকবে না আইনকানুন।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৬৩। ভারতের কাশ্মীরে হজরত বাল মাজার থেকে হজরত মহম্মদের মোই-ই-মুক্কাদাস বা দাড়ির একটু চুল চুরি হল। সারা পাকিস্তান পাগলা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত। দিনরাত রেডিয়ো, সভায়, পথেঘাটে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে জঘন্য গালাগালির বন্যা। আমাদের জমির চাষবাস দেখে এবং এখন বেশিরভাগ ফসলই নিয়ে যায় পুরনো ভাগচাষি হাসিম। তবে ক্ষমা ঘেন্না করে রমার বেগুন আর লঙ্কার চারা ক'টায় হাত লাগায়, লাউ কুমড়োর লতা মাচায় কী চালে তুলে দেয়। সে-ই এক দিন আমাকে এসে বলে, ‘‘কর্তা, হাওয়া খুব গরম ঠ্যাকতাসে, আপনে, মা ঠাকরেন আর পোলামাইয়াগুলারে লইয়া কয় দিন গা ঢাকা দিন গিয়া। ঠাণ্ডা হইলে আইবেন।”

কোথায় যাব রে হাসিম, দিদিরা যে যার শ্বশুর বাড়িতে পাঁচ

জনের সংসারে, সেখানে পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায়? তাছাড়া তুই তো জানিস এখানেই আমার বাপ ঠাকুর্দার বাস, কেন যাবে ভিটা ছেড়ে?

যা, বালো বোজেন করেন, আমার কওনের কথা কইয়া গ্যালাম।

২৯/১২/৬৩ স্কুলে নিয়ম রক্ষার্থে যাওয়া। ছাত্র কেবল শিক্ষকদের বাড়ির ক'জন ছেলে। দুপুরের দিকে অফিস যখন ফাঁকা, মৌলবি সাহেব আমার ঘরে এলেন।

সার, অ্যাকটা কথা কইতে অনুমতি দ্যান তো কই।

মৌলবি সাহেব যে, আসুন, বসুন। কত বার বলেছি আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমাকে 'সার সার' করবেন না।

আপনারে কই না। আপনার ওই চেয়ারটারে কই। উনি বসলেন না, দাঁড়িয়েই থাকলেন।

ঠিক আছে। বসবেন না। না? তাড়া আছে বুঝি? আচ্ছা, বলনু কী বলতে এসেছেন।

পরিস্থিতি বড়োই খারাপ। সব পলিটিক্স করা ইবলিশের ছা বাইর হইসে। ভয়ংকর কিসু অ্যাকটা নিচ্চয় করব। আপনে ফেমিলি লইয়া হেইখান হইতে কয়ডা দিন অন্যত্র গ্যালে বালো হয়। হেই জায়গা আপনের লগে হেক্কেরে নিরাপদ নয়। নজরদারিও জোর চলতাসে। আমি আপনারে সাবধান করতাসি হেই কথাডা পাঁইচ কান হইলেও বিপদ।

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। কেউ কিছু জানবে না। আপনি যে আমার মঙ্গল চান সেটাই আমার বড়ো প্রাপ্তি। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, এখন আসুন।

মৌলবি সাহেব ডান হাতটা আলগোছে কপালে ছুঁইয়ে চলে গেলেন।

৩/০১/৬৪। কাশ্মীর দিবস ঘোষণা। চারিদিকে মিটিং, ভারত বিরোধী প্রচার তুঙ্গে। স্কুল বলতে গেলে বন্ধ। স্বাভাবিক কাজকর্ম স্তব্ধ। হিন্দু এলাকা থমথমে। স্কুলের ক'জন শিক্ষক বাড়িতে এল। কীভাবে আমরা হিন্দুরা এই পরিস্থিতিতে নির্বিঘ্নে থাকতে পারি সেই সমস্যা নিয়ে বৃথা আলোচনা। কোনো সমাধান নজরে নেই। সব ছাড়া ছাড়া বাড়ি, সকলেরই কিছু জমিজায়গা আছে। আছে পুকুর। সংখ্যাই শক্তি, একসঙ্গে অনেকে মিলে কোনো একজনের বাড়িতে থাকব? তাহলে সেই একটা বাড়িতে হামলা চালালেই সবাইকে পেয়ে যাবে। নাহ, আলাদা থাকাই ভালো। আসলে কারও বাড়িতেই তো অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। সবেধন নীলমণি একটা দুটো লাঠি সম্বল। হ্যাঁ, দা কাটারি আছে। সেগুলো হাতের কাছে রাখার প্ল্যান করা হলো। সময়মতো ব্যবহার করতে পারব কিনা সন্দেহ। কজন দা দিয়ে কবে কিছু আমরা কেটেছি? সেই স্কুলে পড়বার সময় হয়তো। বলাবলি করি। আমরা হিন্দুরা আত্মরক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতাও অর্জন করা শিক্ষার অঙ্গ বলে ভাবিনি। আজ তার মূল্য দিতে হচ্ছে।

৪/১/৬৪ হজরতবালের পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার হলো। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত প্রমাণিত তিন জন কাশ্মীরি মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করল ভারত সরকার। উদ্ধারের খবর পাকিস্তান বিশ্বাস তো করলই না উপরন্তু মিথ্যে কথা রটিয়ে ইসলামের অপমানের জন্য যোগ্য প্রতিশোধ নিতে আহ্বান জানালো দেশের মানুষদের। অতঃপর হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা করল ইস্লামিক বোর্ডের আবদুল হাই। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানেই আকাশে বাতাসে হিন্দু উৎসাদনের ডাক। স্কুল তবু চালিয়ে যাই। ক'জন শিক্ষক সঙ্গে আছে, আছে তাদের বাড়ির ছেলেরা। ক্লাসেও বসি, ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্কের টিচার অ্যালজেব্রার ফরমুলা লেখেন, ইংরেজির মাস্টার লেখেন গ্রামারের নিয়ম। সবই স্রেফ মনের জোরে। যাতায়াত করি খালি পায়ে, সাইকেল ছাড়া, কারণ আমাদের মানে হিন্দুদের পায়ে জুতো পরা বারণ হয়েছে, যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ, এমন কী ছাতা মাথায় দেওয়া চলবে না। ভাগ্যে শীতকাল, তাই বাইরে রাস্তায় বেরোতে ছাতার দরকার নেই।

গতকাল বাড়ি ফিরে দেখি রমার চেহারা কেমন ন্যাড়া লাগছে।

একি, তোমার মাথায় সিঁদুর নেই, কপালে নেই ফোঁটা। ব্যাপারটা কী?

ও সব বারণ হয়ে গেছে।

হাত দুটো এগিয়ে দেয়, ক'গছা সরু সোনার চুরি ঠন ঠন করছে, শাঁখা পলাও চলবে না। গুহদের বাড়ির বউ শ্যামলী এসে বলল, বউদি, শিগগির শাঁখা পলা খুলে রাখো, সিঁদুরটাও বাদ দাও, এসব চলবে না, হুকুম জারি হয়েছে।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

বাচ্চারা কোথায়?

এদিকে ওদিকে আছে আর কী। বাইরে বেরোতে তো দেওয়া হচ্ছে না।

অনি অমিকে পড়তে বসিয়েছিলে, না সময় পাওনি বোধ হয়।

সময়ের অভাব কী। রান্নার তো কিছুই প্রায় নেই। বাজার বসছে না। গাছের দুটো বেগুন আর মাচা থেকে তুলে আনা খানিকটা লাউ শাক ভরসা। দুপুরে ভাত, বেগুন পোড়া, লাউ শাক, রাতে ভাত ডাল বেগুন ভাজা। এইতো রান্না। ভাগ্যে পাঁচু নিয়মিত দুধটা দিয়ে যাচ্ছে। ক'দিন বেশি করে নিচ্ছি, দুধ মুড়ি, দুধ চিঁড়ে আর কত খাবে। একটু পায়েস করেছি, মুখ বদলাতে।

পাঁচু গোয়ালারা পুরুষানুক্রমে আমাদের গোয়ালের কাজ করে। গোরু বাছুরকে খেতে দেওয়া, প্রতিদিন দুধ দোয়ানো, সময়মত গোরুকে পাল খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা, বাছুর হওয়ার তত্ত্বাবধান—যাবতীয় দায়িত্ব পাঁচুর। তবে গোসেবা বলে

কথা, রমারও অনেক খাটুনি পড়ত। অনির বছর পাঁচেক বয়স হলে আমরা স্থির করি গোয়ালের হ্যাপা আর রাখবো না। গোরু রাখার খরচ ও ঝামেলা, দুটো থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। পাঁচুই কিছু দিয়ে গোরুটরু সব তার গোয়ালে নিয়ে গেল। তারপর থেকে নিয়মিত দুধ দিয়ে আসছে। মাস কাবারে টাকা নেয়। গোসেবার পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বেচারা রমা হাঁপ ছেড়েছে। সময় পায় আর পাঁচটা জিনিসে মন দিতে, বইটই পড়তে। এখন এই দুর্দিনে পাঁচুই ভরসা।

যতটা পারা যায় কাজেকর্মে থাকো, মনটা যাতে অন্যদিকে দেওয়া যায়।

ঠিক যা আশঙ্কা করেছিলাম, জেহাদের প্রথম টার্গেট খুলনা জেলা। কারণ লড়াকু মন্ত্রী জনাব জিয়াউল হাসান সাহেবের খাস তালুক। সে তো এমন একটা মওকার আশায় আশায় ছিল, খপ করে লুফে নেয়। শুনছি সারাদিন ঘুরে ঘুরে মিটিং করছে, ''ভাই সব শোনেন, আমাগো নবি হজরত মহম্মদের পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন যে কাফের জাত ষড়যন্ত্র কইরা চুরি করে, আবার নকল আইন্যা রাইখ্যা মিছা কথা কয়, তাদের শাস্তি দেওন উচিত কিনা? বলেন, আপনারাই বলেন।''

শতশত কণ্ঠে জবাব, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কাফেরগুলারে সেই শাস্তি দিবার ফরজ কার?

আমাগো, আমাগো।

ভাইসব, হক্কলরে অ্যাকটা খুশির খবর দেই, ইস্পাহানিরা আমাগো লইগ্যা হাতিয়ার জুগাইবার কসম খাইসে। ছুরি, ছোরা, দা, তরোয়াল কোনো কিসুর ত অ্যামনি অভাব নাই। উপরন্তু বন্দুক হাতে আইব। দ্যাশটারে প্রকৃত পবিত্র পাক বানাইতে হইব। কী কইরা? অ্যাকটাই উপায়, না-পাক হিন্দুরে খতম কইরা।

সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না সত্যি। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেলাম। আনসার, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস তো আছেই, সঙ্গে আরও হাজার বিশেক সশস্ত্র মুসলমান রেডি হচ্ছে। তাদের জন্যই এ ধরনের ভাষণ চলেছে ৪ জানুয়ারি সারাটা দিন। এদেশে একটা আধ ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। থেকে থেকে জেগে ওঠে। বিস্ফোরণের আগে গুমগুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইবার তার মুখ থেকে নির্গত হবে লাভাস্রোত, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঘরবাড়ি মানুষজন।

৫ জানুয়ারি, ১৯৬৪। সকালবেলা, জলখাবারের পাট চুকলে রমা রান্না ঘরে দুপুরের আয়োজনে ব্যস্ত। অমি ও অনিকে শোয়ার ঘরে পড়তে বসিয়ে রমাকে বৈঠকখানায় ডাকি। এসো, বসো। জরুরি কথা আছে।

জিজ্ঞাসু মুখে রমা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বসে।

বুঝতেই পারছ কী পরিস্থিতি আর আমাদের হিন্দুদের সামনে কী ভয়ংকর বিপদ। তুমি ভালো করে মন দিয়ে শোন। আমার সঙ্গে বদলা নেবার এটা জিয়াউল, বদরুদ্দিনদের সুবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ ওরা কোনো মতেই ছাড়বে না। নির্ঘাত হামলা করবে। আমি পুরুষ মানুষ, সংসারের কর্তা। আমার কর্তব্য তোমাদের নিরাপত্তা। শোনো, পশ্চিম দিকে ওই যে ঝোপঝাড় আছে, সেটা পেরিয়ে পুকুরটা, অর্ধেক কচুরি পানায় ভরে আছে। তার পরে জঙ্গলের মতো? বুঝতে পেরেছ? যেই ওদের আওয়াজ টের পাওয়া যাবে অমনি তুমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খিড়কি দিয়ে সোজা ওখানে চলে যাবে। টু শব্দটি করবে না। তুমি খুব ভালো সাঁতার কাটো, অমি, অনিও সাঁতার জানে, এক অসীম হচ্ছে সমস্যা। ওকে কোলে নিয়ে তোমার সঙ্গে আঁচলে জাপটে বেঁধে রাখবে। দরকার হলে মুখও। আওয়াজ যেন না বেরয়। কচুরিপানা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে পারবে। একমাত্র বাঁচার উপায় জলের মধ্যে—

এসব কী বলছ কী? না না, তোমাকে বাড়িতে একা ফেলে আমি ওদের নিয়ে কোথাও পালাবো না। মরতে হয় তো সবাই একসঙ্গে মরব। তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না—রমা, রমা, শান্ত হও। কেন বলছি বোঝার চেষ্টা কর। ওরা হয়তো আমাকে আর অসীমকে মারবে। তোমাকে, অমিকে, অনিকে মারবে না। কেন মারবে না বলে দিতে হবে? জানোনা হিন্দু মেয়েদের নিয়ে এরা কী করে? তুমি কি সেই পরিণতি চাও? সেটা কি মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর নয়?

রমা কাঁদতে শুরু করেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাথা হেলায়।

চোখের জল মোছ। মুখে হাসি রাখ। আমাদের জীবনটা তো সুখেই কেটেছে। ঈশ্বরের কথা আশীর্বাদ যেটুকু পেয়েছি সেটুকু মাথায় করে রাখি, এস।

শীতের বেলা। তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসে। ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যে দেয় রমা। আমি গৃহদেবতাকে প্রণাম করি। রমা গলায় আঁচল দিয়ে আমাকে প্রণাম করে। আশীর্বাদ করি, শক্তি ধরো। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, বংশের অস্তিত্ব, মানমর্যাদা ধর্ম, সব তোমার ওপর নির্ভর করছে, মনে রেখো। শোন, শুধু নিজের আর ছেলে-মেয়ের কথা ভাববে, আর কিচ্ছু নয়। পরে সুযোগ বুঝে চারিদিক দেখে, বসাক কী গুহ বা সেনেদের বাড়িতে আশ্রয় নেবে, কোনো দ্বিধা করবে না। ওরা যে কেউ তোমাকে দেখবে।

রমা নীরবে মাথা হেলায়, হ্যাঁ।

অমি জিজ্ঞাসা করে, বাবা আজ হঠাৎ তুমি ঠাকুরঘরে এই সন্ধেবেলা প্রণাম করলে? মাও তোমাকে প্রণাম করল। কেন?

আরে ঠাকুরই বলো আর মানুষই বলো, প্রণামের কি অত দিনক্ষণ থাকে রে।

ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করি। অনি অমনি কাছে ঘেঁসে আসে। ওর কপালে চুমু খাই।

মায়ের কথা শুনবে। তুমি আর দিদি, দুজনে মিলে ছোটো ভাইটিকে দেখবে।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমাদের ছেড়ে দুরে কোথাও যাচ্ছ। অমি অমনি ঠোঁট ফোলায়।

দূর, পাগলি মেয়ে। আমি সর্বদা তোদের সঙ্গে। তোরা দেখতে না পেলেও জেনে রাখিস আমি তোদের কাছেই আছি।

হেসে কথা ঘোরাই। তাড়াতাড়ি সবাই খাওয়াদাওয়া শেষ করে আজ শুয়ে পড়ব।

আর কি কোনো দিন আমি এই খাতাটা খুলতে পারব? লিখতে পারব চারিদিকের ঘটনা? যা লিখলাম, যাদের জন্য

লিখলাম তারা কি কোনদিন পড়ার সুযোগ পাবে?

অসীম প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছে। তারপর, তারপর কী হলো। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে। এবার শুতে যাবে। সন্তর্পণে দরজা খোলে, মায়ের আবার পাতলা ঘুম, চট করে ভেঙে যায়। এই জন্য তাঁর এত খাটা খাটুনির পর যথেষ্ট বিশ্রাম হয় না। শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। মশারিটা তুলে ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। খাতাটা এই পর্যন্ত লেখা অবধি তো বাবা বেঁচেছিলেন। মা সর্বদা বলে এসেছেন বাবা মারা যাওয়াতে কলকাতায় তারা আসতে বাধ্য হয়েছে, সেটা তাহলে এই লেখারই ঠিক পরের ঘটনা। তার মানে বদরুদ্দিনরা নিশ্চয়ই হামলা করেছিল। কী হামলা? না না, এরকম আন্দাজ করার চেষ্টা করে লাভ নেই। কী আন্দাজ করবে? মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুম, হ্যাঁ, ঘুম দরকার। সারা দিনের শ্রান্তি। আর যেন পারছে না।

আবার সেই স্বপ্নটা। ধুতিপরা লোকটাকে আবার পিছন থেকে অসীম দেখছে। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। কোপাচ্ছে আরও কোপাচ্ছে। এক জায়গাতেই কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে। কী একটা গর্ত খুঁড়ছে। চারিদিকে সেই ছায়াছায়া লোকগুলো। তাদের একজন হাত তুলে কোদাল চালানো থামাতে বলে। আর এক জন লোকটার হাত থেকে কোদালটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দুরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হঠাৎ যেন ফ্লাড লাইটের ফোকাস এসে পড়ে। কাছে কোথাও দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। তারই হলকায় অসীম পরিষ্কার দেখতে পায়, দুটো লুঙ্গিপরা লোক ধুতি পরা মানুষটার হাত দুটো চেপে ধরেছে, আর পাশে দাঁড়ানো পাজামাপাঞ্জাবি পরা গাট্টাগোট্টা জোয়ান লোকটা কী একটা তুলল, হ্যাঁ একটা তলোয়ার। এক হাতে তলোয়ারের হাতলটা চেপে ধরে অন্য হাতে ধুতি পরা লোকটার চুলের মুঠি ধরে ঘ্যাচাং করে মুণ্ডটা কেটে নিল। ধড়টা সামনে পড়ে গেল। পড়ল এতক্ষণ ধরে কোপানো জায়গাটায়। হাতে রক্তাক্ত তলোয়ারটা নিয়েই অন্য হাতে চুলের মুঠি ধরা মুণ্ডটা এদিক ওদিক দোলাতে থাকে। চীৎকার করে, 'হালা মালাউনরে দিয়া আমি তার নিজের কবর খুঁড়াইলাম। নিজের কবর খুঁড়াইলাম। হা হা হা। আর মাস্টারি করবা? মাস্টারি করবা? মাস্টারি করবা? হা হা হা, করবা? করবা? করবা? অন্ধকারে প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

ঘুম ভেঙে গেছে। অসীম ঘেমে নেয়ে একাকার, যেন আগুন লাগা বাড়িটার ঝাঁজ তাকে গ্রাস করে রেখেছিল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তেমনই বিছানায় পড়ে থাকে। ওঠার ক্ষমতা নেই। কিছু বোধ করার ক্ষমতা নেই। কখন কাক ডাকতে শুরু করেছে। মা নিঃশব্দে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। চোখ বুজে শুয়ে আছে অসীম, জাগতে পারছে না, উঠতে পারছে না।

তবু এক সময় জাগতে হয়, উঠতে হয়।

আরও একটি দিন। আবার অফিস যাবে, টিফিন টাইমে জয়ন্তদার সঙ্গে বসবে। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান খেটেখাওয়া মানুষের ঐক্য আর লড়াইয়ের কথা শুনবে। জিয়াউল বদরুদ্দিনের চাচাতো খালাতো ভাই-বোনেদের এ দেশের মাটিতে বসাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলবে তার নিজের ফ্ল্যাটটা।

কিন্তু বাবার খাতাটা? খাতাটার কী হবে?

(কাহিনিটি কাল্পনিক। বাস্তবের কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য কাকতালীয়।)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

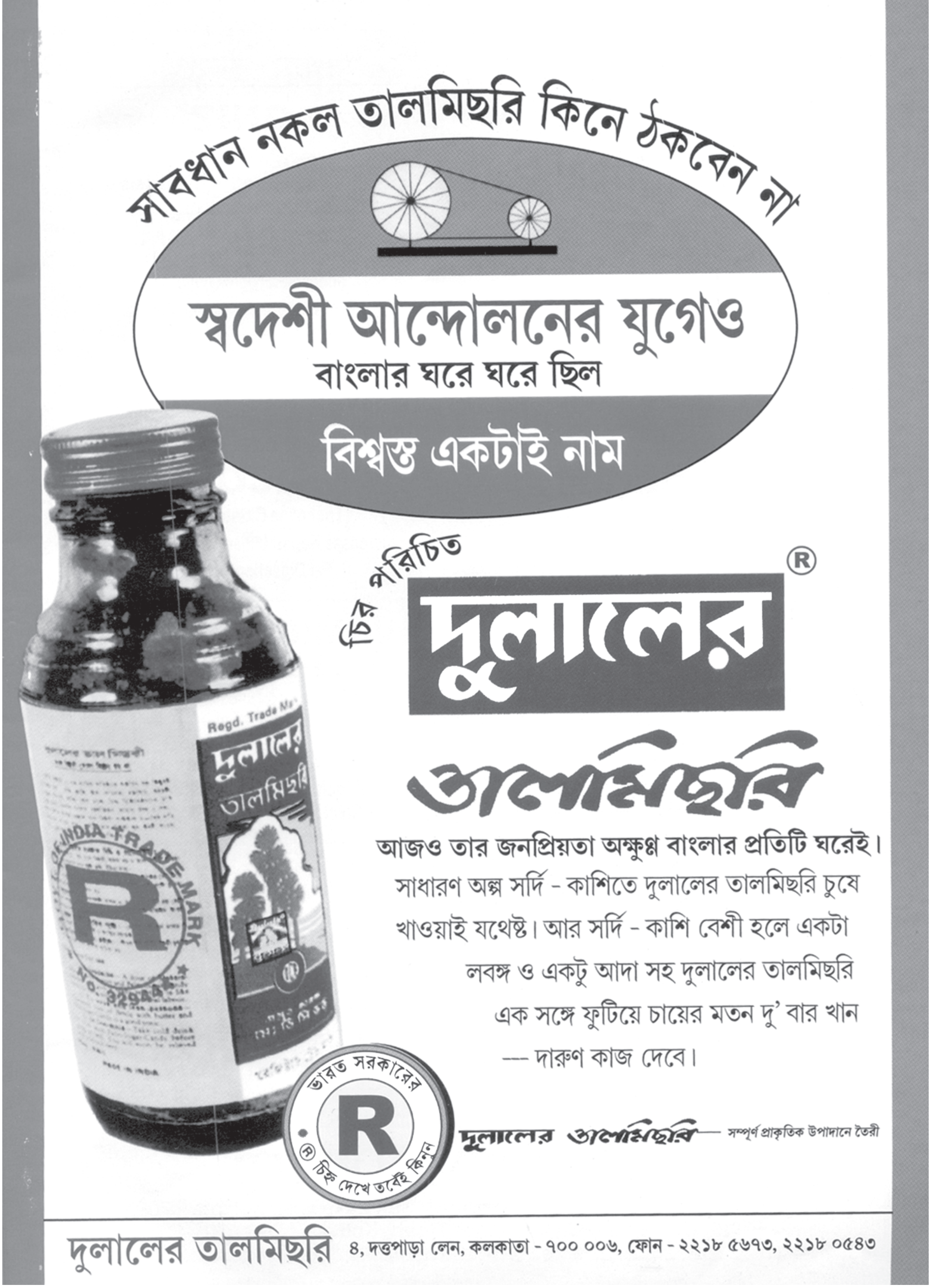

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান --- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বিষয়ে শিশির বসুর গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর

ডা: মধুসূদন পাল

ডা: শিশির বসুর 'মহানিষ্ক্রমণ' গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! ১৯৪১-এর জানুয়ারি মাসের পর প্রায় ৮৫ বছর কেটেগেলেও এখনো পর্যন্ত কলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনরহস্য সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ডাঃ শিশিরকুমার বসু অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ১৯৭৫-এ লিখেছেন, 'মহানিষ্ক্রমণ' (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) এবং এর ইংরেজি অনুবাদ 'The Great Escape' (Netaji Research Bureau, কলকাতা)। দুটি বই-ই একক কথন। লেখক নিজেই সব বলে গেছেন গল্পের ছলে। অজস্র অসঙ্গতিতে পূর্ণ বই দুটি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত না করে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। মহানির্গমনের সময় সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের পৈতৃক বাড়িতে ব্রিটিশ পুলিশের ঘেরাটোপে গৃহবন্দি ছিলেন।

বের হওয়ার পথ ছিল না। অথচ শিশিরবাবুর রচনায় রয়েছে একাধিক বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অসঙ্গতি। পাঠকের অবগতির জন্য সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো। পাঠক বুঝতে পারবেন, কী মিথ্যাচার করেছেন শিশির বসু।

(ক) শিশির বসুর বক্তব্য অনুসারে, মহানির্গমনের সময় তাঁর রাঙা কাকাবাবু সুভাষচন্দ্র জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশ ধারণ করলেও গাড়ি চালক শিশির ছিলেন সাধারণ পোশাকে। অর্থাৎ সতর্কতা হিসেবে তিনি কোনো ছদ্মবেশ ধারণ করার প্রয়োজন মনে করেননি। গাড়ির রং কিংবা নম্বর প্লেটও ছিল অপরিবর্তিত। অথচ ব্রিটিশ পুলিশ ফাইলে দেখা যায় যে, সুভাষচন্দ্রের অন্য ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাদের রাঙাকাকাবাবুর কোনো গোপন কাজ করার সময় যে গাড়ি ব্যবহার করতেন তার নম্বর প্লেট বারবার পরিবর্তন করতেন পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। কলকাতা পুলিশ ফাইল ২৪-এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ আছে।

(খ) মহানির্গমনের কাহিনি শিশিরবাবু এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হবে তিনিই এর প্রধান পরামর্শদাতা ও পরিকল্পক বা সবকিছুই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। অথচ সুভাষচন্দ্রের জীবনী তো ভিন্ন কথা বলে।

মনে রাখতে হবে, 'মহানিষ্ক্রমণ'-এর মতো ঘটনা সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটি নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে নেতাজীর এজাতীয় অভিযানের ঘটনা আছে একাধিক। বার্লিন থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে নেতাজীর জাপান যাত্রা এরকমই আর একটি দুঃসাহসিক যাত্রা। পৃথিবীখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই নেতাজীকে প্রায় নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা, সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়েছে। সবই তাঁর নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত। বার্লিন থেকে জাপান যাত্রার সময় দেখা যায় একসঙ্গে তিনটি সমান্তরাল এবং নিখুঁত পরিকল্পনা তিনি করে রেখেছিলেন শত্রুর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। কোন্‌টা তিনি বেছে নেবেন বা কোন্ পথে শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে যাবেন, সেটি বোধ হয় কেবল তিনিই জানতেন। নেতাজীর সমস্ত অভিযাত্রা আজও রহস্যময়। তিনি নিজে ছাড়া কোনো পরিকল্পনার কথা পুরোপুরি কেউ জানত না।

ডাঃ শিশির বাবুর বিবরণ অনুযায়ী, রাঙা কাকাবাবু মধ্যরাত্রে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন তাঁকে ড্রাইভার হিসেবে নিয়ে। যার দীর্ঘ পথ গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা নেই, তাকে নিয়ে মধ্যরাত্রে বাড়ির গাড়িতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় এবং দ্বিতীয় কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি বেরিয়ে যাবেন, এটা অবিশ্বাস্য। মনে রাখতে হবে, যিনি গোপন যাত্রা করছেন তিনি সুভাষচন্দ্র বসু, ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনীর ক্ষমতা সম্বন্ধে যাঁর এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

আর একটা বিষয়, বসু পরিবারের অন্যান্য সদস্য, যাঁরা শিশির বসুর বিবরণ অনুযায়ী এই অন্তর্ধান পরিকল্পনা রূপায়ণে কিছুটা হলেও সহায়তা করেছেন, সেই ইলা বসু, দ্বিজেন বসু, অরবিন্দ বসু'র এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য না থাকাটাও কম বিস্ময়কর নয়।

ডাঃ শিশির বসুর বক্তব্য অনুসারে, উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে এলগিন রোডের বাড়িতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি গিয়েছেন এবং তাঁর রাঙা কাকাবাবুর সঙ্গে এই অন্তর্ধানের পরিকল্পনা নিয়ে শলাপরামর্শ করেছেন। অন্তর্ধানের পূর্বে এলগিন রোডের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রের কাছে শিশির বসুর ঘন ঘন যাতায়াত, দীর্ঘক্ষণ থাকা, শলাপরামর্শ করা, তারপর ফিরে আসা কার্যত অসম্ভব। সমান অসম্ভব, ব্রিটিশের এক নম্বর শত্রু সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বাড়ি থেকে মধ্যরাত্রে বসু পরিবারের অতি পরিচিত গাড়িতে 'বজ্রগর্জন' করে পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনীর নাকের ডগার উপর দিয়ে শিশিরবাবুর বেরিয়ে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, একদল দক্ষ পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী ২৪ ঘণ্টা সতর্ক দৃষ্টি রাখত দুটি বাড়ির উপর। এদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে একটি মাছিরও সুভাষচন্দ্রের কাছে যাওয়া-আসা কার্যত অসম্ভব ছিল। পৃথিবীখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী রাঙা কাকাবাবুর কাছে শিশিরের ঘন ঘন যাতায়াতের ব্যাপারটি খেয়াল করেনি কিংবা সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে তার সক্রিয় ভূমিকার কথা জেনে বা বুঝে উঠতে পারেনি, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সত্যি, শিশির বসু কত বোকা ভাবেন, বাঙালিকে।

মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্রের এই 'মহানিষ্ক্রমণ' কেবল ওই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গোমো যাওয়া নয়। কলকাতা থেকে সুদূর কাবুল, পেশোয়ার, আফগানিস্তানের পথ ঘুরে হিন্দুকুশ পর্বত ও আমুদরিয়া নদী পেরিয়ে তিনি গিয়েছেন রাশিয়া, পরে জার্মানি, সেখান থেকে দূর প্রাচ্য জাপানে। উদ্দেশ্য, ওইসব দেশে কারও সহায়তায় সেনাবাহিনী সংগঠিত করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। ঘরে বসে অপরিণতমনস্ক শিশির বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রিটিশের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোমো পৌঁছে গেলেই নিশ্চয় সে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ ব্যাপক পরিকল্পনা। চাই প্রস্তুতি, লোকবল, সম্মিলিত ভাবনাচিন্তা, পরামর্শ, যোগাযোগ এবং ততোধিক গোপনীয়তা। অথচ শিশির বসুর বর্ণনায় এসবের লেশমাত্র ইঙ্গিত নেই। যা আছে তা শুধু শিশুসুলভ সাধারণ পরিকল্পনা করে অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে যেভাবে হোক গোমো পৌঁছানো। এর থেকে একটা কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, শিশিরবাবু যদি সত্যিই কাউকে গোমো পৌঁছে দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আর যেই হোন আসল সুভাষচন্দ্র নন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই, সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়ি থেকে এই 'মহানিষ্ক্রমণ' নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ব্রিটিশ ফাইল পাওয়া যায়নি। শুধু একটি আমেরিকান দলিলের ছোটো অংশ পাওয়া যায়। দলিলে ভারত থেকে রাসবিহারী বসু এবং এলগিন রোডের বাড়ি থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে আলোচনা

আছে। একই ফাইলে দুই বসুর একসঙ্গে থাকাটা তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ প্রশাসনের ঝানু গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে সফলভাবে পালিয়ে যেতে ব্রিটিশ ইতিহাসে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিপ্লবী পারেননি। ব্যতিক্রম এই দু'জন। একই দলিলে তাই রাসবিহারী-সুভাষচন্দ্রের নাম একসঙ্গে থাকাটা এই দুই কাহিনির মধ্যে কিছু যোগসূত্রেরই ইঙ্গিত দেয়। এই দলিলের বর্ণনা অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একদিন কোনো এক দাড়ি-গোঁফ সমন্বিত শার্দ্দুল সিংহ কবিশের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এলগিন রোডের বাড়িতে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর শার্দ্দুল সিংহ এবং পরে দাড়ি কামানো এক সুবেশ তরুণ বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর শার্দ্দুল সিংহ এবং পরে দাড়ি কামানো এক সুবেশ তরুণ বেরিয়ে গেলেন। অনুমান, প্রথমে শার্দ্দুল সিংহের ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র, পরে প্রকৃত শার্দ্দুল সিংহ দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে বেরিয়ে যান। সে সময়ে তাদের কেউ চিনতে পারেনি। এদের সম্পর্কে কেউ সামান্যতম সন্দেহও করেনি।

অনেকের অনুমান, সুভাষচন্দ্র এসময় কবিকে জানিয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে যদি তাঁকে গোপনে দেশ ত্যাগ করে রাশিয়া, জার্মানি বা জাপান যেতে হয় সেক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কবি যেন তাঁকে সহযোগিতা করেন। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় বলেই দু'জনের একান্তে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের এই অন্তর্ধান পর্বে ফজলুল হক এবং কলকাতার তৎকালীন মেয়রের সহযোগিতার কথা শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, সুভাষচন্দ্র কলকাতার কোনো এক বড়ো পুলিশ অফিসারের সহায়তায় তারই গাড়িতে চড়ে ঝানু গোয়েন্দাদের সতর্ক চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হন। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে কলকাতা পুলিশের উপর মহলে সুভাষচন্দ্র অনুরাগী কিছু অফিসার ছিলেন। উপরতলায় পুলিশের একটা অংশ যেমন ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত তেমনি একটা ছোট অংশ ছিল বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের অনুগত। সেটাই তিনি কাজে লাগিয়ে স্নেহের সুভাষকে ঝুঁকিপূর্ণ গোপন অভিযানে সহযোগিতা করেছিলেন। সেই কারণেই এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ব্রিটিশ সরকার ফজলুল হককে পদচ্যুত করে। আর একটি মত, ব্রিটিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতা থেকে একটি জাহাজে সুন্দরবন হয়ে তিনি অন্তর্ধান করেন।

(গ) শিশির বসু লিখেছেন, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তিনি গ্রেপ্তার হন ১৯৪৪-এ। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের তিন বছর পরে। কথা হলো, নিষ্ক্রমণের ব্যাপারে সত্য সত্যই তার সহযোগিতা থাকলে পুলিশ নিশ্চয়ই আসল মাথাটিকে এত পরে গ্রেপ্তার করত না। কারণ, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ অনেককেই গ্রেপ্তার করেছিল ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আসলে শিশির বসুর গ্রেপ্তারের পিছনে ছিল অন্য কারণ। শিশিরকে যে ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, Notification No. IV/4/43-M.S. Date, New Delhi, 7th November, 1944, Section 7 of the Restriction and Detention Ordinance, 1944 (111 of 1944) ধারায়। উল্লেখ্য, এই ধারায় সেই সময় নেতাজী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের শতশত অনুগামীদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বন্দি করে রেখেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। শিশির বসু রচিত এই দু'টি গ্রন্থের কোথাও লেখা হয়নি যে, তাকে (শিশির বসুকে) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনে সাহায্য করার অপরাধে। কারণ, ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুগামী হওয়ার থেকেও ব্রিটিশের চোখে অনেক বড়ো অপরাধ, সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করা। শিশিরকুমার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করলে ব্রিটিশ প্রশাসন নিশ্চয়ই তাকে অন্তর্ধানের পরে পরেই সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করত।

(ঘ) শিশির বসু তার রাঙাকাকাবাবুকে এতবড়ো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে এতটাই সহযোগিতা করেছিলেন যে, মহানিষ্ক্রমণের তারিখটাই সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। তাই তার গ্রন্থে নিষ্ক্রমণের তারিখ একবার ১৬ জানুয়ারি আর একবার ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ লিখেছেন। ধানবাদে পৌঁছনোর সময় নিয়েও সংশয় আছে।

শিশির বসুর বক্তব্য, এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরের ভোরেই ধানবাদে তার দাদা ডাঃ অশোক নাথ বসুর বাড়িতে তারা পৌঁছে গেছিলেন। এদিকে অশোক নাথ বসু নিজে লিখছেন, ভাই শিশির 'রাঙা কাকাবাবুকে' নিয়ে ১৮ তারিখ ভোরে তার কাছে পৌঁছেছেন।

দুর্ভাগ্য, বিগত চার দশক ধরে দেশবাসী সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমন সম্পর্কে শিশিরকুমারের গল্পকথাকে মান্যতা দিয়ে গেছেন নির্দ্বিধায়। কারণ, তারাও অসহায়। মহানির্গমন সম্পর্কে একমাত্র শিশির বসু ছাড়া সুভাষচন্দ্রের নিকট সঙ্গী সাথীরা কেউ কোনো বিবৃতি দেননি। শিশির বসুও স্বীকার করেছেন, সুভাষচন্দ্রের

মহানির্গমনে সহযোগিতা করা নিয়ে ভাব ভূমিকার কথা কোথাও কেউ লিখে রাখেননি। প্রশ্ন, ঘটনার ৩৪ বছর পরে হঠাৎই ১৯৭৫-এ তার মনে পড়ে গেল আর তিনি গুছিয়ে সবকিছু লিখে ফেললেন?

একটা কথা, মহানির্গমনের তারিখ নিয়ে বসু পরিবারের অন্য সদস্যরা এ বিষয়ে বাইরে (সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দান ও গ্রন্থ রচনা) কোনো বিবৃতি দেননি। সুভাষচন্দ্রের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদীপকুমার ৯.৪.১৯৭৩-এ কলকাতায় জাস্টিস খোসলা কমিশনে তাঁর সাক্ষ্যে এবং জেরার সময়ে কী বলেছেন সেটা দেখা নেওয়া যাক,

"The pattern of his escape was that he came to the conclusion that once it was known that he had left and if everybody in the family pretended that nobody knew where he had gone, then many of them would be arrested. So, he planned that my elder brother Aurobindo Bose who was supposed to go everyday to him would announce that Netaji would not meet anybody else and then although he left on 12th January night the fact was announced on 26th Janyary....

Shri Sisir Bose has recently published the story but Aurobindo has never published any statement. I should personally think that it is a very interesting question of integrity. (Ref. Deposition of Pradip Kumar Bose, Nephew of Netaji, before Nataji Inquiry Commission 1970, Records XVI, P. No. - 4518-4549, dated on 9.4.1973) অর্থাৎ শিশির বসুর বইয়ে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রদীপ কুমার বসুর সংশয় আছে।

এবারে একটি দলিলের (পার্লামেন্টের ধারা বিবরণী, লোকসভা আগস্ট ৩,১৯৭৭, বক্তা শশাঙ্কশেখর সান্যাল, সাংসদন, জঙ্গিপুর) মমার্থ উল্লেখ করা যাক—

"......নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি এটাই চরম সত্য। ....আমি তাঁর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে শেষ কথা বলেছি ৩ তারিখে (৩.১.১৯৪১)। তাঁর মহানির্গমন ১৩ তারিখে (১৩ জানুয়ারি, ১৯৪১)। আমি ভণিতা করছি না যে, তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনি আমি জানি। আমি জানতাম, সে অসাধারণ কিছু করতে চলেছে। সেই সময় সে আমাকে অতি গোপনীয় কিছু কথা বলেছিল। সেসব.....প্রকাশের অনুমতি নেই। সেসব প্রকাশের আগে তার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি প্রয়োজন। আমি সেই অনুমতি আসার অপেক্ষায় আছি।

অন্তর্ধান ঃ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

১৯৪১-এ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সম্পর্কে বহু সত্য মিথ্যা কাহিনি প্রচলিত আছে। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, মহানির্গমনের পূর্বে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রিয় দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের একান্ত সাক্ষাৎ অথবা পত্রবিনিময় হয়েছিল কিনা?

সুভাষচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায়, মহানির্গমনের পূর্বে তিনি উদ্গ্রীব ছিলেন কবিগুরুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের। কবিগুরু তখন প্রচণ্ড অসুস্থ। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র।

"শ্রদ্ধাভাজনেষু,

গুরুদেবের অসুখের সময় থেকেই ভাবিতেছি আপনাকে চিঠি লিখি। সে সময়ে আমি জেলখানায় এবং আপনারা তাঁর অসুখ লইয়া খুবই বিব্রত। তারপর গুরুদেবের কতকটা আরোগ্য হইবার পরেই আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং অসুস্থ অবস্থায় অনশন আরম্ভ করিতে বাধ্য হই। বাড়ি ফিরিয়া প্রত্যহই ভাবিতেছি আপনাকে লিখি—শেষে আজ সংকল্প করিয়া লিখিতে বসিলাম।

—গুরুদেবের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনি নিজে কেমন আছেন?

আমার শরীর পূর্ব অপেক্ষা ভালো—তবে কতকগুলি গ্লানি এখনও আছে। বোধ হয় স্বস্থানে শীঘ্রই ফিরিয়া যাইতে হবে—

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

সুভাষচন্দ্র বসু"

আসলে, এই চিঠিটি লিখেছিলেন গুরুদেবকেই। প্রণাম জানিয়েছিলেন তাঁকেই। এইটি গুরুদেবের কাছে সুভাষচন্দ্রের শেষ চিঠি, শেষ প্রণাম। ছোট্ট চিঠিটির মধ্যে অলিখিত রয়ে গেছে অনেক কথা। যে কথা কবি হৃদয় দিয়ে উদ্‌বিগ্ন মন নিয়ে অনুভব করলেন কয়েকদিন পরেই। "কী উদ্দেশ্যে কেন গুরুদেবের আশীর্বাণীর আকাঙ্ক্ষা ছিল চির-বিদ্রোহী সুভাষের তাও বুঝতে পারলেন গুরুদেব। হয়তো সেদিন গুরুদেব সমস্ত অন্তর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরম আশীর্বাণী অজানা পথচিহ্নের অশান্ত ভারত-পথিককে—তাঁর একান্ত স্নেহের সুভাষকে।"

অপ্রকাশ্য বা অপ্রত্যক্ষ্যভাবে এসম্পর্কে কিছু সূত্র জানা যাচ্ছে, অনুগামীদের কলমে 'মহাকাল'-এর 'ভগবানজী কথা' থেকে। সেখানে লেখা আছে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে গভীর রাত্রিতে। মহাকাল অনুগামী তাঁর ৫ মে ১৯৭৩ (পৃ. ২৩)-এ লিখছেন, "শেষ দেখা আমার কবিগুরুর সঙ্গে গভীর রাত্রিতে—কেউ জানে না। আমার রওনা হওয়ার শেষ পাথেয় এবং আশীর্বাদ তিনিই পাঠান।...." (এটা মহাকালের মুখের কথা, যা অনুগামীর ডায়েরিতে লিখিত হয়েছে।)

উভয়ের সম্পর্কের খতিয়ান বুঝতে আর একটু পিছনের কথায় আসা যাক। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কবি বোলপুর থেকে মেদিনীপুর চলেছেন—বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামার পর কবির জন্য সংরক্ষিত বিশেষ কামরায় দু'জনের একান্ত কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার বিষয় নিয়ে দু'জনের কেউ কোনো কথা প্রকাশ করেননি। এরপর দু'জনের গোপন আলোচনা হয় ১ জুলাই ১৯৪০ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সম্ভবত, আলোচনা হয়েছিল ভবিষতের কোনো একটি বিষয় নিয়ে

যা তৃতীয় জনের কাছে প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেননি। অনেকের অনুমান, সুভাষচন্দ্র এসময় কবিকে জানিয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে যদি তাঁকে গোপনে দেশ ত্যাগ করে রাশিয়া, জার্মানি বা জাপান যেতে হয় সেক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কবি যেন তাঁকে সহযোগিতা করেন। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় বলেই দু'জনের একান্তে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের বহুল যোগাযোগ ছিল। শান্তিনিকেতনে "Quite a large number of persons appointed by Rabindranath were ex-detenues and prominent Anushilan members" (Santiniketan-A phase of Tagore's association with revolutionaries by Sukumar Sarkar), অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় সুভাষচন্দ্রের আরও বৃহৎ কোনো সুপরিকল্পিত নিরাপদ অন্তর্ধান পরিকল্পনা বা তার রূপায়ণ অসম্ভব ছিল না। বরং সেরকমই কিছু ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে। 'বদনাম' গল্পটি হয়তো কবি সেই আবেগ থেকেই লিখেছিলেন।

'বদনাম' গল্পটি প্রকাশিত হয় মে ১৫—২২, ১৯৪১। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ৪ মাস পরে। গল্পটি পড়লে মনে হবে, কবিগুরু প্রিয় সুভাষের এই অন্তর্ধানের কথা শুধু জানতেন না তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় অংশীদারও। 'বদনাম' গল্পের নায়িকা পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয়বাবুর স্ত্রী সদু না সৌদামিনী, বিপ্লবী নেতা অনিল মিত্র—সবই যেন বাস্তব।

সমালোচকদের মতে, বিপ্লবী অনিল চরিত্রের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের ছায়াপাত স্পষ্ট। 'বদনাম' ছোটোগল্পের রহস্য বিশ্লেষণ করলেই সমালোচকদের অনুমানের সারবত্তা প্রমাণ হয়ে যাবে,

(ক) এর মধ্যে আছে, সুভাষচন্দ্রের ১৯৪১-এর রহস্যময় গোপন অভিযাত্রার পরিকল্পনার ছায়া। আছে, সুভাষচন্দ্রের এই রহস্যময় যাত্রায় কবিগুরুর নিজের সক্রিয় সহযোগিতার ইঙ্গিত।

(খ) বিপ্লবী অনিল মিত্রের চরিত্রের বর্ণনার মধ্যে কবি যেন সুভাষচন্দ্রের আফগানিস্তানের দিকে যাত্রার গোপন ইতিহাস নথিভুক্ত করেছেন।

(গ) অন্তর্ধানের পিছনে বঙ্গপ্রদেশের পুলিশের একাংশের যে সহযোগিতা ছিল পরে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। রবীন্দ্র সমালোচকদের মতে, বিপ্লবী অনিলের কথার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রের গোপন পরিকল্পনার কথাই প্রকাশ করে দিয়েছেন কবি—

'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি / তোদের আছে।'

হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইনস্‌পেক্টরবাবু।

'এই গান অনেকবার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্তানের রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক।'.......

সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমনের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, সোমবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৪৭, জানুয়ারি ২৭, ১৯৪১ সংস্করণে। সংবাদের শিরোনাম—

'শ্রীযুতঃ সুভাষচন্দ্র বসু অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ'

ওইদিনে প্রকাশিত হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সংবাদ শিরোনাম-

"WHAT HAS HAPPEND TO S.J.
SUBHAS CH. BOSE
Unexpected Exit from Home"

যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অঙ্কের ভাষায় কোনো বক্তব্য নেই। অথচ 'বদনাম' গল্পে তিনি কথা বলেছেন অঙ্কের ভাষায়। '১৫ দিন' শব্দবন্ধের ব্যবহার কবির খামখেয়ালিপনা নয়। অনিল মিত্তির তাহলে কবে আফগানিস্তানের পথে যাত্রা করেছে? খবরে প্রকাশ ২৭.১.১৯৪১। ১৫ দিনের ব্যবধানে খবর বেরিয়েছে, তাহলে নির্গমনের তারিখটা হবে ১২ জানুয়ারি। আর যদি বলা যায় ১৫তম দিনে বেরিয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট তারিখ হবে ১৩ জানুয়ারি? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথায়, অনিল মিত্তির নির্গমন এবং সংবাদটি খবরের কাগজে প্রকাশের ব্যবধান ১৫ দিন। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুভাষচন্দ্র ১২ জানুয়ারি ১৯৪১ মধ্যরাত্রে কিংবা ১৩ জানুয়ারি ১৯৪১-এ বেরিয়ে গেছেন। ১৯৭২ সালে সুনীল দাস ও বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী, ১৯৭৩-এ ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদীপকুমার বসু এবং ১৯৭৭-এ মহানিষ্ক্রমণ বিষয়ে মুখ খুলেছেন বিপ্লবী, ব্যারিস্টার তথা নেতাজীর অনুচর শশাঙ্কশেখর সান্যাল। অপ্রত্যক্ষভাবে এবিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেছেন কবিগুরু স্বয়ং। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু তাঁর দেহাবসানের কয়েক মাস পূর্বে 'বদনাম' ছোটগল্পে প্রিয় সুভাষের মহানির্গমন সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ যে তথ্য দিয়েছেন তা শিশির বসুর দেওয়া মহানির্গমন সম্পর্কে ইঙ্গিতপূণ যে তথ্য দিয়েছেন তা শিশির বসুর দেওয়া মহানির্গমনের তারিখ এবং তার ভূমিকা যে মিথ্যা সেকথাই প্রমাণ করে। এই চারজন নিশ্চয়ই ১৯৪১-এর পর চক্রান্ত করে এই অসত্যভাষণ দেননি।

**লেখকের বই 'বিচিত্রা' (জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট, কলকাতা) গ্রন্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যের মূল নথিগুলি মুদ্রিত।*

Shree Cement
SHREE
जंग रोधक
CEMENT
घर की ढाल,
सालों साल
SHREE जंग रोधक CEMENT
Delhi Corporate & Marketing Office: Epitome, Building 5, 9th Floor, DLF Cyber City, Block-B, Gurugram - 122002.
Tel: +91-124-4699200
Kolkata Corporate Office: 21, Strand Road, Kolkata - 700001. | Tel: +91-33-2230 9601-04
www.shreecement.com

টেরর স্টেট

পাকিস্তানের এটাই এখন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ইমেজ

সুজিত রায়

সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের জঙ্গিবাহিনীর হামলায় এখনও পর্যন্ত মূলত ভারতবর্ষে কত সংখ্যক প্রাণহানি ঘটেছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান নিজেও দিতে পারবে না। কারণ হত্যা, সন্ত্রাস, অত্যাচার ও ধর্ষণে পেশাদারী দেশ ধারাবাহিকভাবে অপরাধ করেই চলে। কোনো হিসাব থাকে না তার।

গ্লোবাল টেররিজম ইনডেস্ক অনুযায়ী—শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই পাকিস্তানি সন্ত্রাসী হামলায় মোট হত্যার শিকার ১০৮১ জন যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৪৫ শতাংশ বেশি। এই ইনডেক্সেই দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে পাক-সন্ত্রাসী হামলার মোট সংখ্যা ছিল ৫১৭। হত্যার সংখ্যা ছিল ৭৪৮। বাড়তে বাড়তে বছর ঘুরতেই তা হাজার পার। ফলত গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৫ রিপোর্টে পাকিস্তানকে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক সন্ত্রাসবাদ প্রভাবিত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গোটা বিশ্বের চোখে একটি নিন্দিত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরেও পাকিস্তান সরকার এবং মোল্লাবাদী নাগরিকরা সন্ত্রাসকে বিসর্জন দেয়নি। সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হলো—পাকিস্তান তার ১৯৩০-এর দশকের ভারত বিদ্বেষী

মনোভাবকেই আজও প্রাধান্য দিয়ে চলেছে এবং গত ৭৫ বছর ধরে পৃথক দেশ গঠনের সময় থেকেই ক্রমাগত আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের শেষ পাদানিতে পৌঁছেও এই অন্যতম ভারত-বিদ্বেষী ইসলামিক স্টেট পাক-ই-স্তান অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র ভূমি থেকে পাকিস্তান অর্থাৎ সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরে পরিণত হওয়া দেশটি সন্ত্রাসের পথেই পা বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে।

কেন এই ভারত বিদ্বেষ, সে প্রশ্নের বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়ার আগে আসুন দেখে নিই—গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৫ রিপোর্টে ঠিক কী কী বলা হয়েছে—গ্লোবাল টেরেরিজম ইনডেক্সে সামগ্রিকভাবে ১৬৩টি দেশকে স্ক্যানারের অধীনে আনা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস মূলত সন্ত্রাসবাদ ট্র্যাকার ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে যে সামগ্রিক তথ্যের সম্ভার মজুত করেছে, জিটিআই রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে সেই তথ্যকেই ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে।

এই রিপোর্টে স্পষ্টতই দাবি করা হয়েছে—সবচেয়ে সর্বনাশা সন্ত্রাসবাদের প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়েছে ইসলামিক মোল্লাবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেট বা আইএস নামে বহুল পরিচিত। যদিও এই আইএস-এর ৭১ শতাংশ কার্যকলাপ সিরিয়া এবং ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো বা ডিআরসি তেই সীমাবদ্ধ তবুও আইএসের কার্যকলাপের সবচেয়ে বড়ো সমর্থক দেশ হলো পাকিস্তান। সাব-সাহারান আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল হলো সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রভূমি যা মূলত আইএসের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। ইসলামিক স্টেট সংগঠনটির নেতৃত্ব থেকে গুপ্তচর এবং গুপ্ত ঘাতকবাহিনীর অবাধ অনুপ্রবেশকে স্বাধিকার দিয়ে রেখেছে পাকিস্তান। ফলত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পাকিস্তানই হলো আইএস-এর অন্যতম মূল ঘাঁটি যেখান থেকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদী হানা হয়ে চলেছে সেই ২০০০ সাল থেকেই, অবিরাম।

এমনকী পাকিস্তানের মদতেই আফগানিস্তানের মাটিতেই ডানা মেলেছে তালিবানি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান। এরাও প্রত্যক্ষভাবে আইএস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাসের নয়া জামানার জন্ম দিয়েছে শান্তিপ্রিয় আফগানিস্তানের মাটিতে। এক সময়ে মধ্যপ্রাচ্য ছিল আইএসের ঘাঁটি। এখন মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ—ইরাক, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশগুলির রাজনৈতিক ও সামরিক চাপে তারা সরে গেছে সাহেলে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মৃত্যু কমেনি বরং বিশ্ব মানচিত্রে এই হামলা ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে সামগ্রিকভাবে ২২ শতাংশ। রিপোর্টে স্পষ্টতই দাবি করা হয়েছে—সন্ত্রাসবাদের প্রভাব ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে এবং সন্ত্রাসবাদী হানা এতটাই তীব্র হয়ে উঠছে যে, ২০২৩ সালে সন্ত্রাসবাদে মৃত্যুর শিকারের ৮৭ শতাংশই ঘটে গেছে মাত্র দশটি দেশে। আইএস হানা দিয়েছে ২১টি দেশে। সঙ্গে মদত দিয়েছে বোকা হারাম ও হুথিদের মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিও।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ

পাকিস্তানের সন্ত্রাসী মনোভাব স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্তত ১৭ বছর আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন তৎকালীন মুসলমান নেতৃত্ব এবং মুসলিম লিগ মূলত স্বধর্ম ও স্বাজাত্যভিমানকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে সনাতন ধর্মের অনুকূল হিন্দু ভারতবর্ষের পাশেই একটি ইসলামিক দেশ গঠনের জন্য আন্দোলনের নামে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাঠ আমরা অবশ্যই নেব। কিন্তু পাকিস্তানের স্বাধীন সরকার পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের শিকড় ছড়ায় মূলত ১৯৭৯ সালের পর থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে যখন আফগানিস্তান দখল করে তখন সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান আফগান মুজাহিদিনদের সমর্থন করার পর থেকেই পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়। এই মুজাহিদিন যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, আমেরিকার গুপ্তচর বাহিনী সিআইএ এবং পশ্চিমি দেশগুলির গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। তখন থেকেই মোল্লাবাদী ইসলামিক নেতৃত্ব তথা ধর্মীয় নেতারা ধর্মের আড়ালে জঙ্গিবাদকে পশ্রয় দিতে শুরু করে। শিক্ষার নামে মাদ্রাসা ও খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে কিশোর প্রজন্মকে হিন্দু বিদ্বেষের প্রচারে জারিত করে গড়ে তোলে সামাজিক স্তরের জঙ্গি বাহিনী। সাম্প্রদায়িক মোল্লাবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত মানুষজন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক তাগিদ ঝেড়ে ফেলে হাতে তুলে নেয় আন্তর্জাতিক মানের মারণাস্ত্র। একেবারে সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের তকমাধারী হিসেবে। এই সময় থেকেই জঙ্গি বাহিনীগুলি ধীরে আই এস নিয়ন্ত্রিত শাখা জঙ্গি সংগঠনের চেহারা নেয়। পাকিস্তানের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, গভীর জঙ্গলের সামরিক ডেরায়, গড়ে বাসা বাঁধে সন্ত্রাসের উইপোকা। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা পাকিস্তানে এমনকী পাক অধিকৃত আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের একাংশেও।

পাকিস্তানের এই সন্ত্রাসবাদমুখী পরিচিতিটা এতদিন মুখোশের আড়ালে থাকলেও, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের টুইন টাওয়ারের নারকীয় সন্ত্রাসী হামলার পর। এই ঘটনা গোটা বিশ্বকে সচকিত করে তোলে যা অচিরেই বিশ্ব সন্ত্রাসী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। আফগানিস্তান ও ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি পাকিস্তানের বিদেশনীতি একটি বিপজ্জনক ইউটার্ন নেয়। একদিকে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মোল্লাবাদী সন্ত্রাসী জনগণ যেমন শিয়া, সুফি, আহমেদিয়ার মতো সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে, তেমনি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স সামরিক বাহিনী এবং স্বঘোষিত ইসলামিক মজহবি নেতাদের একটি অপবিত্র জোট জম্মু ও কাশ্মীর ভূখণ্ডকে লক্ষ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদের হানাভূমিতে পরিণত করে। এই জঙ্গি জোটের সঙ্গে হাত মেলায় কাশ্মীরের বসবাসকারী ভারতীয় জেহাদি মুসলমানরা যারা কাশ্মীরের

স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে জম্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের চারণভূমি করে তুলতে চেয়েছিল। এই জেহাদি বাহিনীগুলি আসলে পাকিস্তানের জিহাদি গোষ্ঠী আহলে হাদিস, দেওবন্দি জমায়াত-ই-ইসলামি-সহ নানা গোষ্ঠীর বিস্তারিত অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল।

জেহাদি প্রশিক্ষণের রণভূমি পাকিস্তান

জেহাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ছয়টি ধাপে।

তাসিস ঃ এই পর্বে প্রশিক্ষণরত তরুণ প্রজন্মকে মজহবি ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত করা হয়। এই পর্বে শেখানো হয় ইসলাম হলো বিশ্বের পবিত্রতম মজহবী এবং কোরান হলো পবিত্রতম মজহবি গ্রন্থ। সেরা শত্রু হলো বিধর্মী হিন্দুরা যারা ইসলাম ও কোরানের বিরোধিতা করে। গোমাংস ভক্ষণকে ঘৃণা করে। একাধিক বিবাহ ও তালাক পদ্ধতির অপসারণ দাবি করে ও মহিলাদের পর্দানাশিন না থেকে প্রকাশ্যে মেলামেশায় অনুপ্রাণিত করে। এরা কাফের, এদের মুণ্ডচ্ছেদ করাই হলো শ্রেষ্ঠ শাস্তি। এই প্রশিক্ষণ চলে এক মাস।

আল-বাদ ঃ এই প্রশিক্ষণ চলে তিন মাস। এই পর্যায়ে প্রশিক্ষণরত জেহাদিদের শারীরিক ও মানসিক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে চলে সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পরবর্তী ছ মাস ধরে চলে গেরিলা প্রশিক্ষণ

দোশতা ঃ সাত থেকে দশদিনের এই প্রশিক্ষণে অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হয়।

জান্দলা ঃ এই পর্বে নয় মাস ধরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহার এবং বিস্ফোরক তৈরি করতে শেখানো হয়। তবে দোশতা ও জান্দালা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সব শিক্ষার্থী পায় না। এর জন্য বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক বল এবং ইসলামিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারে তাদেরই দোশতা বা জান্দালা পর্বে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও আছে জোমেলা প্রশিক্ষণ অর্থাৎ কাঁধে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র রেখে আক্রমণের প্রক্রিয়া। আছে জাকাজাকও প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণে ট্যাঙ্ক, কামান বা অন্যান্য ভারী অস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। তবে এই শেষ দুটি প্রশিক্ষণ দিতে গেলে সেনাবাহিনীর সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি যেমন লস্কর-ই-তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন এবং হরকাতুল জেহাদ-ই-ইসলামির মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পাকসেনার কাছ থেকেই এই প্রশিক্ষণগুলি নিয়ে থাকে। এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে পাকিস্তানে জঙ্গি সন্ত্রাসে সরকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই ভারতের ওপর পাকিস্তানের সমস্ত জঙ্গি হানাকেই স্টেট স্পনসর্ড ক্রাইম হিসেবেই দাবি করা হয়ে থাকে।

পাকিস্তানি মদতপুস্ট জঙ্গি বাহিনী

তালিবান, জঈশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা বা লস্কর-ই-ঝাংভির মত অতি সুপরিচিত জঙ্গি সংগঠনগুলি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে অবস্থান করলেও এই গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্য একটাই, বিশ্বজুড়ে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজে তাদের প্রধান সহায়ক শক্তি ইসলামিক স্টেট এবং ইন্টার স্টেট ইনটেলিজেন্স। এদের মাধ্যমে পাক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির যেমন আল কায়েদা, তালেবান, জামায়াত-ই- ইসলামি, হিজবুল মুজাহিদিন ইত্যাদির।

এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আল কায়দাই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড়। আল কায়দার অবিসংবাদিত নেতা ওসামা-বিন-লাদেন আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আশ্রয় নিয়েছিল পাকিস্তানেই পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। আল কায়েদার রয়েছে একটি পাকিস্তানি শাখাও যারা পাকিস্তানি, তালিবান, জইশ-ই-মহম্মদ বা লস্কর-ই-তৈবার মত দেওবন্দি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাসী হানার পরিকল্পনা করে। ইন্টারনেট বা আন্তর্জাতিক সম্প্রচার নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে আল কায়েদা আন্তর্জাতিক জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে। সংগঠনের হিংস্রতা এতটাই এবং এদের আন্তর্জাতিক স্তরে জঙ্গি দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এতটাই মজবুত যে আল কায়েদা আত্মঘাতী ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি বিস্ফোরণ, অপহরণ, লাইভ ভিডিও সম্প্রচার করে মানুষের ধড় ও মুণ্ডু আলাদা করে দেওয়া এবং রকেট লঞ্চার ব্যবহার করার মতো প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে। আজ যখন পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে গোটা বিশ্বের নজরে ঘৃণিত, তখনও সে যখন ভারতের মতো শক্তিশালী দেশকে চোখ রাঙায়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না—পাকিস্তান নিজের যোগ্যতায় কথা বলছে না—বলছে আল কায়েদার মতো নৃশংস পশুসম একটি সন্ত্রাসবাদী ইসলামিক গোষ্ঠীর মদতেই।

আল কায়েদার পাশাপাশি রয়েছে তালেবান-এর পাকিস্তানি শাখাও। তালিবান সংগঠনটির উত্থান ঘটেছিল ৯।১১-র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পর আফগানিস্তানের খাইবার পাখতুনখোওয়া প্রদেশের কিছু অংশে এবং পাকিস্তানের ফেডারেলি অ্যাডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়াস (FATA) অঞ্চলে। প্রাথমিকভাবে তালেবানের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা এবং আফগানিস্তানের দখল নেওয়া। কিন্তু অচিরেই এই মারাত্মক ধরনের নারীবিদ্বেষী এবং নারীর অধিকার হরণকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীই ইসলামিক অ্যাজেন্ডাকেই আঁকড়ে ধরে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামিক সন্ত্রাস কায়েমের ডাক দেয়। আসলে এই আফগান তালিবানদের উৎস হলো দেওবন্দি গোষ্ঠীই। সোভিয়েতের সঙ্গে আফগানের যুদ্ধে আফগান মুজাহিদিনরা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানি মুজাহিদদের পঞ্জাবি মুজাহিদিন বলেই চিহ্নিত করতো। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পঞ্জাব মুজাহিদিনরা জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস কায়েম করলো, তখন তাদের পরিচয় হয়ে গেল আফগান মুজাহিদিন। আবার একই সময়ে পাকিস্তানি তালিবানদের বলা হতো পঞ্জাব তালিবান। আসলে এই

সমস্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, সন্ত্রাসবাদের কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই। সব তালিবান, সব মুজাহিদিন, সব জইশ, সব লস্করই আসলে ইসলামিক স্টেট-এর তাঁবেদার। তারা সকলেই একটি তত্ত্বে বিশ্বাসী---বিশ্ব শাসনের মহান দায়িত্ব আল্লাতালা শুধু মুসলমানদেরই দিয়েছে। সমগ্র মুসলমান সমাজের স্বার্থে তাই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসের আঁধার কায়েম করতে চায়—অন্ধেরা কায়েম হ্যায়, অন্ধেরা কায়েম রহেগা।

মুসলমান গবেষক এবং সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল আলা মুওজুদি জামায়াদ-ই-ইসলামির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে। দলের মূল নীতি ছিল—বিশ্বের প্রাথমিক সংগ্রাম হলো ইসলাম, যা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফলত, জামায়াতের কাছে পুঁজিবাদ, উদারনীতি, সেকুলারিজজমের মতো শব্দগুলি ছিল বিষের মত অসূয়া। দল চেয়েছিল, পাকিস্তানে শরিয়ত আইন মোতাবেক ইসলামি দেশ স্থাপিত হোক। তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে—পাশাপাশি জামায়েত আরও একটি অলিখিত স্বপ্ন পূরণ করেছে—তাহলো একটি নৃশংস সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া। এই জঙ্গি গোষ্ঠীটিই ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজাকার যোদ্ধার বেশে বাঙ্গালি তথা হিন্দু জনগণের গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল এবং তারা এ ব্যাপারে পাক সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তা উপভোগ করেছিল। পাকিস্তানে জিয়া-উল-হকের শাসনকালে জামায়াতের রাজাকার যোদ্ধাদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাও সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করে যে—পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের জনক ও পালক আসলে পাকিস্তানের সরকার। হিজবুল মুজাহিদিন মূলত জামায়াত-ই-ইসলামিরই একটি জঙ্গি গোষ্ঠী যারা জম্মু ও কাশ্মীরে জেহাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে বা দিয়ে চলেছে। হিজবুল মুজাহিদিনের প্রতিষ্ঠাতা হলো কাশ্মীরের এক স্কুল শিক্ষক মুহাম্মদ আহসান দার। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর ও জম্মুকে ছিনিয়ে নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এই সংগঠনের নেপথ্যে রয়েছে কাশ্মীরের কিছু স্বার্থান্বেষী কাশ্মীরি ও অকাশ্মীরি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি। দক্ষিণ এশিয়ান জেহাদি গোষ্ঠীর আদর্শ শীর্ষক রচনার লেখক হুসেন হাক্কানির মতে—হিজাবুল মুজাহিদিনের সাহিত্য ও শিক্ষার বেশিরভাগই জেহাদের প্রায় স্থায়ী অবস্থাকে সমর্থন করে এবং বিস্তৃত পরিভাষায় সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডকে মুসলিম পুনর্বিজয়ের বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করে। সমস্ত পাক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গেই হিজবুল মুজাহিদিন সমর্থনের সংখ্যাও অনেক। মাদ্রাসা শিক্ষার মুজাহিদিনের সমর্থনের সংখ্যাও অনেক। মাদ্রাসা শিক্ষার পরিচালনায় হিজবুলের গভীর নিয়ন্ত্রণ। যদিও বর্তমানে হিজবুল মুজাহিদিন আভ্যন্তরীণ সংঘাতে বহুধা বিভক্ত। তবুও জাকির মুসার নেতৃত্বাধীন হিজবুল মুজাহিদিন কাশ্মীর সমস্যাকে রাজনৈতিক ইস্যু না বলে, বলে থাকে কাশ্মীর হলো ইসলামি সংগ্রামের প্রতীক।

কাশ্মীর উপত্যকায় অত্যন্ত সক্রিয় পাকিস্তানি জেহাদি গোষ্ঠী হলো লস্কর-ই-তৈবা। এটির জন্ম হয়েছিল আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। মূলত মারকাজ দাওয়া-উল-ইরশাদ নামে একটি বৃহৎ মজহবি সংগঠনের জঙ্গি শাখা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল লস্কর-ই-তৈবা। এই গোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নৃশংস নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সেরা জঙ্গির তালিকাভুক্ত তিন নেতা—হাফিজ মুহম্মদ সাইদ, জাফর ইকবাল এবং আবদুল্লা আয়থাম। এদের মূল কার্যকলাপ কাশ্মীর উপত্যকায়। গোটা পাকিস্তান এবং কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে এই গোষ্ঠীর বৃহত্তম জঙ্গি নেটওয়ার্ক। এদের নিজস্ব অফিস আছে ২,২০০টি এবং বিশাল সংখ্যক জঙ্গি সমর্থক যারা নিজেদের যোদ্ধা বা Warrior হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। হাফিজ সাইদের একমাত্র লক্ষ্য কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বৈশ্বিক ইসলামি দেশগুলির অন্যতম হিসেবে পাকিস্তানকে মর্যাদা দেওয়া।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত যতগুলি বড়ো বড়ো জঙ্গিহানা ভারতের মাটিতে সম্পন্ন হয়েছে তার সিংহভাগেরই দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বাস—পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 'ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স' (ISI) এবং লস্কর-ই-তৈবার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাই শহরে আফজল কাসভনসহ একটি জঙ্গিবাহিনী যে নরসংহারের উদাহরণ রেখেছিল, তার পিছনেও ছিল লস্কর-ই-তৈবার সুতীক্ষ্ণ পরিকল্পনা। গোষ্ঠীটির আর্থিক সংগতিও যে কোনও বড়ো মাপের কর্পোরেট সেক্টরের মতই। কারণ বিদেশে বসবাসকারী মোটা অর্থ উপার্জনকারী পাকিস্তানির এবং কাশ্মীর উপত্যকার বেশ কিছু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীরা এই গোষ্ঠীর অর্থ সংগ্রহের মূল চাবিকাঠি।

মওলানা মাসুদ আজহার—যার নাম এখন গোটা ভারতবাসী জানে। শুধু জানেই না, ভারতবাসী দাবি করে, এই শয়তানরূপী জঙ্গি নেতাকে বিশ্বের গণতন্ত্রের দরবারে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হোক। কারণ এই অমানুষটিকে ভারত সরকার গ্রেপ্তার করেও ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর তার মুক্তির দাবিতে ভারতবর্ষের মাটিতে অতি সক্রিয় হারকত-উল-মুজাহিদিন গোষ্ঠী। অন্যতম শাখা সংগঠন জইশ-ই-মুহম্মদের কয়েকজন জঙ্গি নেপাল থেকে দিল্লিগামী একটি ভারতীয় যাত্রীবাহী বিমানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় কান্দাহারে। একশো শতাংশ ব্ল্যাকমেলিং কৌশলে যাত্রীবোঝাই বিমানটিকে ধ্বংস করে দেবার ভয় দেখিয়ে ভারত সরকারকে বাধ্য করে মাসুদ আজহারকে মুক্তি দিতে। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর এই জইশ-ই-মুহম্মদ কাশ্মীর আইনসভায় আচম্বিতে হানা দিয়ে ৩১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ২০০৩ সালে এই জঙ্গি গোষ্ঠীই

পাকিস্তান প্রশাসনের সঙ্গে মতান্তরের কারণে তৎকালীন পাক-রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের উপর আত্মঘাতী হামলার ছক করেছিল। যদিও সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

হিন্দু-বিরোধিতার পাশাপাশি তীব্র খ্রিস্টমত বিরোধী জইশ- ই-মুহম্মদ ২০০১ সালে মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে হত্যা করেছিল। সেই মামলায় দলীয় নেতা ওমর সইদ শেখকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। প্রচুর আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে জইশ-ই-মুহম্মদ গোষ্ঠীর। সেই অর্থ জোগানের পিছনে ইন্টার স্টেট সার্ভিসেস এরও অবদান আছে। যদিও প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত জইশ গোষ্ঠী ক্রমাগত পাকিস্তান প্রশাসনের পক্ষেও ভয়াবহ হয়ে উঠায় ২০০২ সালে পাক- সরকার জইশ গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মাসুদ আজহার আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যান। জনচক্ষুর আড়ালে থেকেই সংগঠনের জন্ম দেন। প্রথম সংগঠন খুদ্দাম-উল-ইসলাম (KUI) এর নেতৃত্বে থাকেন নিজেই। দ্বিতীয় সংগঠন জামাত-উল-ফুরবানের দায়িত্ব দেন আবদুল্লা জব্বারের ওপর। যদিও প্রশাসনিকভাবে দুটি গোষ্ঠীই এখনও

পাকিস্তানের হিংস্র নিঃশ্বাসে দমবন্ধ কাশ্মীর আজ মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই সমস্ত পদক্ষেপই আসলে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া—তোমার দেশে যতই দাউদ ইব্রাহিম বা আইসিসের ছদ্মবেশধারী জঙ্গিদের আশ্রয় দাও না কেন, সবার শেষ পরিণতি হবে আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মতোই। আর গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত হবে পাকিস্তান।

জইশ-ই-মুহম্মদ পরিচিতি হারিয়ে যেতে দেয়নি। কারণ জইশই পাক-সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা একটি ব্রান্ড। জইশকে ভারত সরকারও অত্যন্ত নজরে রাখে। কারণ হায়নার মতো সুচতুর এই মাসুদ আজহার যখন তখন যা খুশি করতে পারে। ফলত, ভারত সত্যিকার সুযোগ পেলেই মাসুদ আজহারকে বন্দি করবে এবং ১৯৯৯ সালের ব্ল্যাকমেলিং এর প্রতিশোধ নেবে। গত মে মাসে পহেলগাঁওতে ২৬ জন ভারতীয়কে পাক জঙ্গিরা হত্যা করার পর ভারত যখন পাকিস্তানের ওপর আক্রমণ চালায়, তখনও স্পষ্ট ছিল পাকিস্তানের অন্দরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় আজহারের মোট সাত জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু হলেও আজহার সুরক্ষিত থেকে যায়। শোনা যায়, পারিবারিক সাত সদস্যের নৃশংস মৃত্যুর পর সে বেঁচে থাকতে চায়নি। তবে তার এটাও মনে রাখা উচিত, সে বাঁচতে চাক বা না চাক—ভারত সরকার তাকে বাঁচতে দেবে না। এটাই তার ভবিতব্য।

পাকিস্তান ও কাশ্মীরের মাটিতে এই সব বড়ো মাপের জঙ্গি সংগঠনগুলির পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু ছোটো ছোটো জঙ্গি

গোষ্ঠী যেমন—আল বদর, আল উমর, জামিয়ত-উল-মুজাহিদিন, এলইটি ইত্যাদি। কট্টরপন্থী এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং তা পাক ভূমির অন্তর্ভুক্ত করা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে যে দেওবন্দি গোষ্ঠীগুলি অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, সেই গোষ্ঠীগুলি পাক-দেশ তৈরি হবার পরও সন্ত্রাসের পথ থেকে পিছু হটেনি। তবে সিপাহ-ই-সাহাবা বা লস্কর-ই-ঝাংভির মূল লক্ষ্য আগের মতই শিয়াদের বিরোধিতা করা। এরা দাবি করে, শিয়াদের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মতোই অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা হোক, যাতে তারা কোনোভাবেই বৈশ্বিক মুসলিম প্রবাহের সুযোগ সুবিধা নিতে না পারে। সিপাহ-ই-সাহাবার নেটওয়ার্ক গোটা মুসলিম দেশগুলি জুড়েই। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত প্রায় ৬০০০ কর্মী। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশেই রয়েছে এদের পাঁচশোটি অফিস। এছাড়া আন্তর্জাতিক অফিস রয়েছে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত, কানাডা, বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

একইভাবে পাকিস্তানকে শিয়াশূন্য করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর লস্কর-ই-ঝাংভি। মূলত পাকিস্তানের করাচি ও পঞ্জাবে অবস্থিত এই গোষ্ঠী প্রাক্তন পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এই গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য দেয় করাচির ধনী মুসলমানরা।

কাশ্মীরের মাটি আঁকড়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণের এমনই আর একটি সহিংস জঙ্গী সংগঠন হলো হারকাত-উল-মুজাহিদিন। মূলত হারকাত-উল-জেহাদ-ই ইসলামি থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা নেতা মওলানা ফজহুর রহমান খলিল এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা। মজহবি শিক্ষা সংগঠন মাদ্রাসার আড়ালে শুধু কাশ্মীরেই নয়, আফগানিস্তানেও জঙ্গি প্রশিক্ষণে খুবই সক্রিয়। দেওবন্দি মজহবি সংগঠন জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম ফজলুর রহমান উপদলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হরজত-উল-মুজাহিদিন আফগানিস্তানের খাইবার পাখতুনখোওয়া এবং মানসেরা ও পাকিস্তানের মুজফফরাবাদে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে।

দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত ও দরিদ্র মুসলমান পরিবারের সন্তানদের কখনও বেহেস্ত কখনও টাকা-কড়ি, গাড়ির লোভ দেখিয়ে জঙ্গি হিসেবে গড়ে তোলে। তারপর ঠেলে দেয় ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলার মধ্যে।

আসলে কখনও কাফেরদের নিকেশ করা, কখন ইসলামি আমিরত প্রতিষ্ঠা করা, কখনওবা বৈশ্বিক ইসলামিক মৈত্রীর ধুয়ো তুলে এরা সৌদি আরব থেকে শুরু করে পাকিস্তানের, এমনকী ভারতবর্ষেরও ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে কোটি কোটি টাকার অনুদান সংগ্রহ করে। সেই টাকার একটা অংশ দিয়ে কেনা হয় আইইডি, মর্টার, রকেট, গ্রেনেড, বন্দুক এবং সেগুলি ব্যবহৃত হয় গণহত্যা, মৃত্যুদণ্ড, অপহরণ অভিযান, বিধ্বংসী হামলার মত হিন্দু ও খ্রিস্টান বিরোধী সক্রিয়তায়। জঙ্গি সংগঠনগুলির এটা হলো একাংশের সক্রিয়তা। কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকে বেআইনি পথে কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রা উপার্জন এবং স্বনামে বা বেনামে দেশে বিদেশে নেতাদের নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের যাবতীয় আস্তানা গড়ে তোলা। মুজাহিদ জিহাদি কাউন্সিল এমনই একটি সংগঠন যেটির পিছনে রয়েছে পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদত। হিজবুল মুজাহিদিনের নেতা সৈয়দ সালাহউদ্দিনের কর্তৃত্বে পাক-সরকার ১৩টি শীর্ষস্থানীয় জেহাদি সংগঠনকে এই জোট সংগঠনটি তৈরি করে যাতে সরকার এই সংগঠনগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। বর্তমানে এই মুহাজিদ মুজাহিদিন বা ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৬। সেই সদস্যরা হলো লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম), হিজবুল মুজাহিদিন, হরকত-উল-আনসার, তেহারিক-ই-জিহাদ, তেহারিক-উল- মুজাহিদিন, আল জেহাদ, আল উমর মুজাহিদিন, জম্মু-কাশ্মীর ইসলামিক ফ্রন্ট, মুসলিম জানবাজ ফোর্স, হিজবুল্লাহ আল ফাতাহ, হিজাবুল মোমিনিন, আল বদর মুজাহিদিন ও জামাত-উল মুজাহিদিন। মূলত পাকিস্তানের মাটি থেকে উদ্ভুত এই সমস্ত জঙ্গি সংগঠনগুলির সংযুক্তিকরণ নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাপী জঙ্গি কার্যকলাপকে সক্রিয় করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং আধুনিক মিসাইল ও ড্রোন হামলার উপকরণও এই গোষ্ঠীগুলির কাছে এসে পৌঁছচ্ছে পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে।

ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল বা ইউজেসি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে—'পাকিস্তান তাদের আদর্শ লক্ষ্য....মুক্তিযোদ্ধারা (কাশ্মীর) পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। জেহাদ আরও শক্তিশালী হচ্ছে..... মুজাহিদিনরা আরও সংগঠিত হচ্ছে এবং কৌশলগতভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে আক্রমণ করছে। এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন ইউজেসি কমান্ডার মঞ্জুর শাহ। সংগঠনটি আরও ঘোষণা করেছে—'ইউজেসি-র লক্ষ্য হলো সংগঠনের সব সদস্যের মধ্যে ঐক্য আনা, একটি সম্মিলিত সামরিক কৌশল পরিকল্পনা করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে একটি সাধারণ অবস্থান তৈরি করা।' সৈয়দ সালাহ্উদ্দিনের ঘোষিত এই বক্তব্যের মূল লক্ষ্য কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং তা পাকিস্তানের অধীনে নিয়ে যাওয়া। সালাহ্উদ্দিন মনে করেন ভারতের মুসলমানরাও এটা চান উপমহাদেশের স্বার্থেই। তাঁর বক্তব্য—'যদি ভারত কাশ্মীর সমস্যার বাস্তবতা মেনে নেয় তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ভারত যদি কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধে তার সেনাবাহিনীর ব্যবহার অব্যাহত রাখে তাহলে ইউজেসি-র হাতে বন্দুকের ব্যবহার ছাড়া বিকল্প কিছু থাকবে না। এ যেন সেই ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই মুসলিম লিগের কর্মপরিষদের সভায় মহম্মদ আলি জিন্নার ভাষণের পুনরুক্তি। আমি এখন আর নীতিকথা বলব না। আমাদের একটি

পিস্তল আছে। এখন সেই পিস্তলটি ব্যবহার করতে হবে।

২০১৭ সালের ২৬ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈয়দ সালাহ- উদ্দিনকে 'বিশ্ব সন্ত্রাসী' বা 'ওয়ার্ল্ড টেররিস্ট' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাতেও এদের উৎসাহকে দমানো যায়নি। কারণ এদের পিছনে রয়েছে বিশ্ব ইসলামিক সন্ত্রাসী শক্তি—ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ড যা কখনও আইএস আবার কখনও আইএসআইএস নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীটিকেও জাতিসঙ্ঘ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আইসিসের উত্থান ঘটেছিল ১৯৯১ সালে জামাত-আল-তাউহিদ ওয়াল-জেহাদ নামের ব্যানারে। এই সংগঠনটি ছিল আল কায়েদার প্রত্যক্ষ সমর্থক। বর্তমানে এই আইসিস পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-সহ মোট ১৮টি দেশে সক্রিয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে আইসিস আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে ঘিরে 'ইসলামিক স্টেট অব খোরাসান' বলে ঘোষণা করে। পাক সরকার আইসিসের কর্তৃত্ব মেনেই চলতে বাধ্য কারণ, পাকিস্তানে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে ২০০টির বেশি সংগঠন রয়েছে যাদের আদর্শ আইসিসের কার্যাবলীর সঙ্গে মিলে যায়। ফলত গোটা বিশ্বের মুসলমান সমাজের মধ্যে আইসিস প্রভাব ছড়িয়ে ফেলতে পারে অতি দ্রুত। ফলত ভারতবর্ষের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম প্রধান দেশগুলি যে নিরাপদ প্রতিবেশী এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। কারণ আইসিস, আইএস, আইএসআই অথবা বিশ্বসন্ত্রাসী মুসলিম সংগঠনগুলির নেতৃত্বের মস্তিষ্ক এতটাই বিষাক্ত যে তারা হিংসা, হামলা, হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, রক্তপাত, আগুন, ছাড়া কোনো ইতিবাচক ভাবনাই ভাবতে পারে না। এই জায়গা থেকেই প্রশ্ন উঠে আসে—পাকিস্তানের মুসলিমদের হিন্দু বিদ্বেষ কি তাদের ডিএনএ-র অংশীভূত? গাদা গাদা জঙ্গি সংগঠনকে পুষে রেখে তাদের মদত দিয়ে ভারতকে বার বার উত্যক্ত করায় পাক সরকারেরই-বা কী লাভ হয়?

অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি প্রতি আক্রমণই নয়—ভারতীয় নারী, ভারতীয় দাম্পত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির সপক্ষে প্রশাসনিক স্তরে একটি যথাযোগ্য জবাব—হে পাকিস্তান, তুমি ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছেছো পরিকল্পিত হত্যার মাধ্যমে। তার পরিবর্তে আমরা ভারতীয়রা তোমাদের সামরিক ঘাঁটি আর জঙ্গি ঘাঁটিগুলির মূল চালিকাশক্তির কেন্দ্রভূমিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিলাম।

পাকিস্তান কেন ভারত বিরোধী?

নিজের দেশের গদ্দারদের হাতে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ার আগে পাকিস্তানের তীব্র ভারত বিরোধী রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলি ভুট্টো একবার বলেছিলেন— 'Pakistani nationalism is thus a continuous contest with India or a thousand year war.' অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানি ব্রাদারহুডের লড়াই একটি ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা, এই যুদ্ধ চলবে আগামী হাজার বছর ধরে।

বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতা যে দেওবন্দি নেতৃত্বের হাত ধরে জন্ম নিয়েছিল—১৯৪৭ এ পাকিস্তান জন্মের পরও আজ তা অক্টোপাশের মতো শত সহস্র হস্তে বিস্তারিত। এটা বিস্ময়কর যে, গোটা বিশ্ব যখন শিক্ষা, কর্মকুশলতা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, কারিগরি উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তীব্র ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তখন পাকিস্তান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। একদিকে সম্প্রদায়, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ—এছাড়া তৃতীয় কোনো ভাবনা ছাড়াই একটা স্বাধীন দেশ যে সুঠাম কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—এই বোধটাই পাকিস্তানি প্রশাসক তথা নাগরিকদের মস্তিষ্কে কোনো শক দিতে পারে না। পাকিস্তান ভুট্টোর মতোই আজও বিশ্বাস করে—কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ না থাকলেও ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন মনোভাবই পাকিস্তানকে দীর্ঘজীবন দিতে পারবে।

অতএব প্রশ্ন ওঠে এর ফলে পাকিস্তানের লাভ কোথায় এবং কতটুকু? মুসলিম হোমল্যান্ডের দাবি প্রথম করেছিলেন 'দেওবন্দি' সাম্প্রদায়িক মোল্লাবাদীরা যার পরবর্তীকালে নানা জঙ্গি সংগঠনকে সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়। কিন্তু এখানেই ঘৃণার রাজনীতির শেষ হয়নি। 'পাকিস্তান' (পাক-ই-স্তান) বা ইসলামের পবিত্র ভূমির প্রথম দাবিদার ছিলেন

তৎকালীন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ছাত্র—মহম্মদ আসলাম খান খট্টক, চৌধুরী রহমত আলি, শেখ মহম্মদ সাদিক এবং ইনায়েতউল্লা খান। এই দাবির নেতৃত্ব দিলেন চৌধুরী রহমত আলি। ১৯৩৩ সালের ২৮ জানুয়ারি এই চার ছাত্র ইংরেজি ভাষায় একটি দীর্ঘ প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল—Now or Never : Are we to live or perish for ever? সেই প্রচারপত্রে এই চার ছাত্রের মূল দাবি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ৩০ মিলিয়ন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের প্রয়োজন। তার কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব মজহব, সংস্কৃতি, লোকাচার, চেতনা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল— 'If we, the Muslims of Pakistan, with our distinct marks of nationality, are deluded into the proposed Indian Federation by friends or foes, we are reduced to a minority of one to ten. This reduction sounds the death-knell of our nation in Pakistan. To help you to realise th full magnitude of this impending catastrophe, let us remind you that we thirty millions constitute about one tenth of the whole Muslim world. The total area of our five units (in Northern Provinces in India) is four times that of Italy, three times that of Germany and twice that of France, and their population seven times that of Commonwealth of Australia, four times that of the Dominion of Canada, twice that of Spain, and equal to France and Italy considered individually.' প্রচারপত্রে আরও স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছিল— 'It is on this basis of such facts and realities that we assert without fear of contradiction that we, the Muslims of PAKISTAN, do possess a separate and distinct nationality from that of the Hindus in India, who constitute the Hindu nation and live and have every right to live in most of India, and that we deserve and demand the recognition of our national status by the grant to Pakistan of a Federal constitution, separate from the rest of India.' কেম্ব্রিজের এই চার ছাত্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল—পঞ্জাব, আফগান প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধ, বালুচিস্তানকে আলাদা দেশের অধীনে আনা, কারণ তারা ভয় পাচ্ছিল—হিন্দু প্রভাবিত ভারতবর্ষে মুসলমানরা তাদের সব ধরনের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

না, এই প্রচারপত্রে কোনো হিংসার কথা সরাসরি ছিল না—কিন্তু বৈষম্যের কথা ছিল। তাঁরা অস্তিত্ব রক্ষার সংকট থেকে অব্যাহতি চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল— হিন্দুরা থাকুক ভারতবর্ষে তাদের মতো করে—মুসলমানরা থাকুক পৃথক দেশে তাদের অধিকার নিয়ে। প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল এর ফলে হিন্দু–মুসলমান কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাবে না। কেউ কারও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তাঁরা লিখেছিলেন—'We are convinced that there can be no peace and progress in India, if we, the Muslims, are duped into a Hindu dominated federation in which we cannot be the masters of our own destiny and captins of our own souls.'

প্রাথমিকভাবে এই ভাবনা নেতিবাচক হলেও, বিধ্বংসী ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সে ভাবনাই ভারতবর্ষের মুসলিম লিগ নেতাদের হিন্দু বিদ্বেষ এবং একশো শতাংশ হিন্দু বিরোধিতার পথে টেনে নিয়ে গেল। ততদিনে অবিভক্ত বঙ্গে অনেকগুলি দাঙ্গা ঘটে গেছে। পাকিস্তানের দাবি জোরদার হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক শত্রুতার সম্পর্কে নেমে এল স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগের মুহূর্তে কলকাতার বুকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে মুসলিম নেতৃত্ব যে হিন্দু হত্যার রক্তাক্ত খেলা খেললো ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট থেকে পরবর্তী পক্ষকাল, তাতে পরিস্ফুট হলো—ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তির বাতাবরণ মুসলমানরা রাখবে না। সম্ভবত রহমত আলি চৌধুরীও সেটি বুঝেছিলেন। তাই ১৯৪৬-এর হিন্দু নরসংহার তিনি মেনে নিতে পারেননি। পারেননি বলেই বোধ হয় তাঁরই ভাবনার পরিণতি 'পাকিস্তান'-এ তিনি কখনও পা রাখেননি। জিন্নাও কখনও চৌধুরী রহমত আলির নাম উচ্চারণ করেননি। সেও এক রহস্য। তবে আসলাম খান খট্টক ফিরেছিলেন এবং দীর্ঘদিন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের রাজ্যপাল, বিদেশে রাষ্ট্রদূত এবং পাক সরকারের মন্ত্রীপদও অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে পাক সরকার তাঁকে সিতারা-ই-পাকিস্তান পুরস্কারে সম্মানিত করে।

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় জঙ্গিবাদের অনুপ্রবেশ কিন্তু সেই অর্থে বিভাজিত দুই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনেক পরে। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলেই কাশ্মীর সমস্যার সূত্রপাত। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা হলো— হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তখনই বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক হয়ে উঠলেও এখনকার মতো ভয়াবহ দুর্বৃত্তের সংজ্ঞা তখনও পাকিস্তানি ও কাশ্মীর মুসলমানরা পায়নি। সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ সবই হয়েছে কিন্তু কোথাও একটা বাঁধন, ছিল যাতে কাশ্মীরের পর্যটকদের কখনও সরাসরি 'হিন্দু' বলে গুলি খেয়ে মরতে হয়নি। হিন্দু জননেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হত্যার পিছনে কাশ্মীরের সংখ্যালঘু রাজনীতি অবশ্যই ছিল কিন্তু ওই হত্যার পরে চরম চাপের মধ্যেও পরে গিয়েছিল কাশ্মীরের মুসলমান প্রধান সরকার।

ভারতের মাটিতে কাশ্মীরের আজাদি আন্দোলন এবং পাকিস্তানের সরকারি মদতে গায়েগতরে বেড়ে ওঠা দুর্বৃত্ত সংগঠনগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে আসার পর। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে যে চরম বিরোধিতার প্রকাশ্য চেহারা সামনাসামনি প্রকাশিত হয়েছিল, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তার কারণ, পাকিস্তান সরকার এবং জঙ্গিরা ভয় পেতে শুরু করে, মুসলিম বিরোধিতা যত তীব্র হবে, ভারত সরকার এবং ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবোধ ততই প্রবল চেহারা নেবে। গুলি ছুঁড়লে ভারত গুলিই ছুঁড়বে—রসগোল্লা

নয়। লক্ষণীয়, যতবার ভারত- পাকিস্তান সমঝোতা আলোচনা বা চুক্তি প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে ততবারই সমস্ত নিয়মকানুন শিকেয় তুলে পাক সরকারের মদতে ভারতবর্ষে জঙ্গিহানা হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ পাকিস্তান ভ্রমণে গেলে, জইশ-ই-মহম্মদ এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠানকোট এয়ারবেসে আক্রমণ হানে। ২০০৮ সালে ২৬/১১য় মুম্বাইতে পাক জঙ্গিরা গণহত্যা চালায় যখন, তখনও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিল্লিতে উপস্থিত। লাহোর চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের কার্গিল হানা চুক্তিভঙ্গেরই পরিণাম। এগুলোই প্রমাণ করে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে চায় যাতে ভারত সরকার দেশের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ না করে যুদ্ধেই ব্যস্ত থাকে।

পাকিস্তানের এই স্থায়ী শত্রুতা যদি হয় ভারত-পাক সম্পর্কের তিক্ততার প্রথম কারণ তাহলে দ্বিতীয় কারণ হলো পাকিস্তানের সেনা-নির্ভর প্রশাসন। একটা কথা খুব প্রচলিত—Pakistan is an army with a state. অর্থাৎ একটা দেশের প্রশাসন কোমরভাঙা একটা কাঠামো মাত্র। সেখানে সেনার কথাই শেষ কথা। তাই বোধহয় পাকিস্তানি লেখক হুসেন হাক্কানি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—''Pakistan inherited one-third of British India's army but only 17% of its own resources. That propelled the army into the drivers seat in defining Pakistani nationalism.'' (Ref. Why the Pakistan's deep state sponsors terrorism in India by Shivam Vij, The Print dt. 18 Feb. 2019) ফলত, পাক সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর ওপর খাটে না। আর সেনাবাহিনীই জঙ্গি সংগঠনগুলিকে গড়ে তোলে, সন্ত্রাসী অস্ত্রসাজে প্রশিক্ষণ দেয় এবং ভারতের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। পাক সরকার বসে থাকে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। পাকিস্তানি স্কলার আয়েশা সিদ্দিকা তার Military Inc. বইতে অভিযোগ করেছেন,পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বোধহয় বিশ্বের একমাত্র সেনাবাহিনী যারা দোকানদারি করে— যারা সিমেন্ট বেচে, মাংসও বেচে। যারা জামাকাপড় বেচে আর বিমাপত্র বেচে। তাহলে যুদ্ধ করে কারা? জঙ্গিরা গোপনে, ছদ্মবেশে, দেশে বিদেশে ইঁদুর ছানার মতো গুপ্তচর বাহিনীকে খুদকুঁড়োর মতো টাকা পয়সা ছড়িয়ে পুষে রেখে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ৩৩টা বছর পাকিস্তানের সরকার চালিয়েছে সেদেশের সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতি পদে বসে। বাকি সময়টা তারা পুতুলের মতো বসিয়ে রেখেছে সিভিলিয়ান সরকারকে।

এই সেনা কেন এত ভারত বিদ্বেষী?

আসা যাক তৃতীয় যুক্তিতে। সোজা কথা ভারত-বিদ্বেষ মূলত প্রতিশোধ নিতে। কারণ ১৯৭১ বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনার প্যান্ট খুলে নিয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিতেই পাক সামরিক বাহিনীর এত ভারত-বিদ্বেষ। তখন সামরিক প্রধান নিয়াজির সব পিয়াজি খতম করে দিয়েছিল মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধে। ভারত ইচ্ছে করলে সেদিন পাকিস্তানও দখল করে নিতে পারত। কিন্তু ভারত তা করেনি। সেই পদক্ষেপটা ছিল পাকিস্তানের মুখে রীতিমতো জোরলো চপেটাঘাত। সেই লজ্জা, সেই দুঃখ ভুলতে পাক সামরিক বাহিনী নিজেদের সংশোধন ও উন্নত করার বদলে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে শক্তপোক্ত করে তুলেছে। ভারতবর্ষে এত পাক-জঙ্গি হানার মূল কারণ এটাই। দিল্লি নিবাসী এক পাকিস্তানি স্কলার হ্যাপিমন জেকব সে কথাই বলেছেন—'Whether or not we would like to acknowedge it, the humiliation of 1971 has had a defining impact on the psyche of the Pakistani military and its approach towards India ever since. It would be a historical to not view its current policy towards India and Kashmir as not being influenced by that deeply entrenched feeling of humiliation'.

পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষের চতুর্থ কারণটা আরও হাস্যকর। যে ক্রিকেটার ইমরান খানকে ভারতের মানুষ চিরকাল আন্তর্জাতিক মানের সম্মান জানিয়ে এসেছে, সেই ইমরান খানও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সখেদ উক্তি করেছিলেন—'ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রতি যে তিক্ত আচরণ করা হয়, সেটাই প্রমাণ করে ১৯৪৭ সালে কেন ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান দেশের জন্ম হয়েছিল।' ইমরান খানের এই অযৌক্তিক ভাষ্যের অর্থ দাঁড়ায় একটিই—ঘৃণা নয়, নিজেদের ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলছে পাকিস্তান আর উগরে দিচ্ছে সমস্ত উত্তাপ ভারতের দিকে, কারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কিংবা প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও দক্ষতা গড়ে তোলায় পাকিস্তান গত ৭৮ বছরে ভারতীয় সূচকের ধারে-কাছেও আসতে পারেনি। পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যা সমাধানে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় তাই তারা ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় জঙ্গি হানার উদাহরণ সামনে রেখে যাতে পাকিস্তানের যে সিংহভাগ অশিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত জনসংখ্যা আছে তারা ছাগলের তৃতীয় ছানার মতো উল্লাসে মত্ত হয়ে ভুলে যায়, আগামীদিনে তার পাতে 'চাউল ঔর রোটি-সবজি' জুটবে না। পাকিস্তানের ভরসা গত ৭৮ বছর ধরে এই পররাষ্ট্র নীতিই এবং এটাই তারা চালিয়ে যাবে। বার বার সার্জিকাল হানায় বিধ্বস্ত হবে। বার বার বিশ্বের দরবারে সাদা পতাকা হাতে হাজির হবে—ভারতের সঙ্গে সমঝোতা চাই বলে। দুদিন পরে আবার মাসুদ আজহারের মতো সরীসৃপ জঙ্গিনেতার নেতৃত্বে নিরপরাধ ভারতীয়দের আচম্বিতে হানায় হত্যা করে গর্তে লুকোবে। এটাই পাকিস্তানের ন্যাশানাল ক্রাইসিসকে ধামাচাপা দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি।

পাকিস্তানের সন্ত্রাসী হামলা এখন গোটা বিশ্বের চোখে নিন্দনীয়। এমনকী ভারতের ওপর পাকিস্তানের বারবার সন্ত্রাস হামলা এবং শয়ে শয়ে ভারতীয় হত্যার নিদর্শন আজ ইরান ও আফগানিস্তানের বালুচ জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে

বাধ্য হয়েছে। বালুচরা তো রীতিমতো স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে বালুচিস্তানের মাটিতে। পাকিস্তান নিজেই এখন নিজের অধিকৃত আফগানভূমিতে তীব্র পরাজয়ের মুখে। পাক-প্রশাসনের চরমতম হিংসা প্রীতি এবং সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা সন্ত্রাসী দেশের তকমা আদায় আজ প্রশাসনের কাছে গর্বের বিষয়—এতটাই মূর্খ একটা দেশ। আর এই নীতিই আগামীদিনে পাকিস্তানকে একঘরে করে দেবে যতই কেন তারা আন্তর্জাতিক স্তরের জঙ্গিবাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করুক।

কাশ্মীর এতকাল ছিল পাক জনগণের সামনে লোভনীয় ললিপপ। পাক প্রশাসন স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্নকে ললিপপের মতো ব্যবহার করে ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার স্ট্রাটেজিটা ছিল জিন্নার একটা আত্ম-অহমিকার প্রকাশ। তাই প্রতিটি কাশ্মীরি মুসলমানকে বোঝানো হয়েছিল, কাশ্মীর পাকিস্তানের, ভারত জোর করে আটকে রেখেছে। হিংসা দিয়ে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে হবে। ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯—তিনবারের যুদ্ধেই কাশ্মীর দখলের চেষ্টা থেকে পাকিস্তান নিবৃত্ত ছিল না। কিন্তু তিনবারই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরতে হয়েছে পাকিস্তানকে। তাদের গর্ব একমাত্র পাক অকুপায়েড কাশ্মীর (POK) এর দখলীকৃত ৫১৩৪ বর্গমাইল এলাকা।

দীর্ঘকাল ধরে ভারত সরকারের দেওয়া অন্যায় স্ট্যাটাস (৩৭০ ধারা) উপভোগ করা। নরেন্দ্র মোদীর তুখোড় পদক্ষেপে সেই বিশেষ অধিকার বাতিল হয়ে গেছে। জঙ্গিবাদ সিংহভাগই স্তিমিত। রাজ্যের মুসলমান প্রশাসনেরও হম্বিতম্বি বন্ধ হয়ে গেছে। এবার মোদী সরকার প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে যে পরবর্তী লক্ষ্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের অংশকে পুনরুদ্ধার করা। তবে কবে হবে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ তা অনেকটাই নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর।

এই মুহূর্তে একটা সত্য উপলব্ধ বিশ্বের দরবারে ভারত পাকিস্তানের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি কাশ্মীরের পহলগাঁওয়ে পাক জঙ্গিরা যেভাবে ২৬ ভারতীয় নাগরিককে, বিশেষ করে হিন্দুদের চিহ্নিত করে হত্যা করেছে—তার জবাব দিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিশেষ করে ভারতীয় বিমানবাহিনী অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে। অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি প্রতি আক্রমণই নয়—ভারতীয় নারী, ভারতীয় দাম্পত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির সপক্ষে প্রশাসনিক স্তরে একটি যথাযোগ্য জবাব—হে পাকিস্তান, তুমি ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছেছো পরিকল্পিত হত্যার মাধ্যমে। তার পরিবর্তে আমরা ভারতীয়রা তোমাদের সামরিক ঘাঁটি আর জঙ্গি ঘাঁটিগুলির মূল চালিকাশক্তির কেন্দ্রভূমিগুলিকে গুঁড়িয়ে দিলাম। এবার যদি আবার ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতনী ঐতিহ্যের শিকড়ে আঘাত হানো—জেনে রেখো ভারতের লক্ষ্য হবে তোমাদের সীমিত পরমাণু অস্ত্রের ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া। বিশ্বের কোন শক্তি তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না।

পাকিস্তানে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। কারণ এখন পাকিস্তানের ঘরে-বাইরে প্রতিবাদের ঝড় বইছে শন শন করে। পাকিস্তানের জনগণ বৃদ্ধ বিশ্বসচেতন বুদ্ধিজীবী আহমেদ রশিদ, আরিশউল্লা খান, হাসান আব্বা, জাহিদ হুসেন, হুসেন হাক্কানি, হ্যাপিমন জেবাব প্রভৃতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরিফ, এমনকী পারভেজ মোসারফও প্রাক্তন সামরিক প্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া সহ বহু মানুষই প্রকাশ্যে পাক জঙ্গিবাদের তীব্র বিরোধিতার সুরে বক্তব্য রেখেছেন বিশ্বের দরবারে। আন্তর্জাতিক স্তরে ইরান এবং সৌদি আরবও পাকিস্তানের জঙ্গি নীতির সমর্থক নয়।

এই অবস্থায় ভারত সরকার এক-এক করে ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য বিশেষ শরিয়ত আইন, মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের কুশ্রী প্রথা তালাক প্রথা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বাতিল করে বিশ্বের দরবারে মুসলমান সমাজের সামনে ভারতের মানবিক নীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। পাকিস্তানের হিংস্র নিঃশ্বাসে দমবন্ধ কাশ্মীর আজ মুক্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই সমস্ত পদক্ষেপই আসলে পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া—তোমার দেশে যতই দাউদ ইব্রাহিম বা আইসিসের ছদ্মবেশধারী জঙ্গিদের আশ্রয় দাও না কেন, সবার শেষ পরিণতি হবে আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মতোই। আর গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত হবে পাকিস্তান। এটাই ভবিতব্য। যত পুষবে জঙ্গি–বিশ্ব ততই হবে রণ-রঙ্গী। একদিন আসবে যেদিন বিশ্বের মানচিত্র থেকে আচমকাই মুছে যাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব। তিল তিল করে দেশটাকে টুকরো করার প্রাথমিক পরীক্ষা সফল হয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এবার হাতছাড়া হতে চলেছে বালুচিস্তান। ভাঙতে ভাঙতে একদিন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে ইসলামের এই অপবিত্র ভূমি—পাক-ই-স্তান। কারণ, ঈশ্বর শুধুমাত্র পবিত্রতাকেই রক্ষা করেন। নিকেশ করেন অপবিত্রতাকে।

সেই কাঠের বাড়িটা

প্রবাল

যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ছিল দুপুর। সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন ছিল সেটা। এখন গোটা আকাশ ছেয়ে আছে মন-খারাপ-করা ঘোলাটে আঁধার মেঘে। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব তটরেখা জুড়ে ভিক্টোরিয়া রাজ্য। আর সেখান থেকে উত্তরে নিউ সাউথ ওয়েলস। যেখানে এসেছি, সেটা এই দুই রাজ্যের সীমান্ত। একদিকে অলবারি হলো নিউ সাউথ ওয়েলসের শহর, অন্যদিকে ওডোঙ্গা ভিক্টোরিয়া রাজ্যের শহর। মোটেল-মালিকের কাছে জানলাম, 'ওডোঙ্গা' মানে হলো সাইপ্রাস বা ঝাউজাতীয় গাছ। স্থানীয় উরুন্দজেরি উপজাতির লোকেরা এই নাম দিয়েছিল জায়গাটার।

এখানে এসেছি অফিসের কাজে। শহর থেকে একটু দূরে চাষের জমি আর ছাড়া-ছাড়া জঙ্গলের প্রান্তে এই মোটেলটা, একটা চত্বরের মধ্যে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কটেজ। আমার বরাদ্দ কটেজের চাবি খুলে মন খুশি হয়ে গেল। পাথরের দেওয়াল, পুরনো আমলের ফার্নিচার, দেওয়ালে অয়েল পেইন্টিং। উঁচু সিলিং। এক চিলতে বসার ঘর, বড়ো বাথরুম। শোবার ঘরটাও বেশ বড়। রান্নার জন্য ছোট্ট একটা জায়গা রয়েছে সেই ঘরের একপাশে, চা কফি বানানো যায়। দেওয়াল জোড়া কাচের দরজা, ওপারে বারান্দা। পরে বেরিয়ে দেখতে হবে বারান্দাটা কেমন, এখন একটু ঘুমিয়ে নিই। এক নাগাড়ে চার ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে শরীর মন দুটোই ক্লান্ত। ঝাঁপালাম বিছানায়, ঘুমের অথই সাগরে ডুবে যেতে যেতে মনে হলো—এই রে, রাতের খাবার কোথায় সারব? কিন্তু আমি তখন তলিয়ে যাচ্ছি, ভাবনাগুলো মাথায় এলেও শরীর পাত্তা দিল না। ঘুম ভাঙ্গল যখন, শরীর অনেকটা ঝরঝরে লাগছে, কিন্তু জম্পেশ খিদে পেয়েছে। রাত আটটা। ছোটো শহর, এদিকটা একটু নিরালাও। দূরে হাইওয়েতে গাড়ির সাঁই-সাঁই ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। নাহ্, আরেকটা শব্দ রয়েছে। দূরে কোথা থেকে যেন, একটা গম্ভীর সুর ভেসে আসছে। বাইরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টের সন্ধান করতে হবে। ঘরের আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখলাম, বারান্দার স্লাইডিং দরজার কাঁচের ওপর একটা হাতের ছাপ। হাতের রেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে ছাপে।

সুটকেস খুলে গরম জামা বার করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল বেশ কয়েকটা বই। উনিশ সালে কলকাতায় গিয়েছিলাম, কলেজ স্ট্রিট থেকে এই বইগুলো কিনেছিলাম। পাক্কা পাঁচ বছর বইয়ের তাকে সাজানো ছিল, পড়া হয়নি। ভালোই হয়েছে ওগুলো সঙ্গে এনেছি, এখানে নিরিবিলিতে পড়া যাবে, সময় কাটবে। গরম জামাকাপড় পরে মোটেল থেকে বেরোলাম। আশা, যদি একটা রেস্টুরেন্ট খোলা পাই। ছায়া ছায়া অন্ধকার, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে। রাস্তার মোড় ঘুরতে দেখি, ফুটপাথে বসে জনজাতি একজন একমনে ডিজরিডু বাজাচ্ছে। এই ডিজরিডু খুব অদ্ভুত একটা বাদ্যযন্ত্র। মরা গাছের শুকনো গুঁড়ি দিয়ে বানানো পেল্লায় লম্বা নলের মতো, গায়ে নানান ছবি আঁকা। তাতে ফুঁ দিয়ে এখানকার জনজাতির মানুষ অদ্ভুত সব সুর বের করে। ওরা বলে, প্রতিটা ডিজরিডু নাকি আত্মসচেতন, সজীব এক সত্তা। অস্ট্রেলিয়ার জনজাতিরা দেখতে অনেকটাই ভারতীয়দের মতো। এই লোকটা—বড্ড চেনা লাগলো এর মুখ। কোথায় যেন দেখেছি। আমার চেনা কারোর সঙ্গে মিল আছে কি? এদের দর্শন, জীবনবোধ, পরিবেশ-সচেতনতা খুব উন্নত স্তরের, কিন্তু বড়ো দুঃখী এই মানুষগুলো। গর্বে অন্ধ সেকালের পাশ্চাত্য সভ্যতা, গোটা পৃথিবীতে সাদা মানুষ এদের বোঝা ভাবত। উন্নত প্রযুক্তির জোরে এদের সর্বস্ব হরণ করেছিল। এমনকী এদের বাচ্চাদের পর্যন্ত মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে তুলে দিত, যাতে বাচ্চারা তাদের সভ্যতা, তাদের পরম্পরার কথা ভুলে যায়। সাম্রাজ্যবাদের সে হীন প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। সেইসব বাচ্চারা, যাদের এখানে 'স্টোলেন জেনারেশন' বলে, বড়ো হয়ে তারা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে তাদের অতীত, পরম্পরা, তাদের পূর্বজদের গল্পগুলো। আজ তাদের অনেকেই নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছে উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারে। কিন্তু এ এক অসম যুদ্ধ। প্রাচীন এক সভ্যতার সামুহিক স্মৃতি যদি মুছে গিয়ে থাকে, তবে সেই লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধার করার কি কোনো পথ আদৌ আছে? এখানকার জনজাতিদের বহুলাংশের মধ্যে জীবনের প্রতি বিরূপতা, নেশাভাঙ করে ভুলে থাকার চেষ্টা দেখা যায়। আমার মনে হয়, এসব ওই লুপ্ত স্মৃতিরই ফল। কোনো জাতি যদি ভুলে যায় পৃথিবীতে তার ভূমিকা কী, সেই মানসিক শূন্যতা জাতির বিবেককে প্রতিনিয়ত দগ্ধে মারে।

রাস্তার ধার ধরে হাঁটতে লাগলাম। লম্বা লম্বা গাছ, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ধু-ধু মাঠ। তার পেছনে জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে, বরফের মতো ঠাণ্ডা জোলো সে বাতাস। পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশার একটা পাতলা চাদর নেমে আসছে দূরে প্রান্তরের শরীরে। তার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা আলো দেখা যাচ্ছে। গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি। অন্ধকার বাড়িটা, ওপরে চিলোকোঠায় আলো জ্বলছে। বাড়ি থেকে দূরে থাকলে মনটা খারাপ লাগে। সেই মন খারাপ বেড়ে যায়, যখন দেখি রাতে অন্ধকারে অন্য বাড়িতে আলো জ্বলছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা সরাইখানা দেখতে পেলাম। ভাগ্য ভালো, খোলা ছিল। জানালার ধারে টেবিল পেলাম। ফায়ারপ্লেস জ্বলছে, বাতাসে পোড়া কাঠের মিষ্টি গন্ধ। আধো আলো আধো ছায়ায় সরাইখানার ভেতরটা কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে। ছোটোবেলায় পড়া আবোল তাবোল মনে পড়ে গেল—'মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে, রামধনুকের আবছায়াতে...।' হাতে চিমটি

কেটে দেখলাম, সত্যিই কি এখানে আছি নাকি মোটেলের বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছি? একটু পরেই এল কাঠকয়লার উনুনে ঝলসানো মাছ, গোলমরিচ ছড়ানো আলুসেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ। খেতে খেতে জানালা দিয়ে দূরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই বাড়িটা এখানে থেকেও দেখা যাচ্ছে। ঝিরিঝিরি কুয়াশা ঝুলছে জঙ্গলের মগডাল থেকে, যেন হ্যাংলা হাতি চ্যাংদোলা।

মোটেল চত্বরে ঢুকে খেয়াল করলাম, অন্ধকারে জায়গাটা আরও সুন্দর লাগছে। অন্ধকার রাস্তার ধার ধরে জায়গায় জায়গায় রঙিন সোলার লাইট, নরম আলোর লুকোচুরি চলছে আশেপাশের ঝোপঝাড়ে। দরজা খুলে দেখি, উঁচু ক্যাথিড্রাল সিলিং থেকে লম্বা শিকলে আলো ঝুলছে। বাতাসে অল্প অল্প দুলছে শিকলটা, আলোটাও দুলছে। সঙ্গে দুলছে সব ছায়া। বড়ো হচ্ছে, ছোটো হচ্ছে। ছায়াগুলো যেন একসারি যন্ত্র, হঠাৎ করেই চালু হয়ে গেছে, কিলবিল করে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে সারা ঘর জুড়ে।

গরম কোকোর কাপে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, রান্নার জায়গার পাশেই আরেকটা দরজা আছে। ওদিকে কি আরেকটা ঘর আছে? দরজার হাতল ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম, দরজা খুলল না। যাকগে! আলো নিভিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

স্বপ্ন দেখছিলাম। জমাট বাঁধা একটা অন্ধকার ভেসে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। গুনগুন শব্দ করে কাঁপছে। কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে, আমার বিছানার ঠিক পাশেই।

—কে তুমি?

—আমি তোমাকে পথ দেখাচ্ছি।

—কীসের পথ?

—স্বপ্নের।

—স্বপ্নের আবার পথ হয় নাকি?

—হয়। আমার সুর তোমাকে পথ দেখাচ্ছে। মন দিয়ে শোনো আমার সুর।

দম বন্ধ করা অস্বস্তির বোধ নিয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘরের মধ্যে শিউলি ফুলের তীব্র সুগন্ধ, নাক জ্বালা করছে। এখন বোধহয় মাঝরাত। অস্বস্তিটা কীরকম, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। যখন জঙ্গলে বেড়াতে যাই, জঙ্গলে ঢুকতেই ইন্দ্রিয়গুলো অনাবশ্যক রকমের সতর্ক হয়ে পড়ে, কেন জানি না। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে তো কোনো বড়ো মাংসাশী প্রাণী নেই। বোধহয় এই সতর্কতার ব্যাপারটা আমাদের রক্তে আছে, পূর্বজ কোনো আদিম মানব জেনেটিক কোডের মাধ্যমে আমাদের বলে পাঠিয়েছে, জঙ্গলে অসাবধান হয়ো না। আজ ঠিক সেরকমই একটা অনুভূতি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে? এদেশের জনজাতিরা জীবনের স্তম্ভ হিসেবে সাতটা জিনিসে বিশ্বাস করে। পাঁচটি অনুভূতি—দেখা, শোনা, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, এটা তো আমরা সবাই মানি। ওদের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে যুক্ত হয় আরও দুটো জিনিস, যাদেরকে ওরা জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে মানে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর আবেগ। আধো ঘুম, আধো জাগার মধ্যে অনুভব করলাম, কানে ভেসে আসছে জঙ্গলের ছোটোখাটো নানান আওয়াজ, তার সঙ্গে একটা হাড়'কাঁপানো বাতাস, সে বাতাসে ভেজা পাতার গন্ধ। বাইরের বাতাস ভেতরে আসছে কী করে? ভুল করে কোনো জানলা খুলে রেখেছি নাকি? অন্ধকারে আলোর সুইচটা খুঁজে পেলাম না। চোখ এবার সয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যেটা একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। রান্নার জায়গার দিকটা থেকে একটা আবছায়া আলো ভেসে আসছে না? হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, তখন যে বন্ধ দরজাটা টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করছিলাম, সেটা হাট করে খোলা। আমি যে টানাটানি করছিলাম, তাতেই কি ওটা খুলে গেছিল, আমি আগে নজর করিনি? দরজাটা বন্ধ করে দিই, এই ভেবে দরজার হাতলে হাত রাখলাম। বরফঠাণ্ডা হাতল ছ্যাঁকা দিল হাতে। বাইরে ঘন জঙ্গল। ডিজরিডুর ক্ষীণ আওয়াজটা এখনো ভেসে আসছে। নিঝুম রাতে ডিজরিডুর গম্ভীর আওয়াজ, গা-ছমছম করে উঠল। দরজার ওপরে উঁকি দিয়ে অবাক হলাম। এত ঘন জঙ্গল এখানে? অন্ধকার, আবছায়া চাঁদের আলো জঙ্গলের পাতায় পড়ে রুপোর মতো চিকচিক করছে।

ভাবলাম, দেখি বাইরে গিয়ে। এ সুযোগ তো সবসময় আসে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ চলে গেছে, একটু এগিয়ে চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম একটা কাঠের খাম্বা। লম্বায় প্রায় দু'মানুষ সমান, গায়ে রকমারি নকশা আঁকা—পাখি, মাছ, কাঙ্গারু, শিকারের দৃশ্য, স্বপ্নজগতের নানান কাহিনি। টোটেম পোল! এখানকার জনজাতিরা বিশ্বাস করে, এই জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড, সবই একটা স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের এক ভাঙ্গা টুকরো হলো আমাদের বাস্তব। সেই স্বপ্ন জগতের গল্প বলে টোটেম পোল। সস্নেহে হাত রাখতে গেলাম খাম্বাটার ওপর। হঠাৎ একটা হিংস্র গর্জন বনের শান্ত পরিবেশটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। চমকে উঠে দেখলাম, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক তাসমানিয়ান টাইগার, থাইল্যাসিন। বিশাল দেহ, নেকড়ের মতো গড়ন, ডোরাকাটা দাগ গায়ে, হিংস্র চোখের দৃষ্টি। বন্য জানোয়ারদের থেকে চোখ সরাতে নেই, সরালেই ওরা আক্রমণ করে। জন্তুটার দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে একপা একপা করে পিছোতে লাগলাম। একটা গাছের আড়াল পড়ল, এই সুযোগ। পেছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় দিলাম। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, তখনো হাঁপাচ্ছি, এই শীতেও শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

সকালে স্নান করে প্রাতরাশ সেরে গেলাম স্থানীয় হাসপাতালে, আমার কাজ মূলত ওখানেই। ওদের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ম্যানেজার ডেমিয়েন, খুব হাসিখুশি মানুষ। কাজের ফাঁকে হাসপাতালের ক্যান্টিনে বসে কথা হচ্ছিল। সারা জীবন মেলবোর্নে কাটিয়ে ডেমিয়েন জীবন সায়াহ্নে এখানে এসেছে, শেষ জীবনটা এখানেই কাটাবে। জিজ্ঞেস করলাম, মেলবোর্নের মতো বড়ো শহর ছেড়ে এই জনবিরল জায়গায় কেন? ও বলল, এখানে ওর বাড়ি পাহাড়ের ওপর, আশেপাশে ফসল ফলানোর জন্য জমি আছে, বারান্দা থেকে দেখা যায় মারি নদী বয়ে চলেছে। এরকম একটা শান্তির আলয়, অথচ সেখান থেকে ওর অফিসে আসতে সময় লাগে মাত্র পনেরো মিনিট। এমন জীবন কি আর বড়ো শহরে পাওয়া যায়? ক্যান্টিনের সামনের মাঠে একটা বাচ্চা মেয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পরনে ভারী জ্যাকেট, রিমোট কন্ট্রোলে খেলনার প্লেন ওড়াচ্ছে। বোঁওওওওও শব্দ করে লাল রঙের প্লেনটা মাঠের চক্কর কাটছে বারবার। ডেমিয়েনকে বলছিলাম গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা ও বলল,

—তাসমানিয়ান টাইগার? হয়তো ডিংগো দেখেছ।

ডিংগো অস্ট্রেলিয়ান বুনো কুকুর। এককালে এদের পূর্বপুরুষ গৃহপালিত পোষা কুকুরই ছিল। কেন জানা যায় না, তাদের একটা অংশ ঘর ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীনতার আকর্ষণে?

—ডিংগো? স্পষ্ট দেখলাম গায়ে ডোরাকাটা দাগ....

—তাসমানিয়ান টাইগার এখানে কোথা থেকে আসবে? তাছাড়া সে তো কবেই, ইউরোপিয়ান সেটলমেন্টের সময়ই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

—আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু নিজের চোখে যে দেখলাম?

—অসম্ভব। তাছাড়া এখানে কোথাও কোনো টোটেম পোল নেই। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছ!

স্বপ্ন? হবেও-বা। থেকে থেকে ঝোড়ো বাতাস বইছে, খেলনার প্লেনটা তখন খাবি খাচ্ছে শূন্যে।

রাতের খাবার সেরে মোটেলে ফিরে প্রথমেই কটেজের পেছনদিকটা দেখে এলাম। আশেপাশে সত্যিই কোনো ঘন জঙ্গল নেই। আরও অবাক কাণ্ড, যে দরজাটা খুলে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, সেটার অন্যদিকে পাঁচিল! কাল রাতে তবে কী ঘটেছিল? স্বপ্ন? সেটাই ভালো, তাহলে ভয়ের কোনো কারণ নেই। বিছানায় যাবার আগে দেখে নিলাম, বন্ধ দরজাটা বন্ধই আছে। বিছানায় শুয়ে একটা বই খুললাম। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য গুহর জীবনী।

কী অসাধারণ একটা মানুষ ছিলেন, অথচ ইতিহাস তাঁকে একেবারেই ভুলে গেছে। ওড়িশা থেকে বিহার, প্রতিটি জায়গায় দেশজ রাজশক্তিগুলোকে একত্র করতে পেরেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধে পদে পদে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন মোগল ফৌজকে। বঙ্গে প্রকৃতি, তার নদী ও তার বর্ষাঋতুকে কীভাবে অস্ত্র হিসাবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, সেটাও প্রতাপ দেখিয়েছিলেন। আকবর আর তার বাইশজন আমিরের বিশাল ফৌজকে হার মানতে হয়েছিল তার কাছে, পূর্বভারত হাতছাড়া হয়েছিল মোগলদের। একই সঙ্গে পর্তুগিজ আর্মাডাকেও রুখে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিশ্বস্ত নৌসেনারা রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে পর্তুগিজ জাহাজে উঠে সবার দফারফা করে একইভাবে নিঃশব্দে পালিয়ে যেত। যে পর্তুগিজ ইনকুইজিশনের বর্বরতার শিকার হয়ে গোয়ার সিংহভাগ হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছিল, সেই ইনকুইজিশনের চিহ্নও বঙ্গের ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই, সেটা শুধু এই মানুষটার জন্য! তারপরের ইতিহাসটা জানি, ওটা আর পড়তে ইচ্ছে করে না। আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর বুঝেছিল, হিন্দুকে শুধু হিন্দুই মারতে পারে। জাহাঙ্গীর কাজে লাগালো মানসিংহকে, আর মানসিংহ কাজে লাগালো ভবানন্দ মজুমদারের মতো বঙ্গের বিশ্বাসঘাতকদের। বইটা পাশে রেখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

******

দমকা বাতাসে একরাশ ধুলো উড়ে এল। তার সঙ্গেই বর্শার ফলার মতো হিমশীতল জলকণার বৃষ্টি শুরু হলো আকাশ থেকে। কালো আকাশ, বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কানে তালা ধরা শোঁ শোঁ গর্জন, উথালপাথাল হচ্ছে গাছগুলো। কিছুতেই মনে করতে পারছি না, কী করে এখানে এলাম। ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলাম নাকি? মনে পড়ছে না কেন? এটা কোন জায়গা? বৃষ্টির হিমশীতল ফোঁটাগুলো যেন বর্শার ফলা, গায়ে দাগ ধরিয়ে দিচ্ছে। একটা বড়ো গাছের নীচে আশ্রয় নিলাম, এরই মধ্যে বেশ খানিকটা ভিজে গেছি। কী ঠান্ডা বৃষ্টি, হি হি করে কাঁপুনি দিচ্ছে। ধোঁয়ার মতো জলকণার পুঞ্জে ঢেকে আছে চারিদিক, দুহাত দূরের গাছগুলোকেও দেখে মনে হচ্ছে ছায়া-ছায়া বিদেহী প্রেত। পকেট হাতড়ে মোবাইল বার করে চেক করলাম, কোনো রিসেপশন নেই।

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির প্রকোপ একটু কমল, হাঁটতে শুরু করলাম। ঘন জঙ্গল! পথ চলা যায় না, পা জড়িয়ে যায় বুনো লতায়, দুটো গাছের মাঝে একটা মানুষ গলে যাবার যথেষ্ট জায়গা নেই। অনেক কষ্টে কিছুক্ষণ এগোনোর পর একটা পায়ে চলার রাস্তা দেখলাম, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। পায়ে চলার রাস্তা যখন, এই পথে চললে একটা লোকালয়ে নিশ্চয়ই পৌঁছোব। মোবাইলে কম্পাস

আছে, সেটা বলছে রাস্তাটা উত্তর দিকে গেছে। এটা দেখা জরুরি, নাহলে যদি রাস্তাটা একই জায়গায় ঘুরপাক খায়, তাহলেও বুঝতে পারব না। জঙ্গলে পথ চেনা কঠিন।

একঘণ্টা হাঁটার পর পায়ে চলা পথটা এখন অনেক স্পষ্ট। কাছে নিশ্চয়ই কোনো খামার কিংবা কোনো খালি জায়গা আছে। একটা অদ্ভুত জিনিস এবার নজরে পড়ল। আশেপাশের গাছের ডাল থেকে কীসব যেন ঝুলছে। কাটুম-কুটুম। ভাঙ্গা গাছের ডাল দড়ি দিয়ে বেঁধে নানান রকম মানুষের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল, সঙ্গে বিকট গন্ধ। এটা কী? গলায় ফাঁস, উঁচু একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা মরা ক্যাঙ্গারু! পেট আড়াআড়িভাবে চেরা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলছে। রক্ত পড়ছে টপটপ করে। তখনই খেয়াল করলাম, গাছের গোড়ায় আঁকাবাঁকা হরফে কী যেন লেখা আছে, লাল কালিতে। এসব কী? কোনো জাদু-টোনা? গাছের গুঁড়িটা যেন কীরকম। ঠিক যেন একটা মুখ খোদাই করা। বুড়ো মানুষের মুখ। গাছের ডালে, রাস্তার ধারে, জায়গায় জায়গায় সবুজ থকথকে কীসব যেন লেগে রয়েছে। বিশ্রী দুর্গন্ধ। ঠিক এই সময় দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। ধুপ ধুপ ধুপ, গুব গুব গুব। মাটি কাঁপছে। যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, দৌড়ে আসছে এদিকেই। কী ওটা? ভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়লাম।

অনেকটা পথ দৌড়ানোর পর খেয়াল করলাম, ধুপধাপ শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। তার বদলে বুকের মধ্যে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবছিলাম, এখানে এলাম কী করে? শেষ মনে পড়ছে, গত রাতে কটেজে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। যশোরের রাজা প্রতাপের কথা। আর ভাবছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির কথা। অখণ্ড ভারতের কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গ, সুজলা সুফলা সুমধুরভাষিণী বংঙ্গের ভাগ্যে এমনটা কেন হলো? ভাবছিলাম, ছোটো ছোটো ঘটনা কীভাবে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কেন সম্ভাবনা অঙ্কুরেই মরে যায়। কেমন হতো, যদি শশাঙ্কর সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতো? কিংবা যদি পাল সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে যেত? বল্লালসেন যদি নাথযোগীদের সঙ্গে শত্রুতায় না জড়াতেন, যদি যশোরের প্রতাপাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতার শিকার না হতেন, তবে ইতিহাসটা কেমন হতো? চৈতন্যদেবের প্রভাবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজকর্মচারী সাগির মালিক আর দবির খাস বৈষ্ণব হয়েছিল। রূপসনাতন আর যবন হরিদাসের সঙ্গে সুলতান হোসেন শাহও যদি বৈষ্ণব হয়ে যেত, তাহলে বঙ্গ সেই যুগেই রাহুমুক্ত হতো। সেটা তো হলোই না, উলটে আমরা চৈতন্যদেবকে হারালাম। কেন বঙ্গের ভাগ্যে বারবার এরকম ঘটে? কেন? কেন? বাঙ্গালি কেন বারবার ট্র্যাজিক হিরো হয়েই রয়ে যায়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতকে স্বাধীন করার একটা বড়ো পরিকল্পনা হয়েছিল, রাসবিহারী বসু আর বাঘা যতীনের নেতৃত্বে। একটামাত্র লোকের বিশ্বাসঘাতকতা সেটাকে বানচাল করে দেয়। বঙ্গের আজকের পরিস্থিতি কেমন হতো, যদি ১৯১৭ সালে রাসবিহারী বসু স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হতেন?

ঝোড়ো বাতাস বইছে, একরাশ কুয়াশা জড়ো হয়েছে। এত কুয়াশা আসছে কোত্থেকে? চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, এক হাতের দূরত্বেও কিছু দেখা যায় না। অন্ধকারে হাতড়ে এগোবার চেষ্টায় দু'একবার গাছের গুঁড়িতে ঠোক্কর খেয়ে গেল মাথাটা। হাত-পাও বোধহয় ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে। হঠাৎ করেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল, কুয়াশাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা বিশাল একটা সরোবর। পাড় ধরে একসারি সারস দাঁড়িয়ে রয়েছে। একরকম দেখতে, সবাই একইদিকে মুখ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটার সঙ্গে অন্যটাকে তফাত করা যায় না। সরোবরের পাড়ে বেড়ায় ঘেরা বড়ো একটা ফাঁকা জায়গা। খামার নিশ্চয়ই। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, কাঠের তৈরি। একতলা বাড়ি, ওপরে চিলেকোঠা। এই বাড়িটাকেই কি সরাইখানার জানালা দিয়ে দেখছিলাম? কই, আশেপাশে তো সরাইখানাটা দেখা যাচ্ছে না। এটা কি তবে একইরকম দেখতে অন্য কোনো বাড়ি?

যাক, এযাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম। একটু ইতস্তত করে, তারপর বেড়ার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বিরাট বড়ো, কিন্তু বাড়িটা ভাঙাচোরা, মনে হচ্ছে যেন ফুঁ দিলে ভেঙ্গে যাবে। বাড়ির সামনে অনেকগুলো শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু, ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের, অবহেলায় এদিক-ওদিক পড়ে রয়েছে। সবুজ শ্যাওলা জমা দেবদূত, পরি। ভাঙ্গা ফোয়ারা আছে একটা, জল নেই তাতে। এককোণে তিনটে দানবের মূর্তি। একইসঙ্গে দানব আর দেবদূত? কিছু একটাতে হোঁচট খেতে গিয়ে সামলে নিলাম। নীচু হয়ে কুড়িয়ে দেখি, কাদায় মাখামাখি একটা খেলনার মডেল প্লেন, লাল রঙের। জং ধরা, দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরোনো।

—হ্যালো মাইট!

চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ধারালো মুখের গড়ন, লালচে-সাদা চামড়ায় লাল-লাল বুটি, চোখে ভোলাভালা সারল্য। পরনে গামবুট, মলিন প্যান্ট, জ্যাকেট, মাটি লেগে আছে তাতে। হাতে একটা বই। কারোর হাতে বই দেখলেই কী বই সেটা দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লোকটার হাতের বইটার মলাটে কী লেখা আছে, সেটা পড়তে পারলাম না। এটা কি ইংরিজি হরফ নয়?

—লস্ট?

—ইয়ে, মানে, হ্যাঁ, লস্ট। সেই কখন থেকে হাঁটছি।

—কোথায় যাবে?

—ওডোঙ্গা, শহরের প্রান্তে যে মোটেলটা আছে, সেটাতেই উঠেছি....

—ওয়েল মাইট, ওডোঙ্গা তো এখান থেকে অনেক দূর। তুমি এখন মারী নদীর অন্য পাড়ে আছো। এই জায়গাটার নাম বেথাঙ্গা।

হায় ভগবান! বেথাঙ্গা কোথায়, সেটা আমি জানি। সোজা পথে তিরিশ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা, এখানে এলাম কী করে?

—নো ওয়ারিজ মাইট। আমি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব। তার আগে আমার বাড়ি চলো। তোমার হাল তো দেখছি খুবই খারাপ, হাত পা ছড়ে গেছে। চলো, পরিষ্কার হয়ে কিছু খেয়ে নেবে। তারপর আমি তোমাকে তোমার মোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেউ কি ওপর থেকে আলো ফেলছে? হ্যাঁ, বাড়িটার

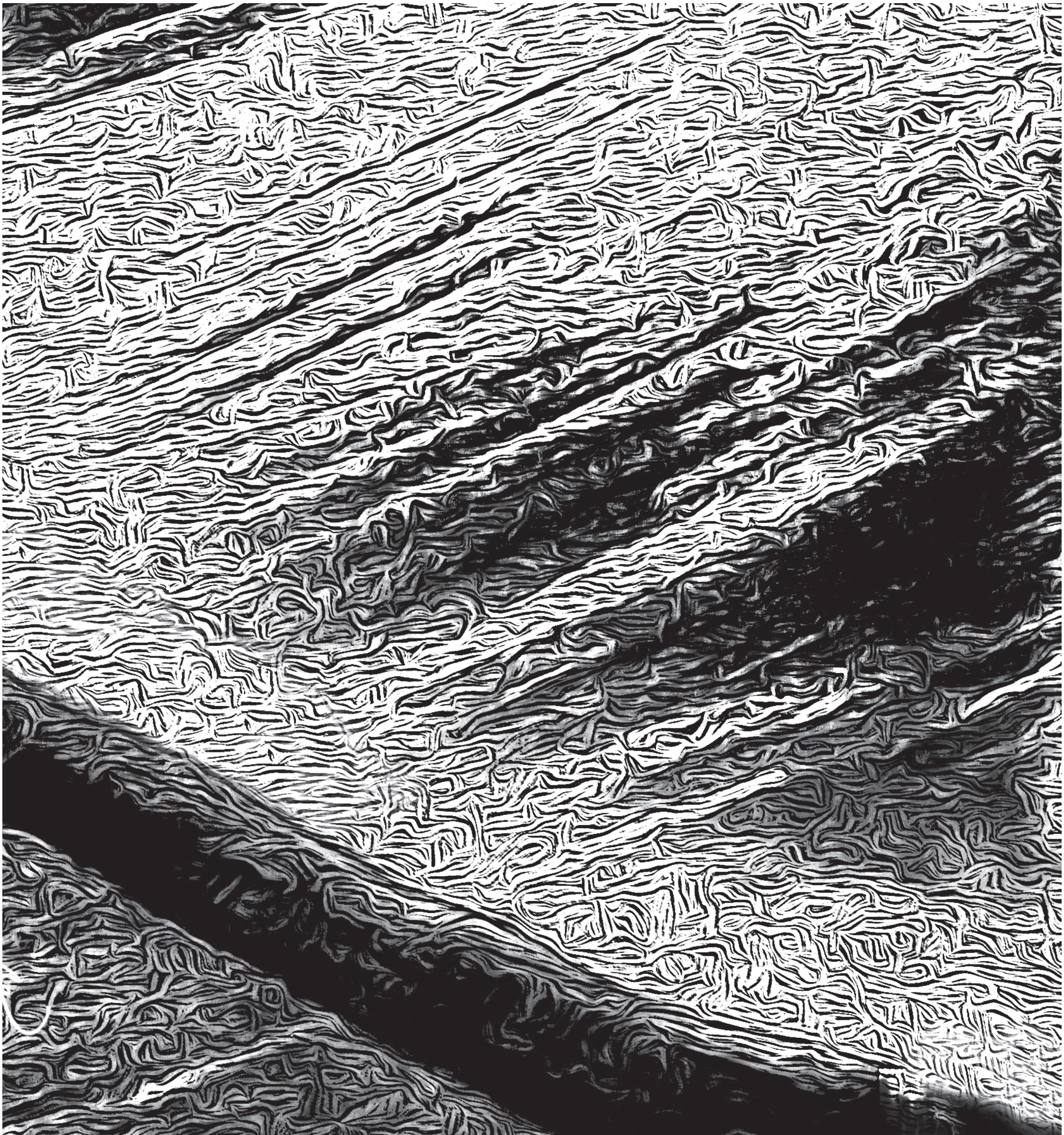

চিলোকোঠা থেকে কেউ এদিকে আলো ফেলছে। ক্ষীণ আলোর সিল্যুটে দেখতে পেলাম, জানলায় দাঁড়িয়ে, এদিকেই তাকিয়ে আছে একটা ছায়ামূর্তি। খর্বাকৃতি, একটু সামনে ঝুঁকে আছে।

—তুমি কি ইন্ডিয়ান?

—হ্যাঁ।

—ইন্ডিয়ার কোথাকার? কোন সিটি?

—ক্যালকাটা। আপনি ইন্ডিয়া গেছেন কখনো?

—আমার জন্মই তো ইন্ডিয়ায়। বাবা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল। তোমাদের স্বাধীনতার পর আমরা সবাই ইংল্যান্ডে চলে এলাম, তারপর আর কোনদিনও যাওয়া হয়নি। বাবা অবসর নিল, সাসেক্সে বাড়ি করল। বেশিদিন বাঁচেনি তারপর। সাসেক্সের ওই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সহ্য

করতে পারেনি বাবা। তারপর সবকিছুই কেমন যেন হয়ে গেল। বাবা মারা যাওয়ার পর মা অন্য একটা লোকের সঙ্গে চলে গেল, আমার লেখাপড়া আর এগোলো না। কিছুদিন ট্রাভেলিং সেলসম্যানের কাজ করলাম, খুব একটা সফল হইনি। সেই সময় সবাই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিল। আমিও চলে এলাম, ফ্রি জাহাজে চড়ে। অস্ট্রেলিয়া সরকার ফ্রি জমি দিল, এই জঙ্গলে। শহুরে লোক আমি, চাষবাস কিছুই জানতাম না। প্রথমদিকে খুব কষ্ট হয়েছিল। সেই থেকেই এই খামারে আছি। বাড়িটা বানিয়েছি, চাষবাস করি, মাছ ধরি। কিছু মুরগি আছে, ডিম দেয়।

—একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না?

—বলো?

—আপনার হাতে এটা কী বই?

—কেন? ক্যান্টারবেরি টেলস, চসারের। পড়োনি?

—না, মাপ করবেন। আমাদের দেশে ডিকেন্স, শেক্সপীয়ার পর্যন্ত চল আছে, কিন্তু চসার? শুনেছি ও খুব পুরনো ইংরিজি, দুর্বোধ্য।

—হ্যাঁ, ভাষাটা পুরনো ধাঁচের। কিন্তু চসার আমার ভীষণ প্রিয়। আমার প্রথম মাইনে দিয়ে চসারের পুরো সেট কিনেছিলাম, কালেক্টার্স এডিশন, সোনার জলে বাঁধানো। সাসেক্স থেকে চলে আসার সময় অনেক কিছুই ফেলে এসেছিলাম, কিন্তু ওগুলো ছাড়িনি।

এবার আবার ভালো করে মলাটটা দেখলাম। চমকে উঠলাম। কষ্ট হয় পড়তে, কিন্তু হরফগুলো অজানা নয়। হ্যাঁ, মলাটের ওপর সোনার জলে লেখা আছে, ক্যান্টরবেরি টেলস, বাই জিওফ্রে চসার। কিন্তু হরফগুলো সব উল্টো। ঠিক যেন আয়নায় প্রতিফলন। ভুল দেখছি নাকি? হবেও বা। শারীরিক আর মানসিক চাপ, দুটোই তো কম হয়নি। বাড়ির বারান্দায় বসে এক বৃদ্ধা। আর একটা মেয়ে। বৃদ্ধার বয়স ভদ্রলোকের মতোই হবে, মেয়েটা বয়ঃসন্ধির। মেয়েটার মুখটা অবিকল সেই শ্বেতপাথরের পরিটার মতো। এই মেয়েটাকেই হাসপাতালের ক্যান্টিনের মাঠে দেখেছিলাম না? এটাও কি মনের ভুল?

—আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে।

মেয়ের সঙ্গে বাবা-মা'র বয়সের অনেক তফাত।

—গুড ইভিনিং। বললাম।

মহিলা বোধহয় কানে শোনেন না। কিংবা বোবা। পাথরের মতো শক্ত মুখ, কোনো ভাবান্তর নেই। মেয়েটাও প্রায় তাই, আমাকে দেখে খেয়াল করল না। একটা পুতুল নিয়ে নিবিষ্ট মনে কী যেন করে যাচ্ছে।

—এস, ভেতরে এস। আমি তোমাকে টাওয়েল দিচ্ছি, বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এস।

ঘরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তে রীতিমতো অবাক হলাম। দামি কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ফোটো ঝুলছে সে দেওয়ালে। তার একটা ছবি এক অচেনা ব্রিটিশ যুবকের, পরনে সামরিক পোশাক। কিন্তু তার পাশের ছবিটা? বার কয়েক চোখ রগড়ালাম, আমি কি ভুল দেখছি? এই ছবিটা বঙ্গ তথা ভারতের অনেক বাড়িতেই দেওয়ালে ঝুলতো এককালে।

—ছবিটা দেখে অবাক হলে নিশ্চয়ই? বলল বুড়ো লোকটা।

—হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। ইনি তো.....

—আমার বাবার কাছে শুনেছি। তোমাদের নেতা।

—তার ছবি, এখানে? মানে....

—এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে, বাবার কাছে শুনেছি। তখন বিশ্বযুদ্ধের সময়, স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তোমাদের দেশ। ব্রিটিশ সরকার তোমাদের সব নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরে তারপর তাদের ওপর অত্যাচার করে মনোবল ভেঙে দিত, আর এইভাবে এক-এক করে তাদেরকে ব্রিটিশ পক্ষে নিয়ে আসছিল। তারপর তাদের ছেড়ে দিত, যাতে তারা তোমাদের স্বাধীনতার চেষ্টাকে ভুলপথে চালিত করে। অনেকের সঙ্গেই সফল হয়েছিল। এই লোকটা ছিল ব্যতিক্রম। অত্যাচারে অসুস্থ হয়ে পড়ল, কিন্তু মনোবল ভাঙল না। লোকটাকে মগজ ধোলাই করার সব চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। ইতিমধ্যে তোমাদের দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠেছে, বাধ্য হয়ে লোকটাকে জেল থেকে বের করে নিজের বাড়িতেই বন্দি রাখার ব্যবস্থা হলো। পরিকল্পনা ছিল, লোকটাকে বাড়িতেই ধীরে ধীরে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হবে। এই সময় গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর এল, লোকটা বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। আমার বাবা তখন ব্রিটিশ সরকারের প্রথম সারির গোয়েন্দা। তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল লোকটার ওপর নজর রাখার। অবাক কাণ্ড, লোকটা আমার বাবার সঙ্গে গোটা প্রশাসনেরই চোখে ধুলো দিয়ে পালাল। আমার বাবা লোকটাকে ধাওয়া করেছিল, কলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত। লোকটা বারবারই বাবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। আমার বাবা ছিল ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে ডাকসাইটে গুপ্তচর, তাঁর জীবনকাহিনি নিয়ে কত গল্প লেখা হয়েছে, সিনেমা হয়েছে। দুঃখের কথা, তোমাদের ওই নেতা বাবাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণ করে দিয়েছিল। এই দুঃখ, এই অপমান বাবা সহ্য করতে পারেনি। বিশ্বযুদ্ধের পর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকত বাবা, দিনরাত তোমাদের নেতার এই ছবিটাকে দেখত। ওইভাবেই চেয়ারে বসে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে মারা গেল একদিন। বাবা মারা যাওয়ার পর ওঁর ছবিটা তোমাদের নেতার ছবির পাশেই টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে এরকম চলে আসছে। বাবা, আর বাবার চিরশত্রু, একই সঙ্গে। কিন্তু তোমাদের দেশের লোকেদের বলিহারি! আমার বাবাকে নিয়ে হলিউড কত সিনেমা বানাল। জেমস বন্ডের সিনেমা দেখেছ নিশ্চয়ই? কিন্তু যে লোকটা আমার বাবাকে হারিয়ে দিল, তাকে নিয়ে তোমাদের

বলিউড কই কোনো ছবি বানাল না তো? শুনেছি তোমাদের বলিউড নাকি হলিউডের থেকেও বেশি ছবি বানায় প্রতি বছর....

এটা বোধহয় এদের বসবার ঘর। পুরনো ধাঁচের বাড়ি। ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার। পিয়ানো, ওপরে স্ফটিকের ফুলদানি। ফুলদানিতে একরাশ শুকনো ফুল। একটা বইয়ের আলমারি, অনেক বই তাতে। দেওয়ালে ওয়ালপেপার, তাতে গোলাপ ফুলের নকশা। গোলাপ ফুলের ছড়াছড়ি মেঝের কার্পেটেও। কেন জানিনা, চারিদিকে এত গোলাপফুল দেখে গা গুলিয়ে উঠল। ঘরের ভেতর বোঁটকা গন্ধ। কার্পেটটা ময়লা, পা দিতে অস্বস্তি হচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়তো শারীরিকভাবে অক্ষম, এত বড়ো বাড়ির দেখভাল করা সহজ নয়। কিন্তু মেয়েটা? এরকম নোংরার মধ্যে থাকে, পরিষ্কার করার চেষ্টা করে না? পকেট থেকে বার করে মোবাইলটা দেখলাম, কোনো রিসেপশন নেই। হাতে একটা তোয়ালে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

—এই সামনে করিডোর পেরিয়ে হলঘর পাবে। হলঘরের পরেই বাথরুম।

—এখানে কি মোবাইলের কোনো রিসেপশন নেই?

—মোবাইল? ভদ্রলোক কেমন অবাক চোখে তাকালেন।

—মোবাইল, ফোন। আপনার কি ফোন আছে?

—না। ওসব ফোনটোন আমি ব্যবহার করি না। করবই-বা কেন? এই খামারের বাইরে কাউকেই আমি বিশেষ চিনি না। এক দিদি ছিল ইংল্যান্ডে, আর মা, সে ছাড়া আার আর কোনো আত্মীয় নেই। ইংল্যান্ড ছেড়ে আসার পর তাদেরও কারোর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। হয়তো সবাই মরে ভূত হয়ে গেছে। যাও যাও, ফ্রেশ হয়ে নাও, আমরা বারান্দায় খাবার সাজাচ্ছি। ফিল ফ্রি মাইট, বাড়িতে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।

হঠাৎই একটা খটকা লাগল। বাড়িতে আর কেউ নেই মানে? তবে চিলেকোঠা থেকে কে আলো ফেলছিল? জিজ্ঞেস করলাম।

—চিলেকোঠা থেকে আলো? ভুল দেখছ নিশ্চয়ই। চিলেকোঠায় কেউ থাকে না, বহুকাল ওটা ব্যবহার হয় না। ইন ফ্যাক্ট, চিলেকোঠার সিঁড়ি তো ভাঙ্গা, কারও পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

চোখের ভুল? হবেও-বা! লোকটার দেখানো রাস্তায় করিডোর ধরে এগোলাম। অন্ধকার করিডোর। এক জায়গায় ছাদ থেকে একটা শিকল ঝুলছে। করিডোর পেরিয়ে খাবার ঘরে পৌঁছে দেখি, সেরকমই ওয়ালপেপার, কার্পেট। গোলাপ ফুলের নকশা। ডাইনিং টেবিলের ওপর স্ফটিকের ফুলদানি। এই ফুলদানিতেও একরাশ শুকনো ফুল। অবাক কাণ্ড। কেউ কি এরকমভাবে শুকনো ফুল সাজিয়ে রাখে? ঘরগুলো কেমন যেন অন্ধকার। গা-ছমছমে। জানলা-দরজা ছোটো ছোটো। জানলাগুলোয় লাল কাচ। বাইরের আলো সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢুকে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি করেছে। ঠিক যেন নরকের আগুন। কোথাও একটা খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

বাথরুমে ঢুকে ভালো করে হাত-পা ধুয়ে, চোখে-মুখে-ঘাড়ে জল দিলাম। বাথরুমে কোনো আয়না নেই। হাত-মুখ মুছতে মুছতেই শুনতে পেলাম, বাইরে একটা আওয়াজ। চাপা ভোঙানির আওয়াজ। কেউ কি অসুস্থ? এখনো পর্যন্ত একটা আয়না দেখিনি কোথাও। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছার পর আয়নায় মুখটা না দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। ভাগ্য ভালো, এত নোংরার মধ্যেও তোয়ালেটা অন্তত পরিষ্কার। গোঙানির আওয়াজটা ধীরে ধীরে কান্নার আওয়াজে পরিণত হচ্ছে। কে কাঁদছে? কোনো মেয়ের গলা কি? সেই মেয়েটা? নাকি বুড়িটা?

হঠাৎ করেই ঘরের মধ্যে সব চুপচাপ হয়ে গেল। তখনই খেয়াল করলাম, বাইরে থেকে অনেক রকম শব্দ ভেসে আসছে। ঝড়ের শব্দ, গাছপালার উথাল পাথাল হওয়ার শব্দ, আলগা জিনিসপত্র উড়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ার শব্দ। তার সঙ্গেই টালির চালে একশো বাজনাদারের মৃদঙ্গে চাঁটির ধ্বনি উঠল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এটা সেই খাবার ঘরটা নয়, যেখান থেকে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। এটা একটা খোলা বারান্দা। সম্ভবত এটা বাড়ির পেছনদিক, বারান্দার পেছনে ঘন জঙ্গল। বাঁদিকে একটা ঢালু জমি, সেদিকটায় জঙ্গল নেই। কিন্তু সে অভাব পুষিয়ে দিয়েছে লম্বা লম্বা আগাছা। ঘন ঝোপ, জায়গায় জায়গায় কোমর পর্যন্ত উঁচু। বেগুনিরঙের আকাশ, তুমুল শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। রাগে মাথা ঝাঁকাচ্ছে গাছগুলো। ডেকের ওপর একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। এককোণে উনুন। এখানে এসে পড়লাম কী করে? বাথরুমে কি দুটো দরজা ছিল? একটা খাবার ঘরের সঙ্গে, আরেকটা বারান্দার সঙ্গে? বোধহয়। রেলিং থেকে একটা পাখির খাঁচা ঝুলছে, খালি। না, খালি তো নয়! খাঁচার ভেতরে এটা কী? একটা মরা পাখির কঙ্কাল, চিত হয়ে পড়ে আছে। গা গুলিয়ে উঠল। আকাশজুড়ে বেগুনি অন্ধকার, দিন না রাত বোঝা যাচ্ছে না। কী হবে এখন? এই বৃষ্টিতে বেরোবো কী করে?

ক্ষীণ আওয়াজ, পাশের ঘর থেকে আসছে। কেউ কি গান গাইছে? ডেকের পাশের দরজাটা দিয়ে ঢুকে দেখি, এই ঘরটাও আগে দেখিনি। এঘর ওঘর খুঁজতে লাগলাম। এ বাড়িতে নিশ্চয়ই আরও অনেক লোকজন থাকে! এইসব হাসি, কান্না, গান, এসব কে করছে? বাড়িটা যেন গোলকধাঁধা। ওপরে চিলেকোঠা রয়েছে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার সিঁড়ি নেই কোথাও। বাড়ির লোকজনেরা সব গেল কোথায়? এইতো, এটা একটা

শোবার ঘর। কেউ আছে এটাতে। সেই মেয়েটা, যাকে বাইরে দেখেছিলাম। কিন্তু মেয়েটা তো বাইরে বারান্দায় খেলছিল, এখানে এল কী করে? ভদ্রলোকের দুটো মেয়ে নয় তো, একরকম দেখতে, যমজ? তা কী করে হয়, ভদ্রলোক তো বললেন বাড়িতে আর কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে মেয়েটা একা একা ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে, গেয়ে চলেছে। ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে। হুম হুম, হুম হুম, ইন অ্যান্ড আউট, হো! হুম হুম, হুম হুম, ইন অ্যান্ড আউট, হো! সুরটা খুব চেনা। এটা কি কোনো কেল্টিক পল্লীগীতি? মনে হচ্ছে আগে কোথাও শুনেছি। ঘরের একপাশে একটা বিছানা, বিছানার চাদরে বিচিত্র সব নকশা। কোথায় যেন দেখেছি এরকম নকশা। খুব হালেই দেখেছি। যেকোনো শোবার ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিল বা আয়না থাকা স্বাভাবিক, এঘরে সেসব কিছুই নেই। এই বাড়িতে কোথাও কোনো আয়না নেই কেন? সিলিং থেকে অনেক দড়িদড়া ঝুলছে। সেসব থেকে ঝুলছে অনেক কাটুম-কুটুম। এবার মনে পড়েছে, বিছানার চাদরের নকশাগুলো কোথায় দেখেছি। জঙ্গলের মধ্যে, সেই গাছের ওপর রক্ত দিয়ে আঁকা নকশাগুলো, হুবহু এক! মেয়েটা এবার আমাকে খেয়াল করল, নাচ থামল।

—গুড ইভিনিং! বললাম।

—ইভিনিং! কে তুমি?

—আমি এই কাছেই কাজে এসেছি। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, তোমার বাবা.....

—বাবা? আমার তো কোনো বাবা নেই!

—মানে? এই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা, এরা তোমার বাবা মা নয়?

—না। এরা অবিকল আমার বাবা মা'র মতো দেখতে। আসলে শয়তান এদের পাঠিয়েছে, আমাকে বশ করতে। কিন্তু পারবে না। জানো তো, আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেল আমাকে কানে কানে সব বলে দেয়। সেই বলেছে, এরা খারাপ লোক। এদের খুন করে ফেলা উচিত। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

গার্ডিয়ান এঞ্জেল, মানে দেবদূত কানে কানে বলে দেয়? মেয়েটা বদ্ধ উন্মাদ! সিজোফ্রেনিক! এর সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তাছাড়া, শুধু শুধু এখানে সময় নষ্ট করছি কেন?

—বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে জানো? জিজ্ঞেস করলাম।

—ওই তো, ঐ দরজাটা দিয়ে বেরোলেই সামনে করিডোর, সেটা দিয়ে এগোলেই বসার ঘর, তারপরেই বারান্দা।

ঠিক তো। করিডোরটা চিনতে পারলাম, এটা দিয়েই তো বসার ঘরে পৌঁছেছিলাম। তাহলে এতক্ষণ এই করিডোরটা খুঁজে পাইনি কেন? মোবাইলে আবার চেষ্টা করলাম, এখনো কোনো রিসেপশন নেই। ধুত্তেরি! করিডোরের অন্যপ্রান্তে বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে এগিয়ে এলো।

—এস, এস। বাইরে বারান্দায় খাবার বাড়া হয়েছে।

—খিদে খুব একটা পায়নি আমার। বরঞ্চ তাড়াতাড়ি মোটেল ফিরতে পারলে ভালো হতো।

—বাইরে কী বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখেছ? এই বৃষ্টিতে যাবে কোথায়? তারচেয়ে বরং খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো, বৃষ্টি থামলে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে চমকে গেলাম। সেই মেয়েটা তো এখানে বসে আছে! এক্ষুনি মেয়েটাকে ভেতরের ঘরে দেখলাম না? মেয়েটা আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারল না। পাথরের মতো মুখ করে টেবিলে বসে আছে, সেই বুড়ি মহিলার পাশে। উল্টোদিকের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। খাবারের আয়োজন সামান্যই। ঘরে বানানো মাংসের পিঠে, ঝলসানো আলু, স্যালাড। খিদে পেয়েছিল, তবু তৃপ্তি করে খেতে পারলাম না। কোথা থেকে যেন একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ভেসে আসছে। তার ওপর এই মা মেয়ে। খাবার টেবিলে সামনে চেয়ারে যদি দুজন অচেনা লোক পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকে, কোনো কথা না বলে, তাহলে অস্বস্তি হয় না? মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম, সামনের পুরো দৃশ্যপট জুড়ে প্রকৃতি যেন মাতলামো শুরু করেছে। আকাশের ছাদ বোধহয় ফুঁটো হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামার নাম নেই। কালো জল সরোবরে, দূরের জঙ্গলের পাগলের মতো মাথা নেড়ে না-না বলছে।

বেগুনি আকাশ বারবার আলো হয়ে যাচ্ছে। বেগুনি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তখনই ব্যাপারটা খেয়াল করলাম। ওরা তিনজনই বাঁ হাত দিয়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য!

*****

বুড়ি আর তার মেয়ে খাওয়া শেষ করে ভেতরে চলে গেছে। আমি আর সেই ভদ্রলোক এখনো বসে আছি বারান্দায়। প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল, বৃষ্টি এখনো সমানে চলছে। এরকম বৃষ্টি তো কই মেলবোর্নে হয় না? জঙ্গলের বৃষ্টি কি অন্যরকম? ভদ্রলোক বলছিলেন,

—এই জঙ্গলে থাকি বটে, কিন্তু পৃথিবীর খবর এখনো কিছু কিছু রাখি। বিশেষ করে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে একটা আগ্রহ তো রয়েইছে। আচ্ছা বলো তো, আরাকান আর্মি সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা? এদের সঙ্গে তোমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

—সে কী? আজাদ হিন্দ ফৌজ তো আশি বছর আগের কথা। তাছাড়া তাদের সত্তর শতাংশ সেনা মারা গিয়েছিল,

বাকিরা আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই....

—লোকে তাই বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, ওই সত্তর শতাংশ আসলে মারা যায়নি। ওরা আত্মগোপন করে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা এশিয়ায়, মিশে গিয়েছিল স্থানীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে। আরাকান আর্মির অতীত হয়তো সেখান থেকেই......

—এরকম কোনো প্রমাণ তো নেই! তাছাড়া, এখন এসব ভাবতে পারছি না। বড্ড ধকল গেছে আজ, মাথাটা টিপটিপ করছে।

—তাহলে শুধু শুধু বসে থেকে কী করবে? তার চেয়ে ভেতরে শোবার ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট নিতে পারো।

বিছানায় শুয়ে একটা আচ্ছন্ন তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল। সেটা ভেঙ্গে গেল তীক্ষ্ণ গোঙানির শব্দে। সেই আওয়াজটা ফিরে এসেছে? কী ব্যাপার? কে ওটা? বিছানা ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়লাম। জানালার কাছে গিয়ে দেখি, বৃষ্টি এখনো চলেছে। শব্দটা কোত্থেকে এল? তখনই ওপরে ছাদের কাছে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেলাম। কাঠের মেঝেয় কাঠের পা ঘষটে চলার আওয়াজের মতো কিছু। ওপরে তো চিলোকোঠা। সেখানে নাকি কেউ থাকে না? তবে আওয়াজটা আসছে কোত্থেকে? জেদ চেপে গেল। বাইরে বেরিয়ে করিডোর ধরে এগোতেই সামনে দেখলাম, ছাদ থেকে সেই শিকলটা ঝুলছে? এটা তো আগেই দেখেছিলাম। কী মনে হলো, ধরে টান দিলাম। অমনি ছাদের মধ্যে একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেল, ওপর থেকে ভাঁজ করা একটা সিঁড়ি নেমে এল। সিঁড়িটা তো বেশ অক্ষতই আছে। তবে যে লোকটা বলেছিল সিঁড়িটা ভাঙা? এই বাড়িটাতে কে যে সত্যি কথা বলে, আর কে মিথ্যে, সেটা বোঝা দায়! সাবধানে সিঁড়িতে পা রাখলাম। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করে উঠল সিঁড়িটা। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। বিশ্রী পচা গন্ধ ঘরটাতে। বাইরে হঠাৎ বৃষ্টির আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। নিঝুম, চুপচুপ হয়ে গেল সবে। চিলেকোঠায় ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে অন্ধকার চোখে সয়ে এল। আলো-আঁধারিতে দেখা যাচ্ছে, ঘরে একটা বিছানা আছে। সেই বিছানার ওপর পড়ে আছে একটা কঙ্কাল। তার কোমর পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে এল। বিরাট কোনো একটা গোলমাল আছে এই বাড়িটাতে। পালাতে হবে এখান থেকে। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। করিডোর দিয়ে আন্দাজে এগোলাম সদর দরজার দিকে। চলতে চলতেই মোবাইলটা বার করলাম। রিসেপশন ফিরে এসেছে কি? খুব অন্ধকার এখানটায়। নাকি মোবাইলের কাচটা ঝাপসা হয়ে আছে। কাছে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম।

কানফাটানো একটা আর্তনাদে চমকে উঠে হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল। বাইরে থেকে আওয়াজ এসেছে। কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে বাইরে। একাধিক গলার চিৎকার। মোবাইলটা কুড়িয়ে নিয়ে বারান্দার দিকে দৌড়োলাম। বারান্দায় পৌঁছে যে দৃশ্যটা দেখলাম, সেটা অতিবড়ো দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি। টেবিল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে দেহদুটো। এর ওপর কেউ যেন ওদের কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে, সারা শরীরে অজস্র আঘাতের চিহ্ন। রক্তের পুকুরের মধ্যে মেয়েটা ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে। মুখ, হাত, জামা রক্তে মাখামাখি, বাঁ হাতে আধহাত লম্বা একটা রক্তমাখা ছুরি। গুনগুন করে গেয়ে ছলেছে—হুম হুম, হুম হুম, ইন

অ্যান্ড আউট, হো। হুম হুম, হুম হুম, ইন অ্যান্ড আউট, হো।

ওহ্, কী বীভৎস দৃশ্য। চিৎকার করে প্রাণভয়ে দৌড়োলাম, জঙ্গলের দিকে। দৌড়, দৌড়, দৌড়। পার হয়ে এলাম সেই স্ট্যাচুগুলো। ওহ্ মাগো! চোখের সামেন জলজ্যান্ত দু'টো লোককে ডেডবড়ি হয়ে যেতে, জবাই করা মুরগির মতো ছটফট করতে আগে কখনো দেখিনি। ভীষণ গা গুলোচ্ছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাব।

টলতে টলতে এলোমেলো পায়ে বাগানের গেট খুললাম। দেখি, সেই মেয়েটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। সাদা ধপধপে পোশাক মেয়েটার, একটুও রক্তের দাগ নেই তাতে। হাতে লম্বা সেই ছুরিটা, সেটাতেও রক্ত লেগে নেই। মাথাটা ঘুরে উঠল, আতঙ্কে পা দুটো অবশ হয়ে এল। মেয়েটা বেড়ার ওপারে গেল কোন ফাঁকে?

—তুমি কি আমার গার্ডিয়ান এঞ্জেল? তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? দুটো লোক আছে এই বাড়িতে...

ভয়ে চিৎকার করে উল্টোদিকে দৌড়োলাম। পার হয়ে গেলাম সেই মূর্তিগুলো, বাড়িটা, বাড়ির পেছনের ডেক, উনুন। লাফিয়ে বেড়া টপকে, জঙ্গল পাশ কাটিয়ে ওদিকের ঢালু জমিতে গিয়ে পড়লাম। হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেলাম। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে থামলাম। সারা গায়ে কাদা লেগে গেছে। মাটি ছেড়ে উঠতে গিয়ে আছাড় খেলাম। সামলে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়।

ঝোপঝাড় ভেঙ্গে অনেকটা দৌড়োনোর পর মনে হলো, খামারটা থেকে এখন বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছি। মেয়েটা পিছু নেয়নি। বুক ঢিপঢিপ করছে, হৃদপিণ্ডটা গলার কাছে আটকে গেছে। মোটেলে ফিরতে হবে, কিংবা কোনো লোকালয় খুঁজে বার করতে হবে। হাঁপাতে হাঁপাতে পা চালালাম, জোর কদমে। আবার ঘন জঙ্গল ধেয়ে এল চারিদিকে। আগেরবার উত্তরদিকে গিয়ে খামারটা পেয়েছিলাম, তাই এবার ঠিক উল্টোদিকে হাঁটা দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। গন্ধটা চেনা। সামনে একটা গাছ, গাছটাও খুব চেনা। গাছের ডাল থেকে একটা মরা ক্যাঙ্গারু ঝুলছে। পেটটা আড়াআড়িভাবে চেরা, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে ঝুলছে। আশেপাশের গাছের ডাল থেকে অজস্র কাটুম-কুটুম ঝুলছে। একটা আশঙ্কা মনে জমছে। ঝোড়ো বাতাস একরাশ কুয়াশা জড়ো করল। কয়েক পা এগোতেই সামনে দেখলাম, সেই ফাঁকা জায়গা, সরোবর, সেই ভাঙাচোরা বাংলো—প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। সরোবরের ধারে তিনটে সারস একইদিকে তাকিয়ে আছে।

—হ্যালো মাইট!

চমকে উঠলাম। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জীবন্ত!

দেজা ভু! আবার দৌড়োলাম। এবার পশ্চিমে। আবার সেই বিশ্রী গন্ধ। গাছের ডাল থেকে মরা ক্যাঙ্গারু ঝুলছে, অজস্র কাটুম-কুটুম। ঘন কুয়াশা, ফাঁকা জায়গা, ভাঙাচোরা কাঠের বাড়ি। সরোবর, সারস। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জ্যান্ত। আবার দৌড়। বিশ্রী গন্ধ। গাছের ডাল থেকে মরা ক্যাঙ্গারু, কাটুম-কুটুম। কুয়াশা, ফাঁকা জায়গা, ভাঙাচেরা বাড়ি। বৃদ্ধ। জ্যান্ত। দৌড়। মাথা ঘুরছে। বিশ্রী গন্ধ। কাছের ডাল থেকে মরা ক্যাঙ্গারু, কাটুম-কুটুম। কুয়াশা, ফাঁকা জায়গা, ভাঙাচেরা বাড়ি। বৃদ্ধ। জ্যান্ত। দৌড় কতক্ষণ এরকম চলেছে, জানি না। রাত নামছে জঙ্গলে। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সঙ্গে বিদ্যুৎ চমক আর ঝোড়ো বাতাস। দূরে কি সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, লোনা গন্ধও আছে বাতাসে। আর আছে গম্ভীর একটা সুর। ডিজরিডুর সুর।

পা বসে যাচ্ছে পাঁকে, যেন চোরাবালি। কিন্তু কাঁধ জুড়ে অসীম এক শক্তির স্রোত বইছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি—একাকিত্ব, সঙ্গে শক্তি, অসীম শক্তির অনুভূতি। বিশেষত কাঁধে। শক্তির স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ছে কাঁধ থেকে সারা শরীরে। যেন একজোড়া অদৃশ্য ডানা পিঠ থেকে বেরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে ছড়িয়ে আছে অনেকদূর পর্যন্ত। পালক নেই সে ডানায়, চামড়ায় ঢাকা। প্রচণ্ড শক্তি সেই ডানাজোড়ায়। সামনে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। পা বসে যাচ্ছে, কিন্তু ডানাজোড়ার শক্তিতে ভর করে এগিয়ে চলেছি, ডিজরিডুর সুরের উৎস সন্ধানে। বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সামনে বিশাল সমুদ্র, তিনদিক বিস্তৃত। জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিক করছে, বড্ড চেনা লাগছে জায়গাটা। কন্যাকুমারী? কিন্তু কুমারী মন্দির নেই, থিরুভায়ুর নেই, বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল নেই, শুধু ধু ধু প্রস্তর প্রান্ত, আর চন্দ্রস্নাত সাগরের অবিরাম আসাযাওয়া। এ যেন এক আদিম কন্যাকুমারী, সভ্য মানুষ পৃথিবীতে আসার আগের। পাথর ডিঙিয়ে সাগরের জলে নামলাম। অগভীর সমুদ্রে হেঁটে পৌঁছলাম বিবেকানন্দ রকে। এখন আমার সামনে থাকার কথা অসীম সমুদ্র, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মালা, তার মাঝে মাঝে স্বপ্রভ অগভীর সমুদ্র। অথচ কন্যাকুমারীর দক্ষিণে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো ভূখণ্ড নেই, এ তো অসম্ভব! তবে কী...প্রাচীন তামিল সাহিত্যে আছে, কন্যাকুমারীই ভারতের শেষ বিন্দু নয়, তারপরে ছিল বিশাল এক ভূমিখণ্ড, যার নাম কুমারী-গণ্ডুপ। ভারতের সঙ্গে একদিকে আফ্রিকা, অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার যোগ ছিল এই ভূখণ্ড দিয়ে। এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের শেষে নাকি কুমারী-গণ্ডুপ হারিয়ে গিয়েছিল চিরতরে।

ওপারে নারকেল গাছের সারি, সমুদ্রের পাড়ে আগুন জ্বলছে, তাকে ঘিরে গোল হয়ে নাচছে একদল মানুষ। তামাটে তাদের গাত্রবর্ণ, সাদা রং দিয়ে চিহ্ন আঁকা গায়ে মুখে, অনেকটা আমাদের সন্ন্যাসীদের মতো। অস্ট্রেলিয়ার জনজাতি এরা। শুনেছি এরকম অনুষ্ঠানকে এরা করবরী বলে। করবরীর মাধ্যমে

এরা প্রকৃতির সঙ্গে, সৃষ্টির সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। কে ওই লোকটা? ওদের মধ্যে বসে আছে, ডিজারিডু বাজাচ্ছে? এ কি সেই লোকটা, যাকে স্বপ্নে দেখেছি? যাকে সেদিন ফুটপাথেও দেখলাম? আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, আমার স্মৃতির কোনো একটা পাতা হঠাৎ আলো করে দিয়ে গেল। কলকাতায় বাড়িতে বিরাট একটা ওয়েল পেন্টিং ছিল, আমার ঠাকুর্দার। অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন তিনি। এককালের দুর্ধর্ষ সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামী, পরে ত্রিগুণা সেনের ভাবশিষ্য, যাদবপুরের গোল্ড মেডেলিস্ট ইঞ্জিনিয়ার।

—ঠাকুর্দা?

লোকটা এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখলো। ঠাণ্ডা সে হাতের স্পর্শ, শরীর জুড়িয়ে গেল।

—কী দাদু, দুঃস্বপ্নের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলে? বলল লোকটা।

—হ্যাঁ, মানে...

—ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু দাদু, তুমি তো জেগেও দুঃস্বপ্নের মধ্যেই আটকে পড়ে আছো! একই কাজ বেজার মুখে করে চলেছ নিত্যদিন। মনে রেখো দাদু, আমরা হলাম স্বপ্নজগতের বাসিন্দা, পৃথিবীতে এসেছি শুধু অভিজ্ঞতার সন্ধানে। অভিজ্ঞতা আমাদের বিবর্তনের তাগিদে। যখন এই পৃথিবীতে আসি, সজ্ঞানেই আসি। সজ্ঞানেই ঠিক করি কোন বাবা-মা'র ঘরে, কোন পরিস্থিতিতে, কোন বংশাণু নিয়ে জন্ম নেব। পৃথিবী হলো আমাদের পাঠশালা, তার প্রতিটি কণা স্বপ্নজগতের চাবিকাঠি। প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানের ভাণ্ডার এখানে সাজানো আছে। কিন্তু বেজার মুখে পাঠশালায় দিন কাটালে সেসব কিছুই তো দেখতে পাবে না। তাতে কী লাভ, বলো দাদু? অনন্য এই পৃথিবী, অনন্য এর জীবন। স্বপ্নজগৎ আমাদের শেখায়, আমাদের রাস্তা দেখায়। শক্তি দেয়, জ্ঞান দেয়। আমাদের একটাই প্রার্থনা, যেদিন আমরা সেখানে ফিরে যাব, সেদিন যেন চক্র পূর্ণ হয়, আর আগামী চক্র যেন আরও বড়ো হয়। ওই দেখো ওদের। ওরা কোনোদিন চাষবাস করেনি, কলকারখানা বানায়নি, ব্যবসা করেনি। ওরা শুধু চেয়েছে রূপকার হতে, গান গাইতে, ছবি আঁকতে, কবিতা লিখতে, তারাদের ভাষা বুঝতে। চেয়েছে যাত্রী হতে। প্রকৃতি যা দেয়, তাই ওরা মাথা পেতে নেয়, বেশি লোভ করে না। নিজেদেরকে প্রকৃতির খণ্ডখণ্ড টুকরোর মালিক ভাবেন। তাই ওদের সমাজ, এই জীবজন্তু, গাছপালা, এই প্রকৃতি, এই ব্রহ্মাণ্ড; সবার সঙ্গে ওরা একাত্ম।

—তার মানে? তুমি কি বলছ, আমিও ওদের মতো সবকিছু ছেড়েছুড়ে....

—না, দাদু। তা আমি বলিনি। শুধু কোনটা সত্যি আর কোনটা স্বপ্ন, সেটা চিনতে ভুল করো না। দুঃস্বপ্নটাকে দুঃস্বপ্ন বলে চিনে নিলেই তো আর সেটা কষ্ট দেয় না, তাই না দাদু? ওই দেখ, বৃষ্টি শেষ, সকাল হচ্ছে, রামধনু উঠছে। রামধনু হলো স্বপ্নজগতের বার্তাবহ, বুঝলে দাদু?

******

ঘুম ভাঙল। সত্যিই অন্ধকার কেটে গেছে। বৃষ্টি থেমেছে। বাইরে অনেক পাখি ডাকছে। কাচের দরজা ঠেলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম, আকাশ আলো করে কমলা রঙের সূর্য উঠছে। দূর থেকে ঝাপসা ছায়ার মতো সেই কাঠের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সত্যিই কি ওটা ওখানে আছে, নাকি আমার চোখের ভুল? একটা নয়, তিনটে রামধনু আকাশে। ভিজে বাতাস মাথায় ঠাণ্ডা স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল, মনে হলো যেন দাদুর আশীর্বাদ। মনের মধ্যে এখনো ডিজরিডুর সুর ভাসছে। ছোটোবেলায় ছবি আঁকতাম, আজ বহু বছর পরে আবার মনের আনন্দে পেন্সিল নিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে। কাচের স্লাইডিং দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে বসলাম। আগেরদিন এখানে শুধু পাঁচিলই দেখেছিলাম। আজ দেখলাম, পাঁচিলের ওপারে একটা বাগানবিলাস গাছ, বেগুনি ফুলে ভর্তি। তার ওপরে একটা পাখি বসেছে। ভোরের বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে ফুলগুলো, পাখিটা সেই তালে নেচে চলেছে। অন্যদিন হলে হয়তো পাখিটাকে খেয়ালই করতাম না। আজ কিন্তু ওটাকে খুব ভালো লেগে গেল। মনে হলো, আমার সঙ্গে কথা বলতেই ও এই গাছটায় এসে বসেছে। কোভিড অতিমারীর পর আজ প্রথম বাতাসে এত সুগন্ধ একসঙ্গে পেলাম। ভেজা ঘাসের গন্ধ, ঝরা পাতার গন্ধ, ফুলের গন্ধ।

আজ মেলবোর্নে ফেরার দিন। মোটেল ছাড়তে হবে, হাতে বেশি সময় নেই। ঘরে ঢুকে দেখি, রাজা প্রতাপের জীবনীর বইটা টেবিলের পাশে পড়ে আছে। তার পাশে আরও একটা বই আছে। বঙ্গের আরেক রাজবংশের কথা। জল্পেশ শিবের অবতার রাজু পৃথু, যিনি নালন্দা ধ্বংসকারী বখতিয়ার খিলজির বর্বর সেনাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। যিনি নরপিশাচ বখতিয়ারকে বাঁশপেটা করে বঙ্গে ছাড়া করেছিলেন। রাজা পৃথু আর রাজা সন্ধ্যার রাজবংশের পরাক্রমে উত্তরবঙ্গ কোনোদিন বিধর্মীর সামনে মাথা নোয়ানি। বাঙ্গালি শুধুমাত্র ট্র্যাজিক হিরো নয়। সফল নায়কও বটে।

ওডোঙ্গায় না এলে জানতেই পারতাম না, আকাশে একসঙ্গে তিনটে রামধনু ওঠে।

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators
&
Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের প্রাসঙ্গিকতা

ড: নারায়ণ চক্রবর্তী

ভাভারতের কমিউনিস্টদের জন্ম হয় ১৯২০ সালে তাসখন্দে। ভারতের কমিউনিস্টদের জন্মলগ্ন থেকে তাদের কার্যপ্রণালী যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে অবশ্য এসব নিয়ে অবাক হওয়ার কারণ নেই। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে প্রথম Communist Party of India-র জন্ম হয়। এই সময় তাসখন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্টির ৭ জনের যে কোর কমিটি তৈরি হয়, তার প্রধান সংগঠক ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁর স্ত্রী ইভলিন রায়। সঙ্গে ছিলেন বেশ কিছু প্রাক্তন মুজাহিদ, যারা দেশ থেকে বাইরে গিয়ে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়। তারপর খিলাফত ব্যর্থ হওয়ায় লেনিনের বলশেভিক দলের সংস্পর্শে আসে। এদের

বিপ্রতীপে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা আমেরিকায় গঠন করেছিলেন গদর পার্টি। মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করলেও তিনি চেয়েছিলেন ভারতের অভ্যন্তরের বিপ্লবী গোষ্ঠী যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি থেকে যুবক ক্যাডার সংগ্রহ করতে। কিন্তু তিনি এই দুই সংগঠনের থেকে বিশেষ কাউকে টানতে পারেননি। ফলে প্রাক্তন মুজাহিদ মহম্মদ সফিক পার্টির প্রথম সেক্রেটারি হন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ এমপিটি আচারিয়া প্রথম চেয়ারম্যান হলেও এক বছরের মধ্যে এই মুজাহিদদের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দলের সংশ্রব ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে চলে যান। এই সময় প্রাক্তন মুজাহিদরা তাদের মজহবি প্রভুত্ব স্থাপনায় ব্যর্থ হওয়ায় দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে তাদের আশা পূরণের অভিলাষে এই দলে যোগদান করে। মহম্মদ সফিক ছাড়াও মহম্মদ আলি এবং আরও অনেক মুজাহিদ কমিউনিস্ট দলে যোগ দেয় এবং শুরু থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতার সুর চড়াতে থাকে তাদের মজহবি ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের স্বাধীনতার বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র জন্য নয়। ১৯২০-২১ সালে ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য করার যে ড্রাইভ নেওয়া হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই মুজাহিদরা মহম্মদ সফিক ও মহম্মদ আলির নেতৃত্বে। এখানে যে রেজোলিউশান নেওয়া হয়, সেখানে পরিষ্কার বলা হয় চীনা কুয়োমিনতাংয়ের আদর্শ এবং প্রয়োজনে যে কৌশল ভারতের পার্টির পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তা গ্রহণ করা হবে।

প্রাক্তন মুজাহিদদের একদল যেমন ভারতের কমিউনিস্টদের ড্রাইভিং সিটে বসল, তেমনি আরেক দল রাশিয়ার লেনিনের বলশেভিকদের কাছে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে গেলে—যার বড়ো অংশ পরবর্তী সময়ে ভাড়াটে বাহিনীতে নাম লেখালো। এই মুসলমানরা ভারত থেকে তাদের মজহবি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে তাদের সেই স্বপ্ন কমিউনিস্ট ভারত থেকে তাদের মজহবি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দিয়ে তাদের সেই স্বপ্নপূরণ করার জন্য এই দলের প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতে লাগল। তাসখন্দ মিলিটারি স্কুলে প্রাচ্যের অনেক প্রাক্তন মুজাহিদ যারা প্যান-ইসলামিজমের বাহক, তারা যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর আত্মজীবনী উৎসর্গ করেন দু'জন প্রাক্তন মুজাহিদ আবদুল মজিদ এবং ফিরোজউদ্দিন মনসুরের নামে। ১৯২১–২২ সাল থেকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হল মূলত মুজফ্ফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তির পর।

পটভূমিকা জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পরবর্তী সময়ে এই কমিউনিস্ট পার্টি বারবার নীতির মোড়কে ব্যক্তিস্বার্থ ও নেতৃত্বের লিপ্সার কারণে বিভক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই প্রাক্তন মুজাহিদ মহম্মদ সফিকের সময় থেকে যে প্যান-ইসলামিজমের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তলে এসেছিল, সেই মূল নীতি দেশের সব কমিউনিস্ট দলের আদর্শ হয়ে আছে। তারা শুধুমাত্র সর্বহারার কথা বললেও একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সকল 'সর্বহারা'কে খুঁজে পায়। তারা ইসলাম মেনে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' পালন করে, ফলে আজ থেকে বহু বছর আগে তাদের 'ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষতা'র বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের বহু কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ্যে যে গোরুর মাংস ভক্ষণ করে তা সংবাদমাধ্যমে প্রচার করে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভড়ং দেখান। অথচ, বহুবার চ্যালেঞ্জ করলেও মুসলমান কোনো কমিউনিস্ট নেতাকে কেউ শুয়োরের মাংস খেতে দেখেনি। সোহরির পর রোজা পালন না করে ইফতারে রোজা ভাঙার নাটক এদেশে প্রথম কমিউনিস্টরাই দেখায়। তারাপীঠ মন্দিরে মা কালীর কাছে পুজো দেওয়ার জন্য এ রাজ্যে এক কমিউনিস্ট মন্ত্রীকে তিরস্কার করা হলেও আরেক মন্ত্রীকে হজ পালনের জন্য কিছু বলাই হয় নি, পরন্তু তাঁর হজ যাত্রায় রাজ্য সরকার সহযেগিতা করে। কিছু উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন—বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, যিনি ৩৭ বছর কমিউনিস্ট পার্টির এমপি ছিলেন, একজন ঘোষিত হিন্দু-বিরোধী নেতা ছিলেন। এই লোকটি ৬২ বছর বয়সে আহম্মদ আলির তালাক দেওয়া বউ সুরাইয়াকে নিকাহ করেন এবং নিজের ধর্ম (যদি থাকত) ও নাম পরিবর্তন করে ইসলাম 'কবুল' করেন এবং ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত থেকে হন ইমতিয়াজ গনি। তারপর, সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা পশ্চিমবঙ্গে 'চাষার ব্যাটা' রেজ্জাক মোল্লা বাম আমল থেকে তাঁর এলাকায় দায়িত্ব সহকারে হিন্দুদের জমি বর্গার নামে তাঁর মজহবের মানুষদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের নেতা হয়েছেন। শুধু এই কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তিনি কমিউনিস্টদের পরিত্যাগ করে শেষ বয়সে তৃণমূলের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ভারতে সব মুসলমান যেমন সুযোগ বুঝে কমিউনিস্ট হয়, তেমনি সব কমিউনিস্টের শেষ আশ্রয়স্থল হলো ইসলাম। এখানে কবি গোলাম মোস্তাফার একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করি, 'হিন্দু কমিউনিস্ট এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো ইসলাম।' এভাবে তোষণ করতে করতে এবং নিজেদের ভারতীয় জাতিসত্তায় বিশ্বাস না রেখে এই দেশের কমিউনিস্টরা তাদের শিকড়কে উপড়ে ফেলেছে। নিজেদেরকে ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ হিসেবে না দেখার কারণে এরা নির্বোধের মতো কতগুলি মারাত্মক ভুল করে ফেলে। তারা মুজাহিদদের প্যান-ইসলামিজমে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম লিগের সহযোগী হিসেবে লিগের হিন্দু-বিরোধী আগ্রাসী নীতির অংশীদার হয়ে পড়ে। তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই -এর) জেনারেল সেক্রেটারি ড. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস, যা এখনও সিপিএম-সিপিআইয়ের আর্কাইভসে পাওয়া যাবে, সেই বইতে তিনি দাবি করেন যে, ভারত কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতির দেশ

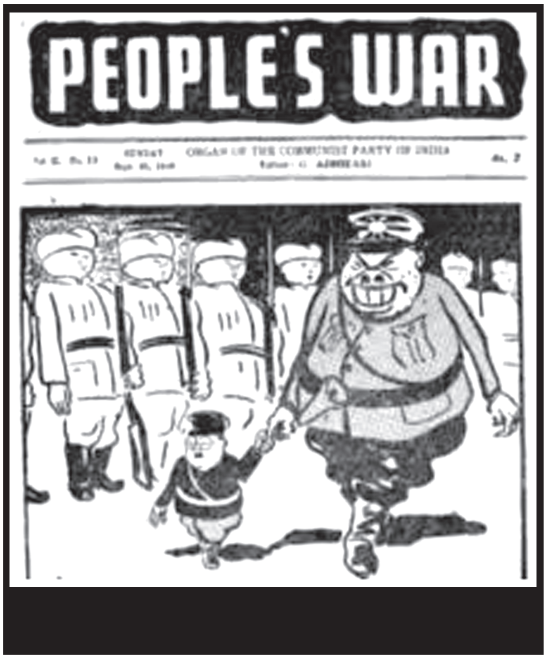

নয়। 'ভারতীয়' বলে কোনো ন্যাশনালিটি বা জাতিসত্তা নেই। ভারত হলো ১৮টি পৃথক জাতিগোষ্ঠীর একটি সমষ্টি মাত্র। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্বতা থাকার দরুন স্বীয় পরিচয় বা জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা এবং জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ক্ষমতা, যোগ্যতা, শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনা অনুযায়ী নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজস্ব রাজ্য বা দেশ গঠন করতেই পারে। তার এই থিসিসের ভিত্তি ছিল জোসেফ স্তালিন রচিত 'মার্ক্সিজম অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন' বইটি। ১৯৪২ সালে এই থিসিসটি রচিত হয়। এই সালেই গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদনা করেন 'পাকিস্তান অ্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিটি' বইটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরে সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে 'অন পাকিস্তান অ্যান্ড ন্যাশনাল ইউনিটি'-শীর্ষক একটি রেজোলিউশান পাশ করা হয়, ১৯৪৩ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে যার শিলমোহর পড়ে। অধিকারী রচিত এই থিসিস এবং কমিউনিস্ট পার্টির এই রেজোলিউশান যে ভারত ভেঙে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সিপিআইয়ের আগাগোড়া দাবি ছিল যে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। ভারত বিভাজন ছাড়া 'স্বাধীনতা' সম্ভব নয়। জিন্না ও মুসলিম লিগের 'লাহোর প্রস্তাব' অর্থাৎ পাকিস্তান দাবির সমর্থক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এইসব ভারত বিরোধী শক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী রক্তাক্ত বিভাজনের মাধ্যমে ভারত পেল খণ্ডিত স্বাধীনতা। ভারত বিভাজনের সময় উগ্র মজহবি কারণে পূর্ব ও পশ্চিমের পাকিস্তানি ভূখণ্ড তীব্র ইসলামি জাতীয়তাবাদের সূত্রে গাঁথা হলো। ভারত যা হিন্দুদের আবাসস্থল, তাঁদের পিতৃভূমি-মাতৃভূমি, তাকে সব উপাসনা পদ্ধতি, মত-পথের জন্য অবারিত দ্বার করে রেখে নেহরু চরম রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রশাসনিক গাফিলতিতে এবং প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক মদতে শুধুমাত্র মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার রাস্তা করে দিল।

এভাবে অযাচিত দাক্ষিণ্য ভারতের অভ্যন্তরে যেমন মজহবি মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল, তেমনই প্যান-ইসলামিজমের তত্ত্ব বুকে বয়ে বেড়ানো জেহাদি ইসলামির সংখ্যাও বাড়তে লাগল। কমিউনিস্ট পার্টির এক অদ্ভুত ধারণা জন্মালো যে, ভারতের অন্য সব দলের রাজনীতিকরা জাতীয়তাবোধের কথা মাথায় রেখে রাজনীতি করেন না। এই কথায় আংশিক সত্যতা পাওয়া যায় কমিউনিস্টরা ধীরে ধীরে তাদের প্যান-ইসলামি নীতির রূপায়ণের পক্ষে এগোতে লাগলো। মজহবি সুবিধে বাড়ানোর আন্দোলন, লাভ জিহাদ— ইত্যাদিতে কমিউনিস্টরা তাদের সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকে তোল্লা দিতে শুরু করল।

জোট রাজনীতির সময় এই কমিউনিস্টরা তাদের নীতির সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে তাদের সমমনোভাবাপন্ন দলকে ভোট দিয়ে থাকে। আবার জাতপাত ও ধর্মনিরপেক্ষতার চক্করে নাজেহাল হিন্দুদের ভোট বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় তা ভোট রাজনীতিতে এক নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে যখন ভারতে কমিউনিস্টদের ভোট রাজনীতিতে প্রভাব, বিশেষত কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে বাড়তে লাগল, তখন ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস একটি বিশেষ পরিবারের রাজনৈতিক দলে পরিণত হলো। দশকের পর দশক ধরে ভারতের নানা ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচীর বিরোধিতা চালিয়ে গিয়েছে বামপন্থীরা। কিন্তু তারা ভারতের গতিরোধ করতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের ভারত বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও নেট দুনিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বের খবরাখবর পাওয়ায় কমিউনিস্টদের গোয়েবলসীয় প্রচারের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবোধ, যা সুভাষচন্দ্র বসু আনার চেষ্টা করলেও এক সময় জওহরলালের কংগ্রেসের দ্বিচারিতা ও ব্রিটিশ শাসকের নিপীড়নের ফলে হারিয়ে যায়। এই জাতীয়তার ধারণাই আবার ভারতীয় মননে জায়গা করে নিতে থাকে। ভারতীয় ভোটারদের মনে জাতীয়তার বোধ ও তার প্রয়োজনীয়তাকে ঘিরেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের পারস্পরিক নৈক্যটের সূচনা হয়।

এখানে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে হয়, যা কমিউনিস্টদের মুখোশ খুলে দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পক্ষ অবলম্বনকারী সব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বকে তারা বরাবর কুৎসিত আক্রমণ করে গেছে এবং এখনও করছে। তারা এভাবেই জাতীয়তাবোধের ভিত্তিটাকেই আঘাত হেনে নীতিগতভাবে নষ্ট করতে চেয়েছে। ডাক্তারজী যখন কলকাতায় ১৯২৮ সালে

কংগ্রেসের অধিবেশনে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসেবে এসেছিলেন, তখন সেবাদলের দায়িত্বে থাকা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা, আলাপ ও মত বিনিময় হয়। দুজনের জাতীয়তাবাদী চেতনাই তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করে। এবং এই কারণেই ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার বিরোধী কমিউনিস্টরা পরবর্তী পর্যায়ে দুই শ্রদ্ধেয় নেতাকে যারপরনাই আক্রমণ করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো নেতাকে 'তোজোর কুকুর', 'কুইসলিং' আখ্যা দিয়ে কমিউনিস্টরা তাদের ব্রিটিশ রাজশক্তির লেজুড় ও মুসলিম লিগের চামচা হিসেবে নিজেদের অবস্থানের প্রমাণ রাখে। নেতাজীর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণা, এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে তাঁর লেখা কমিউনিস্টদের পছন্দ ছিল না। এমনকী সাভারকরের সঙ্গে নেতাজীর আলাপ এবং তাঁদের মধ্যে ১৯৪০ সালের ২২ জুনের সাভারকরের মুম্বইয়ের (তৎকালীন বোম্বের) বাড়ি সাভারকর সদনে যে আলোচনা হয়, তাকেও এই কমিউনিস্টরা বিকৃতভাবে প্রচার করে। সাভারকরের উপদেশ মেনে সুভাষচন্দ্র জানুয়ারি, ১৯৪১ সালে মহানিষ্ক্রমণের পর জার্মানিতে সাহায্যের জন্য যান এবং তাঁরই পরামর্শে জাপানে গিয়ে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করে রাসবিহারীসৃষ্ট আইএনএ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ জন্যই নেতাজীকে কমিউনিস্টরা 'তোজোর কুকুর' বলত। এমনকী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধী এবং হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে থাকা সাভারকরকেও কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' এবং আরও নানা মিথ্যা প্রচারে হেয় করেছে। (Firstpost, Arun Anand, ২২ জানুয়ারি, ২০২২)।

কমিউনিস্টদের হিন্দুভোট ভাগ এবং মুসলমান ভোটব্যাংকের কৌশল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের কথা, বর্তমান ভারতে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষভাবে আঞ্চলিক দলগুলিতে জাতীয়তাবোধের অভাব অনুভূত হচ্ছে।

১৯৯২ সালে অযোধ্যায় পরিত্যক্ত, বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংস নিয়ে কমিউনিস্টরা পরবর্তী ৩০ বছর দেশের মুসলমানদের উত্তেজিত করে গেছে। অথচ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে যে শয়ে শয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা এবং হিন্দু-নিধন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো কমিউনিস্ট দল কোনো কথা বলেনি। তারা সকলেই এক গোষ্ঠীগত মানসিক বিকৃতিতে আক্রান্ত, যারা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে শুধুমাত্র মুসলমান তোষণ বোঝে। তাই ইতিহাস বলছে, ভারতীয় কমিউনিস্টরা সর্বদা ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষী জেহাদিদের লেজুড়বৃত্তি করে চলেছে। এটাই এদের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় নীতি। কিছুদিন আগের সিপিএমের ব্রিগেড জমায়েতে ক্যাডারদের হাতে দেখা গিয়েছে হামাসের পতাকা বং তাদের অন্যতম স্লোগান ছিল, 'মুসলমান বাঁচাও, বিজেপি হটাও'। সেখানে তাদের রাজ্য নেতৃত্বের শীর্ষ পদে আসীন মুসলমান নেতা দলের হিন্দু কর্মী, যিনি মুর্শিদাবাদে জেহাদিদের হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় ঠিক করে বলতে পারেন না। এটি হিন্দু কমিউনিস্টদের জন্য এই দলের আন্তরিকতার অন্যতম নমুনা!

এবার আসা যাক সিপিএমের ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে 'ইন্ডিজোট'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার অকথিত আসল কারণে। নির্বাচন কমিশনের যে দুটো ক্রাইটেরিয়া আছে তার মধ্যে যে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসেবে তারা যে সর্বভারতীয় দল থাকতে পারবে না, সেটা 'ঘুরে দাঁড়ানো'র প্রবক্তারা নিজেরাও জানত। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্য যে নীতিহীন জোট করে তাদের উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া, অর্থাৎ অন্ততপক্ষে তিনটি রাজ্যে যে তাদের আসন জেতার প্রেক্ষিতে উপস্থিতি থাকবে, সেই যুক্তিতে তারা সর্বভারতীয় দলের তকমা ধরে রাখতে সফল! আচ্ছা ভাবুন তো সিপিএম সবচেয়ে বেশি আসন কোন রাজ্যে পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালা বা বিহার নয়, তারা সবচেয়ে বেশি আসন জিতেছে তামিলনাড়ুতে। তাহলে কমরেডরা, হয়তো বলতে থাকবেন যে তাদের তামিলনাড়ুতে সংগঠনের ব্যাপক বিস্তার। এবারের নির্বাচনে এটা তাদের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য যার জন্য তারা লেজুড়বৃত্তি করে ইন্ডি নামের খিচুড়ি জোটে থাকার জন্য তামিলনাড়ুর বর্তমান শাসক দল ডিএমকে-র থেকে তাদের সহযোগী দল হিসেবে দুটি আসন লড়ার অনুমতি পায়। সেখানে যেহেতু ডিএমকে শতকরা ১০০ ভাগ আসনে তার দলকে জেতাতে পেরেছে, তাই এই আসন দুটিতে (দিন্দিগুল ও মাদুরাই) ডিএমকে-র অনুগ্রহে সিপিএম জয় পেয়েছে। আবার কেরালায় তাদের রাজ্য সরকার থাকলেও সেখানে তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়েছে। কোনোক্রমে তারা একটি আসন (অলাথুর) পেয়েছে। এমনকী, ওই রাজ্যে বিজেপিও একটি আসন পেয়েছে। তাছাড়া, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থাকার কারণে তারা রাজস্থানে একটি আসনে (সীকর লোকসভা কেন্দ্রে) জিতেছে। অর্থাৎ সাকুল্যে এই ৪টি আসনে জিতে (লোকসভার মোট আসন ৫৪৩) তারা তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সার্থকতা প্রচার করেছে। এই নির্লজ্জতা শুধুমাত্র কমিউনিস্ট রাজনীতিক এবং লেফট্ ইকোসিস্টেমের সাংবাদিকদের থেকেই আশা করা যায়। এমনকী উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র এমন সাফল্যের মধ্যেও সিপিএমকে সপার ছেড়ে দেওয়া আসনে তারা জিততে ব্যর্থ— এই হচ্ছে কমিউনিস্টদের ঘুরে দাঁড়ানোর সাম্প্রতিক তত্ত্ব।

মোদ্দা কথা হলো, এরা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এখন সত্যিই বেমানান। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের মিলিত ভোট ছিল ১৩.০২%; ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ৮.৬৯% এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ১০.৮৩%। এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার, যেহেতু ২০২৪ সালে দু'দল (কংগ্রেস-কমিউনিস্ট) জোটবদ্ধভাবে লড়েছে, সেহেতু

তাদের আলাদাভাবে ভোট প্রাপ্তির শতকরা হিসাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুসলমান ভোটের প্যাটার্ন বলে দিচ্ছে, বাম-কংগ্রেস জোট এই রাজ্যে সেভাবে মুসলমান ভোট পায়নি। জোটপ্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএমের ভোট কংগ্রেস প্রার্থী পেলেও, কংগ্রেসের ভোট কিন্তু সিপিএম প্রার্থীরা পায়নি। কংগ্রেসকে বুঝতে হবে, সিপিএম তথা কমিউনিস্টরা এখন জোটের রাজনীতিতে বোঝা। কারণ, শুরু থেকেই দেশ বিরোধিতা, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করা-সহ ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা বওয়ার মতো ঘটনাগুলি কমিউনিস্টদের দেশের সংখ্যাধিক্য মানুষের কাছে বিরাগভাজন করেছে। এমনকী তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রচার মানুষের মনে দাগ কাটেনি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের সিপিএমের শাসনকে মানুষ ভোলেনি। এখন সিপিএমকে নিজেদের তামিলনাড়ুর দল বা কেরালা, রাজস্থানের দল না বলে সর্বভারতীয়স্তরে দেশবিরোধী শক্তির লেজুড়বৃত্তি করেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। এই রাজ্যেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে তৃণমূলের লেজুড়বৃত্তি করতে হবে। বিরোধী দল সেজে থেকে এই রাজ্যে তারা 'ভোট কাটুয়া'র ভূমিকা পালন করবে। অবশ্য ভোটের ফল বেরোনোর পর 'গণশক্তি' ও 'জাগো বাংলার' ছবি ও খবর দেখলে মনে হয় সে পদ্ধতি শুরু হয়ে গেছে।

উগ্র ইসলামি ভাবধারার বাহক হওয়ায় এই মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো দেশের থেকে তারা সমর্থন পেলেও তাদের মূল সমর্থনকারী বিদেশি শক্তি চীনের সুবিধার কথা ভেবে ভারতের বিরুদ্ধে সুর ইদানীং ক্রমশ নামাচ্ছে এই কমিউনিস্টরা। তার বড়ো কারণ হলো, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের 'ডিডলারাইজেশন' পদ্ধতি আমেরিকার বিরক্তির কারণ হওয়া এবং তাদের সংবাদমাধ্যমের তীব্র ভারত, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধিতা চীনকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এইসব কারণে সিপিএম এখন একটি 'কনফিউজড্' রাজনৈতিক দল যার রাজনৈতিক অস্তিত্ব অন্য দলের লেজুড়বৃত্তির উপর নির্ভরশীল।

এই সিপিএমের সংসদীয় রাজনীতিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব না থাকলেও এই দলটি যেমন লেলিন-স্তালিনকে কবর খুঁড়ে টেনে আনে, তেমন কমিউনিস্ট শিক্ষায় শিক্ষিত রাজ্যের সাংবাদিকতায় ডিগ্রি পাওয়া সাংবাদিককুল তাদের সংবাদমাধ্যমের মালিকদের 'ডিপ স্টেট'-এর গুণগ্রাহিতার সুযোগে ভারতীয় রাজনীতিতে মৃত এই দলটিকে ভেন্টিলেশনে রেখে নানা প্রচার জারি রাখে। হয়তো মনে প্রচ্ছন্ন আশা, কোনো হেকিমি চিকিৎসায় ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আবার জেগে উঠবে। সর্বভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে এরা গুরুত্বহীন কেন, তা বলতে গেলে এদের সাম্প্রতিক ভোট রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা বিচার করতে হয়। এরা যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানে তাদের লোকসভায় আসন মাত্র একটি। পশ্চিমবঙ্গে পরপর কয়েকটি নির্বাচনে বিধানসভা এবং লোকসভায় আসন সংখ্যা শূন্য। তারা রাজনৈতিক যুদ্ধে শূন্য থেকে মহাশূন্যে বিলীন হওয়ার পথে। তবু কীসের বাধ্যবাধকতায় তাদেরকে সংবাদমাধ্যম এত গুরুত্ব দেয়? সংবাদমাধ্যমের এই প্রবণতা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

অনেকে বলেন, এর জন্য ওই দল এবং তাদের আগের নেতারা দায়ী। এটা একদম ভাবের ঘরে চুরি করার মতো একটি কথা, যা একদম ঠিক নয়। এই বামপন্থী দলটির (অর্থাৎ সিপিএমের) যতই পরিবর্তন করা হোক না কেন, এ সব পরিবর্তন সর্বদা নতুন পাত্রে পুরোনো মদ পরিবেশনের মতো। তার কারণ হচ্ছে, দলটির ভারতীয় রাজনীতিতে জন্মের ইতিহাস এবং এই দেশের পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে নিজেদের নীতির পরিবর্তন না করা। এই যে দেশদ্রোহিতা ও নিজেদের ধ্বংসাত্মক নীতিতে অবিচল থাকা, এই রাজনৈতিক সততাই দলটিকে ভারতীয় রাজনীতিতে অপাঙ্‌ক্তেয় করে তুলেছে।

১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় যখন তার জেনারেল সেক্রেটারি হন ব্যর্থ খিলাফত

আন্দোলনের জেহাদি সৈনিক মহম্মদ সফিক, তখন থেকেই এই ভারতের কমিউনিস্টদের কাজের দিক নির্দেশ তারা (জেহাদিরা) ঠিক করে। তারা চিরকাল 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' থেকেছে, 'ভারতীয় কমিউনিস্ট' পার্টি হয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে ১৯৬২-তে ভারতকে চীনের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে চীনের সমর্থনে এগিয়ে এসে একদল কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) ভেঙে সিপিএম তৈরি করলেও তাদের ভারত ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ও জেনারেল সেক্রেটারি ড. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস এখনো সিপিএমের পার্টি অফিসে রেখে দেওয়া। তাদের মূল নীতি হলো, স্বাধীনতার পর ভারতকে গণতান্ত্রিক রিপাবলিক না মনে করে শুধুমাত্র ভারতে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির ফেডারেল রিপাবলিক মনে করা। তাদের তদানীন্তন স্লোগান, ''ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মত্''— এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো, শক্তিশালী রাজ্য এবং দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি। যেটা হলে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতকে ভেঙে আরও টুকরো করা সহজ হতো। পাকিস্তান গঠন ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধাচরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত দেওয়া, চীনের সমস্ত ভারতবিরোধী পদক্ষেপের নিন্দা দূরের কথা, তার সঙ্গে সহমর্মিতা পোষণ করা, ভারতের যে কোন জাতীয়তাবাদী কাজের বিরোধিতা করা, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রচারের মধ্যে দিয়ে মুসলমান তোষণনীতিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সব রকম মিথ্যাচার করা— এসব করতে করতে একসময় তারা ভারত বিরোধী বাইরের ও ভিতরের রাজনৈতিক শক্তিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে। যখন জনসাধারণ তাদের কথায় ও কাজে দ্বিচারিতা এবং দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা দেখল, তখন তারা আস্তে আস্তে ভোট রাজনীতিতে এই দলটিকে রাজনীতির আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করল।

এসব তো তাদের নীতির প্রশ্ন। কিন্তু, ভারত ও হিন্দু-বিদ্বেষী এই দলটির ইউএসপি-ই এখন এদের এই দেশে অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রধান অন্তরায় হলেও এরা খালি সেটিং, কানেকশান ও ইজমের সহমর্মিতাকে ব্যবহার করে ভারতীয় রাজনীতিতে টিকে রয়েছে। এক সময় সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, তাঁর যখন কোনো বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা বুঝতে অসুবিধা হতো, তখন তিনি স্টেটসম্যান কাগজ কী লিখেছে সেটা পড়তেন এবং ওই কাগজ যা বলছে, তিনি তার বিপরীত মত গ্রহণ করতেন। এভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের মানুষ এই কমিউনিস্টদের মতের বিপরীতে চলে বলেই এরা বর্তমানে পরজীবী রাজনীতি নির্ভর হচ্ছে। সে কারণেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের বছরখানেক আগে এরা আবার অজ্ঞাত জাদুস্পর্শে তেড়েফুঁড়ে জেগে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই বছর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এই দলটির রাজ্য সম্মেলনে কি ঘোড়ার মাথা না ঘোড়ার ডিম প্রস্তাব নেওয়া হলো, তা বহু প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে বড়ো করে 'সংবাদ' করছে। সাম্প্রতিক অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে শূন্য পাওয়া এই দলের প্রচারের উদ্দেশ্য একটাই। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে এরা প্রভূত সাহায্য করছে এবং করবে।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে মিথ্যাচার ও দ্বিচারিতা ছাড়াও এদের সব নাটকের পিছনের অঙ্ক ধরে ফেলা যায়। আগামী নির্বাচনেও একই নাটক অনুষ্ঠিত হবে, শুধুমাত্র নতুন বোতলে পুরোনো মদ পরিবেশনের মত করে।

এই দলের দ্বিচারিতার আরও একটি উদাহরণ হল, দিল্লিতে আপের বিজেপির কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর এদের দলীয় দৈনিকে এরা লিখেছে যে, কংগ্রেস নাকি দিল্লিতে প্রার্থী দেওয়ায় ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে আপ (আম আদমি পার্টি) বিজেপির কাছে হেরেছে। এ একদিকে যেমন ভাবের ঘরে চুরি, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এক যুক্তি করে দিল্লিতে বিপরীত যুক্তি। যদিও কংগ্রেসের নিজস্ব ভোটের সব ভোট আপে যায়, তাহলেও দিল্লিতে বিজেপির জিততে অসুবিধা হয় না। অন্তত অঙ্ক তাই বলে। আর দিল্লিতে একদা যে দল থেকে টানা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল, সেই সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস সেখানে আপের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেখানে দলকে আপের কাছে বন্ধক রাখবে, ভোটে আপের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে না। তাহলে একই যুক্তিতে সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ইন্ডিজোট-সঙ্গী তৃণমূলকে সমর্থন করার কথা। তখন তারা কেন প্রার্থী দিচ্ছে? কারণ, তৃণমূল-বিরোধী ভোট বিভাজনের ফলে বিজেপির ক্ষতি আর তৃণমূলের লাভ। তাহলে, মহাশূন্যে অবস্থান করা সিপিএম কাদের জন্য, কাদের দৌলতে, কাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ছে? এখানেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকদের বুঝতে হবে নিজেদের সুরক্ষা এবং রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কাকে ভোট দেবেন আর কোন ভোটকাটুয়াকে পরিত্যাগ করবেন। তাদের পরিপক্কতার উপর নির্ভর করবে রাজ্যের ভবিষ্যৎ।

১৯২০ সালে তাসখন্দে জন্ম হওয়া ভারতের কমিউনিস্ট দল এবং বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বের স্বার্থের প্রয়োজনে তার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা কমিউনিস্ট দলগুলি একক বা সংঘবদ্ধভাবে কখনো দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, জন্মের একশো বছরের মধ্যেই প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক দলগুলির আনুকূল্য না পেলে তারা সর্বভারতীয় দলের তকমাটাও হারাবে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে হয়, তা হলো, ভারতের স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে যে রাজনৈতিক সাফল্য পেয়েছিল, তা নিজেরাই নষ্ট করেছে নেগেটিভ রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে।

যখন দেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল, তখন তারা সেই আন্দোলনের বিপরীত দিকে গিয়ে ব্রিটিশ

রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের বদলে গরিব, সর্বহারার নামে সাম্প্রদায়িক, হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলিম লিগকে শর্তহীন সমর্থন দিতে শুরু করল। সেই প্রথম তারা দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সরাসরি বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে চাইল। পরাধীন দেশে যত মুসলিম লিগের আগ্রাসন বাড়তে থাকে, কমিউনিস্টরাও ততই লিগের সমর্থনে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসে। এমনকী, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের মুসলিম লিগের ডাকা ডাইরেক্ট অ্যাকশানের মিটিংঙে, যেখান থেকে সুরাবর্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনরা সরাসরি হিন্দু নিধনের ডাক দিয়েছিল, সেই মিটিঙে সহযোগী দল কমিউনিস্ট পার্টি শুধু যোগই দেয়নি, তাদের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু সেদিন অক্টারলোনি মনুমেন্টের নীচে মঞ্চ আলো করে এই লিগ নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল— আগে পাকিস্তান গঠনের পর তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে, তারপর আসবে অবশিষ্ট খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন। তারা মুসলিম লিগের সঙ্গে মিছিলে গলা মিলিয়ে নারা লাগাত—''লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান''। এমনকী স্বাধীনতার পরে দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে তারা স্লোগান তুলত, ''ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্''।

তারপর এল ১৯৬২-র চীনা আগ্রসন। সে সময় সোভিয়েত রাশিয়ার দাক্ষিণ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লাফালাফি চলছে। এই আগ্রাসনের প্রশ্নে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রথম বড়ো ভাঙন দেখা দিল। এর প্রধান কারণ নেতৃত্বের সংঘাত। যেহেতু দলটি তার জন্মের শুরু থেকেই দ্বিচারিতাকে দলের বাড়বাড়ন্তের মূল রাস্তা বানাতে চেয়েছে, সেহেতু নিজেদের দেশের স্বার্থে চীন একদল নেতৃত্বলোভী কমিউনিস্টদের মগজ ধোলাই করিয়ে তাদের দিয়ে খোলা বিবৃতি দেওয়ালো যে, চীন ভারতকে নয়, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে। অবাস্তবকে সত্যি বলে চালানোর গোয়বলসীয় প্রচারের ফলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা দু'ভাগ হয়ে গেল। জ্যোতি বসু, মুজফ্ফর আহমেদের মত নেতারা কিছুদিন সীমানায় বসে জল মেপে দেখলেন দ্বিতীয় দল ভারী হচ্ছে, তখন তারা এই দলে ভিড়ে গেলেন। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বে সিপিআই এবং হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ, জ্যোতি বসুদের নেতৃত্বে সিপিএম— আড়াআড়ি দু'ভাগে ভাঙল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। তারপর এরা সোভিয়েত ও চীন, এই দুই দেশের অঙ্গুলি হেলনে ভারতীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় নাচতে লাগল। অবধারিতভাবে এমন আদর্শের দলে আরও ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ছিল। একটি বাঙ্গালি প্রবাদ মনে পড়ল। ''লঙ্কায় রাবণ মরলো, বেউলা কেঁদে রাড় হলো''। চীনে কালচারাল মার্ক্সিজমের দাপট শুরু হলো। নেতৃত্বের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইজমের দোহাই পেড়ে সমর্থন জোটানোর আশায় তাদের কলকাঠি নাড়ানোর ফল হলো, সিপিএমের চেয়ে বড়ো মার্কসবাদী হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র আবির্ভাব। এদের স্লোগান ছিল— ''চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'' ও ''ধনীর গায়ের চামড়া দিয়ে গরিবের পায়ের জুতো তৈরি হবে''। দুর্ভাগ্য আমাদের! যারা গরিব, সর্বহারার কথা বলে, তারাই সর্বহারার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য সর্বহারাকে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপনে বাধ্য করে। প্রথম স্লোগানটি সরাসরি ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিরোধী। দ্বিতীয়টি কালচারাল মার্ক্সবাদ ও মাওবাদজাত অতিবামপন্থী। রাশিয়ার 'সোভিয়েত রাশিয়া' হয়ে ওঠার জন্য যে শোষণ, পীড়ন এবং উগ্র সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত হয়েছিল, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের জাতীয়তাবোধ সেই সোভিয়েতের পতনের কারণ হলো। চীন তার জাতীয় স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দলকে মদত ও তোল্লা দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিরোধী দলে পরিণত করল। আর এই কমিউনিস্টরাও চীনের ফাঁদে ধরা দিল। যদিও এ দেশের কমিউনিস্টরা সর্বদা সর্বহারার কথা বলে, কিন্তু তারা ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমানদের সম্প্রদায়গতভাবে গরিব, সর্বহারা এবং হিন্দুদের সম্প্রদায়গতভাবে বুর্জোয়া ছাপ দিয়ে হিন্দু-নিধনে তোল্লা দেয়। ১৯৪৬-এ 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্'-এর সময় মেটিয়াবুরুজে যে দু' শতাধিক হিন্দু দিন-মজুর ও শ্রমিকদের শুধু হিন্দু হওয়ার 'অপরাধে' হত্যা করা হয়, সে বিষয়ে ভারতের কোনো কমিউনিস্ট দল একটি কথাও খরচ করেনি।

এই কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক ভুলের

কারণে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। তখন পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের কারণে এই উদ্বাস্তুদের কাছে কমিউনিস্টরা কপট সমব্যথীর মতো আচরণ করে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়। এভাবে এই তিন রাজ্যে তাদের ভোট বাক্স স্ফীত হয়— বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। কিছু ক্ষেত্রে এদেরকে দলীয় সংগঠনে তারা যুক্ত করে নেয়। তারপর মূলত এদের ভোটের দৌলতে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা বিশেষত সিপিএম গরিবের অন্ন, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বারোটা বাজিয়ে দেয় হিংস্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাড়বাড়ন্ত করতে গিয়ে। শিক্ষায় দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রশাসনিক মদতে শিক্ষার উৎকর্ষতা নষ্টের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ বিষিয়ে দেয় কমিউনিস্টরা। অর্থনীতির সকলক্ষেত্রে এবং শিক্ষায় কমিউনিস্ট রেজিমেন্টেশন প্রতিষ্ঠিত হলো। অন্যদিকে ভূমি-সংস্কারের নামে সব বড়ো জমির মালিকদের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে অসংখ্য দলীয় আনুগত্যে থাকা পেটি-বুর্জোয়া তৈরি হলো। এর দুটি অত্যন্ত খারাপ fall out হলো— ছোট জমিতে ভবিষ্যতের আধুনিক চাষবাসের পদ্ধতির প্রয়োগে অসুবিধা; দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের জমি কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার কারণে গ্রামবাঙ্গলায় জনবিন্যাসে আমূল পরিবর্তন। এই সময় থেকেই দলীয় সমর্থনে পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কেন্দ্রের কংগ্রেসি সরকার চোখ বন্ধ করে থাকে। এই বিদেশি মুসলমানদের ভারতীয় রেশন কার্ড এবং পরবর্তীতে ভোটার কার্ড তৈরিতে রাজ্যের শাসক দল সিপিএম এবং বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট সাহায্য করে। এদের সবাই হলো বাংলাদেশের নাগরিক এবং রোহিঙ্গা মুসলমান। এদের এই পশ্চিমবঙ্গে থাকতে সাহায্য করে কমিউনিস্টরা শুধু ভারতীয় হিন্দুই নয়, দেশীয় মুসলমানদের পর্যন্ত ক্ষতি করেছে। এই কারণেই দেশীয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এনআরসি কার্যকর করার আশু প্রয়োজন। পরবর্তী পর্যায়ে গোটা দেশে এই ব্যবস্থা বলবৎ করা দরকার। মনে রাখতে হবে, 'সিটিজেনশিপ কার্ড' পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় দেশে আছে। তবে ভারতের নাগরিকদের সুবিধার জন্য এই নাগরিকত্বের কার্ডের ব্যাপারে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের আপত্তি কেন? এদিকে বাম আমলে শ্রমিক ও কৃষকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান তো দূরের কথা, তাদের দলীয় ক্যাডারে পরিণত করে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধি এবং ভোটের সময় জাল, জোচ্চুরি, ছাপ্পা ভোট ও নির্বাচনী হিংসার কাজে লাগানো শুরু হলো খুব সুচারুরূপে। এতে মানুষের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ সংকুচিত হল। এর অবিসংবাদী ফল হিসেবে বামফ্রন্টের বকলমে সিপিএমের শাসন মানতে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাধ্য হলো। একের পর এক নির্বাচনে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জয়ী হতে থাকলো বামফ্রন্ট। এই কমিউনিস্টরা কয়েকটি ক্ষেত্রে কখনো তাদের লাইন পালটায়নি। প্রথমত, তারা যেকোনো ভারত-বিরোধী ঘটনা ও কাজে উৎসাহ বোধ করে। দ্বিতীয়ত, শুধু এই উপমহাদেশেই নয়, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে সব জায়গায় জেহাদিদের সমর্থন করে। এমনকী সম্প্রতি ইজরায়েল বনাম হামাস সংঘর্ষে তারা খোলাখুলি হামাসকে সমর্থন করেছে। সেখানেও অবশ্য তারা তাদের দ্বিচারিতা ও মিথ্যাচার বজায় রেখেছে। তারা হামাসকে 'প্যালেস্তাইন' বলে চালাতে চাইছে। অথচ ঘটনা হচ্ছে, হামাসের সঙ্গে প্যালেস্তাইনের ফাতাহর সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়।

কমিউনিস্ট শাসনের দ্বিচারিতায় দেখা যায় উদ্বাস্তু মেরে উদ্বাস্তু প্রেম। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে গণহত্যা এবং বালিগঞ্জে বিজন সেতুর উপর পূর্বপরিকল্পিত হামলায় আনন্দমার্গী অবধূতদের নৃশংস হত্যার মতো ঘটনা উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে ক্রমশ কমিউনিস্ট শাসকদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। যাই হোক, এটা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সৃষ্টি হওয়ার পর এই রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের যে নজর ও সাহায্য দেওয়ার দরকার ছিল, তা জওহরলাল নেহরু ও তার পরবর্তী কংগ্রেস সরকারের থেকে কখনোই পাওয়া যায়নি। উপরন্তু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিজমের নামে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় অস্মিতা যাতে যুবমানসে তৈরি না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে এই রাজ্যে জেহাদি মদত এবং হিন্দুত্বের বিরোধিতার চাষ করা হয়েছে। শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম, হিন্দুদের পূজার্চনা, হিন্দু দেবদেবীকে বিদ্রূপ করাকেই আধুনিকতার মাপকাঠি মানা হয়েছে। 'রোটি, কাপড়া অউর মকান' স্লোগান যখন কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করল, তখন কমিউনিস্টদের এই ''ভাত দে'', 'শিক্ষা দে'র ধ্যাষ্টামো ধীরে ধীরে রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ব্রিগেডে সিপিএম-এর যুব সংগঠন যেসব জমায়েত করে, সেখানে আবার ভাত দে, চাকরি দে-র ভড়ং শুরু করে। এরা কখনো বিকল্প পজিটিভ চিন্তাধারার প্রকল্প মানুষের সামনে তুলে ধরে না। অতুল্য ঘোষের চোখের সমস্যাকে কুৎসিতভাবে 'কানা অতুল্য' বলে তুলে ধরা; ইন্দিরা গান্ধীর কার্টুনে নখ, দাঁত থেকে রক্ত ঝরা ডাইনির রূপ দেওয়া; রাজীব গান্ধীকে বোফর্স গান্ধী বলে সম্বোধন করা হয়তো বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্মৃত হয়েছে। তবে বাঙ্গালি এখনো এসব ভোলেনি। ১৯৪৬-এ 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের সময় মুসলিম লিগের 'ইন্সাফ' চাওয়াকে সমর্থনকারী কমিউনিস্টদের বর্তমান ব্রিগেড ফের 'ইন্সাফ' চাওয়াকে মনে করাচ্ছে। সে সময় মুসলিম লিগের ইন্সাফ ছিল কার বিরুদ্ধে? ইংরেজ শাসক তাদের আলাদা দেশ হিসেবে স্বাধীনতা দিতে রাজি। কংগ্রেসও দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। তাহলে এই ইন্সাফের নামে

মুসলিম লিগ ও তাদের সহযোগী কমিউনিস্টদের ইন্সাফ কার বিরুদ্ধে ছিল তা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। নির্বিচারে হিন্দু হত্যাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যা ইওরোপীয় সাংবাদিকের লেখায় অব্দি উল্লেখিত। তাই ভয় হয় আবার 'ইন্সাফ'- এর নামে এরা কী চাইছে?

এখন কমিউনিস্ট শাসনের উন্নততর সংস্করণ হলো তৃণমূলি শাসন, যা রাজ্যের মানুষের প্রতিবাদের অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছে— প্রতিরোধ তো দূরের কথা। এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ১৯৮৯ থেকে ২০১৪-১৫-র কাশ্মীরের কথা। সে রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও ইসলামি দেশের সঙ্গে বিস্তৃত খোলা সীমান্ত রয়েছে। এ রাজ্যের সঙ্গে যে সীমান্ত রয়েছে তা এতদিন ছিল রাজনৈতিকভাবে অনুকূল পরিবেশে। কিন্তু গত বছর বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারকে জেহাদি অভ্যুত্থানের দ্বারা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাচ্যুত করে, আর্থিক ও লজিস্টিক সাহায্যের মাধ্যমে ভারত-বিদ্বেষী মহম্মদ ইউনুসকে ক্ষমতায় বসিয়েছে গ্লোবাল ডিপ স্টেট। বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেখানে ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু-বিতাড়ন পর্ব শুরু হলেও ভারতের কমিউনিস্টরা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। কারণ ওই একটাই। সেই মহম্মদ সফিকের সময় থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক লাইন হলো, তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষ এবং ভারতের ক্ষতি ও পাকিস্তানকে মদত।

গত ২২ এপ্রিল ঘটে যায় পহেলগাঁও কাণ্ড। সেখানে যখন ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে পাকিস্তানি লস্কর জঙ্গি এবং তাদের কাশ্মীরি সঙ্গীদের দ্বারা নিহত হতে হয়, সে সময় পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলে বসে একজন পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞ উর্দুতে বলেছিলেন, কাশ্মীরিয়তের এবং ৩৭০ ধারার প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে অনেক ভারতীয় আছেন, যেমন অরুন্ধতী রায়, মমতা ব্যানার্জি। এরই সঙ্গে তিনি কংগ্রেস দল এবং ভারতের কমিউনিস্টদের নাম বলেছিলেন। কনসার্টেড মিথ্যাচার ও দেশদ্রোহিতার সঙ্গে এরা যে ইসলামি জঙ্গিদের গেস্টাপো বাহিনী হিসেবে এখনো কাজ করে চলেছে, তা দেশের ১৪০ কোটি মানুষের কাছে পরিষ্কার।

ছোটবেলায় শোনা একটি স্লোগান মনে পড়ে গেল, 'চীনের কাস্তে-হাতুড়ি, পাকিস্তানের তারা, এখনো কি বলতে হবে দেশের শত্রু কারা'। কমিউনিস্টদের থেকে দেশকে মুক্ত করার সুহার্তো দাওয়াই আধুনিক ইন্দোনেশিয়ার স্থিরতা ফিরিয়ে এনেছিল। সেটিই কমিউনিস্টদের জন্য সঠিক দাওয়াই। কমিউনিস্ট-মুক্ত ভারত না হলে জেহাদি ও পাকিস্তানপন্থী 'ফিফথ্ কলাম' বা পঞ্চম বাহিনী দেশকে কখনো সুস্থ থাকতে দেবে না। এদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচার শুনে স্বয়ং গোয়েবলস পর্যন্ত কবরে পাশ ফিরে শুয়েছেন।

With Best Compliments From -

W L

Willowood Chemicals Limited

With Best Compliments
from -

A
Well Wisher

গৌরব

গার্গী দেব

জ্যৈষ্ঠের ভরা দ্বিপ্রহর। গনগনে রোদ যেন আগুনের ভাটা। অ্যাসবেস্টাসের চারচালা ছোট্ট বাড়িটার পাশে উঠানে আমগাছটার ছায়ায় বসে রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছিল বুধিয়া সোরেন। রাজমিস্ত্রিরা একের পর এক কেমন ইটগুলো গাঁথছে, আবার ওলোন ঝুলিয়ে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে ঠিক সোজা হচ্ছে কিনা। ইট তো গাঁথছে না, যেন স্বপ্নের ইমারত গাঁথছে। সবই তো ওই একমাত্র খোকাটাই যা করছে। না হলে বুধিয়ার কি সাধ্য ছিল রাজমিস্ত্রি লাগায়? মাটির বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দুঃখে বুধিয়ার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। অ্যাসবেসটস তো সেদিন হলো। এর আগে তো ছিল দরমার বেড়া দেওয়া খড়ের ছাউনি। আহা! দীর্ঘ তিরিশ বছর ওই

দীনহীন বাড়িই তিনটে প্রাণীকে আশ্রয় জুগিয়েছে গ্রীষ্মে-বর্ষায়। আজই না হয় ইমারতের স্বপ্ন দেখছে, কোঠাবাড়ির আশা করছে সে। ওর তিনকুলে কেউ ভাবতে পেরেছিল কি? সাহস ছিল কি তাদের?

রাজমিস্ত্রিরা বিশ্রাম করতে করতে চলতি হিন্দি গানের সুর ভাঁজতে থাকে। এরমধ্যেই বেশ অনেকটা গাঁথা হয়ে গেছে ওদের। রাজমিস্ত্রিদের হাতের প্রশংসা করতে হয় বটে। নিজের শিরা ওঠা দুই শীর্ণ হাত দুটো মেলে পরখ করে বুধিয়া। হায় রে, খেটে খাওয়া মানুষের হাত তো এমনই হয়—রুক্ষ, কর্কশ, চামড়া ওঠা। এই হাতেই তো লাঙল, বলদ, কোদালে জমি কুপিয়েছে। মসৃণ হাতের স্বপ্ন দেখাও যেন ওদের পাপ। মাটির গল্প ওদের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে।

দুপুরের রুক্ষ বাতাসে উড়ছে লালমাটির ধুলো, গাছের শুকনো পাতা। অনেক দূরে একটা কাঁঠালগাছের ডালে বসে একটা দাঁড়কাক একটানা কা-কা করে ডেকে যাচ্ছে।

বুধিয়ার মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে। দীর্ঘ তিরিশটা বছর ভুবন দাসের জমিতে চাষ করেছে সে। বাবুলোক খারাপ নয়, টাকাপয়সা, ভাগের ধান মোটামুটি দিয়ে এসেছে। তাতেই পেটগুলো কোনোরকমে চলত। গরিবের ঘরে চাঁদপানা খোকাটা এসেছিল। সবাই বলত---রাজপুত্তুর। ছোটোবেলা থেকে একরত্তি ছেলেটার কী বুদ্ধি, কী সাহস! ছোটো ছোটো হাত দুটো যতটা পারে বিস্তৃত করে বলত—'দেখবে, এই এত্তবড়ো বাঘ আমি তোমাদের ধরে এনে দেব।' শুনে সকলের কী হাসি। মনে করে বুধিয়ারও ষাট বছরের ফোকলা মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সেসব কত কালের কথা।

গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার যতীনবাবু বলেছিলেন— 'ছেলেকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করে দে। বড়ো হয়ে ভবিষ্যতে তোদের নাম রাখবে।"

কষ্টে-সৃষ্টে মাস্টারমশায়ের হাতেই ছেলেকে তুলে দেয় সে। মাস্টারমশাই-ই নাম রাখেন, গৌরব সোরেন। জীবনে স্কুলের কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় না হয়ে নামের মর্যাদা রেখেছিল সে। গৌরব, বুধিয়ার গৌরব, গোটা গ্রামের গৌরব। একের পর এক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শেষে সরকারি পরীক্ষায় পাশ করে শহরে নামকরা স্কুলে গণিতের শিক্ষক রূপে যোগদান করে। আর সেটাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত। আদর্শ শিক্ষক রূপে ছাত্রদের পড়ানো, সমাজ গড়া।

মাত্র পাঁচবছরেই গৌরব সোরেন দারুণ জনপ্রিয়, খুব প্রিয় ছাত্রদের কাছে, সহকর্মীদের কাছে। তার পড়ানোর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

রাতে খেতে বসে গৌরবই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে—'বাবা, অনেক কষ্ট করেছ। আর কেন? পুরানো দেওয়াল খসে পড়ছে। মাটির মেঝেতে ইঁদুর গর্ত করছে। এসব ছাড়ো। আমি তোমাকে নতুন পাকাবাড়ি তৈরি করে দেব।' খুশিতে বুধিয়ার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—'সত্যি খোকা? সত্যি বলছিস, আমাকে বাড়ি বানিয়ে দিবি?' পরে অস্পষ্ট স্বরে বেদনার সঙ্গে বলতে থাকে— 'আমার যে অনেকদিনের স্বপ্ন, খোকা। বুড়া মা-রে এবার আমি দ্যাশ থেকে লিয়া আসব। নিজের ঘরে রাখব। তুই আর দেরি করিস না রে খোকা। তবে চালাঘরটা আমার তরে রাখিস।'

ইচ্ছেটা গৌরবের মনে অনেকদিনই ছিল, এখন তাগিদটা আরও জোরালো হয়ে উঠল। স্কুলের বেতন ভালো থাকায় ব্যাংকের লোন পাওয়াও সহজ হলো। তাদের পাঁচকাঠা জমির মধ্যে তিনকাঠার ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ির প্ল্যান সরকারি অনুমোদন পেয়ে গেল। সবই বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ। শুভদিনে ভিতপূজা সেরে বাড়ি শুরু হয়ে গেল। সামনের বর্ষা আসার আগেই বাড়িতে ঢুকে পড়তে হবে, নাহলে ও বাড়ির যা অবস্থা, বৃষ্টির তোড়ে ভেঙে না পড়ে।

—'ও দাদু, পাঁচটা বাজল। আমাদের ডিউটি খতম। এবার আমরা বাড়ি যাচ্ছি। বাবুকে বলবেন, কাল দশ বস্তা সিমেন্ট লাগবে, আর স্টোনচিপস্ তিন বস্তা।' শিস্ দিতে দিতে সাইকেল নিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়।

পাড়ার বন্ধু হারান মণ্ডল রায়পুকুরের দিকে গামছা কাঁধে এগিয়ে যাচ্ছিল। বুধিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।— 'বেশ রে বুধো, দারুণ বাড়ি তুলছিস, ভাগ্যটা তোর খুব ভালো, ভোগ কর রে বুধো, ভোগ করে নে।'

—'আমার কোনো যশ নাই রে হারান। সবই ওই খোকা।'

—'সত্যিই তুই সোনার বেটা পেয়েছিস রে বুধিয়া।'

স্কুলে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা চলছে। গৌরব অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগেই স্কুলে পৌছাল। ত্বরিত হাতে প্রশ্নপত্র আর উত্তরপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল। ক্লাস ফোর স্টাফ বরুণ এসে বলল—'গৌরববাবু, হেড মাস্টারমশাই আপনাকে তাঁর ঘরে দেখা করতে বলছেন।' কিন্তু, পরীক্ষা শুরু হতে তো বেশি বাকি নেই। চিন্তিত মনে গৌরব একতলার দিকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।—'আসব স্যার? আমায় ডেকেছেন?' গৌরবের দিকে একপলক তাকিয়ে হেডস্যার নীরবে একটা খাম তার দিকে এগিয়ে দেন।—'কী আছে এতে?' গৌরব কৌতূহল প্রকাশ করে। —'তুমিই দেখ, গৌরব। আই অ্যাম ভেরি সরি।' কী এক যেন অশনিসংকেতে ওর মনটা কেঁপে উঠল। নিমেষে খামটা খুলে পড়তে লাগল—'Regret to inform you that you are suspended from you job as per Court order till further procedure.....'

একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গৌরবের পায়ের তলাটা যেন দুলে উঠল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে ধপ্ করে সামনের চেয়ারের উপর বসে পড়ল সে, বাষ্পরুদ্ধ হতাশ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'কিন্তু, কেন স্যার? আমার কী দোষ? আমি তো পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেই চাকরি পেয়েছি, আমি....

বাকি কথাগুলো সে উচ্চারণ করতে পারে না। গলার কাছে একটা দলা পাকানো কান্না তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে ধূসর মাঠটার দিকে। ফ্ল্যাশব্যাকের মতো একের পর এক অপস্রিয়মাণ—ব্যাংকে তার হোম লোন, লিন্টেল পর্যন্ত ঢালাই করা তার নতুন বাড়ি আর বুধিয়া সোরেনের নতুন বাড়ির জন্য স্বপ্নভরা দুটো উজ্জ্বল চোখ।—'খোকা, সত্যিই তুই নতুন বাড়ি বানিয়ে দিবি? খোকা, তুই যে আমাদের গৌরব!' □

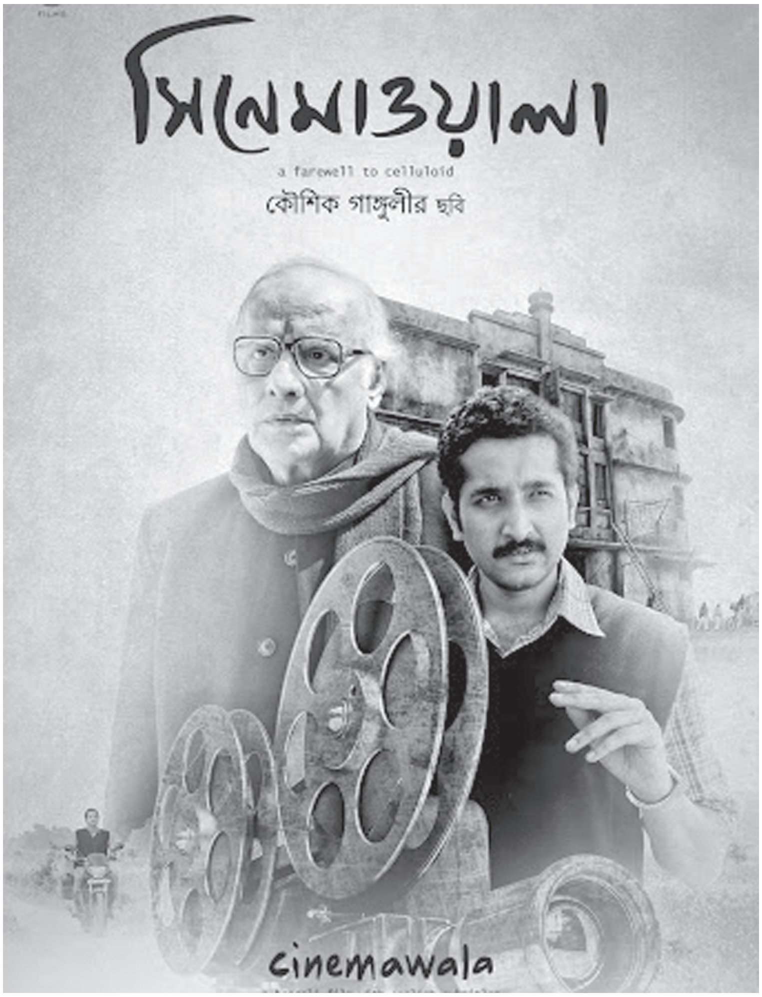

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'সিনেমাওয়ালা' ছবির পোস্টার।

প্রেক্ষাগৃহহীন বাংলা ছবি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পহেলগাঁও পরবর্তী আধা যুদ্ধকালীন একটি সপ্তাহ এবং দেশের নিরীহ পর্যটকদের ওপর নির্মম জেহাদি আক্রমণের রেশ যখন দেশবাসীকে মানসিকভাবে গনগনে আগুনের ওপর বসিয়ে রেখেছে, সে সময় দেশের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন সমান উদ্বিগ্ন এবং দেশবাসীর মৃত্যুতে অধীর। ২২ এপ্রিল ২০২৫-এর গণহত্যা পরবর্তী পর্যায়ে ২৪ এপ্রিল বিহারের মধুবনী জেলায় একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁর মুখাবয়বে ফুটে ওঠা প্রতিক্রিয়া

দেখে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি কারও। এরপরই ১৫ দিনের মাথায় দেখা গেল ভারতের পরাক্রম। সেটা কেমন, কীরকম বা তার ফলশ্রুতি এসব এখন আলোচ্য নয়। কিন্তু তার অভিঘাত যে কত নির্ভুল ও নির্ণায়ক হয়েছিল তা একটি আপাত অসংশ্লিষ্ট কারণের মাধ্যমে বেরিয়ে এল।

প্রধানমন্ত্রী এই সামরিক প্রত্যাঘাতটির একটি অব্যর্থ নাম দিয়েছিলেন 'Operation Sindoor'। অর্থাৎ প্রত্যাঘাতটির নাম ছিল মর্মস্পর্শী। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা মহিলাদের সিঁদুর মুছে দেওয়ার বীভৎস উন্মাদনায় তাঁদের স্বামীদের মাথায় গুলি করেছিল। বিষয়টা নিতান্তই জান্তব মানসিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে কেঁপে উঠেছিলেন প্রধানমন্ত্রীও। তাই প্রতিশোধের অভিযানের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'সিঁদুর'। সিঁদুর যখন কেড়ে নিয়েছ তখন দেখো সিঁদুরের জোর কত। সন্ত্রাস পীড়িতদের প্রতি ন্যায়বিচার এবং জেহাদিদের উপর প্রত্যাঘাতের সংমিশ্রণের নির্যাস এই সামরিক প্রত্যাক্রমণ।

বিষয়ান্তরে বাংলা সিনেমার দুর্দশা, প্রেক্ষাগৃহের অভাবে তার প্রদর্শনজনিত করুণ পরিণতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে সম্প্রতি নানা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যতই অকিঞ্চিৎকর করে আজকের তথ্যনিষ্ঠ ও সমাজ-সম্পৃক্ত ছবিগুলিকে দেখা হোক না কেন তাদের আপামর আকর্ষণকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সে কথায় পরে আসছি। গত ১১ মে'র টাইমস অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রের একটি পৃষ্ঠার অর্ধেক অংশ জুড়ে ছিল 'সিঁদুর'-এর রক্ত রং।

''Film producers' associations get an overwhelming number of applications for the title sindoor''— দেখুন এই সুযোগসন্ধানীরা দেশবাসীর নাড়ী ঠিক জায়গায় ধরেছে। সারা ভারত যখন উদ্বেল তখন 'সিঁদুর' প্রত্যাঘাতের সাফল্যে।

দক্ষিণের বিখ্যাত জেপি দত্ত ব্যানারে যে সব বড়ো বড়ো ছবি প্রযোজিত হয় তাঁরা এই নামটি পেটেন্ট করে নিতে চাইছে। ইতিমধ্যেই জনা পনেরো আবেদনকারীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে নামটা কার কপালে শিকে ছিঁড়বে? দেখুন, সিনেমার জোর বা মাহাত্ম্য। প্রযোজকরা বলছেন যখনই কাউকে মুখবন্ধ খাম নিয়ে অফিসে ঢুকতে দেখছেন, তাঁকে বলছেন ''কি ব্যাপার? 'Operation Sindoor বা Mission Sindoor' যদি হয়, তো ঘাবড়াবেন না। আপনার আগে এক দল কড়া নাড়ছে।'' দক্ষিণের এক প্রযোজক তো ইতিমধ্যেই 'সিন্দুর এক জঙ্গ' (লড়াই) নামও ঠিক করে ফেলেছেন, তবে অনুমোদনের অপেক্ষা।

প্রযোজকদের তরফ থেকে খুবই আন্তরিকভাবে বলা হচ্ছে এই প্রচেষ্টা কিন্তু সর্বতোভাবে আমাদের দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের কারণেই। দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি তাঁদের অগাধ সম্মানের কথাও তাঁরা বলেছেন। সে কারণে সুযোগসন্ধানী কথাটা সর্বার্থে গ্রহণীয় নিশ্চয় নয়। একই অঙ্গে এত রূপের মতো নানান প্রযোজকরা 'সিন্দুর কা যুদ্ধ', 'অপারেশন সিন্দুর', 'সিন্দুর দ্য রিভেঞ্জ', 'অপারেশন সিন্দুর জয় হিন্দ' ইত্যাকার নামের অঢেল স্বপ্নে মগ্ন। বিষয়টা প্রমাণ করে সিনেমায় কেবলমাত্র কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দর্শককে বীভৎস উত্তেজনায় চমকে দেওয়াই শেষ কথা নয়। দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মানেই দীর্ঘকালীন সার্থকতা।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে এখন কি দর্শকের ভালা লাগার উপকরণ সংবলিত জীবনমুখী কোনো বিষয়ই পর্দায় বিচ্ছুরিত হয় না? হয়, সংখ্যায় কম হলেও তা সীমাবদ্ধ থাকে বিপুল খরচসাপেক্ষ 'মল'গুলির বৈভবের মধ্যে। অনেক সময়ই নিবিড় মনঃসংযোগ ও আবেগসঞ্জাত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি নিয়ে পরিচালকের পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশন চিত্রগৃহের পারিপার্শ্বিক আড়ম্বর ও দর্শককুলের নির্দিষ্ট উপভোগস্পৃহার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই হারিয়ে যায়। এখানে মানসিক অনুশীলনের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণও একই সঙ্গে চলে। অতীতের সেই আলো-অন্ধকারময় ঘরোয়া, পরিচিত পরিবেশের মায়াপুরীর অদৃশ্য আলিঙ্গন আর অনুভব করা যায় না। সিনেমা প্রদর্শন ও দর্শক চরিত্র (এখানে যে দর্শক সিনেমা অনুরাগী, বা চলচ্চিত্রপ্রেমী হিসেবে সিনেমা দেখতে যান এবং সিনেমা দেখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাদের প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে) অতীতচারিতা বা স্মৃতিমেদুরতা সকল মানুষের মধ্যেই চলমান থাকে। শুধু তাকেই বিষয় করা নয়। বিষয় অতীতকে ফিরে দেখার আকাঙ্ক্ষা। বিশ্ব সিনেমায় এই প্রয়োজন দীর্ঘদিন আগেই ধরতে পেরেছিলেন প্রখ্যাত হলিউড পরিচালক আমেরিকান মার্টিন স্করসিস। তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তৈরি করেছিলেন TFF (The Film Foundation)। স্করসিস একান্ত চেষ্টায় বেছে বেছে বিশ্বের যুগান্তকারী ছবিগুলিকে বিপুল খরচে পুনরুদ্ধার করা শুরু করেন। ভারতের তরফে অনেকদিনই যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট সিনেমাপ্রেমী, Film Heritage Foundation-এর মহেন্দ্র সিংহ দুঙ্গরপুর। এখন ভরপুর ছবি বেরোচ্ছে ৮০ ঊর্ধ্ব শর্মিলা ঠাকুর, সিমি গ্রেওয়াল, সৌমিত্রবাবুদের। ৫৫ বছর আগে ১৯৭০ সালে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র ফ্রান্সের অভিজাত ও চলচ্চিত্র কৌলীন্যে পথিকৃৎ Cannes (কান) চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ মর্যাদায় পুনরুদ্ধৃত সংস্করণের প্রদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৪ থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসপঞ্জী নির্মাণ করলে তার মধ্যে দেখা যাবে বিভিন্ন ওজনের, চিন্তনের মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু শোনা গেছে যে, আর প্রদর্শন যোগ্য নয়। এর মধ্যে একেবারে প্রথম দিকের হীরালাল সেন, দেবকী বসু প্রমুখের মতো বহু দিকপাল মানুষের চলচ্চিত্র কর্মও রয়ে গিয়েছে। সিনেমাপ্রেমীরা ইচ্ছে থাকলেও সেগুলির আর ছোঁয়া পাবেন না। এ প্রসঙ্গে মনে হয় অর্থের অভাব বড়ো বিষয়। কিন্তু আমরা তো museum (মিউজিয়াম) করে অনেক পুরনো স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যত্নে সংরক্ষণ করি। কয়েক হাজার ছবির মধ্যে কয়েকশো ছবিকে এ বিষয়ে কৃতবিদ্য, পারদর্শী মানুষদের নিরীক্ষণ সাপেক্ষে কি ধরে রাখা যায় না? আমাদেরই অতীত ইতিহাস তো ধরা থাকবে।

আজকে ভাবতে বিষণ্ণ লাগে যে, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, এমন কী উত্তম কুমার অভিনীত 'শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক', 'মনের ময়ূর' প্রভৃতি ছবিও আর দর্শনগ্রাহ্য নয়।

শুধু বইকে ঝেড়ে ঝুড়ে র‍্যাকে তুলে রাখা নয়। সরকারের কোটি কোটি টাকা নানাভাবে অপব্যয় হয়। উৎসুক মানুষ যদি তার পূর্বপুরুষদের জীবনচর্যায় পরিধেয়, লোকাচার, সংস্কৃতির বহমানতা যা সত্যনিষ্ঠভাবে বহু চলচ্চিত্রের রিলগুলির মধ্যে চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে তাকে দেখতে বা জানতে চায়, তবে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় অন্তত একটি প্রেক্ষাগৃহে অর্থকরী ক্ষতি হলেও সেগুলির প্রদর্শন কি নিতান্তই অসম্ভব? অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্রে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। তাই এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ রয়েছে।

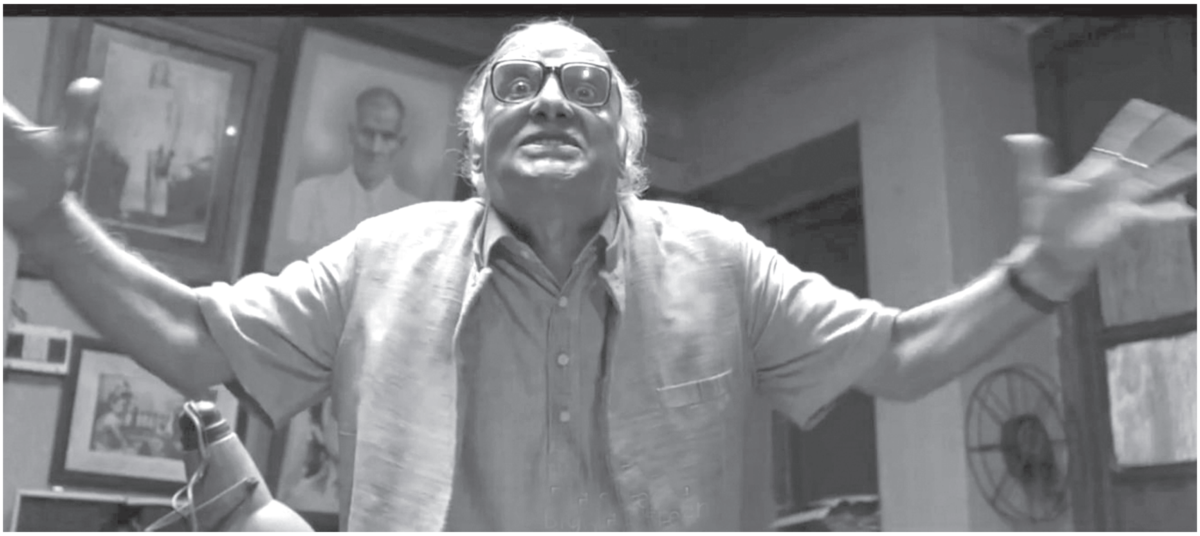

'সিনেমাওয়ালা' ছবির একটি দৃশ্য।

এই রাজ্যের বহু জেলায় অসংখ্য প্রেক্ষাগৃহ ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গেরই এক যশস্বী পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৫ সালে তিনি নির্মাণ করেছিলেন অত্যন্ত মননশীল এক ছবি 'সিনেমাওয়ালা'। সেখানে কোনো রূপবান নায়ক বা প্রখর রুদ্র ধরনের গোয়েন্দাও ছিল না। নায়িকা তো নয়ই। আপন মুন্সিয়ানায় তিনি অনবদ্য অভিনেতা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার করেছিলেন। আদ্যন্ত সিনেমাপ্রেমিক পরানের একটি গ্রামীণ সিনেমা হল ছিল। সেটি অবশ্যই এক পর্দার। কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে সেই প্রেক্ষাগৃহে ছবির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন পরানের কথায় 'রূপকথার রাজপুত্তুর উত্তম কুমার'। এই সিনেমার একটি দৃশ্যে প্রজেক্টর চালক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু একটু তির্যক মন্তব্য করায় তাকে প্রায় মারতে ওঠেন তিনি।

অধিকাংশ মানুষের পরিবার-পরিজন সন্তানসন্ততি নিয়ে জীবন পরিক্রমা চলে। কিন্তু আজকাল অনেকেরই ছেলে-মেয়েরা বিদেশে তথাকথিতভাবে সেটলড্ বা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। অভিভাবকদের প্রাথমিক গর্বের পরিসরটি ক্রমে এক অসহ্য মানসিক চাপ ও নিঃসঙ্গতা তৈরি করে। সে সময় অনেকেই কৈশোরের পুস্তকপ্রীতি, কেউ-বা গান শোনার অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনেন। নিঃসঙ্গতা দূর করতে 'সিনেমা' এক অন্যতম মাধ্যম যা মানুষের খারাপ সময়ে মনকে সমবেদনার প্রলেপ দিয়ে যায়। অনেকেই জানেন যে PVR আর OTT-র সঙ্গে সাধারণ চলচ্চিত্রপ্রেমীর এক পর্দার অভ্যস্ত খরচে সিনেমা দেখা দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গে এক পর্দার প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ৭৫০ থেকে ২৫০-এ নেমে যাওয়ার কারণে ২০১৫ সালে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছবিটিকে যেন এই ক্রমহ্রাসমান প্রেক্ষাগৃহগুলির উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছিলেন। সেটি চলচ্চিত্র প্রেমের এক অভিনব নিদর্শন। আজ সেই সংখ্যার নিম্নমুখী অভিযান আরও বেগবান হয়েছে। 'সিনেমাওয়ালা' ছবিটিতে প্রেক্ষাগৃহের অবশ্যম্ভাবী বিলয়ের হতাশায় প্রেক্ষাগৃহের মালিকের (মালিকের চরিত্রে অভিনয় করেন পরান বন্দ্যোপাধ্যায়) আজীবন সাথী প্রজেক্টর অপারেটর প্রজেক্টর বিক্রির পর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এর পরই একটি মর্মভেদী আর্তনাদ করেন পরান। তিনি যেন এক আপোশহীন 'সিনেমাওয়ালা'। হ্যাঁ, এক পর্দার (single screen)। এর পরই মনের অর্ন্তলীন বেদনায় আক্রান্ত ও অবশ্যম্ভাবী প্রেক্ষাগৃহ বিনাশের যন্ত্রণায় পরান নিজের সিনেমা হলে নিজেই আগুন ধরিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তিনি এক পর্দার অলঙ্ঘ্যতা থেকে সরেননি। এই অসাধারণ ছবিটি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এমন দুঃসাহসিক ছবিটি দেখার সুযোগ খুব কম বাঙ্গালিই পেয়েছেন কেননা 'নন্দন' ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। অন্য প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বেশিরভাগ কমার্শিয়াল ছবি চলে। আর আগেকার মতো দেওয়ালে খবর দিয়ে পোস্টারও মারা হয় না। আমরা খুবই আলটপকা মন্তব্য করে থাকি যে, আজকালকার বাংলা ছবি কহতব্য নয়। কথাটা আংশিক সত্য মাত্র।

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত
'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াছবির একটি দৃশ্য।

আজকের কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় আশ্চর্য দক্ষতায় ঋত্বিক ঘটককে নতুন প্রজন্মের বাঙ্গালিকে চিনিয়েছেন। ঋত্বিকের ছবি তো মাত্র ৮টি। সেগুলি কে আর দেখাবে তাই পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঋত্বিক ও তাঁর চিত্রকর্মকেই গভীর নৈপুণ্যে ও ভালোবাসায় চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। কিন্তু যাদের জন্য করা তারাই দেখার সুযোগ পেল না। প্রেক্ষাগৃহ কই? কমলেশ্বর বলেছেন যে, দক্ষিণের ডাব করা ছবি বাঙ্গালি, হিন্দীভাষী দর্শকরা দেখছেন। দক্ষিণের ছবি সংলগ্ন চারটি রাজ্যে বাজার পায়। সেখানেও মননশীল ছবি তৈরি হয় যা বাঙ্গালি চায়। পরিচালক বাংলা সিনেমাকে বাঁচাতে অনেক হল তৈরির কথা বলেছেন। তাঁর কথায় বহু রাজ্যেই নিয়ম আছে সেখানে যে সিনেমা তৈরি হবে তা নিজ রাজ্যে নির্দিষ্ট সময় বাধ্যতামূলকভাবে চালাতে হবে। প্রশ্ন আসে, এক পর্দার ছবিঘর নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে কি? অথচ আমরা অনায়াসে ভুলে যাই এই বাংলা সিনেমার এক মহীরুহসম পরিচালক বিশ্বের দরবারে সর্বোত্তম চলচ্চিত্র স্বীকৃতি 'অস্কার পুরস্কার' দেশে নিয়ে এসেছিলেন। ভিডিয়ো সিডি বা DVD-তে সিনেমা দেখার পথও সিনেমাপ্রেমী মানুষদের কাছে বন্ধ। ভিসিআর এবং সিডি-ডিভিডি প্লেয়ারগুলির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুরনো ছবির ভিডিয়ো ক্যাসেট বা সিডি আর পাওয়া যায় না। পুস্তকপ্রেমী তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনকে লেখাপড়া করে যান, কিন্তু পড়ে থাকে তাঁর আমৃত্যু লালিত স্নেহের বইগুলি। জীবনের প্রান্তবেলায় এগুলির পাতাই তাঁকে যেন ICU থেকে বার করে আনে। ব্যক্তিগত আলাপে কয়েকজনের কাছে জেনেছি এই আপাত প্রয়োজনহীন অথচ এই মানুষটির কাছে মননের অংশবিশেষ পুস্তক বিচ্ছেদের কথা তাঁরা মুখেই আনেন না। এই নিঃসঙ্গ সঙ্গীর (অর্থাৎ বইগুলি সম্পর্কে) আলোচনার সময় তাঁদের একজনের চোখদু'টি মায়াময় হয়ে উঠছিল।

একটি প্রশ্ন থেকে যায়। বইগুলি ইচ্ছে করলে পড়ার চেষ্টা করা যায়। সঙ্গীত রসিক রসভাণ্ডার ফোনে টেপ করে ভবিষ্যৎ শ্রবণকে নিশ্চিত করতে পারেন। ক্রীড়াপ্রেমী মাঠে ঘুরতে পারেন। কিন্তু একসঙ্গে ৫০০ বা ততোধিক মানুষের একই আনন্দ-বেদনায়, 'দুঃখ সুখের এপারে ওপারে' যাত্রার অংশীদার হওয়া অকল্পনীয়। অমিতাভ বচ্চন একবার বলেছিলেন একটি চিত্রগৃহের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত একদল মানুষ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বসে স্থিরদৃষ্টিতে একই আবেগের সঙ্গী হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। এ প্রেক্ষাগৃহ ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। এটি একটি যূথবদ্ধ আনন্দ নিকেতন।

সবই ঠিক আছে, কিন্তু সরকার নতুন হল নির্মাণের টাকা দেবে না। বচ্চনজীর মতো আরও বহু কোটিপতি, নিযুতপতি আছেন যাদের সমগ্র জীবন ও প্রতিষ্ঠা আবর্তিত হয়েছে এই প্রেক্ষাগৃহে সাময়িক অন্তরীণদের অর্থানুকূল্যে। তাঁরা সিনেমার সংলাপ ছেড়ে 'এক পর্দা'কে বাঁচাতে একটু যাকে বলে হাত খুলুন না। তাঁদের বদান্যতায় crowd funding-এও অনেকেই এগিয়ে আসবেন। না হয় খরচটা জলেই যাবে। তবু 'হাসি কান্নার দোল দোলানো' যে পালার কাছে থেকে তাঁদের যে রম্য জীবন অট্টালিকা আক্ষরিক অর্থে নির্মাণ করেছেন তার প্রতি মমত্ববোধ বা ঋণ বললেও ভুল বলা হবে না। সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা একবার হাত দিতে পারেন। যতই PVR, OTT হোক না কেন তার সঙ্গে প্রাচী সিনেমার বাংলায় লেখা টিকিটে 'অলিন্দ'-এ বসে রাগ-অনুরাগের যে প্রহর কেটেছিল তা চিরকালীনভাবে বিলীন হয়েছে। তাই প্রত্যেক জেলায় একটি করে হলে পুরনো ও একেবারে নতুন ছবি মিলিয়ে অন্তত এক সপ্তাহ করে চালাবার সুযোগ করে দিলে ক্ষতি হবে না। কয়েকটি প্রজন্ম আপনাদের নিষ্ক্রিয় কিন্তু সংবেদনশীল লীলাসঙ্গী হতে পারবে।

PVR, OTT, আর এক পর্দার প্রেক্ষাগৃহে একই জিনিস বিতরিত হয়। কিন্তু সাদা হলেও নুন, চিনি, ময়দা নিশ্চিতভাবে এক নয়। এটা জানলেই মঙ্গল। তবে 'জানার কোনো শেষ নাই। জানার চেষ্টা বৃথা তাই' (সত্যজিৎ রায়)।

ভাগ্য বিড়ম্বিত মহাবীর–দানবীর কর্ণ

গোপাল চক্রবর্তী

মথুরার যদুবংশে শূরসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁর অনেক সন্তান ছিল। পিতৃস্বশ্রীয় ভ্রাতা নিঃসন্তান কুন্তি ভোজ শূরসেনের কাছে একটি সন্তান প্রার্থনা করলে তিনি অসামান্য রূপবতী ও সর্বগুণ সম্পন্না কন্যা পৃথাকে দুহিতৃ রূপে দান করেন। কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা, তাই পৃথার নাম হয় কুন্তী। শৈশব থেকেই কুন্তী সর্বকর্মে নিপুণা ও দায়িত্বশীলা। ভোজরাজের প্রাসাদে নিত্য অতিথিদের আগমন, তাঁদের মধ্যে মুনিঋষিদের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার উগ্রতপা। অতিথি সেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়, তাই ভোজরাজ কন্যা কুন্তীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

বালিকা কুন্তীর সেবাযত্নে অতিথিরা পরমপ্রীত এবং চতুর্দিকে রাজার জয়জয়কার। এমনি ভাবেই চলছিল অতিথি সেবা। এই সময়ে একদিন অতিথি রূপে এলেন মহাক্রোধী মুনি দুর্বাসা। সমস্ত প্রাসাদ ত্রস্ত। কিন্তু বালিকা কুন্তী নির্বিকার যথাযথভাবে অতিথি দুর্বাসার সেবা করে চলেছে। প্রথমে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে মুনিকে বরণ করা হলো। আপন হাতে মুনির পদ প্রক্ষালন করল। চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দিয়ে মুনির ভোজন সমাপনের পর তাঁকে রত্নময় খাটে উত্তম শয্যায় শয়ন করানো হলো। বালিকা কুন্তী সর্বদা করজোড়ে মুনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কখন তাঁর কী প্রয়োজন হয়। দুর্বাসা বেশ কিছুদিন কুন্তীভোজের প্রাসাদে হৃষ্টমনে অবস্থান করলেন। বালিকা কুন্তীর সেবা সেবাযত্নে মুনি পরম প্রীত। বিদায়কালে তিনি কুন্তীকে নিভৃতে ডেকে বললেন—

—আমি তোমাকে একটি গোপন মন্ত্র দিচ্ছি, এই মন্ত্র জপ করে তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে তিনি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে আগমন করবেন।

দুর্বাসা কুন্তীর কানে এক গূঢ় মন্ত্র প্রদান করে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। দুর্বাসা চলে গেলেন কিন্তু বালিকা কুন্তীর মনে এক পরম কৌতূহল—মুনির দেওয়া এই গোপন মন্ত্র সত্যিই কার্যকর হবে কিনা? এই কৌতূহল নিরসনের জন্য একদিন নিভৃতস্থানে কুন্তী ওই মন্ত্র জপ করে দেব দিবাকরকে আহ্বান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানটি আলোকিত হয়ে গেল, কুন্তীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন সূর্যদেব। সেই আলোকময় মূর্তি দেখে কুন্তী মূর্চ্ছিতা হলেন। সূর্যের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলো কুন্তীর। তিনি ভীত কণ্ঠে বললেন—

—হে দেব! শুধুমাত্র কৌতূহল বশে, মহর্ষি দুর্বাসার মন্ত্র পরীক্ষা করার জন্য আমি আপনাকে আহ্বান করেছি। আমাকে মার্জনা করবেন।

সূর্যদেব স্মিতহাস্যে বললেন—হে কন্যা, দুর্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র বলে এবং তোমার আহ্বানে আমার আগমন হয়েছে। এই আগমন কদাপি বিফল হতে পারে না। তুমি আমাকে ভজনা করে পুত্রবর নাও। আমাকে ভজনা না করলে মুনির এই মন্ত্র নিষ্ফল হবে।

ভীতা কুন্তী করজোড়ে সূর্যকে বললেন—হে দেব, হে নাথ! আমি বালিকা, অনূঢ়া, এই অবস্থায় তোমার ভজনা করলে সংসারে আমার অপযশ হবে। গর্ভধারণ করলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না।

—কুন্তী, তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ। আমাকে ভজনা করলে তোমার কোনও অপযশ হবে না। তুমি গর্ভধারণ করে সন্তান প্রসব করবে কিন্তু তোমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই বলে দিবাকর সলাজ কম্পিত কলেবর তরুণী কুন্তীকে আলিঙ্গন করে তাকে পুত্রবর দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করলেন। কুমারী কুন্তী হর্ষ-বিষাদে ভাসলেন। ক্রমে দিন যায়, মাস যায় কুমারী কুন্তীর গর্ভ ক্রমে স্ফীত হতে থাকে, তাঁর সেই স্বভাবজাত চঞ্চলতা আর নেই। কুন্তীর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে রাজপ্রাসাদের এক প্রবীণা ধাত্রীর। কুন্তীরও তখন প্রয়োজন এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার। একদিন নিভৃতে এই ধাত্রীর কাছে অকপটে সব কথা খুলে বলেন কুন্তী। ক্রমে গর্ভ আরও ভারী হতে থাকে। কুন্তী আবার স্মরণ করলেন দেব দিবাকরকে, তিনি আশ্বস্ত করলেন কুন্তীকে। সেই ধাত্রী গোপনে নিয়ে গেলেন এক নির্জন স্থানে। সূর্যের বরে কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা কুন্তী প্রসব করলেন কবচকুণ্ডলধারী এক দিব্য শিশু। কর্ণরন্ধ্রে জন্ম তাই নাম কর্ণ। পুত্রমুখ দর্শনে কুমারী কুন্তীর মাতৃস্নেহ উত্তাল হলো। কিন্তু এই সন্তানকে এই মুহূর্তেই বিদায় দিতে হবে। হাহাকার করে উঠল মায়ের মন। ধাত্রী সংগ্রহ করে আনল এক সুগঠিত তাম্রপেটিকা। তাতে সযত্নে স্থাপন করা হলো দেবকান্ত শিশুটিকে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার কেঁদে উঠল শিশুটি। মায়ের বুকেও হাহাকার, চোখে অশ্রুর বন্যা। ধাত্রীর সঙ্গে অপেক্ষা করছেন কুন্তী, রাত্রির অন্ধকার নামার জন্য। ধীরে ধীরে নামল অন্ধকার। পেটিকায় শায়িত শিশুটিকে নিয়ে দুই নারী ত্রস্তপদে এগিয়ে চলেছে রাজপ্রসাদের অদূরে বহমান অশ্বনদীর দিকে। রাজবাড়ির ঘাটে তখনও লোকজনের আনাগোনা। তাঁরা ঘাটে না গিয়ে এসে দাঁড়ালেন নদীতীরের এক নিভৃত স্থানে। ধাত্রী পেটিকাটি জলে ভাসাতে যাচ্ছিলেন, রোদুদ্যমান কুন্তী বাধা দেয়, পেটিকা ভূমিতে স্থাপন করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পুত্রের মুখের দিকে। ধাত্রী বোঝায়, রাত গভীর হচ্ছে, এতক্ষণে প্রাসাদে কুন্তীর খোঁজ শুরু হয়ে গেছে। এইবার প্রাসাদে ফিরতে হবে। অনেকটা জোর করে কুন্তীর হাত থেকে পেটিকাটি মুক্ত করে অশ্বনদীর জলে ভাসিয়ে দিল ধাত্রী। বাঁধভাঙা অশ্রুতে সিক্ত হলেন কুমারীমাতা কুন্তী। ধাত্রী তাঁকে ধরে নিয়ে পা বাড়ালেন রাজপ্রাসাদের দিকে। সবার অলক্ষ্যে ঘটে গেল এতবড়ো একটা ঘটনা। কেউ দেখল না, কেউ জানল না। সদ্যোজাত নিষ্পাপ দেবশিশুকে নিয়ে সেই তাম্রপেটিকা ভেসে চলল নামহীন গোত্রহীন, পরিচয়হীন, এক অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিতব্যের দিকে।

প্রাসাদে ফিরে রত্ন-পালঙ্কে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন কুন্তী। ধাত্রী শুরু করল তার জন্য নির্দিষ্ট কাজকর্ম। ততক্ষণে প্রসাদে খোঁজ শুরু হয়েছে রাজকন্যার, দীর্ঘ সময় ধরে কুন্তীকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় কুন্তী? অবশেষে তাঁর খোঁজ মিলল, আপন কক্ষে শয্যায় শুয়ে আছেন কুন্তী। কিন্তু তার চোখমুখের একি অবস্থা যেন দীর্ঘ রোগ ভোগ করে উঠেছে। বিচলিত পিতা কুন্তীভোজ রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিতে বললেন। কুন্তী বারণ করে বললেন— না পিতা, রাজবৈদ্যের প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক আছি। তবে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

কুন্তীভোজ বললেন—বলো মা, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

—আমি এক স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, আগামী একুশ দিন আমি আমার কক্ষে নিভৃতে সূর্যদেবের আরাধনা করতে চাই। এই একুশদিন আমি অন্য কোনো দেবর্চনা আর অতিথি সেবা থেকে বিরত থাকব।

—তাই হোক মা, তুমি নিভৃতে সূর্য আরাধনা কর। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। এই ক'দিন অতিথি সেবার দায়িত্ব তোমার মা নেবেন। আর দু'জন দাসী সর্বদা তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

স্মিতহাস্য দেখা দিল কুন্তীর মুখে। শুরু হলো পুত্র জন্মের আনন্দ অশৌচ। কিন্তু পুত্র কোথায়? সেই সদ্যোজাতকে নিয়ে অশ্বনদীতে ভেসে চলল সেই তাম্রপেটিকা। অনেক দূর ভেসে গিয়ে শেষে স্রোতের টানে এসে পড়ল চর্মস্বতী নদীতে। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে যমুনার জলে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম পেরিয়ে পেটিকা ভাসতে ভাসতে প্রবেশ করল গঙ্গার জলে। গঙ্গার স্রোতের টানে ভেসে চলেছে তাম্রপেটিকা, ভিতরে সদ্যোজাতের ক্রন্দন। গঙ্গাতীরে চম্পাপুরী এক ছোটো জনপদ। কয়েকঘর ক্ষত্রিয় আর সারথীদের বাস। জনপদের প্রধান অধীরথ সুত হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়পাত্র। নিষ্ঠাবান অধিরথ প্রতিদিন প্রাত:কালে পত্নী রাধাকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করেন। যেদিনও স্নানে এসেছেন। হঠাৎ সূতপত্নী রাধা লক্ষ্য করেন গঙ্গার মাঝবরাবর একটি তাম্রপেটিকা স্রোতের টানে ভেসে চলেছে, সেই পেটিকার মধ্য থেকে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কালবিলম্ব না করে অধিরথ ঝাঁপ দিলেন গঙ্গার জলে। সাঁতারে গিয়ে ধরে ঘাটে নিয়ে এলেন সেই পেটিকা। দুজনে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন পেটিকার মধ্যে শুয়ে আছে কবচকুণ্ডলধারী এক দিব্য দেবশিশু। এই শিশু বিধাতার দান ভেবে নিঃসন্তান দম্পতি তাকে বুকে তুলে নিয়ে ফিরে এলেন আপন গৃহে। সেইদিন থেকে কুন্তীপুত্র কর্ণের পরিচয় হলো নীচকুল জাত রাধানন্দন রাধেয় রূপে। বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কবচকুণ্ডল রূপ মহাসম্পদ নিয়ে জন্মেছে বলে শিশুর নামকরণ করলেন বসুসেন।

এদিকে কুমারীমাতা কুন্তীর আনন্দ আশৌচের একবিংশ দিনের একের পর এক দিন অতিবাহিত হচ্ছে। প্রত্যহ প্রাতস্নান করে কুন্তী প্রাসাদশীর্ষে এক নিভৃত স্থানে উদীয়মান সূর্যের দিকে বসে দীর্ঘক্ষণ সূর্যের স্তব, আরাধনা করেন। নিমিলিত নয়না কুন্তী প্রত্যক্ষ করেন সেই কবচ কুণ্ডলধারী দেবদিবাকরের দীপ্ত মূর্তি। মুনি প্রদত্ত মন্ত্র পরীক্ষার জন্য কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠান্তে সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন। সহসা আবির্ভূত হয়ে সূর্যদেব বলেছিলেন—

সহসা কারও পদধ্বনিতে কুন্তীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন সেই ধাত্রী। কুন্তী দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললেন—কোনো সংবাদ আছে?

ধাত্রী চারদিক তাকিয়ে নীচুস্বরে বলল—

—হ্যাঁ, শোন। আমার ভগ্নী আর ভগ্নীপতি কুরুরাজ্যের চম্পাপুরীতে থাকে। গতকাল সে আমাদের বাড়িতে এসেছে। তার কাছে শুনলাম কয়েকদিন আগে চম্পাপুরীর গঙ্গার ঘাটের নিকট দিয়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল এক তাম্রপেটিকা তার মধ্যে শোনা যাচ্ছিল এক সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন। চম্পাপুরীর অধিরথ নামে এক সুত সাঁতারে সেই পেটিকাটি তীরে নিয়ে আসে এবং তার মধ্য থেকে পুত্রটিকে উদ্ধার করে। অধিরথ এবং তার স্ত্রী রাধা নিঃসন্তান, তারা বর্তমানে পুত্রটিকে আপন সন্তানবৎ লালন পালন করছে।

পুত্রের কুশল সংবাদে কুন্তী অত্যন্ত হর্ষান্বিত হয়ে আপন কণ্ঠমালা সেই ধাত্রীর গলায় পরিয়ে দিল। বলল—তোমার সেই আত্মীয়কে বলবে যেন প্রতিনিয়ত কর্ণের সংবাদ তোমার কাছে প্রেরণ করে তাকে যথোচিত পারিতোষিক দেওয়া হবে।

—কর্ণ নয়, চম্পাপুরীর অধিবাসীরা তোমার পুত্রের নাম রেখেছে বসুসেন।

—হোক, আমার পুত্র জগতে কর্ণ নামে পিতার ন্যায় যশস্বী হবে।

* * * * * *

সূত অধিরথের পুত্ররূপে কর্ণ ক্রমে বড়ো হচ্ছে। জনসমক্ষে রাধার পুত্র রাধেয় নামে সে পরিচিত। অতি শৈশব থেকে কর্ণের দেবোপম দেহকান্তি সকলকে আকৃষ্ট করতো। তার শক্তি ও সাহস ছিল অতুলনীয়। সমবয়সিরা এমনকী বয়স্করাও তাকে সমীহ করতো। অধীরথ হস্তিনাপুর থেকে একটি ছোটো ধনুক আর তির এনে দিয়েছিল বসুসেনকে। নিয়মিত লক্ষ্যভেদের অভ্যাস করে সে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য। হস্তিনাপুরের প্রাসাদে একশো পাঁচ রাজপুত্র সবাই প্রায় কর্ণের সমবয়সি। গুরু দ্রোণাচার্য এসেছেন তাদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য। রাজকীয় গুরুকুলে আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্যও এসেছেন গুরুরূপে। দ্রোণাচার্যের পুত্র বালক অশ্বত্থামাও এই বালকদের সঙ্গে ধনুর্বেদ চর্চা করে। অধিরথের ইচ্ছা, তার পুত্র বসুসেনও দ্রোণাচার্য কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করুক। হস্তিনাপুরের রাজপ্রসাদের দীর্ঘদিনের সারথী অধিরথ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু সকলের রথ চালিয়েছে। বিশাল এই প্রাসাদের প্রায় সবার সঙ্গে পরিচয় আছে অধিরথের। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রীতিভাজন সে, ভীষ্মও তাকে স্নেহ করেন। একদিন সুযোগ বুঝে ভীষ্মকে বসুসেনের কথা বলল অধিরথ। তার ইচ্ছা বসুসেনকে ধনুর্বেদ শিক্ষার জন্য আচার্য দ্রোণের কাছে সমর্পণ করা। ভীষ্ম বসুসেনকে হস্তিনায়

নিয়ে আসতে বললেন। পরদিন উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে পিতার সঙ্গে হস্তিনাপুর প্রাসাদে এল কর্ণ বসুসেন, যেন এক দেবশিশু। একে একে প্রণাম করল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে। অন্তপুর থেকে কুন্তী দেখলেন কবচকুণ্ডলধারী বালককে। দেখেই চিনতে পারেলেন, বুকের ভিতর মোচর দিয়ে উঠল, ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে বালককে বুকে তুলে নিয়ে তার মস্তকে চুম্বন করে। কিন্তু এক অজানা আতঙ্ক তাকে বাধা দিল। বসুসেনকে দেখে এবং তার কথাশুনে প্রীত হলেন ভীষ্ম। তিনি আচার্য দ্রোণের কাছে প্রস্তাব করলেন এই বালকের অস্ত্রশিক্ষার ভার নিতে। দ্রোণ দেখলেন বালককে। জহুরির চোখে পর্যবেক্ষণ করলেন এ কোনো সাধারণ বালক নয়। বসুসেনের বীরোচিত আচরণে প্রীত হয়ে আচার্য দ্রোণ তাকে ধনুর্বেদ পারদর্শী করে তোলার দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। কৃপাচার্যও তাঁর সঙ্গে সহমত হলেন। গুরুকুলের অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সঙ্গে এই নবাগত বালকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। এই নবীন সতীর্থকে পেয়ে সব বালকেরা প্রীত হলো। তবে কর্ণ আবাসিক নয়, অনাবাসিক হিসেবে গুরুকুলে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করবে। অধিরথ বললেন কোনো সমস্যা নেই।

—প্রাসাদের নিকটস্থ সূতপল্লীতে আমার একটি কুটির আছে। রাধেয় আমার সঙ্গে সেখানেই থাকবে। পিতা-মাতার আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হলো কর্ণের অস্ত্র প্রশিক্ষণ। স্মিতহাস্য সদাচারী বসুসেনের সঙ্গে অন্যান্য সতীর্থদের অল্প দিনের মধ্যেই সখ্য গড়ে উঠল। নিরলস অধ্যাবসায়ী বসুসেন অচিরেই আচার্যগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এতদিন ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এবার কর্ণের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। দুজনেই সমান সমান।

হস্তিনাপুরের এই রাজকীয় গুরুকুলে একশো পাঁচ জন বিদ্যার্থী ছিল। কর্ণকে নিয়ে একশো ছয় হলো। বিদ্যার্থীদের আবার দুটি দল একটি একশো ভাই কৌরবদের, অন্যটি পাঁচভাই পাণ্ডবদের। কৌরব দলের নেতা দুর্যোধন আর পাণ্ডবদলের নেতা ভীমসেন। সদাচারী সদালাপী পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সর্বদা কর্ণের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করে। অপরদিকে কৌরব দুর্যোধন বসুসেন কর্ণকে সবসময় নিজেদের দলে রাখার চেষ্টা করে। যেমন করে দ্রোণপুত্র অহংকারী নিষ্ঠুর অশ্বত্থামাকে নিজেদের দলে টেনেছে। তবে কর্ণ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের বিশেষ অনুরাগী। কুচক্রী বালক দুর্যোধন কর্ণ-যুধিষ্ঠিরের এই সখ্য পছন্দ করে না। সে সর্বদাই কর্ণকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। ক্রমে ক্রমে দেশ দেশান্তর থেকে রাজকুমারেরা অস্ত্র শিক্ষার্থে হস্তিনাপুরে দ্রোণের ধনুর্বেদ শিক্ষার গুরুকুলে আসতে থাকে। বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ততদিনে কর্ণকে দুর্যোধন সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিয়েছে। কুরু-পাণ্ডবের কদাপি বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হলে কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে এবং বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। দুর্যোধনের প্ররোচনায় কর্ণ পাণ্ডবদের নানা প্রকার অবমাননা করতে থাকে। তথাপি সমাগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তরুণ অর্জুন বাহুবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্বেদ শিক্ষায় প্রায় গুরু দ্রোণের সমকক্ষ হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন বিদ্যারম্ভের আগে সারাদিনের ব্যবহারের জন্য বিদ্যার্থীদের গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসতে হতো। আচার্য দ্রোণ প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে এক একটি অতি ক্ষুদ্রমুখ কলসী দিলেন যাতে জল ভর্তি হতে অনেক সময় লেগে যায়। কেবল নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে এক বৃহৎমুখ কলসী দিলেন যা অতি দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায়। এই কলসীতে জল ভর্তি করে অশ্বত্থামা দ্রুত গুরুকুলে ফিরে আসে; অন্যান্য বিদ্যার্থীরা তখনও গঙ্গায় জল ভরছে। এই অবসরে আচার্য দ্রোণ অশ্বত্থামাকে বিশেষ বিশেষ গূঢ় অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। এই ঘটনা অর্জুনের দৃষ্টিগোচর হলে অর্জুন বরুণাস্ত্রে কলসী ভর্তি করে গুরুর কাছে ফিরে আসতেন, অর্জুনের এই হঠকারিতায় গুরু দ্রোণ ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং প্রীত হয়ে অশ্বত্থামার সঙ্গে গূঢ় যুদ্ধপদ্ধতি এবং অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। এই পর্যায়ে চক্রব্যূহের মতো অতি গূঢ় সৈন্য সজ্জার মতো ক্ষত্রিয়দের পক্ষে দুর্লভ বিদ্যাও অর্জুন আয়ত্ত করেছেন। তৃতীয় পাণ্ডবের প্রতি গুরুর এমন পক্ষপাতিত্বে কর্ণ প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত।

এক রাতে অর্জুন ভোজন করছেন, সামনে একটি দীপশিখা প্রজ্বলিত। হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহে দীপটি নির্বাপিত হলো। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অন্নসহ অর্জুনের হাত ঠিক মুখেই চলে যাচ্ছে। অর্জুন মনে মনে ভাবলেন যা অভ্যাস করা যায় তাই শক্তিশালী হয়ে উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করে রাত্রিকালে ধনুর্বেদ অনুশীলনের জন্য শরাসনে জ্যা রোপণ করে বারংবার টংকার দিতে লাগলেন। সেই টংকার ধ্বনি শ্রবণ করে বিস্মিত দ্রোণ সহসা সেখানে এসে অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন—

—বৎস! সত্যিকথা বলছি, এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্ধর যাতে প্রখ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করব।

অন্তরাল থেকে এই ঘটনাটি আরও একজন প্রত্যক্ষ করলেন। ধনুকের টংকারে তারও নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি গুরু দ্রোণকে অনুসরণ করে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে বৃক্ষান্তরালে থেকে সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি কর্ণ। ক্রমে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভুতলে অবতীর্ণ হয়ে কীরূপে যুদ্ধ করতে হয় পুনর্বার সবিশেষ শিক্ষাদান করতে লাগলেন। গদাযুদ্ধ, অসিচর্যা, তোমার প্রয়াস ও শক্তি প্রয়োগ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধের কৌশল শেখালেন।

দ্রোণাচার্যের অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য শ্রবণ করে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে অগণিত রাজা ও রাজকুমার ধনুর্বেদ শিক্ষার জন্য হস্তিনায় আসতে থাকেন। এই সময়ে একদিন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ সন্নিধানে সমাগত হলো; কিন্তু

সে বন্যজাতি, সমাগত রাজা ও রাজকুমারদের সমতুল্য ও সতীর্থ নয়, সে অবাঞ্ছিত অপাঙ্‌ক্তেয়, এই বিবেচনা করে আচার্য দ্রোণ তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন না। তখন আশাহত, বিষাদগ্রস্ত নিষাদ রাজকুমার ভক্তিভরে দ্রোণের পাদবন্দনা করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। সেখানে এক পর্ণকুটীর নির্মাণ করে তারমধ্যে আচার্য দ্রোণের সহস্ত নির্মিত এক মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করে, তাঁকে গুরুরূপে অভিষিক্ত করে ব্রতধারণ পূর্বক অস্ত্রবিদ্যা আরম্ভ করল। অচিরেই সে অস্ত্রের প্রয়োগ, সন্ধান ও সংহার বিষয়ে সবিশেষ কৃতকার্য হয়ে উঠল। তবু তার অভ্যাসের বিরাম নেই।

একসময় আচার্য দ্রোণের আদেশে কৌরব ও পাণ্ডবেরা মৃগয়ার্থে রথারোহণে অরণ্যে গমন করে। যেহেতু এটি শুধুমাত্র হস্তিনাপুর রাজকুমারদের জন্য নির্দিষ্ট মৃগয়া, তাই দুর্যোধনের অনুরোধ সত্ত্বেও আচার্য দ্রোণ কর্ণকে এই মৃগয়ায় অংশগ্রহণে অনুমোদন করেননি। শিকারের সহযোগী কুকুর, বাগুরা ইত্যাদি নিয়ে কয়েকজন তাদের অনুগমন করল। অরণ্যে প্রবেশ করে কৌরব ও পাণ্ডবেরা যখন শিকারের সন্ধানে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন তখন সেই শিকারি কুকুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদরাজ তনয়ের সান্নিধানে সমুপস্থিত হলো। সেই কুকুর মলিন-কলেবর কৃষ্ণাজিন–জটাধারী নিষাদরাজ কুমার একলব্যকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগল। কুকুরের চীৎকারে অস্ত্রাভ্যাসে বিঘ্ন ঘটায় একলব্য এক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে তার মুখ বন্ধ করে দিল। ভীত কুকুরটি দ্রুত সেই স্থান পরিত্যাগ করে পাণ্ডবদের কাছে চলে গেল। পাণ্ডবেরা কুকুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সেই শর নিরীক্ষণ করে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং সেই শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হয়ে প্রয়োগকর্তার প্রশংসা করতে লাগলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করে পরিশেষে বনবাসী এক মলিন, জটাধারী, কৃষ্ণাজিন পরিহিত যুবককে নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করতে দেখলেন। পাণ্ডবেরা এই বিকৃতদর্শন পুরুষকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—

—হে বীরবর! তুমি কে? কার পুত্র?

—আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, আচার্য দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্বেদ অনুশীলন করছি। পাণ্ডবেরা মৃগয়া শেষে রাজধানীতে ফেরার পর দ্রোণ সন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত অদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করলেন। অতঃপর কুন্তীপুত্র অর্জুন এক নির্জন স্থানে বিনীতবচনে আচার্য দ্রোণকে বললেন—গুরুদেব! আপনি অঙ্গীকার করেছিলেন আমার অপেক্ষা আপনার কোনো শিষ্যই উৎকৃষ্ট হবে না, কিন্তু এক্ষণে তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। নিষাদাধিপতির পুত্র একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্বেদে আমা অপেক্ষাও সমাধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে।

অর্জুনের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করে আচার্য দ্রোণ মুহূর্তকাল চিন্তা করে এর বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না। পরিশেষে একদা অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, জটাচীরধারী, মলিন-কলেবর, নিষাদ রাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করে বারংবার বাণ বর্ষণ করে চলেছে। এই অবসরে আচার্য দ্রোণ তার সম্মুখীন হলেন। একলব্য সহসা সম্মুখে আচার্যকে দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। তাঁর পদবন্দনা পূর্বক আসনে উপবেশন করিয়ে আচার্যের সামনে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে যথোচিত পূজা করল এবং গুরুর আশীর্বাদের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর সামনে দণ্ডায়মান হলো। আচার্য দ্রোণ বললেন—হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হয়ে থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।

একলব্য আনন্দের সঙ্গে বলল—ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই। আদেশ করুন আমার সামর্থের মধ্যে কোন দক্ষিণায় আপনাকে তুষ্ট করব?

—হে বীর! যদি তুমি সম্মত থাক তবে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে প্রদান কর।

সত্যবাক্ একলব্য গুরু দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে প্রফুল্লমনে হাসিমুখে স্বহস্তে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করল।

অর্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করে অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হলেন। তখন তাঁর অপকর্ম বিষয়কে আশঙ্কা তিরোহিত হলো; এই ধরাধামে অর্জুনকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না; দ্রোণাচার্যের এই অঙ্গীকার বাক্যও রক্ষিত হলো। দুরাত্মা ধার্তরাষ্ট্রেরা এবং রাধেয় কর্ণ বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জুনের প্রতি নিতান্ত ঈর্ষাপরায়ণ হলো।

আচার্য দ্রোণ শিষ্য কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষায় অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য গোপনে শিল্পীদ্বারা একটি পক্ষী নির্মাণ করিয়ে সেটিকে একটি গাছের উঁচুডালে স্থাপন করলেন। তারপর পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শরাসন সহ প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তিনি আহ্বান করনেল যুধিষ্ঠিরকে। বললেন—

—হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি শরসন্ধান করে আমার নির্দেশ অনুসারে বাণ নিক্ষেপ কর।

যুধিষ্ঠির আচার্যের নির্দেশ অনুসারে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে শরাসন নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। দ্রোণ বললেন—

—তুমি লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থির কর। যুধিষ্ঠির বললেন—

—গুরুদেব আমি তাই করছি।

দ্রোণ বললেন—

—তুমি এক্ষণে পাখি ছাড়া আর কী দেখছ?

—আমি এক্ষণে পাখি, বৃক্ষ, আপনি এবং আমার ভ্রাতৃগণকে দেখতে পাচ্ছি।

তখন দ্রোণ অপ্রসন্ন হয়ে বললেন—

—তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারবে না, এস্থান থেকে অপসৃত হও।

এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে আচার্য দ্রোণ দুর্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্যায়ক্রমে একই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তাঁর অভিপ্রেত উত্তর দিতে পারলেন না বলে সবাই তিরস্কৃত হলেন। এবার গুরু লক্ষ্যভেদের জন্য অর্জুনকে আহ্বান করলেন। অর্জুন শরাসন সহ উপস্থিত হলে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—

—তুমি এখন কী দেখছ?

—আমি এখন শুধুমাত্র পাখিটিকে দেখছি।

—সম্পূর্ণ পাখিটিকে দেখছ?

—না, এখন শুধুমাত্র পাখিটির চক্ষু আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

—বৎস তবে লক্ষ্যভেদ কর।

আদেশ পাওয়া মাত্র অর্জুন তির নিক্ষেপ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই পাখির চক্ষু বিদ্ধ হলো। আচার্য দ্রোণ আনন্দে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন আচার্য দ্রোণ সমস্ত শিষ্যকে নিয়ে স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে গমন করলেন। উপস্থিত সকলে যখন গঙ্গায় অবগাহন করছেন তখন এক বিশালাকৃতি কুমির আচার্য দ্রোণের কটিদেশ কামড়ে তাঁকে গভীর জলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আপন শক্তিতে কুমিরের মুখ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে শিষ্যদের পরীক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আবেদন জানালেন—বৎসগণ! তোমরা এই কুমির বিনাশ করে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

তাঁর আহ্বান শুনে সকল রাজকুমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাকল। অর্জুন তখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্নিবার ও খরধার পঞ্চবাণে কুমিরকে সংহার করে গুরুকে উদ্ধার করলেন। অর্জুনের এই কৃতকার্যতায় আচার্য দ্রোণ অতিশয় প্রীত হলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁকেই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করলেন।

এইভাবে কৌরব ও পাণ্ডবেরা আচার্য দ্রোণের কঠোর তত্ত্বাবধানে অস্ত্রবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। আবার এক-একজন এক-এক বিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম। যেমন যুধিষ্ঠির মহারথী, দুর্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারঙ্গম, অর্জুন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, বিকর্ণ, নকুল ও সহদেব অসিচর্য্যায় অত্যন্ত কুশলী। এইসময়ে একদিন রাজসভায় যেখানে ব্যাস, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বাহলীক ও বিদুরের উপস্থিতিতে আচার্য দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

—মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হয়েছেন। আপনি অনুমতি দিলে তারা আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ! আপনি আমাদের বংশের হিতার্থে এক মহৎ কার্য সম্পাদন করলেন। এখন আপনি আদেশ করলেই আপনার শিষ্যদের প্রকাশ্যে অস্ত্র পরীক্ষা হবে। আপনি যেরূপ নির্দেশ করবেন সেরূপ রঙ্গভূমি নির্মিত হবে। আমি অন্ধ, তথাপি কুমারেরা যে সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করবে, আমি তাঁদের সান্নিধ্য লাভের একান্ত অভিলাষ করি।

বিদুরকে আচার্য দ্রোণের সঙ্গে পরামর্শ করে রঙ্গভূমি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। হস্তিনাপুরীর প্রান্ত ভাগে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মিত হলো। রাজপুরুষদের জন্য, অন্তঃপুরিকাদের জন্য এবং চতুর্বর্ণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনাগার নির্মিত হলো।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্বর্ণ লোক রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দশনার্থী হয়ে রাজধানী থেকে দ্রুত রঙ্গস্থলে আগমন করতে লাগলেন। যথাসময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে ভীষ্ম ও কৃপাচার্যকে অগ্রে রেখে রাজপুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট মহার্ঘ আসনে এসে উপবেশন করলেন। অন্তঃপুর থেকে শিবিকারোহণে গান্ধারী, কুন্তী, পরাশরী প্রভৃতি পুররমণীরা রঙ্গস্থলের মুক্তাজালবষ্টিত নির্দিষ্ট স্থানের আসনে এসে উপবেশন করলেন। তখন শুক্লাম্বরধারী, শুক্লশ্মশ্রু-শুক্লকেশ, শুক্লমাল্য পরিহিত আচার্য দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার সঙ্গে উন্নতশিরে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বলি-প্রদানপূর্বক শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করালেন। পুণ্যকর্ম সমাধান হলে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র বহন করে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করল। এইবার আচার্য দ্রোণ রাজকুমারদের রঙ্গস্থলে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন, রণসাজে সজ্জিত রাজকুমারেরা সর্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে রেখে সশস্ত্র হয়ে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক্রমে রঙ্গাস্থলে প্রবেশ করলেন। আচার্য দ্রোণের নির্দেশক্রমে অস্ত্রপরীক্ষা শুরু হলো। কৃপাচার্য আসন ত্যাগ করে রঙ্গস্থলে এসে যথাবিধি শস্ত্রপরীক্ষা পরিচালনা করতে লাগলেন। রাজকুমারেরা তখন অত্যাশ্চর্য অস্ত্রসমুদয় নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বেগবান রথে আরোহণ করে স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করলেন। অসি-চর্ম গ্রহণ পূর্বক কখনও গজে কখনও-বা অশ্বে অধিরূঢ় হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। একমাত্র অসিদ্বারা কৌশলক্রমে নানা অস্ত্র নিবারণ করলেন। এইরূপ অসিচর্চায় রাজকুমারগণের অসিযুদ্ধে দক্ষতা ও নির্ভীকতা প্রকাশ পেল। তাঁদের হস্তমুষ্টি থেকে অসি একবারও স্খলিত হয়নি। অনন্তর মহবলপরাক্রান্ত দুর্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হয়ে গদাহস্তে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ

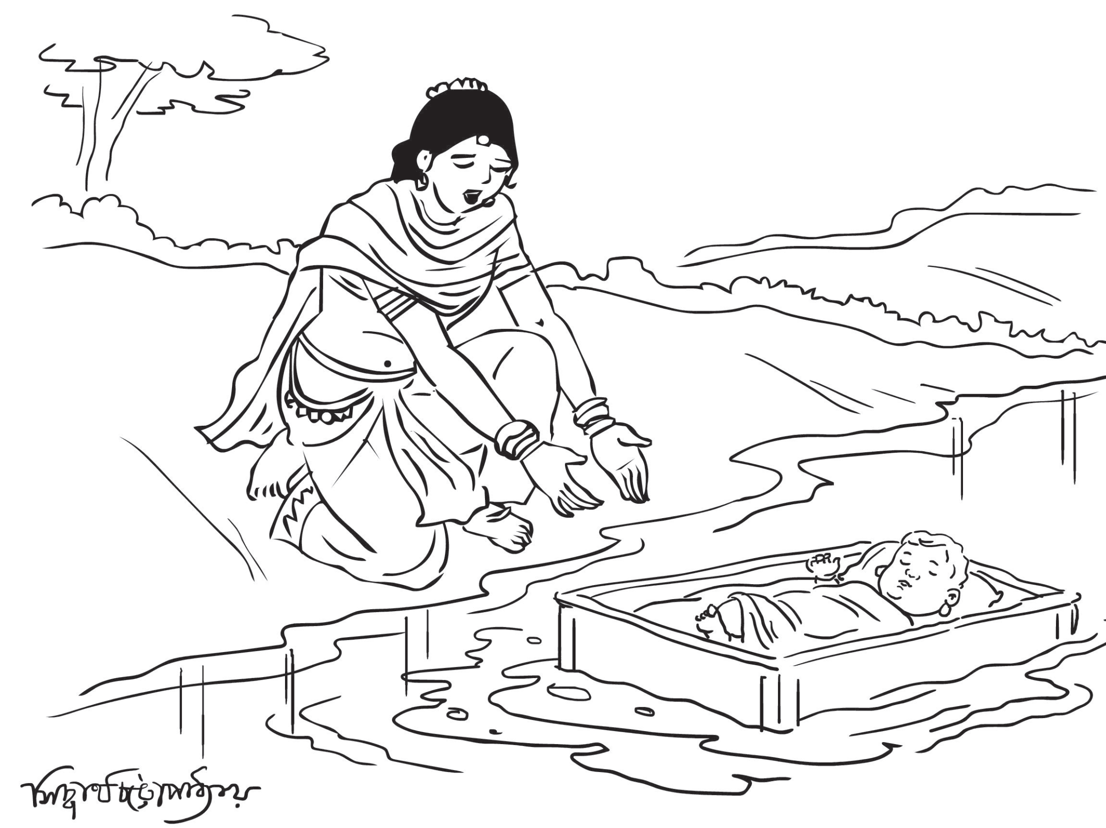

হলেন। দুর্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হলো। উভয়ের সমর্থনে দর্শকদের মধ্যে মহা কোলাহল শুরু হলো। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না। অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তখন আচার্য দ্রোণ আত্মজ অশ্বত্থামাকে সংগ্রামে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। গুরুর নির্দেশক্রমে ব্যর্থমনোরথ দুই বীর রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করলেন। এইবার আচার্য দ্রোণ প্রিয় শিষ্য সব্যসাচী অর্জুনকে রঙ্গস্থলে আহ্বান করলেন। আচার্য দ্রোণ রঙ্গস্থলে বললেন—

—শিষ্য অর্জুন আমার পুত্রের থেকেও প্রিয়তর। সর্বশাস্ত্র বিশারদ, উপেন্দ্র তুল্য মহাবীর। উপস্থিত দর্শকগণ আপনারা এই মহাতেজার অস্ত্রবিদ্যা নৈপুণ্য দর্শন করুন।

অনন্তর জনতার কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থলের লোকসকল শান্ত হলে, মহাবীর অর্জুন আচার্য দ্রোণের ইঙ্গিতে নিজের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করতে লাগলেন। প্রথমে অগ্নিবাণ প্রয়োগে অগ্নিসৃষ্টি করে সেই অগ্নি প্রশমিত করলেন বারুণবাণের জলধারায়। বায়বাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করে পর্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করলেন। অন্তর্ধনাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হলেন। অতঃপর শিক্ষাকৌশলে কখনও দীর্ঘ, কখনও হ্রস্ব, কখনো রথসন্মুখে, কখনও রথমধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন এবং অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হলেন।

এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্র প্রয়োগ দর্শনে দর্শককুল প্রথমে বাক্‌রুদ্ধ এবং পরে হর্ষধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। শত ভ্রাতা বেষ্টিত দুর্যোধন ও কর্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। সমবেত দর্শকদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা আর প্রশংসা নিয়ে নতমস্তকে সকলকে অভিবাদন করে অর্জুন উন্নতশিরে রঙ্গস্থল ত্যাগ করলেন।

* * * * * *

অর্জুনের অলৌকিক অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর বিস্ময়ভাব তখনো কাটেনি, এই সময়ে দুর্যোধনাদির প্রবল উৎসাহে সেই সুদৃশ্য রঙ্গস্থলে নভোমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় প্রবেশ করলেন মহাবীর কর্ণ। তাঁর মুখমণ্ডল সহজাত কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত, তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে অসিবন্ধন করে পদচারী পর্বতের ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন। দীপ্ত, কান্তি ও দ্যুতিদ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তি সমূহের বল একাকী ধারণ করতেন। তিনি রঙ্গস্থল ইতস্তত অবলোকন করে নিয়ম রক্ষার জন্য আচার্য দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম জানালেন। স্পষ্টত এতে ভক্তি ছিল না।

রঙ্গস্থলে উপস্থিত জনতা তখন তাঁর সবিশেষ পরিচয় জানার জন্য উদ্‌গ্রীব। তখন সূর্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা কুন্তীতনয় অর্জুনকে জলধরগম্ভীর স্বরে বললেন—

—হে পার্থ! তুমি যেরূপ অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করেছ, সর্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করছি, তুমি বিস্মিত হবে না।

কর্ণের এই দাম্ভিক বাক্য শ্রবণে চারদিক থেকে দর্শকেরা উৎসাহ ব্যাঞ্জক ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। জনতার এই উৎসাহকে কর্ণ-দুর্যোধনের প্রীতি এবং অর্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক করল। অতঃপর আচার্য দ্রোণের নির্দেশ অনুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণ, অর্জুন যেসব বিদ্যা প্রদর্শন করেছিলেন কর্ণও অবিকল সেই সেই বিদ্যা প্রদর্শন করলেন। তখন দুর্যোধন ভ্রাতৃগণ সহ কর্ণকে আলিঙ্গন করে সাদরে বললেন—

—হে মহাবাহু! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়ে আপন পরাক্রম দেখালে। এক্ষণে এই কুরুরাজ্যকে আপনার ভেবে উপভোগ কর।

—হে বন্ধু! বোধহয় আমার কর্তব্য আমি সমাধা করেছি। এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে সখ্য এবং অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে বাসনা করি।

দুর্যোধন কর্ণের বাক্যে অতিশয় প্রীত হয়ে বললেন—

—উত্তম, এক্ষণে আমার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বিষয়ভোগবাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষদলের মস্তকে পদার্পণ করে পরমসুখে কালাতিপাত কর।

দুর্যোধনের এইরূপ প্ররোচনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুন বললেন—রে কর্ণ! যারা অনাহূত হয়ে উপদেশ প্রদান করে এবং বাক্যালাপ করে তারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করে সেখানে প্রেরণ করব।

অর্জুনের ঈদৃশ স্পর্ধায় কর্ণের পৌরুষ দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হলো, প্রকাশ্যে বললেন—

—হে অর্জুন। দেখ, এই রঙ্গস্থল সর্বসাধারণের, এখানে তোমার কোনো প্রভুত্ব নেই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করে থাকেন। বেশি কথায় কাজ কী, যতক্ষণ গুরুজন সমক্ষে শরদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করছি, তক্ষণ আর বিফলশরক্ষেপের আবশ্যকতা নেই।

কর্ণ-অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনিবার্য উপলব্ধি করে আচার্য দ্রোণ অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ দিলেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ কুশলী কৃপাচার্যকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। দুইবীর মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মল্লভূমে আবির্ভূত হলেন। অলক্ষ্য থেকে দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেব আপন আপন আত্মজদের সহায়তা করলেন। কর্ণের পক্ষে ধৃতরাষ্ট্ররা এবং অর্জুনের পক্ষে আচার্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, এমনকী দুর্যোধনের অনুজ তরুণ বিকর্ণও অবস্থান করতে লাগলেন। রঙ্গস্থলের সমস্ত দর্শক এমনকী অন্তঃপুরিকারাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক-এক পক্ষে পক্ষপাত করতে লাগলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করে কুন্তী মূর্চ্ছিতা হলেন। সর্বধর্মবেত্তা বিদুর তাঁকে মূর্চ্ছিতা দেখে পরিচারিকাদের সুশীতল জলসিঞ্চনদ্বারা পরিচর্যা করার আদেশ দিয়ে কুন্তীকে আশ্বস্ত করলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করে পুত্রদ্বয়কে দর্শন করে কিংকর্তব্য বিমূঢ় এবং অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হলেন। তখন আচার্য কৃপ উভয় যুদ্ধার্থীকে ধনুর্ধারণ করতে দেখে কর্ণকে বললেন—

—কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন। হে মহাবাহু। এক্ষণে তুমি তোমার মাতা ও পিতার নাম উল্লেখ কর এবং কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেছ আর কোন্ রাজবংশে তাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হলে অর্জুন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, নচেৎ তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না। কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীলদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না।

কৃপাচার্যের এই বাক্যশ্রবণে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল, তিনি বাক্‌রহিত হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বৃষ্টিজল নিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। কর্ণের এমন অবস্থা দেখে দুর্যোধন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আচার্য দ্রোণের প্রতি বিনীতভাবে বললেন—

—আচার্যদেব, শাস্ত্র বলে যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্যচালনায় সমর্থ, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। তথাপি যদি অর্জুন রাজা কিংবা রাজকুল বংশোদ্ভূত ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হন, তবে আমি এই মুহূর্তে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করছি। রাজা হলে নিশ্চয় অর্জুনের কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে আপত্তি থাকবে না।

দুর্যোধনের আদেশে সেবকরা তৎক্ষণাৎ রঙ্গস্থলে অভিষেকের আয়োজন করে ফেলল। অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হলো। এলেন শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ। বেদ ধ্বনিতে মুহূর্তের মধ্যে মুখরিত হলো রঙ্গস্থল। রত্নসিংহাসনে আসীন কর্ণকে আতপ তণ্ডুল, চন্দন, কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা শাস্ত্রমতে অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করা হলো। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হলে তাঁর শিরোপরি রাজছত্র ধৃত হলো, উভয় পাশে চামর-বীজন এবং কৌরবগণের অনুসারীরা জয়ধ্বনি করতে লাগল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ দুর্যোধনকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক বললেন—

—মহারাজ! তুমি আমাকে রাজ্যদান করে কৃতকৃতার্থ করেছ। এই মুহূর্তে তোমাকে প্রতিদান হিসাবে আমি কী দিতে পারি?

দুর্যোধন অত্যন্ত প্রীতি হয়ে বললেন—মহারাজ কর্ণ, আপাতত তোমার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা ছাড়া আমার অন্য কোনো বাসনা নেই। সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তুমি সদাসর্বদা আমার পাশে থেকো।

—তাই হবে সখা, তোমার আমার কখনো বিচ্ছেদ হবে না।

অতঃপর উভয়ে সহর্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

তাৎক্ষণিকভাবে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করা এবং কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের সখ্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রমুখ ভালোভাবে নেননি। তাঁরা এতে দুর্যোধনের কুঅভিসন্ধির আভাস পেয়েছিলেন। পাণ্ডবরাও এই সখ্য ভালো চোখে দেখেনি। তবে অন্যন্যেরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করলেও ভীমসেন চুপচাপ থাকার পাত্র ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে পুত্রের অঙ্গরাজ্যে অভিষেকের সংবাদ পেয়ে অতি দ্রুত ঘর্মাক্ত কলেবরে রঙ্গস্থলে এসে প্রবেশ করলেন সূত অধিরথ। পিতাকে দেখামাত্র পুত্র কর্ণ নতজানু হয়ে পিতার চরণ স্পর্শ করে চরণধূলি মস্তকে ধারণ করলেন। রঙ্গস্থলে উপস্থিত হস্তিনানগরের সাধারণ মানুষ কর্ণের মহানুভবতা ও কর্তব্যপরায়ণায় ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। আবার এই দৃশ্য দেখে কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করে ভীমসেন অত্যন্ত অবজ্ঞার স্বরে কর্ণকে বলতে লাগলেন—

—রে সূতপুত্র! রণে অর্জুনের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করা তোর পক্ষে কোনোমতেই শ্রেয়স্কর নয়। বরং আপন বংশোচিত রথের অশ্ববল্গা ধারণই তোর যোগ্য কর্ম। রে নরাধম! অগ্নি সন্নিহিত যজ্ঞীয় ঘৃত অবলেহনে যেমন কুকুরের অধিকার নেই, তেমন অঙ্গরাজ্য উপভোগেও তোর অধিকার নেই।

ভীমের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে কর্ণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন, তাঁর অধর কম্পিত হতে লাগল, তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যদেবকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। ভীমের এমন অপমানসূচক বাক্যে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে বললেন—

—হে ভীম! কর্ণের প্রতি এইরূপ বিদ্রূপ করা সমুচিত নয়। ক্ষত্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন। জন্মের নিরিখে বীরত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব নিরুপণ অনুচিত। এইরূপ বহু প্রমাণ আছে, কৃত্তিকার পুত্র কার্তিকেয় দেব সেনাপতি। গৌতমবংশে শরস্তম্ব থেকে গৌতম উৎপন্ন হয়েছেন। আমাদের গুরু আচার্য দ্রোণের জন্মও কুম্ভ থেকে। আর তোমাদের জন্ম কীভাবে হয়েছে তা কারও অগোচর নেই। অতএব জন্ম নয়, কর্মই প্রধান। সহজাত কবচকুণ্ডলধারী, সর্বসুলক্ষণ যুক্ত, সূর্যসঙ্কাশ, মহাবীর কর্ণ আজ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর। কর্ণ ইচ্ছা করলে আপন বাহুবলে এবং আমার সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করতে পারেন। কর্ণের এই রাজ্যলাভ বিষয়ে যদি কারও বিদ্বেষ থাকে তিনি কর্ণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে পারেন।

দুর্যোধনের এই ঘোষণায় রঙ্গস্থলে এক সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদের ধ্বনি উত্থিত হলো। মহাবীর অর্জুন ক্ষিপ্ত হয়ে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে ধনুকে টঙ্কার দিয়ে বীরদর্পে দ্বন্দ্বভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। ঠিক এই সময়ে দিনমণি অস্তাচলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো ধরণীতে। আচার্য কৃপ ঘোষণা করলেন, ধনুর্বেদের অনুশাসন অনুযায়ী সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ নিষিদ্ধ, তাই প্রতিযোগিতা শেষ। অন্তরাল থেকে এতক্ষণ যিনি দুই সন্তানের দ্বৈরথে আতঙ্কিত হয়ে প্রহর গুনছিলেন সেই জননী কুন্তী আশ্বস্ত হলেন। রঙ্গস্থলে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি কর্ণের, কোনো ব্যক্তি অর্জুনের পরাক্রমের প্রশংসা করতে করতে আপন আপন গৃহের দিকে অগ্রসর হলেন। কর্ণের সহায়তালাভ করে দুর্যোধনের অর্জুন-আতঙ্ক তিরোহিত হলো। মহাবলী কর্ণও দুর্যোধনকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করলেন।

দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের কাছে কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা শেষ। তথাপি কর্ণের মনে অতৃপ্তি, ধনুর্বেদের অনেক কিছু এখনো তাঁর অজানা। একজন মহারথীর সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র সেটি এখনো তাঁর কাছে অধরা। দ্রোণের গুরু পরশুরামের সহায়তা ছাড়া এই অস্ত্রলাভ অসম্ভব। কর্ণ উপস্থিত হলেন পরশুরামের কাছে। একদা ব্রাহ্মণ বিপ্লবের নায়কশ্রেষ্ঠ পরশুরাম, আপন হস্তে একুশবার ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। ত্রেতাযুগে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের দর্পচূর্ণ করার জন্য তির নিক্ষেপ করে তাঁর স্বর্গ গমনের পথ চিরকালের মতো রুদ্ধ করে দিয়েছেন, তথাপি ব্রহ্মতেজে বলীয়ান পরশুরাম দ্বাপর যুগেও অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী। অস্ত্রগুরু পরশুরাম একমাত্র ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য কাউকে অস্ত্রশিক্ষা দেন না। তাই কর্ণকে নিতে হলো ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ। মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী, গলায় যজ্ঞোপবীত, কপালে তিলক। সূর্যপুত্রের সহজাত তেজ ব্রহ্মতেজের মতোই জ্বাজ্জ্বল্যমান। আচার্য পরশুরামের সামনে গিয়ে প্রণিপাত করলেন কর্ণ। তাঁর দিব্যকান্তি দেখে ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে কোনো সংশয় রইলো না পরশুরামের। তিনি কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে সম্মত হলেন। শুরু হলো কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কর্ণ ধনুর্বেদে গুরুর কাছে আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। কর্ণের অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা দেখে আচার্য পরশুরাম তাঁকে গূঢ় অস্ত্রবিদ্যাসমূহ শিক্ষা দিতে লাগলেন। কর্ণ তখন গুরু পরশুরামের নিত্যসঙ্গী। সর্বক্ষণ গুরুর অনুগমন করেন। একদা এক ঋষিকুমার বার্তা নিয়ে এল অরণ্যের উত্তর অংশের তপোবনের ঋষিরা রাক্ষসদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছেন। রাক্ষসদের অত্যাচারে তাঁদের যাগযজ্ঞ বিঘ্নিত। পরশুরামের নির্দেশে কর্ণ সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের বিনাশ করতে লাগলেন। অনেক রাক্ষস ভীত হয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করল। ঋষিদের যাগযজ্ঞ ও ধর্মাচরণ নির্বিঘ্ন

With Best Compliments from -

NITIN ENTERPRISES

Engineers & Die Castings

HAND TOOLS

D-138A, Phase-V, Focal Point, Ludhiana

M: 9814025239, 9814126239

(O) 0161-2676985

With Best Compliments from :-

M/s. Sant Steel Forgings Private Limited

G. T. Road Bye Pass

Jalandhar - 144012

Tel. 0181-2601719

Phones : Fac : 2222224, 2222225,
2222226

Resi : 2426562, 5050350

Rai *KNITWEARS*

842/2, Industrial Area - A,

Backside R.K. Machine Tools Ldt.

LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL

UNIFORMS & T-SHIRTS

ALL FASHION WEARS

হলো। উত্তর দিকের অরণ্যকে নিরুপদ্রপ করে ফিরে আসছেন সশিষ্য পরশুরাম। পথশ্রমে ক্লান্ত, এক বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন তিনি। তারপর কর্ণের উরুতে মস্তক স্থাপন করে পরশুরাম নিদ্রা গেলেন, গভীর নিদ্রা। দীর্ঘসময় অতিবাহিত হচ্ছে, এই সময়ে এক বজ্রকীট কর্ণের উরুতে দশংন করল। কর্ণের উরুদেশ থেকে রক্তধারা বইতে লাগল। পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে কর্ণ সেই বজ্রকীটের সুতীব্র দংশন জ্বালা আর রক্তপাত নীরবে সহ্য করতে লাগলেন।

নিদ্রাভঙ্গ হলে পরশুরাম রক্তাক্ত কর্ণকে দেখে বললেন—

—তুমি এই কীটের দংশন সহ্য করলে কেন?

—অধৈর্য হলে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হতো, তাই নীরবে সহ্য করেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কর্ণের দিকে তাকালেন পরশুরাম। বললেন—

—তুমিতো ব্রাহ্মণ নও! সত্য করে বলো তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? এত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা তো ব্রাহ্মণের থাকে না, তুমি ব্রাহ্মণ কুমার নও! কে, তুমি সত্যি করে বল?—'ন ত্বং বিপ্রঃ কোহসি সত্যং বদেতি।'

নতমুখে কর্ণ বললেন—ভগবন! আমি সূতপুত্র রাধেয় কর্ণ। ব্রহ্মাস্ত্র লাভের জন্য নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

জ্বলন্ত অগ্নির মতো পরশুরাম কর্ণকে অভিশাপ দিলেন—মিথ্যা পরিচয়ে যে ব্রহ্মাস্ত্র তুমি আমার থেকে লাভ করেছ তা বিফল হবে। কার্যকালে এই বিদ্যা তুমি বিস্মৃত হবে—'ন কর্মকালে প্রতিভাশ্যতিত্মাম্।' (কর্ণপর্ব–৪২ অঃ)

কর্ণের শিরে বজ্রাঘাতের মতো গুরুর এই অভিশাপ বর্ষিত হলো। অভিশাপের পর্ব এখানে শেষ নয়, অস্ত্রচালনা সর্বদা সক্রিয় রাখার জন্য কর্ণ প্রায় অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতেন। একদিন অস্ত্র চালনা করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে অলক্ষ্যে এক ঋষির হোমধেনুকে তিরবিদ্ধ করেন। মৃত্যু হয় সেই হোমধেনুর। প্রিয় হোমধেনুর মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘাতক কর্ণকে অভিশাপ দিয়ে বললেন— রে পাষণ্ড! আমার প্রিয় হোমধেনুকে তুমি বধ করেছ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার জীবনের শেষ ঘোর যুদ্ধে মেদিনী তোমার রথচক্র গ্রাস করবে। —'শ্বভ্রেতে পততাং চক্রমিতি মাং বাহ্মনো—হব্রবীত।' (কর্ণপর্ব ৪২ অঃ)

গুরু পরশুরামের অভিশাপ, ব্রাহ্মণ বিজয়ের অভিশাপ। তথাপি কর্ণ অকুতভয়, অপরাজেয়। কর্ণ প্রজাবৎসল নৃপতি। তাঁর নিকট থেকে কোনো প্রার্থী কোনোদিন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়নি। দাতা কর্ণের খ্যাতি তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কর্ণ অকৃতদার, কেননা কোনো ক্ষত্রিয় রাজা সূতপুত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি নন। আবার কর্ণও কোনো হীন জাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন না।

অঙ্গরাজ্যের রাজপ্রসাদ থেকে গঙ্গা বেশ খানিকটা দূর। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে এই দূরত্ব অতিক্রম করে কর্ণ রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান করেন। স্নানান্তে দীর্ঘসময় জপ, তপ আর সূর্যবন্দনা। উদীয়মান সূর্যরশ্মি যেন কর্ণের সর্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয়। উদীয়মান সূযের দিকে তাকিয়ে কর্ণ দেখতে পান অতি আপন কাউকে। প্রভাত-সূর্যের অদর্শনে কর্ণ বিচলিত হয়ে পড়েন। এক ভোরে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। গাঢ় মেঘের অন্তরালে উদীয়মান সূর্যদেব। কর্ণ পবনাস্ত্রে মেঘ বিতারিত করে সূর্য দর্শন করলেন। স্নান সেরে যখন প্রাসাদে ফেরেন তখন সিংহদুয়ারে প্রার্থীদের ভিড়। তাদের নানা চাহিদা। হাসিমুখে রাজা তাঁদের সব চাহিদা পূরণ করেন। এভাবেই শুরু হয় রাজা কর্ণের দিন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছন্দ পতন হলো। সেদিনও কর্ণ গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছেন, হঠাৎ পথের পাশে এই এক কুটীর থেকে নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব থামিয়ে কুটীর অঙ্গনে উপস্থিত হলেন কর্ণ। অনুসন্ধান করে জানলেন এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধার একমাত্র কন্যা পদ্মাবতী। গতরাতে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। বর্তমানে পিতার সৎকার এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। রাজা তাকে আত্মপরিচয় দিয়ে ক্রন্দন থেকে বিরত করলেন। যথোচিতভাবে তার পিতার সৎকার করালেন। তার সেবার জন্য দাসী এবং রক্ষী নিয়োগ করলেন। যথাসময়ে সেই ক্ষত্রিয় যোদ্ধার পারলৌকিক কার্য সমাধান হলো। এবার কন্যার দিকে নজর দিলেন কর্ণ। অসাধারণ রূপবতী পদ্মাবতী, অত্যন্ত সুশীলা, রাজরানি হওয়ার যোগ্য কন্যা। এখন তার চিন্তা রাজানুকূল্যে আর কতদিন চলবে? কর্ণ একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন প্রাসাদে। রাজকীয় রথ পদ্মাবতীকে নিয়ে প্রবেশ করল অঙ্গ রাজপ্রাসাদে। পরিচারিকা তাকে নিয়ে গেল রাজসন্নিধানে, বসাল উত্তম আসনে। রাজা কর্ণ বিন্দুমাত্র ভনিতা না করে পদ্মাবতীকে বললেন তার আপত্তি না থাকলে কর্ণ তাকে বিবাহ করতে রাজি আছেন, তার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করছে। লজ্জিতা পদ্মাবতী সবদ্বিধা দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে প্রণাম করে রাজা কর্ণের পদতলে পতিত হলেন।

অঙ্গরাজ্যের রানি হলেন পদ্মাবতী। কয়েকদিন উৎসবের জোয়ারে ভেসে গেল অঙ্গরাজ্য। হস্তিনাপুর থেকে দুর্যোধন পাঠালেন অনেক মহার্ঘ্য উপঢৌকন। শুদ্ধশীলা পদ্মাবতী হয়ে উঠলেন রাজা কর্ণের প্রকৃত সহধর্মিণী। স্বামীর দান ধ্যান ও অন্যান্য ধর্মে-কর্মে যথাযথ অংশগ্রহণ করেন পদ্মাবতী। যথাসময়ে এক সর্বসুলক্ষণ যুক্ত পুত্র প্রসব করেন পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণরা এই পুত্রের নামকরণ করেন বৃষসেন।

* * * * *

হস্তিনাপুরে তখন শুরু হয়েছে এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। দুই ভাইয়ের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হলেও যেহেতু জন্মান্ধ, তাই পাণ্ডু রাজা হলেন। পাণ্ডুর অকালমৃত্যুর পর আবার ভীষ্মের নির্দেশে বিদুরের সহায়তায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যপাট চালাচ্ছেন। ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলছে এবার যৌবরাজ্যে বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রকে অভিষিক্ত করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক। কিন্তু পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির রাজপুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, তাই নীতিগতভাবে বাধ্য হয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করতে হলো। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ায় হস্তিনাপুরের প্রজারা আনন্দিত হলো। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুররা প্রীত হলেন। আবার একজন ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। তিনি দুর্যোধন। নগরে, হাটে-বাটে সর্বত্র যুধিষ্ঠিরের গুণগান। এতে দুর্যোধনের গাত্রদাহ আরও বেড়ে গেল। আপনজনদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন দুর্যোধন। মাতুল শকুনি, অনুজ দুঃশাসন, অঙ্গরাজ্য থেকে ছুটে এলেন মিত্র কর্ণ। প্রাথমিক মন্ত্রণার পর বিরসবদনে দুর্যোধন গেলেন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। বোঝালেন বর্তমানে প্রজারা চাইছে ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে যুধিষ্ঠির রাজা হোক। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা হিসেবে আর কেউ চাইছে না। হয়তো পিতামহ ভীষ্মেরও এই মত। যুধিষ্ঠির রাজা হলে তার পুত্র রাজা হবে, দুর্যোধন, দুঃশাসন-সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা হবে প্রজা। ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করার জন্য দুর্যোধন আরও বললেন—আমার জন্ম বৃথা, জীবন বৃথা, এই শরীর বৃথা, পরভাগ্যজীবী হয়ে আমি বাঁচতে চাই না। আপনার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করব।

পুত্রের এহেন বাক্য ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে শেলের মতো বাজল। আবার মন্ত্রণাসভা বসল শকুনি, কর্ণ আর দুঃশাসনদের নিয়ে। দীর্ঘ মন্ত্রণার পর সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো পাণ্ডবদের হস্তিনাপুর থেকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু বিনা করণে পাণ্ডবদের দূরে পাঠাতে গেলে তারা সম্মত হবে কেন? তাছাড়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর তাঁরা রাজি হবেন না। বিনা কারণে পাণ্ডবদের দূরে কোথাও পাঠালে প্রজাবিদ্রোহ ঘটতে পারে। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। দুর্যোধন প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে অনেক অমাত্য ও রাজপুরুষদের নিয়োগ করলেন যারা ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে নগর বারণাবতের মহিমাকীর্তন করতে লাগল। বারবার এই নগরের মহিমা শুনে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বারণাবত যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। স্বেচ্ছায় যুধিষ্ঠিরের বারণাবত যাবার আগ্রহ দেখে ধৃতরাষ্ট্রর বললেন— ধরাধামে বারণাবত শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান মহেশ্বর সেখানে নিত্য অবস্থান করেন। তুমি বারণাবত যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছ দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। তুমি মাতা কুন্তী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন বারণাবতে থেকে এস।

অতি দ্রুত প্রস্তুতি সমাপ্ত হলো। যুধিষ্ঠির হৃষ্টমনে মাতা ও ভ্রাতাদের নিয়ে যাত্রা করলেন নগর বারণাবতের পথে। এদিকে হস্তিনাপুরের এক কক্ষে বসেছে অত্যন্ত গোপন মন্ত্রণাসভা। দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ আর দুঃশাসন সেখানে উপস্থিত। যত কুকর্মে সিদ্ধহস্ত মন্ত্রী পুরোচন। দুর্যোধন তাকে নির্দেশ দিলেন পাণ্ডবেরা বারণাবতে পৌঁছানোর আগে, তাদের বসবাসের জন্য দাহ্যপদার্থ দিয়ে এক গৃহ নির্মাণ করতে হবে। পাণ্ডবরা ওই গৃহে বসবাস শুরু করলে গভীর রাতে অগ্নিসংযোগ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের পুড়িয়ে মারতে হবে। এই কাজের জন্যে পুরোচন পাবে অশাতীত পুরস্কার।

দুর্যোধনের এই চক্রান্তে যখন বিদুর গুপ্তচরের মাধ্যমে জেনে ফেললেন। বিদুরও এক বিশ্বস্ত খনক পাঠিয়ে সেই জতুগৃহের ভিতর থেকে দূরের জঙ্গল পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটিয়ে রাখলো। যাতে কোনো বিপদ ঘটলে পাণ্ডবেরা এই সুড়ঙ্গপথে পালাতে পারে। যাত্রার সময় বিদুর যুধিষ্ঠিরকে সংকেতের মাধ্যমে অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক থাকার ইঙ্গিত দিলেন। বারণাবতের সেই জতুগৃহ সম্পর্কে পাণ্ডবেরা সচেতন থাকল। একদিন গভীর রাতে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করল। পাণ্ডবেরা কুন্তী-সহ সেই সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেল। দৈবযোগে সেদিন সন্ধ্যায় পঞ্চপুত্র-সহ এক নিষাদরমণী সেই গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ভস্মীভূত হলো। গভীর রাতে অগ্নি দেখে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে জল সিঞ্চন করে অগ্নি নির্বাপণ করে। ভস্মীভূত গৃহমধ্যে পঞ্চপুত্র-সহ সেই নিষাদ রমণীর বিকৃত দগ্ধদেহ দেখতে পায়। সবার ধারণা কুন্তী-সহ পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহে ভস্মীভূত হয়েছে। এই সংবাদ হাস্তিনাপুরে পৌঁছে যায়। পরিকল্পনা সার্থক ভেবে দুর্যোধন তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠে। পঞ্চপাণ্ডব কুন্তী-সহ তখন গভীর অরণ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে। পাণ্ডবদের আত্মীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনকে সাধারণ প্রজারা ধিক্কার আর অভিসম্পাতে ভরিয়ে দিল।

* * * *

কুন্তী-সহ পঞ্চ পাণ্ডব সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছেন। এক পাহাড়ি উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। তখন সবে ভোর হচ্ছে, রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। চারদিকে ঘন বনানী কিন্তু কোথাও কোনো পশুপাখি দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। রাক্ষসরাজ হিরম্ব ও তার ভগ্নী হিড়িম্বার অধীনে এই বন। তারা বনের পশুপাখি নিত্য সংহার করে, তাই প্রাণভয়ে পশুপাখি দূরদূরান্তে পালিয়ে গেছে। হিড়িম্বা রোজ

সকাল হলে শিকারের সন্ধানে বেরোয়। যা সংগ্রহ করতে পারে দুই ভাই-বোন মিলে আহার করে। সেদিন সকালে ছয় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হলো হিড়িম্বার। জিহ্বা লক্‌লক্ করে উঠল তার। সন্তর্পণে এগিয়ে এল হিড়িম্বা শিকারের দিকে। কিন্তু এই মনুষ্যদলের মধ্যে একজন পুরুষ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহধারী। প্রশস্ত বক্ষদেশ। তাকে দেখে রাক্ষসী হিড়িম্বার নারীসত্তা জাগ্রত হলো। সে এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে সেই পুরুষটির কাছে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে তার কাছে প্রেম নিবেদন করল। পুরুষটি প্রথমে সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেও পরে মাতার আদেশে তাকে সঙ্গ দিতে সম্মত হলো। এদিকে বোনের বিলম্ব দেখে হিড়ম্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বোনের সন্ধানে এসে তাকে এক মনুষ্যের সান্নিধ্যে দেখে হিড়িম্বাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ভীম তাকে রক্ষা করার জন্য হিড়িম্বকে হত্যা করেন। পরে মাতা ও অগ্রজের নির্দেশে ভীম সেই রাক্ষসী হিড়িম্বাকে রাক্ষস মতে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তান বীর ঘটোৎকচ। সেই বনভূমিতে কিছুদিন অবস্থানের পর হিড়িম্বা তাঁদের একচক্রা নামে এক নগরে পৌঁছে দেয়। সেই নগরে তাঁরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এক কুম্ভকারের গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে বক নামে এক নিষ্ঠুর রাক্ষসকে বধ করে ভীম নগরবাসীদের পরিত্রাণ করেন। একদিন ভিক্ষা অন্বেষণে বেরিয়ে তাঁরা সংবাদ পান পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, কন্যা পাঞ্চালীর জন্য এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছেন। রাজপথ দিয়ে নৃপতিবর্গ চলেছেন সেই স্বয়ম্বর সভায়। পঞ্চপাণ্ডব সিদ্ধান্ত নেন তাঁরাও সেই স্বয়ংবর সভা দেখতে যাবেন। পাঁচভাই পদব্রজে চললেন পাঞ্চালের উদ্দেশে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছালেন পাঞ্চালে।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যজ্ঞসেনের অভিলাষ ছিল যে পাণ্ডুতনয় অর্জুনের হস্তে আপন দুহিতা দ্রৌপদীকে সম্প্রদান করবেন। কিন্তু জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবের ভস্মীভূত হওয়ার সংবাদে যজ্ঞসেনের সেই অভিলাষ অপূর্ণ থেকে গেল। তবে দ্রুপদ যজ্ঞসেনের বিশ্বাস এত সহজে পাণ্ডবদের মৃত্যু হতে পারে না। তারা হয়তো কোথাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই কথা ভেবে দ্রুপদ যজ্ঞসেন এমন এক সুদৃঢ় দুরামনীয় শরাসন প্রস্তুত করালেন এবং কৃত্রিম আকাশ যন্ত্র নির্মাণ করে তার সঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপন পূর্বক ঘোষণা করলেন, 'যে ধনুর্ধর এই শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক যন্ত্র অতিক্রম করে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে সমর্থ হবেন, আমি তাকেই কন্যা দান করব।' দ্রুপদ যজ্ঞসেনের দৃঢ় বিশ্বাস যে কৌন্তেয় অর্জুন ছাড়া অন্য কেউ এই লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হবে না।

এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ামাত্র চারদিক থেকে নৃপতিরা কেউ রথে, কেউ-বা গজে পাঞ্চালের দিকে অগ্রসর হলেন। রাজা দ্রুপদ রাজন্যবর্গের যথাযথ বরণ ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দুর্যোধন প্রমুখ কৌরবেরা। মদ্ররাজ শল্য, শিশুপাল, মগধরাজ জরাসন্ধ, ভগদত্ত দন্তবক্র, এলেন বৎসরাজ, কোশলাধিপতি-সহ ভারতবর্ষের সব রাজ্যের রাজা এবং রাজকুমারেরা।

সভাস্থলে দাঁড়িয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—ভগ্নী যাজ্ঞসেনী, এই সমুদয় নৃপতিবর্গ লক্ষ্যবিদ্ধ করতে সমবেত হয়েছেন। যিনি এই কার্যে সফলকাম হবেন তুমি তাঁর গলায় বরমাল্য দেবে।

এইবার সেই বীর্যবান বলদর্পী নৃপতিরা একে একে অগ্রসর হলেন। সেই ধনুকে শর সংযোজন করা দূরে থাক, অনেকে ধনুটি তুলতেই পারলেন না। কেউ-বা ধনু উত্তোলন করে, শরযোজনা করতে গিয়ে দূরে নিক্ষিপ্ত হলেন। কারও অঙ্গের আভরণ সকল বিক্ষিপ্ত হলো। রাজন্যবর্গের এই দুর্দশা দর্শনে এবং কৌরবগণের উৎসাহে কর্ণ এবার এগিয়ে গেলেন রঙ্গস্থলের দিকে। বীরদর্পে ধনুক উত্তোলনপূর্বক, জ্যা-সংযুক্ত করে শরসন্ধান করলেন। রাজন্যবর্গ নিশ্চিত যে কর্ণই লক্ষ্যভেদে সক্ষম হবেন, পাণ্ডবরাও ভাবলেন দ্রৌপদীর বরমাল্য কর্ণই লাভ করবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দ্রৌপদী দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না।

সভাস্থলে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। বিমর্ষ কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে শরাসন পরিত্যাগ করলেন। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে তাঁর সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হলো উষ্ণ রক্তস্রোত। সগৌর মুখমণ্ডল হয়ে উঠল রক্তিম। প্রচণ্ড জিঘাংসা সংবরণ করলেন কর্ণ। মিত্র দুর্যোধন কর্ণের হস্তগ্রহণ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অপমানের প্রতিশোধ একদিন নেবেন।

ক্ষত্রিয়কুল যখন বিফল মনোরথ হয়ে একে একে প্রস্থান করছেন তখন চেদিরাজ শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্ন জানু হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। মগধরাজ মহাবীর জরাসন্ধও শরসন্ধান করতে চেষ্টা করে ধরাশায়ী হলেন এবং গাত্রোত্থান করে আপন রাজধানীতে প্রস্থান করলেন। অতঃপর মদ্ররাজ শল্য সেই ধনুকে জ্যা-আরোপ করতে জানু পেতে ভূতলে পতিত হলেন। এইভাবে সভাস্থ অবশিষ্ট নৃপতিগণও সেই মহাধনুকে শরসন্ধানে ব্যর্থ হলে দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বললেন, তাঁদের মধ্যে যদি তেজস্বী ধনুর্ধর কেউ থাকেন তবে লক্ষ্যভেদের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। এই আহ্বান শুনে ব্রাহ্মণরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মণ সভায় উপবিষ্ট পঞ্চপাণ্ডব, যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে অর্জুন সেই রঙ্গস্থলের দিকে অগ্রসর হলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের কেউ কেউ তাঁকে এই দুঃসাহসিক কাজে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। কেউ নিন্দা করলেন। আবার অনেকে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখে উৎসাহ প্রদান করলেন।

বীরদর্পে রঙ্গস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন অর্জুন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে এই মহাক্ষত্রিয়কে দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন। অর্জুন শরাসনের কাছে পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হলেন, ইষ্ট

মহাদেবকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলেন। অতঃপর কার্মক প্রদক্ষিণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে অনায়াসে ধনুক উত্তোলন করে তাতে জ্যা রোপণ করে শরসংযোজন করলেন। অতঃপর রন্ধ্রপথে জলমধ্যে দৃশ্যমান অতি কষ্টসাধ্য লক্ষ্যভেদ করে ভূপাতিত করলেন। অন্তরীক্ষে জয়দুন্দুভি বেজে উঠল। ব্রাহ্মণকুমারের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হলেন ব্রাহ্মণ মণ্ডলী। সহাস্যে এগিয়ে এলেন রাজা দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রৌপদী বরমাল্যে বরণ করলেন ব্রাহ্মণ কুমাররূপী অর্জুনকে। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত রাজন্যবর্গ হতচকিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করেন। এত শক্তিধর রাজাদের উপস্থিতিতে এই কন্যারত্নকে নিয়ে যাবে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, এ সমগ্র রাজন্যবর্গের অপমান! অতএব সমবেতভাবে আক্রমণ করে ছিনিয়ে নাও দ্রুপদকন্যাকে, জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। তাহলেও রাজাদের সম্মান রক্ষিত হবে। নৃপতিদের এই বিড়ম্বনার জন্য দায়ী যজ্ঞসেন দ্রুপদ। তাই আগে আক্রমণ করতে হবে দ্রুপদকে। রাজন্যবর্গ ধেয়ে আসছে দ্রুপদের দিকে। ভীত দ্রুপদ আশ্রয় নিলেন ব্রাহ্মণদের কাছে। অর্জুন ও বীর বৃকোদর ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন দ্রুপদের সামনে। অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে প্রতিরোধ করছেন সম্মিলিত রাজাদের। ইতিমধ্যে ভীম এক বিশাল মহীরুহ উৎপাটিত করে সেই রাজাদের আক্রমণ করলেন। কালান্তক যমের মতো ভীমের আক্রমণে মুহূর্তের মধ্যে রাজন্যবর্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু কর্ণ অনড়ভাবে আক্রমণ করলেন অর্জুনকে। তাঁর সেনাদলও বিপুল উৎসাহে অর্জুনকে আক্রমণ করল। অর্জুন প্রতিআক্রমণে তাদের পর্যুদস্ত করলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জুনের বীরত্ব দেখে অভিভূত হলেন এবং অস্ত্রসংবরণ করে অর্জুনকে বললেন—

—হে বিপ্রবর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুণ। আপনার দেহকান্তি, শৌর্যবীর্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীতি হলাম। হে দ্বিজোত্তম, আমার বোধ হচ্ছে আপনি মূর্তিমান ধনুর্বেদ অথবা রাম, সূর্য বা স্বয়ং বিষ্ণু। আত্মপ্রচ্ছাদনের জন্য বিপ্ররূপ ধারণ করেছেন, আর আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমি যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ করলে ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় অর্জুন ছাড়া অন্য কোনো যোদ্ধা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না।

প্রত্যুত্তরে অর্জুন বললেন—হে কর্ণ! আমি ধনুর্বেদ নই, রাম কিংবা সূর্যও নই। আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্মণ এবং পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হয়েছি। আজ তোমাকে পরাজিত করার জন্য এই সমরে অবতীর্ণ হয়েছি।

ব্রাহ্মণের প্রতি কর্ণের অচলাভক্তি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার জন্যও তিনি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের দুর্জয় ব্রহ্মতেজ স্বীকারপূর্বক কর্ণ অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে পরান্মুখ হলেন। ভীম তখনও প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেক রাজাকে পর্যুদস্ত করে শেষে শল্যের মুখোমুখি হলেন। দুজনেই বীর, কিন্তু ভীম অচিরেই শল্যকে ভূপাতিত করলেন, কিন্তু তাকে বধ করলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ শেষ হলে রাজন্যবর্গ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবরাও দ্রৌপদীকে নিয়ে চললেন একচক্রা নগরে কুম্ভকার গৃহে মাতা কুন্তীর কাছে।

এদিকে সমস্ত দিবস অতিক্রান্ত। রজনী সমাগত। পঞ্চপুত্রের দেখা নেই। কুন্তী মহাচিন্তায়। একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যমপুত্র ভীমসেনকে নিয়ে মাতার চিন্তা বেশি, প্রতিটি ক্ষেত্রে কারও না কারও সঙ্গে তার বিরোধ লেগে আছে। ভীমের ডাকে কুন্তীর চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। ভীম মাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

মা, আজ সারাদিন তোমার উপবাসে কেটেছে। আমরাও সারাদিন কলহের মধ্যে কাটিয়েছি। সন্ধ্যায় ভিক্ষা মিলেছে। দেখে যাও।

মাতা কুন্তী পুত্রদের আগমনে আনন্দে উচ্ছ্বাসে বললেন—যা এনেছ পাঁচভাই ভাগ করে নাও।

একথা বলে দ্রুত বাইরে এলেন, পাঁচ পুত্রের শিরচুম্বন করে দেখেন পেছনে দাঁড়িয়ে শশীমুখি দ্রুপদ কন্যা। পুত্রদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। আবেগের বশে যে কথা বলে ফেলেছেন তার জন্য বিচলিত হলেন। এদিকে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দ্রৌপদীকে যেতে দেখে দ্রৌপদীর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছদ্মবেশে তাদের অনুসরণ করেন। কৃষ্ণ, বলরামও দ্রুপদসভা থেকে পাণ্ডবদের অনুসরণ করে কুম্ভকারগৃহে এসে কুন্তীর সঙ্গে মিলিত হলেন। দৃষ্টদ্যুম্নের কাছে ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে দ্রুপদ পঞ্চপাণ্ডব কুন্তী ও দ্রৌপদীকে পাঞ্চালে নিয়ে আসেন। সর্বজ্ঞ মুনিঋষিদের উপস্থিতিতে ব্যাসদেব ঘোষণা করলেন পূর্বজন্ম অনুসারে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীই ভবিতব্য।

* * * * *

এর মধ্যেই আপন বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেছে কর্ণ। তার সেই দিগ্‌বিজয়ের তুলনা কেবল অর্জুনের বীরত্বের সঙ্গেই করা যেতে পারে। শুরুতেই কর্ণ পরাজিত করেছিল পাঞ্চালরাজ দ্রপদকে, উত্তর ভারতের ভগদত্তকে। তারপর আরও উত্তরে পার্বত্যরাজ্য নেপালও তাঁর কাছে পরাজিত হয়।

পূর্বদিকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, র্ষকখণ্ড— আরও দূরে আবশীর যোধ্য ও অহিক্ষত্র দেশ।

দক্ষিণভারতে পরাজিত হলেন ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী, কেরলের রাজা নীল। ভদ্র রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, ম্লেচ্ছ,

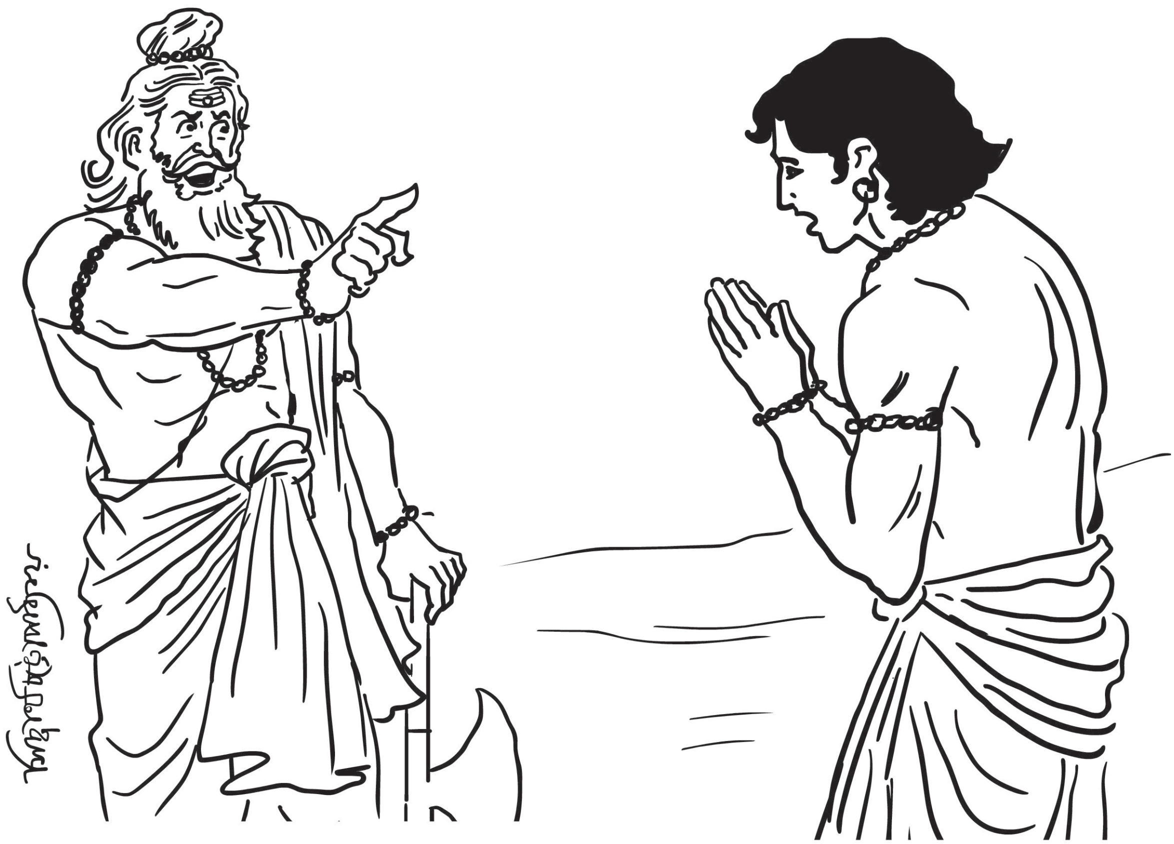

যবন ও শশব প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিগুলি। এরা কেউই কর্ণের পরাক্রমের কাছে দাঁড়াতে পারেনি।

অবন্তীদেশের রাজা ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সঙ্গে সামনীতি সন্ধিতে মিলিত হয়ে কর্ণ জয় করলেন সমগ্র পশ্চিম ভারত।

দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত করে মহাবীর কর্ণ ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। দুর্যোধন বিজয়তোরণ নির্মাণ করে কর্ণকে অভ্যর্থনা জানাল।

চিরদিন চির অবজ্ঞাত, স্নেহবঞ্চিত মহাবীর কর্ণের এই দিগ্‌বিজয় তাঁর নিজের জন্য নয়। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের বিজয় মুকুট যে হাসতে হাসতে পরিয়ে দিল মিত্র দুর্যোধনের শিরে। সুহৃদ দুর্যোধন, বন্ধু দুর্যোধন, হোক সে পাপমতি, কুচক্রী, অধার্মিক। তবুও সে তার মিত্র, অসময়ের আশ্রয়দাতা, রাজ্যলাভের একমাত্র সহায়ক।

কর্ণের সুশাসনে অঙ্গরাজ্য তখন সমগ্র ভারতবর্ষে এক সেরা রাজ্য। সর্বত্র সুখসমৃদ্ধি, প্রজারা প্রতিনিয়ত ধর্ম-কর্মে নিরত। দানশীলতায় কর্ণের সমকক্ষ কোনো রাজা সমসাময়িক ভারতবর্ষে আর ছিল না। শুধু অঙ্গরাজ্য নয় দূরদূরান্তের রাজ্য থেকেও প্রার্থীরা সবসময় সমবেত হতো অঙ্গের প্রাসাদ অঙ্গনে। রানি পদ্মাবতী আক্ষরিক অর্থেই সহধর্মিণী। পুত্র বৃষকেতু শৈশব থেকেই বীর, ধর্মশীল, অকুতোভয়। এক কথায় অঙ্গরাজ্য এক ধর্মরাজ্য।

একদিন রাজসভায় বসেছেন কর্ণ। বিচারপর্ব শেষ, শেষ দান পর্বও। এমন সময় এলেন এক প্রার্থী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত অবয়ব। তাঁকে দেখে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন কর্ণ। উত্তম আসনে বসালেন। হাত যুক্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন—দেব, আদেশ করুন আপনার কী সেবা করতে পারি?

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বললেন—আমি নরমাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক। ব্রাহ্মণের কথা শুনে চমকে উঠলেন কর্ণ। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য রক্ষীকে আদেশ দিলেন কারাগার থেকে কোনও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কোনো বন্দিকে হত্যা করে, তার মাংস দিয়ে ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণ করতে।

ব্রাহ্মণ কর্ণের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন—

তা হবে না। আমি তোমার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করতে চাই।

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল কর্ণের, কিন্তু স্থির হতেও সময় লাগল না। শান্তকণ্ঠে বললেন—

তাই হবে দেব। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

সভাকক্ষে একটা গুঞ্জন উঠল। আমাত্যগণ, সেনাধ্যক্ষগণ সরোষে দণ্ডায়মান হলেন। ব্রাহ্মণ আবার বললেন—আমার

কথা এখনও শেষ হয়নি। তোমার পুত্রকে বধ করবে তুমি আর তোমার রানি পদ্মাবতী।

আর্তনাদ করে উঠলেন সেনাধ্যক্ষ বীরবাহু—

মহারাজ! ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এ এক নরপিশাচ। আদেশ করুন এই মুহূর্তে এর শিরশ্ছেদ করি। যদি ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় সেই পাপের ভাগী আমি।

কর্ণ ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন বীরবাহুকে। ইতিমধ্যে সবকিছু জ্ঞাত হয়ে বৃষকেতু উপস্থিত হয়েছে পিতার সামনে। বীরদর্পে বলল—পিতা! আপনি হৃষ্টমনে এই ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার দাতাকর্ণ নামে কলঙ্ক লাগতে দেবেন না। আমার এই নশ্বর দেহ যদি ব্রাহ্মণের সেবায় লাগে তবে আমার জীবন সার্থক। আমি মাকে ডেকে আনছি আপনারা এই পূজ্য ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূরণ করুন।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন—দাতা কর্ণ, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তোমরা অক্ষম হলে বলো, আমি অন্যত্র আহারের সন্ধান করি।

করজোড়ে কর্ণ বললেন—না প্রভু, আপনার অভিপ্রায় আমরা পূরণ করব।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন—আমার আরও একটা শর্ত আছে।

কর্ণ বললেন—আবার শর্ত!

পুত্রকে বধ করার সময় তোমাদের চোখ দিয়ে যেন একফোঁটা অশ্রুপাতও না হয়।

এই সংবাদ ততক্ষণে অন্তঃপুরে পৌঁছে গেছে। আলুথালু বেশে রাজসভায় ছুটে এসেছেন রানি পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন—না, প্রভু না, আপনি আমার মাংস ভক্ষণ করে তৃপ্ত হোন। আমার সন্তানকে রেহাই দিন।

দাতা কর্ণ, আমি তাহলে অন্যত্র চললাম।

না প্রভু, আমি সত্যভ্রষ্ট হবো না। শান্ত হও পদ্মাবতী। সুযোগ্যা সহধর্মিণীর কর্তব্য পালন করো। এসো, আমার হাতে হাত রেখে অস্ত্রধরো। বৎস বৃষকেতু, নারায়ণ স্মরণ করো। পরজন্মে যদি সাক্ষাৎ হয় পুত্রহন্তা, পাষণ্ড বলে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বলল বৃষকেতু—

পিতা, আমার জীবনদেবতা, দাতা কর্ণ, আমার গর্ব। জন্ম জন্মান্তরে যেন আমি আপনাদের সন্তান হয়ে জন্মাই। আর দেরি করবেন না পিতা। কর্তব্য পালন করুন।

হেঁটমুণ্ড হয়ে বসল বৃষকেতু। কর্ণ বললেন—পদ্মাবতী আমার হাতে হাত রেখে অসি ধারণ করো।

নিষ্কোষিত করলেন তলোয়ার। দুজনে একসঙ্গে অস্ত্রধারণ করে চক্ষুমুদ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তারপর প্রচণ্ড আঘাত। উপস্থিত সভাসদ্গণ সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করলেন। কিন্তু কোনো আর্তনাত শোনা গেল না, শোনা গেল সমধুর বংশীধ্বনি। সভয়ে চক্ষু উন্মিলীত করলেন সকলে। চোখের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য। স্বয়ং বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে বংশীবাদন করছেন সামনে জোড় হাতে বসে আছে বৃষকেতু, মুখে স্মিতহাস্য। এবার অশ্রুজলে সিক্ত হলেন রাজদম্পতি। কর্ণ বললেন—

প্রভু! এ তোমার কী লীলা?

বংশীধারী বললেন—সত্যি তুমি দাতা কর্ণ। চন্দ্র সূর্য যতদিন উদিত হবে পৃথিবী ততদিন দাতা কর্ণের নাম উচ্চারণ করবে। ধন্য কর্ণ, তুমি ধন্য।

বংশীধারীকে আর দেখা গেল না।

* * * * *

দুর্যোধনের একান্ত বিশ্বাসভাজন গুপ্তচরেরা সংবাদ দিয়ে গেছে। জতুগৃহে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়নি। সম্প্রতি পাঞ্চাল রাজ্যে লক্ষভেদ করে অর্জুন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেছে। মাতা কুন্তীর আদেশে এবং ব্যাসদেবের বিধানে পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রতি তাঁরা মাতা কুন্তী-সহ পাঞ্চাল রাজ্যে দ্রুপদ রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন।

এই সংবাদে দুর্যোধনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জরুরি মন্ত্রণা প্রয়োজন, মিত্র বসুসেন কর্ণ এই মুহূর্তে অঙ্গরাজ্যে। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপ, খুল্লতাত বিদুর এঁরা প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে বার্তাবাহক ছুটল অঙ্গদেশে। বার্তা পেয়ে দ্রুত হস্তিনায় পৌঁছে গেলেন কর্ণ। এদিকে পাণ্ডবদের কুশল সমাচার বিদুর পৌঁছে দিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পাণ্ডবদের কুশল সংবাদে অন্ধ রাজার অন্তর দগ্ধ হলেও বিদুরের কাছে তা গোপন করে বললেন—

অতি উত্তম, তারা পাণ্ডুর পুত্র হলেও আমি তাদের আপন সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাদের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। মহাবীর পাণ্ডবেরা মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্ছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদের আর নিস্তার নেই। শক্তিশালী দ্রুপদের পরমাত্মীয় হয়ে এবার তারা কৃতকার্য হওয়ার নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বোধোদয় হয়েছে ভেবে বিদুর হৃষ্টমনে অগ্রজের পাদস্পর্শ করে বললেন—

মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

এইকথা বলে বিদুর সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলে, এতক্ষণ অন্তরালে থাকা দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে আগমন করল।

দুযোর্ধন বলল—

তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোনোপ্রকার গোপন

আলোচনা করতে পারবো না। তাই আমাদের অভিলাষ আপনার কাছ্যে ব্যক্ত করি। আপনার ইচ্ছা আমরা বুঝতে পারছি না। শত্রুদের সৌভাগ্যকে আপনি আপন সৌভাগ্য মনে করছেন। বিদুরের নিকট সপত্নদের স্তুতিবাদ করছেন। হে তাত! শত্রুদের উৎখাত করা এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য। এক্ষণে এই বিষয়ে আমি এবং মিত্র কর্ণ আপনার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করতে চাই।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

তোমাদের যা পরিকল্পনা তাতেই আমার সম্মতি থাকবে। বিদুরের কাছে অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। তাই আমি তাঁর কাছে সর্বদা পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করে থাকি।

সরলমতি বিদুর আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারে না। এখন হে দুর্যোধন তুমি যা বিবেচনা করেছ বলো। রাধেয়, তুমিও যা মনে করেছ বল। এসময়ে বলার কোনো বাধা নেই।

দুর্যোধন বললেন—

তাত! আমার বিবেচনায় পাণ্ডবতনয়দের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে তাদের প্রথমে হীনবল করতে হবে। কুশলী পুরুষদের নিয়োগ করতে হবে যারা সুকৌশলে বহুপতির অশেষদোষ উল্লেখপূর্বক দ্রৌপদীর হৃদয় দূষিত করে কলহ উৎপাদন করুক। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী বলবান পুরুষ গোপনে ভীমসেনকে হত্যা করুক, যেহেতু ভীম তাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা বলবান। অর্জুন তার সাহসেই সাহসী হয়ে আমাদের তৃণতুল্য জ্ঞান করে। বৃকোদর পাশে থাকলে অর্জুন অপরাজেয়। কিন্তু ভীম ছাড়া অর্জুন একাকী রণস্থলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হতে পারে কিনা সন্দেহ। ভীম ব্যতীত তারা নিজেদের দুর্বল এবং আমাদের অধিক বলবান ভেবে আর রাজ্যের প্রত্যাশা করবে না। অথবা তাদের হস্তিনাপুর আনার জন্য রাধেয়কে প্রেরণ করুন তাদের একত্রিত করে কৌশলে যমালয়ে প্রেরণ করুন।

হে তাত! এই উপায়সমূহের মধ্যে আপনি যা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তার প্রয়োগ করুন। মিত্র কর্ণ, তোমার মতামতও ব্যক্ত কর।

কর্ণ এতক্ষণ কোনও মন্তব্য করেননি। এবার বললেন—

মিত্র দুর্যোধন! তোমার পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত বোধ হচ্ছে না। আগেও তুমি অতি সূক্ষ্ম কৌশলদ্বারা পাণ্ডবদের নিগ্রহের চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তাতে কৃতকার্য হতে পারনি। যখন পাণ্ডবেরা শৈশবাবস্থায় সহায়বিহীন হয়ে এই প্রাসাদে অবস্থান করছিল তখনও অনেক চেষ্টা করেও তুমি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারনি। বর্তমানে তারা আত্মশক্তিতে প্রবল এবং বৈদেশিক সহায় সম্পন্ন। যারা একপত্নীতে অনুরক্ত তাদের সৌভ্রাতৃত্ব অবশ্যই বদ্ধমূল। সুতরাং তাদের পরস্পর ভেদ উপস্থিত করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। অতএব হে তাত, পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হতেই তাদের যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পক্ষ প্রবল এবং পাঞ্চাল পক্ষ হীনবল থাকতেই তাদের প্রহার করতে হবে।

মিত্র দুর্যোধন, যতক্ষণ পর্যন্ত পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল রাজের পরিপূর্ণ সামরিক সাহায্য প্রাপ্ত না হচ্ছে এবং স্বয়ং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে পাঞ্চালদের সঙ্গে মিলিত না হচ্ছে তার আগে তোমার বিক্রম প্রকাশ কর। আমাদের সমবেত বিক্রমের দ্বারা পাণ্ডবদের পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করে নিঃসপত্ন রাজ্যভোগ কর।

কর্ণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

হে কৃতাস্ত্র, মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন। এই বীরবাক্য তোমারই উপযুক্ত বটে। কিন্তু এক্ষণে আমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সম্মতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরাগ। তোমরা দুইজন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করণীয় তা স্থির কর।

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় কর্ণ ও দুর্যোধন দুজনেই অত্যন্ত হতাশ হলেন তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে তাঁরা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন। কর্ণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্ম একদম সহমত পোষণ করলেন না। ভীষ্ম বললেন—পাণ্ডবদের সঙ্গে অযথা সংগ্রামে আমি তোমাদের সঙ্গে সহমত নই। আমার কাছে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ে সমান। গান্ধারীর পুত্ররা আমার কাছে যেমন, কুন্তীর পুত্ররাও তার চেয়ে কম নয়। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবেরা আমার, তোমার, দুর্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সর্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্ধরাজ্য প্রদানপূর্বক পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ হস্তিনাপুর তাদেরও পৈতৃক রাজ্য। দুর্যোধন তুমি যেমন ভাব এটি তোমার পৈতৃক রাজ্য; পাণ্ডবরাও সেরকম বিবেচনা করে থাকে। পাণ্ডবরা রাজ্য প্রাপ্ত না হলে শাস্ত্রানুসারে তোমারও এই রাজ্যে অধিকার নেই। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁদের পৈতৃক অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। রাজ্যে উভয় পক্ষেরই অধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, পাণ্ডবেরা এক মতাবলম্বী, ধর্মনিরত ও অধর্মপরান্মুখ। অতএব যদি ধর্মরক্ষা করা কর্তব্য হয় এবং যদি আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

কর্ণ ও দুর্যোধনের চোখে মুখে বিরক্তিরেখা ফুটে উঠলেও তাঁরা প্রকাশ্যে এখন কোনো কথা বললেন না। এবারে আচার্য দ্রোণ বললেন।

—মহারাজ, শাস্ত্রে আছে মন্ত্রণার্থে হিতৈষী বিজ্ঞ পুরুষদের মতকে মান্যতা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত আমারও সেই মত। পাণ্ডবদের যথোচিত রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, তাতে ধর্ম রক্ষা হয়। আপনি সত্বর পাঞ্চাল রাজ্যে

মহারাজ দ্রুপদের কাছে কোনো রাজপুরুষকে প্রেরণ করুন। এবং এই বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে পঞ্চপাণ্ডব-সহ দ্রৌপদীকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করুন। পাণ্ডবদের প্রত্যাগমনে আপনি ও দুর্যোধন যে সবিশেষ আগ্রহী, সেই রাজপুরুষ যেন তাও ব্যক্ত করেন। মহারাজ! গঙ্গাপুত্র মহামতি ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি সন্তানতুল্য পাণ্ডবদের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করুন।

পিতামহ ও গুরুর এমন প্রস্তাব শুনে ক্ষুব্ধ দুর্যোধন নিজে কিছু না বলে মিত্র কর্ণকে কিছু বলার জন্য ইঙ্গিত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কর্ণ তাঁরই প্রীত্যার্থে বলতে লাগলেন—মহারাজ! আপনি অর্থ ও মান দ্বারা সর্বদা যাঁদের সৎকার করে থাকেন, এবং সর্বকার্যে যাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করলেন না। এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী আছে? যিনি দুষ্টমন আর প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হতে পারেন? মহারাজ। যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদয় লোক বিরোধী হলেও আপনি অনায়াসে অভীষ্টলাভ করবেন। নতুবা একান্ত যত্ন করলেও অভীষ্ট লাভ অসম্ভব। এক্ষণে আপনি মন্ত্রীগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্যালোচনা করে দুষ্টের ও সত্যের বাক্য বিবেচনা করুন।

কর্ণের এই অশিষ্ট বচন শুনে আচার্য দ্রোণ বললেন—

কর্ণ! তুমি কেবল নিজের মনোগত ভাবদোষে এই কথা উল্লেখ করছ। হে দুষ্ট, তুমি পাণ্ডব সম্পর্কে রাজার কাছে আমাদের প্রতি দোষারোপ করছ। কর্ণ, আমি পরম হিতকর বাক্য বলেছি, তুমি সেই বাক্যকে পুষ্টবাক্য বলছ। যদি এর থেকে কোনো সুপরামর্শ প্রদান করতে পার কর। কিন্তু আমার মতে এর অন্যথা করলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হবে, সন্দেহ নেই।

আচার্যকে ক্রুদ্ধ দেখে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

আচার্য! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। দুর্যোধন, কর্ণ এরা চঞ্চল মতি। শাস্ত্র, ধর্ম ও বাস্তব সম্পর্কে এদের জ্ঞান সীমিত। এইবার আমি যিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, বাস্তববাদী আমার অনুজ শ্রী বিদুরের মতামত চাইছি।

বিদুর এতক্ষণ নীরবে সকলের মতামত শুনছিলেন। এবার রাজার আদেশ পেয়ে বললেন—

মহারাজ! হিতার্থীগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করবেন। কিন্তু আপনার শোনার ইচ্ছা না থাকলে সেই হিতকর বাক্যসমূহ বিফল হবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আপনি তা গ্রহণ করলেন না, আচার্য দ্রোণও আপনার পুত্র ও পাণ্ডবদের জন্য অনেক মঙ্গলদায়ক কথা বললেন। কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তা আপনার হিতকর বিবেচনা করলেন না। এখন এই দুই পুরুষসিংহ ছাড়া কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও আপনার পরমমিত্র, তা ভেবে স্থির করতে পারছি না। এঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, পরাক্রম ও বয়ঃক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহপরায়ণ। অতএব মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ মহারাজের অশুভ সংকল্পে মন্ত্রণা করবেন তা অকল্পনীয়।

মহারাজ! পৌর ও জনপদবাসীরা পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনে, তাঁদের দেখার জন্য অতিমাত্র উৎসুক হয়েছে, এইবার তাদের প্রিয়কার্য সম্পাদন করুন। দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এরা নিতান্ত অধার্মিক, দুর্বদ্ধি ও বালকস্বভাব। এদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি দুর্যোধনের অপরাধে এই মহান বংশ উচ্ছন্নে যাবে।

ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের বাখ্যা সম্যক অনুধাবন করে পাণ্ডবদের দ্রৌপদী-সহ সসম্মানে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচুর উপঢৌকন-সহ বিদুরকে রাজপ্রতিনিধি রূপে পাঞ্চাল রাজ্যে প্রেরণ করলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সেই স্থান ত্যাগ করলেন। বিদুরের সৌজন্যে অবিভূত পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ ও রাজপরিবারবর্গ আদরিণী রাজদুহিতাকে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে প্রভুত উপহার সামগ্রী ও দাসদাসী-সহ রাজকীয়ভাবে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করলেন।

হস্তিনাপুরে দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনির দল ছাড়া সমস্ত পুরবাসী আনন্দে মেতে উঠল। বধূমাতা-সহ কুন্তীপুত্রদের আগমন প্রতীক্ষায় নগরবাসীরা রাজপথের দু'ধারে সমবেত হবেন। সঙ্গে বরণডালা, মঙ্গলঘট, মঙ্গলশঙ্খ। অবশেষে নগরে প্রবেশ করলেন পাণ্ডবরা, বহুকাল পরে তাঁদের দর্শন করে পুরবাসীরা আনন্দে মাতোয়ারা। তাঁদের বরণ করতে গিয়ে সবাই উন্মাদপ্রায়। গান্ধারী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীরা নববধূ দ্রৌপদীকে ধর্মীয় আচার পালন করে সাদরে বরণ করলেন। অতঃপর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ গুরুজনদের পাদবন্দনা করে বিশ্রামার্থে নির্দিষ্ট আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আহারাদি ও বিশ্রামপর্ব শেষ হলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম পাণ্ডবদের আহ্বান করে এক মন্ত্রণা কক্ষে সমবেত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন—

বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আমার বাক্য শ্রবণ ও তার মর্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্ধাংশ গ্রহণ করে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে বাস কর। তাহলে দুর্যোধনের সঙ্গে তোমাদের পুনরায় বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, তেমনি অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদের সেইরূপ রক্ষা করলে আর কেউ তোমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। পিতামহ ভীষ্ম ও এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে নতুন রাজধানী পত্তন করে বসবাস করবেন।

পাণ্ডবেরা অর্ধরাজ্য প্রাপ্তির প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। অতঃপর গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে এবং তাঁদের চরণে প্রণিপাত করে সুহৃদ সখা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করলেন। অতি সুরক্ষিত ও রমণীয় এই নগর। নানাবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত এক সুরম্য প্রাসাদে পাণ্ডবেরা প্রবেশ করলেন। সশস্ত্ররক্ষী ও দাসদাসীরা তাঁদের সেবা যত্নের ত্রুটি রাখল না। পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে আগমনবার্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক এবং বিভিন্ন পেশায় সুনিপুণ শূদ্রগণ এসে আলাদা আলাদা স্থানে বসতি স্থাপন করল। অচিরেই ইন্দ্রপ্রস্থ এক সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হলো। এরমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। অর্জুন যাদবকন্যা বলারামের ভগ্নী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেছেন। অগ্নির রোগ মুক্তির জন্য কৃষ্ণ অর্জুন খাণ্ডববন দহন করেছেন সমস্ত প্রাণীকুল-সহ। একমাত্র বিশ্বকর্মার পুত্র দানবশিল্পী ময়দানবকে মুক্তি দেন। প্রত্যুপকারে ময়দানব খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য এক মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন যার তুলনা ভূ-ভারতে নেই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবেরা বীরত্বের সঙ্গে দিগ্বিজয় সমাপ্ত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ও সহায়তায় ভীম মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করে তাঁর কারাগারে বন্দি রাজাদের মুক্ত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার অনুমতি দিলেন। কৃষ্ণের অনুমতি পেয়ে যুধিষ্ঠির সহদেবকে নৃপতি, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতিকে নিমন্ত্রণ করার আদেশ দিলেন। সহদেব দিকে দিকে দূত পাঠিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিতরা হৃষ্টমনে যজ্ঞদর্শনার্থে আগমন করলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত রাজন্যবর্গ সপার্ষদ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গ, অঙ্গরাজ কর্ণ, গান্ধাররাজ মহাবল শকুনি, অচলবৃষক, শল্য, বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, শাল, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূল নিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল, মালবদেশীয় ভূপালগণ, অন্ধকগণ, দ্রাবিররাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীর দেশীয় রাজা, কুন্তীভোজ, গৌরবাহন, বিরাট ভূপতি, শিশুপাল প্রমুখ মহার্ঘ উপহার সামগ্রী-সহ ধর্মরাজের যজ্ঞ দর্শনে আগমন করলেন।

এদিকে বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বীর্যবান, চারুদেষ্ণ, কীঙ্ক, উল্মুখ, নিশঠ, মহাবীর অঙ্গবাহ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হলেন।

যুধিষ্ঠির সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের পৃথক পৃথক বাসস্থান প্রদান করতে নির্দেশ দিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। দুর্যোধনের ইচ্ছানুযায়ী কর্ণ ও দুর্যোধনের জন্য পাশাপাশি গৃহ নির্ধারিত হলো। পাণ্ডবদের এমন বৈভব দর্শনে দুর্যোধন অত্যন্ত বিমর্ষ হলে কর্ণ বললেন—

—মিত্র! পাণ্ডবদের এই বৈভব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আমরা অচিরেই মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে এমন এক কৌশল নির্ধারণ করবো যাতে পাণ্ডবদের পথে বসতে বিলম্ব না হয়।

কর্ণের এই প্রবোধ বাক্যে দুর্যোধন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন—

—মিত্র কর্ণ, আমাদের সকল পরিকল্পনা বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আর ক্রমশ পাণ্ডবদের বিত্ত, বৈভব আর পরাক্রম গগনচুম্বী হচ্ছে।

—মিত্র, আমরা এবার এমন এক জাল বিস্তার করবো যা থেকে পাণ্ডবরা আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। তবে এই কর্মে মাতুল শকুনিকে নিতে হবে মুখ্য ভূমিকা। ন্যায়বিধি মেনে হবে আমাদের এই ষড়যন্ত্র। পাণ্ডবহিতৈষী গুরুজনেরাও তাতে বাধা দিতে পারবেন না।

—মিত্র কর্ণ! নিশ্চিদ্র অন্ধকারে তুমি আমাকে যেন একটা আলোর দিশা দেখালে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রটা কী?

—ক্রমশ প্রকাশ্য। আগে মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ হোক।

এই সময়ে সহদেব যুধিষ্ঠিরের বার্তা নিয়ে এলেন। ধর্মরাজ দুর্যোধনকে যজ্ঞ ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিতে চান। তিনি এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে যুধিষ্ঠির প্রীত হবেন। কর্ণের ইঙ্গিতে দুর্যোধন এই দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুঃশাসন অশ্বত্থামা, সঞ্জয় প্রমুখ এক একটি গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলেন। ঋষিগণ কর্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধের মধ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ পরিসমাপ্তি হলো। রাজন্যবর্গ ও বিশিষ্ট অতিথিরা স্ব-স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। হস্তিনায় প্রত্যাবর্তনের পর দুর্যোধনের মনোপীড়া আরও বেড়ে গেল। আহারে রুচি নেই, নিদ্রায় আগ্রহ নেই, চক্ষু মুদ্রিত করলেই ভেসে উঠছে পাণ্ডবদের অফুরন্ত বিত্ত বৈভব, ধনরত্ন, প্রজাদের নিশর্ত আনুগত্য। যার কৌরবদের তুলনাই হয় না। শুধু কৌরব কেন, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী তা দেবরাজেরও নেই, যমরাজেরও নেই, বরুণদেবেরও নেই। দুর্যোধনের এই মানসিক অশান্তিতে সমব্যথী মিত্র কর্ণ ও মাতুল শকুনি। এই সময়ে একদিন শকুনি প্রকাশ্যে দুর্যোধনকে বললেন—

—প্রিয় দুর্যোধন! তোমার মর্মপীড়ার কারণ আমি অবগত। পাণ্ডবের অশেষ ঐশ্বর্য, অতুল প্রতিপত্তি, অপরিমেয় ক্ষমতা

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

With Best Compliments from-

Laghu Udyog Bharati

All India Organisation in the Service of small scale industries

ADVOCATE ARVIND DHUMAL

All India Vice President
Co-ordinator Punjab, Chandigarh,
J/K & Laddakh

With Best Compliments from -

ARIES ENGINEERS

JALANDHAR
PUNJAB
M: 9815479543

With Best Compliments from -

SANT VALVES PVT. LTD.

G.T. Road, By-pass,
Jalandhar
Pin - 144012 (PB.) India

Mfrs. of **SANT**
IBR CERTIFIED : BRONZE, CAST IRON, CAST STEEL, FORGED STEEL, BOILER MOUNTINGS
IST MARKED : GM VALVES, CI BALL VALVES, SLUICE VALVES, BUTTERFLY VALVES, '**SBM**' BRONZE INDUSTRIAL VALVES
Ph. +91 181-5084693-94-95, 2603308
FAX : +91-181-5062270
E-mail : info@santvalves.com
Website : www.santvalves.com

তোমাকে ঈর্ষান্বিত ও বিচলিত করেছে। বিনা রক্তপাতে পাণ্ডবদের সমুদয় ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা তোমার করায়ত্ত হতে পারে এমন একটি বিষয় আমার জানা আছে।

দুর্যোধন জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত। বললেন—

—মিত্র কর্ণ বলেছিলেন আপনার দ্বারা আমার অভীষ্ট পূরণ হবে। এইবার সেই গুপ্ত বিষয়টি প্রকাশ করুণ।

— পাণ্ডবদের যে রাজলক্ষ্মী প্রত্যক্ষ করেছ, তা লাভ করার উপায় শ্রবণ কর। অক্ষক্রীড়ায় আমার তুল্য অভিজ্ঞ ভূ-ভারতে দ্বিতীয়জন নেই। যুধিষ্ঠিরও অক্ষ-ক্রীড়ায় আসক্ত কিন্তু এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা নেই। ক্ষত্রিয় রীতি অনুসারে দ্যুত ও রণের আহ্বান প্রত্যাখান করা যায় না। তুমি যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতে আহ্বান কর তাকে আসতেই হবে। আমি তোমার প্রতিনিধি হয়ে কপট ক্রীড়ায় তাকে পরাজিত করে তার দিব্য সম্পদ তোমার করায়ত্ত করে দেব তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রস্তাবটি দুর্যোধনের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। কালবিলম্ব না করে দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ার আবেদন জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন মন্ত্রী বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি মতামত জানাবেন। দুর্যোধন বিলক্ষণ জানতেন যে বিদুর কস্মিনকালেও এই দ্যুতক্রীড়া অনুমোদন করবেন না। দুর্যোধন তখন পিতাকে বললেন—

—পিতা! খুল্লতাত বিদুর কদাপি এই দ্যুতক্রীড়ায় সম্মতি দেবেন না। কারণ তিনি পাণ্ডবদের অধিক স্নেহ করেন। তাদের অকল্যাণ হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি নিশ্চিতভাবে এই অক্ষ প্রতিযোগিতা রদ করার চেষ্টা করবেন। তিনি সর্বদাই আমার প্রিয় কার্যে বিরোধিতা করে থাকেন। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি—এইবার আপনার সমক্ষে আত্মবিসর্জন ছাড়া আমার উপায় নেই।

দুর্যোধনের বাক্যে জন্মান্ধ স্নেহান্ধ পিতা বিচলিত হলেন। তিনি বিদুরের আগমনের অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ অনুচরদের এক সুরম্য দ্যুতক্রীড়া গৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। বিদুর এই সংবাদ অবগত হয়ে এই সর্বনাশা অক্ষক্রীড়া বন্ধের আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্ররোচনায় অনড়। এমনকী ভীষ্মের পরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করলেন না। যুক্তি দেখালেন— যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিদুর ও তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন, সেখানে কোনো অন্যায় বা এমন কিছু ঘটবে না যাতে কোনো পক্ষের ক্ষতি হয়। বিদুরকেই দায়িত্ব দেওয়া হলো পাণ্ডবদের অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ এবং তাঁদের সপরিবারে হস্তিনায় আনয়নের। বিদুরের গূঢ় সংকেত উপেক্ষা করে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং বিদুরের সঙ্গে সপরিবারে হস্তিনাপুরীতে আগমন করলেন।

গান্ধারী ভানুমতি প্রভৃতি পুরনারীরা দ্রৌপদীকে অভ্যর্থনা করে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষে বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো পঞ্চপাণ্ডবদের। গোপন মন্ত্রণাকক্ষে মন্ত্রণায় বসেছেন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন। তৈরি হচ্ছে কপট পাশাখেলার নীলনক্শা। এক চরম বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় বিপর্যস্ত বিদুর বিষণ্ণ মনে ফিরে গেলেন আপন কুটিরে।

নির্ধারিত দিনে নবনির্মিত দ্যূতগৃহে ক্রীড়ার্থে প্রবেশ করলেন কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষ। মহার্ঘ্য আসনে উপবিষ্ট পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরআষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বিদুর। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণযুক্ত আসনে উপবেশন করলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

—মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই সভামধ্যে বহুবিধি লোকের সমাগম হয়েছে, সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এক্ষণে অক্ষক্ষেপ করে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক।

যুধিষ্ঠির বললেন—

—দেখ, কপট পাশাক্রীড়া অতি পাপজনক, এতে বিন্দুমাত্র ক্ষাত্র পরাক্রম নেই, বিবেচনা করলে একে রাজনীতি বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। তুমি কী কারণে দ্যূতের প্রশংসা করছ? ধূর্তের কপটাচারকে কেউ প্রশংসা করে না। অতএব হে শকুনি, দেখো তুমি যেন নৃশংসের মতো অসৎপথে আমাকে পরাজিত করো না।

শকুনি বললেন—মহারাজ! যিনি গণনায় নিপুণ, ধূর্ততায় রীতিপদ্ধতি সমুদয় সবিশেষ জানেন, অক্ষক্ষেপ বিষয়ে সুচতর ও দ্যুতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোনো প্রকারেই পরাজিত হন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনো দোষ আশঙ্কা নেই। অতএব আশা আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি।

যুধিষ্ঠির বললেন—দ্যূতে আহূত হলে নিবৃত্ত হবো না, দ্যুতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত। অতএব বলুন এই লোকসমবায় মধ্যে আমার প্রতিযোগী কে?

তখন কর্ণের ইঙ্গিতে দুর্যোধন কপট বিনয়ের সঙ্গে বললেন—

—হে বিশাম্পতে! আমি সমুদয় ধন ও রত্ন প্রদান করব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হয়ে ক্রীড়া করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে সর্ববিদ্যা বিশারদ! একজনের প্রতিনিধি হয়ে অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত। যাহোক সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছ ক্রীড়া আরম্ভ করা যাক্।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন—

—হে রাজন! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত সম্ভূত কাঞ্চন খচিত এই মরিময় হার পণ করলাম, তুমি যা দিয়ে খেলবে সেই প্রতিপণের বস্তু কোথায়?

দুর্যোধন বললেন—আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তারজন্য অহংকার করি না। যে যা হোক এইবার

দ্যুতে জয়লাভ কর।

তখন অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করে—'আমিতো এই জিতলাম' বলে অক্ষবিক্ষেপ করামাত্র তাঁরই জয় হলো।

প্রথমবার হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের জেদ বেড়ে গেল। এইবার তিনি একলক্ষ আট হাজার সুবর্ণ মুদ্রায় ভর্তি কলস, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত সুবর্ণ পণ রাখলেন।

এবারেও শকুনির জয় হলো। যুধিষ্ঠির থামলেন না, এইবার তিনি আট ঘোড়ায় টানা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য সহস্র রথ পণ রাখলেন। শকুনি এবারও ছলনাপূর্বক অক্ষবিক্ষেপ করে জয়ী হলো।

যুধিষ্ঠির এবার চোষট্টি কলায় পটিয়সী শত সহস্র সুন্দরী তরুণী দাসীকে পণ রাখলেন। শকুনি এবারও অবলীলায় পাশা জিতলেন। তথাপি অনড় যুধিষ্ঠির একে একে তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজি রেখে বার বার শকুনির কপট চালে হারতে লাগলেন। তখন মহাত্মা বিদুর এই কালাগ্নিরূপ দ্যুতক্রীড়ার বিষময় ফল ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। পুত্রের বারম্বার জয়ে মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথায় কর্ণপাত করলেন না। যুধিষ্ঠির তখন সর্বস্বান্ত। বাজি রাখার মতো আর কিছুই নেই। এবার যুধিষ্ঠির নিজের এবং ভ্রাতাদের সমস্ত রত্নাভরণ সমূহ বাজি রেখে হারলেন শকুনির কাছে। শকুনির প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেললেন বাজি রাখলেন প্রাণাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলকে আবার হারলেন, এইবার ক্রমে ক্রমে সহদেব, অর্জুন, ভীম এবং সবশেষে নিজেকে পণ রেখে শকুনির কাছে হেরে গেলেন। এবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব যুধিষ্ঠির কিন্তু দুরত্মা শকুনি নিবৃত্ত হলো না, পুনর্বার যুধিষ্ঠিরকে বলল।

—হে রাজন্! তোমার পত্নী দ্রৌপদী এখনও অপরাজিতা, তুমি তাঁকে পণ রেখে আপনাকে মুক্ত কর। এক অদৃশ্য মোহপাশ যেন যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির সেই দূতসভায় উপস্থিত গুরুজন এবং রাজপুরুষদের সমক্ষে ঘোষণা করলেন—

আমি এবার সর্বগুণান্বিতা, সর্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখলাম।

যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করা মাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদের কলেবর হতে ঘর্মবারি নির্গত হতে লাগল। বিদুর মাথায় হাত রেখে নিরুপায় ক্ষোভে সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন। আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হয়ে মনের ভাব গোপন করতে না পেরে বারবার জানতে চাইছেন দুর্যোধন জয়ী হলো কিনা? কর্ণ দুঃশাসনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রইলো না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে 'এই জিতলাম' বলে চীৎকার করে ছলপূর্বক অক্ষবিক্ষেপ করা মাত্রই তার জয় হলো। পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহশীল সভাসদ্গণ ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হলেন। দুর্যোধন বিদুরকে অপমান করার জন্য দ্যূতসভায় পাঞ্চালীকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ করলেন। ক্রুদ্ধ বিদুর দুর্যোধনকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। এবার দুর্যোধন প্রতিহারীর উপর দায়িত্ব দিলেন দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনয়নের জন্য, প্রতিহারীও এইকার্যে বিফল হলেন।

তখন দুর্যোধন সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুগামী, অনুজ দুঃশাসনকে পাঠালেন দ্রৌপদীকে দ্যুতসভায় জনসমক্ষে আনার জন্য। অগ্রজের আদেশ পেয়ে দুরাত্মা দুঃশাসন অন্তঃপুর থেকে রজঃস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে দ্যুতসভায় নিয়ে এল। লজ্জায় অধোবদন হলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুররা।

তখন দুঃশাসনের প্রচণ্ড আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও অবিন্যস্তবসনা দ্রুপদনন্দিনী লজ্জায় ও ক্রোধে অভিভূতা হয়ে বলতে লাগলেন—

—হে দুরাত্মন! আমি রজঃস্বলা, তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করছিস, এঁরা কেউই তোর নিন্দা করছেন না, বোধ হয় এঁদের এতে অনুমোদন আছে, হায়! ভরতবংশীয় গণের ধর্মে ধিক্। বুঝলাম—মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ এঁদের বিন্দুমাত্র সত্ত্ব নেই, প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুর্যোধনের এই বর্বরতা অনায়াসে উপেক্ষা করছেন।

দ্রৌপদীর এই কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে এখন পর্যন্ত কেউ দেননি। ভীষ্ম প্রথম কথা বললেন—

সূক্ষ্ম ধর্ম বিচারে এর বিধান আমি জানি না। একদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখতে পারে না, অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় অসমর্থ হচ্ছি। দেখ, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ধর্ম থেকে এক পদও বিচলিত হতে পারেন না। বিশেষত তিনি আপনার মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন, তাই আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ বিবেচনা করতে পারছি না। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যুধিষ্ঠির স্বয়ং তার সঙ্গে ক্রীড়া করেছেন, আবার তিনি স্বয়ং তোমার এই অপমান উপেক্ষা করছেন, তাই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছি না।

ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পাণ্ডবেরা অতিশয় নিরাশ হলেন। এবং দুর্যোধনের অনুচর কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনির দল অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে দ্রৌপদীর উপর লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। এই অবস্থায় মধ্যমপাণ্ডব বৃকোদর সম্যক ঘটনার জন্য অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। প্রকাশ্যে বললেন—

—হে রাজন! দ্যুতপ্রিয় ব্যক্তিরা গৃহস্থিত বারাঙ্গনাদেরও পণ রেখে ক্রীড়া করেন, তাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রদর্শন করে থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন দেশের নৃপতিবর্গ আপনাকে এবং

আমাদের যেসব মহার্ঘ দ্রব্যাদি উপহার দিয়েছিলেন সেই সমুদায়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও অয়ূধ সকল এবং তোমাকে এবং আমাদেরকেও শত্রুগণ জিতে নিয়েছেন, কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর, তাই আমি তাতেও ক্রোধ করিনি। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রেখে পাশাখেলা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। দেখ দুরাত্মা, নীচাশয় কৌরবগণ এবং তাদের বশংবদেরা একমাত্র তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী, কুলকামিনী দ্রৌপদীকে কীভাবে ক্লেশ দিচ্ছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছি। আজ তোমার বাহুদ্বয় আমি ভস্মসাৎ করবো, সহদেব শীঘ্র আগুন নিয়ে এস।

ভীসেনের এই ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখে সভাস্থ সকলে ভীত হলেন। কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন প্রমুখ ভীমের হাতে যুধিষ্ঠিরের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখার জন্য উৎসাহিত করলেন। তখন অর্জুন ভীমসেনকে লক্ষ্য করে বললেন—হে বৃকোদর! তুমি পূর্বে কখনও এমন দুর্বাক্য প্রয়োগ করোনি। স্পষ্টই বোধ হচ্ছে, শত্রুগণ তোমার ধর্মগৌরব বিনষ্ট করেছে। আমার অনুরোধ ধর্মাত্মা অগ্রজকে অপমান করো না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্তৃক দ্যূতে আহূত হয়ে ক্ষাত্রধর্মানুসারে তাদের ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করেছেন, এতো আমাদের গর্বের।

ভীমসেন বললেন—

—হে ধনঞ্জয়! ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষাত্রধর্ম পালন করেছেন বলে এখনো পর্যন্ত তাঁর বাহুদ্বয় ভস্ম করিনি।

এইবার দ্যূত সভামধ্যে কৌরব বিকর্ণ উঠে দাঁড়ালেন। কুরুভ্রাতাদের মধ্যে সদাচারী স্পষ্টভাষী বিকর্ণ। পাণ্ডবদের দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে কাতর দেখে সভাস্থ নৃপতি ও বিজ্ঞজনদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—

—মহোদয়গণ! যাজ্ঞসেনী যা বলেছেন, আপনারা সকলে তাঁর বিষয় বিশেষ বিবেচনা করে বলুন, যথার্থ বিচার না করা হলে আমাদের নরকগামী হতে হবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর এঁরা এসে এবিষয়ে কিছু বলুন। সকলের আচার্য দ্রোণ ও কৃপ এঁরা কোনো কথা বলছেন না কেন? আর যে সকল নরপতি এই সভায় বসে আছেন তাঁরাও কাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক যথার্থ বক্তব্য বলুন, কুলকামিনী দ্রৌপদী বারম্বার যা বলছেন তার কোন্ পক্ষ কার অভিপ্রেত বিবেচনা করুন। সদাশয় বিকর্ণ যখন দেখলেন যে, তিনি সভাসদবর্গকে যার নিমিত্ত বারবার অনুরোধ করলেন, তাতে কোনো ব্যক্তিই সাধু কী অসাধু কিছুই বললেন না। তখন এই প্রজ্ঞাবান রাজপুত্র হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করতে লাগলেন, তাঁর নিশ্বাস দ্রুততর হলো। তিনি তখন শ্লেষাত্মক ভাষায় বলতে লাগলেন—

—এক্ষণে মহাপালেরা বলুন আর নাই বলুন, আমি যা ন্যায্য বলে জানি তা অবশ্যই বলব। মহাপুরুষেরা বলে থাকেন যে, রাজাদের ব্যসন চার প্রকারের—প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অত্যানুরাগ। মানুষ এইসকল বিষয়ে অনুরক্ত হলে ধর্ম থেকে দূরীভূত হন, লোকে তেমন ব্যসনাসক্ত পুরুষের কাজ অপ্রামাণিক বলে জানেন। দ্যূতক্রীড়ায় আহূত যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, বিশেষত এই অনিন্দিত রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখার পূর্বে স্বয়ং পরাজিত হয়ে এতে স্বত্ববর্জিত হয়েছেন। এদিকে শকুনি পণার্থী হয়েও কৃষ্ণার নাম উল্লেখ করেছেন। এই সকল বিচার করে দেখলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলে স্বীকার করা যায় না।

ক্রীড়াগৃহে উপস্থিত প্রায় সকলেই এই বাক্য শ্রবণমাত্র বিকর্ণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করতে লাগল। সেই উচ্ছ্বাস কিছুটা প্রশমিত হলে কর্ণ ক্রোধপরতন্ত্র হয়ে বিকর্ণের বাহু ধারণ পূর্বক বলতে লাগলেন—

—হে বিকর্ণ! এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু আরণি থেকে অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় এসব যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তারই বিনাশের জন্য। উপস্থিত রাজণ্যবর্গ দ্রৌপদীর প্রবতনা-পরতন্ত্র হয়েও যে কিছু বলছেন না, তার কারণ এই যে তাঁরা পাঞ্চালীকে ধর্মত জয়লব্ধ বলেই জানেন। তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসিহিষ্ণুতায় অধৈর্য হয়ে সভামধ্যে বাতুলের মতো কথা বলছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, সব বিষয়ে যথাযথ অভিজ্ঞতাও তোমার নেই, এই কারণে জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অর্জিত বলে প্রতিপন্ন করছ। যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্বস্ব পণ করলেন, আর দ্রৌপদী সেই সর্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি দ্রৌপদী জয়লব্ধ নয় তা জানলে কী করে? পাণ্ডবদের অনুমতিক্রমেই দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, অতএব কী কারণে তোমার কাছে দ্রৌপদী অজয়লব্ধা? আর একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে এই সভায় আনয়ন করা তুমি অধর্ম বলে প্রতিপন্ন করছ। এক্ষণে তার কারণও শ্রবণ কর। স্ত্রী জাতির এক স্বামীই দৈব এবং সামাজিক বিধান। দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করে বহুস্বামীর বশবর্তিনী হয়েছেন, অতএব ইনি যে বারাঙ্গনা তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন এবং বিবসনা করা অনৈতিক নয়। দ্রৌপদী-সহ পাণ্ডবদের যা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদয় ধর্মত জয় করেছেন। অতএব হে দুঃশাসন, তুমি বিকর্ণের বালসুলভ কথা ছাড়, তুমি পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সবকিছু কেড়ে নাও।

কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবেরা নিজেদের উত্তরীয় বস্ত্রলঙ্কার খুলে রেখে সভামধ্যে নিঃশব্দে বসে পড়লেন। দ্রৌপদী একবস্ত্রা, দুঃশাসন সেই বস্ত্র আকর্ষণ করে খুলে নেবার চেষ্টা করছে, দ্রৌপদী সর্বশক্তি দিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছেন আর বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করছেন। কিন্তু দুঃশাসনের দানবীয় শক্তির সঙ্গে আর পেরে উঠছেন না। তথাপি শেষ চেষ্টা লজ্জা নিবারণের, আর পারলেন না, এবার

আত্মসমর্পণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ভগবান এই আত্মসমর্পণের অপেক্ষায় ছিলেন। দুঃশাসন যত দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করে জগৎপতি ধর্মরূপে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য থেকে একের পর এক বস্ত্রের স্তূপ পর্বতপ্রমাণ হলো, অবসন্ন দুঃশাসন ভূমিতে আশ্রয় নিল। এই দৃশ্য দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হলো। সভাসদ্‌গণ দ্রুপদনন্দিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে দুঃশাসনকে তিরস্কার করতে লাগলেন। দ্রৌপদীর সাধুবাদে চতুর্দিক আলোড়িত হলো। ভীম পাণ্ডবদের মধ্যে বসেছিল। হঠাৎ মহানাদে গর্জন করে উঠে দাঁড়াল ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত, কম্পিত হস্তপদ, ঘূর্ণায়মান নয়নযুগল। তাঁর মহানাদে সভাস্থল স্তব্ধ, তিনি সভায় উপস্থিত সভ্যদের সম্বোধন করে প্রতিজ্ঞা করলেন—

—হে লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর। এমন বাক্য পূর্বে কেউ কখনও বলেনি এবং বলবেও না। এই পাপাত্মাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য, আর সেই যুদ্ধে যদি বলপূর্বক এই নরাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রুধির পান না করি, তাহলে আমি যেন পূর্বপুরুষগণের গতিপ্রাপ্ত না হই।

উপস্থিত রাজন্যবর্গ ভীমসেনের এই প্রকার ভীমবাক্য শ্রবণে দুঃশাসনের কুৎসা এবং ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়গণকে অবলোকন করেও কোনো প্রশ্ন করতে পারছেন না। সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করে পরিতাপ করতে লাগলেন। তখন সর্বধর্মজ্ঞ বিদুর সভাসদগণকে নিবারণ করে বলতে লাগলেন।

—হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী অনাথার ন্যায় বার বার রোদন করছেন, আপনাদের কাছে ন্যায় প্রার্থনা করছেন। আপনারা কোনো বিহিত করছেন না, এতে ধর্মকে পীড়া দেওয়া হচ্ছে। আর্তজন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভায় আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে, সত্য ও ধর্ম দ্বারা তাঁকে প্রশমিত করা আপনারা কেউ এই কর্তব্য পালন করছেন না। কামক্রোধাবেগ বিবর্জিত হয়ে দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞা অনুসারে সিদ্ধান্ত করেছেন। এক্ষণে আপনাদের ওই প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত।

বিদুরের বাক্য শ্রবণের পর উপস্থিত সভ্যরা কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। তখন কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করে বললেন—

—হে দুঃশাসন। এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে নিয়ে যাও।

কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন কম্পমানা, সলজ্জা, অনাথা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দ্রৌপদী বললেন—

—দুষ্ট দুর্যোধন! তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর। সভামধ্যে আমি যে প্রশ্ন করেছি তার সদুত্তর এখনো পাইনি। এই দুষ্ট আসুরিক শক্তিতে আমাকে আকর্ষণ করায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি, তাই কৌরবসভায় কুরুগণকে নানাপ্রকার অপ্রিয় কথা বলছি। পূর্বে এই রকম বাক্য আমি মুখেও আনিনি, এক্ষণে আমি নিরুপায়। যাকে পূর্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখতে পাননি, এক্ষণে তাকে সভামধ্যে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হতে হলো। যে পাণ্ডবেরা পূর্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু স্পর্শ করলে সহ্য করতে পারত না, আজ সেই পাণ্ডবরাই দুরাত্মা দুঃশাসন যে আমাকে স্পর্শ করছে তা অনায়াসেই সহ্য করে আছেন। আমি কুলকামিনী, সতী, আমার এর থেকে বেশি কষ্ট কী আছে? শাস্ত্রমতে ধর্মপরায়ণা স্ত্রীদের সভামধ্যে আনয়ন করতে নেই, কিন্তু এই অভাগিনী সভায় প্রবেশ করেছে, এক্ষণে ক্ষিতিপালকদের সেই সনাতন ঐতিহ্য কোথায় অন্তর্ধান করল? যখন পাণ্ডবদের সহধর্মিণী, পার্ষতের ভগিনী, কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় এনেছ, তখন কৌরবদের পূর্বপুরুষ-পরম্পরাগত নিত্যধর্ম বিনষ্ট হলো। হে ভূপালগণ! আমাকে জিতা বা অজিতা যা বোধ করুন, আমি যে প্রশ্ন করেছি তার প্রত্যুত্তর দিন, তৎপরে যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো।

মহামতি ভীষ্ম বললেন—

—হে কল্যাণি! ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞরাও তা সম্যক্ নিরূপণ করতে পারেন না। শক্তিধর ব্যক্তি ধর্মানুসারে চলে থাকেন কিন্তু সেই ধর্ম অভিভূত হয়ে অধর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কার্যের সূক্ষ্মত্ব, গহনত্ব, গৌরবত্ব প্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তর পক্ষে কিছুই নির্ণয় হচ্ছে না, কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হয়েছে, অতএব বোধহয় অচিরাৎ এই বংশ লোপ হবে। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হলেও, কদাপি ধর্ম হতে বিচলিত হলেও কদাপি ধর্ম হতে বিচলিত হন না, অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থগ্রস্ত হয়েও যে ধর্মপথ নিরীক্ষণ করছ, তা তোমার সমুচিতই হয়েছে। এই সমস্ত ধর্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণ, কৃপাদি গতাসুর ন্যায় আনত হয়ে শূন্যশরীরে অবস্থান করছেন। এক্ষণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করবেন, তাই প্রমাণ হবে। তুমি জিতা বা অজিতা ইনি তা সম্যক নিরূপণ করুন।

সভাস্থ নৃপতি ও পদাধিকারীগণ ব্যাধভয়ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করে ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভালো-মন্দ কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁদের মৌনতা অবলোকন করে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বললেন—

—যাজ্ঞসেনি! এইবার তুমি ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, এরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। তারা তোমার জন্য এই আর্যলোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুক এবং যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তোমার দাসীত্বশৃঙ্খল মুক্ত করুক। এই সমস্ত কৌরবেরা তোমার দুঃখে

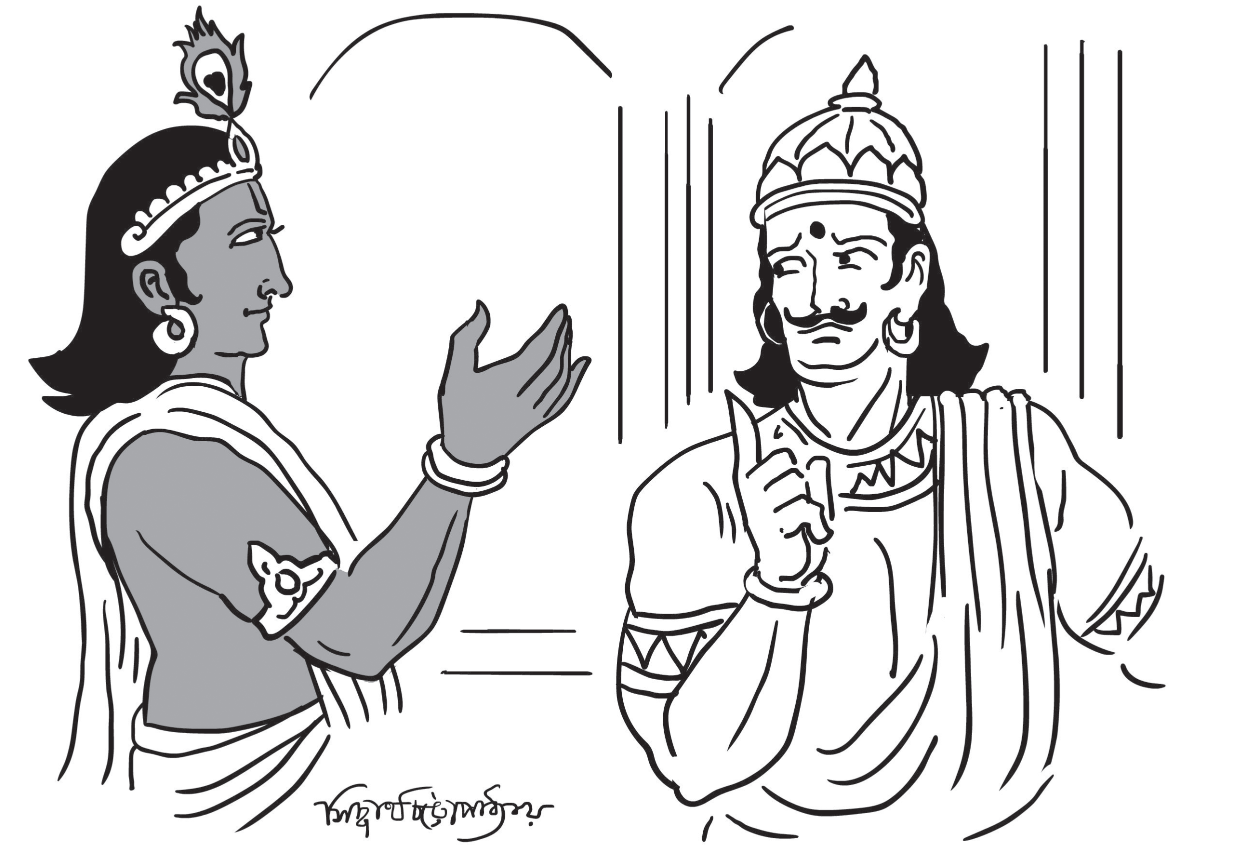

যৎপরোনাস্তি দুঃখিত। বিশেষত তোমার স্বামীদের দুর্ভাগ্য দর্শন করে এঁরা যথার্থ কথা বলতেই পারলেন না। যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক, তিনি যা করবেন, অবিলম্বে তা প্রতিপালন করবেন। সভাস্থ অনেকেই দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করে ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন, অন্যদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—

—দেখ, ধর্মজ্ঞ কী বলেন এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এঁদেরই-বা কী মত?

কোলাহল কিছুটা কমে এলে ভীমসেন বাহু উত্তোলন পূর্বক বললেন—

—যদি এই উদার স্বভাব কুলপতি ধর্মরাজ প্রভু না হতেন, তাহলে আমরা কখনই ক্ষমা করতাম না। যিনি আমাদের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদি তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করেন, তাহলে আমরাও পরাজিত হয়েছি সন্দেহ কী? আমার প্রভুত্ব থাকলে কি পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে এই দুরাত্মা এখনও জীবিত থাকতে পারে? ধর্মপাশে বদ্ধ রয়েছি, এইজন্য আমার ভুজবল আজ সকলের প্রত্যক্ষ হলো না। নতুবা আমার ভুজান্তরে নিপাতিত হলে স্বয়ং ইন্দ্রও মুক্ত হতে পারেন না। এখনও যদি ধর্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণসংহার করে, সেইরূপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করতে পারি।

ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হচ্ছে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাকে সম্বোধন করে বললেন—

—ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই, তোমাতে সকলই সম্ভব।

ভীমের ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে এবং সভা শান্ত হলে কর্ণ দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বললেন—

—হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য এই তিনজন সবল আছেন, এঁরা স্বীয় প্রভুকে দুষ্ট বলে থাকেন। স্ব স্ব ধনবৃদ্ধি করতে বাঞ্ছা করেন কিন্তু তার জন্য ব্যাকুল হন না। দাসের পত্নী ও তার সমুদয় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্বক রাজপরিবারের অনুগত হও। রাজকন্যা! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নয়। এখন তুমি এমন একজনকে পতীত্বে বরণ কর, যে তোমাকে পাশাখেলার পণ রূপে ব্যবহার করে দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে না। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও

সহদেব দ্যূতে পরাজিত হয়েছে, তুমিও দাসী হয়েছ, ওই পরাজিত পঞ্চ ভ্রাতা এখন আর তোমার স্বামী নয়। যুধিষ্ঠির আপনার জন্মের আবশ্যকতা পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। তিনি এই সভা মধ্যে দ্রুপদ নন্দিনীকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করেছেন।

স্বভাবক্রোধী ভীমসেন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে অধিকতর ক্রোধান্বিত হয়ে আরক্তনয়নে, উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত করে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—

—হে রাজন, আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইনি। আমরা যথার্থই দাসভাবাপন্ন হয়েছি। কিন্তু আপনি যদি পাঞ্চালীকে পণ রেখে এই কালপাশা না খেলতেন, তবে শত্রুরা এইরূপ কটূক্তি করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না।

ভীমের বাক্যে যুধিষ্ঠির লজ্জায়, অপমানে অধোবদন হলেন। যুধিষ্ঠিরের এই পরিণতিতে অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে পাশাপাশি দুই মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট হলেন। দুর্যোধন এইবার যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—

—হে নৃপতে! ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত, এক্ষণে বল দ্রৌপদী পরাজিতা হয়েছে কিনা?

ঐশ্বর্যমদমত্ত দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্মরাজকে এরূপ ব্যঙ্গার্থক কথা বলার পর সহাস্যে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

—হে দ্রুপদকন্যা! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছ। এস আমার উরুতে এসে বস।

একথা বলে স্বীয় কদলিবৃক্ষের ন্যায় উরুদেশ বসন মুক্ত করে দ্রৌপদীকে দেখালেন। কর্ণ উচ্চহাস্য করে উঠল। দ্রৌপদী ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত করলেন। ভীমসেন তখন সাতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন, তাঁর লোহিতবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হলো। দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁর রোমকূপ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল। বজ্রনির্ঘোষে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে রাজগণসমক্ষে বলতে লাগলেন—

—হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই ঊরু ভঙ্গ না করি, তা হলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হবে না।

ভীমের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞায় সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন বিদুর বললেন—

—হে পার্থিবগণ, ভীমসেন এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করলেন। নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করেছেন।

তখনো দ্রৌপদীর দাসীত্ব আদৌ ন্যায়সঙ্গত কিনা এ নিয়ে দুর্যোধন ও অর্জুনের মধ্যে বিতণ্ডা চলছে, কর্ণ ও শকুনি উভয়ে দুর্যোধনকে প্রবলভাবে সমর্থন করছে। তাঁদের এরূপ উত্তরপ্রত্যুত্তর চলছে, এমন সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে সেই দিবাভাগে যুগপৎ শৃগাল ও গদর্ভের দল চীৎকার করতে আরম্ভ করল এবং পক্ষীরা চারদিকে ভয়ানক শব্দ করে উঠল। তত্ত্ববিদ্ বিদুর এবং সতী গান্ধারী সেই অমঙ্গলজনক শব্দে স্পষ্ট বিপদের আভাষ পেলেন।

দূরদর্শী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য এই অমঙ্গলসূচক শব্দশুনে 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' বলতে লাগলেন। এই ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত হয়ে বিদুর ও গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে আতঙ্কিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলেন।

—হে দুর্বিনীত দুর্যোধন। তোর পাপে এই মহান বংশ ধ্বংস হবে। যেহেতু কুরুকুলকামিনী বিশেষত পাণ্ডবদের সহধর্মিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করছিস্। অতঃপর দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা বাক্যে তুষ্ট করে বললেন—

—ভদ্রে! তুমি আমার নিকট সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী বললেন—

—হে ভরতকুল প্রদীপ। যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে সর্বধর্মযুক্ত যুধিষ্ঠিরকে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করলাম। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। তুমি শুধুমাত্র এক বরের উপযুক্ত নও।

দ্রৌপদী বললেন—

—মহারাজ যদি কৃপা করেণ, তবে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করলাম। এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর প্রদানে তোমার যথোচিত সৎকার হয়নি। তুমি ধর্মচারিণী, আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

দ্রৌপদী বললেন—

—হে ভগবান! লোভ ধর্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করব না। আমার পতিগণ দাসত্বরূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়ে আপনার কৃপাবশে পুনরায় উত্থিত হলেন, এঁরা পুণ্যকর্মদ্বারা শ্রেয়োলাভ করতে পারবেন।

পিতার এই উদারতায় পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কর্ণও নিরাশ হলেন, তথাপি বললেন—

—ইতিপূর্বে আমরা যে সকল অসামান্য রূপবতী কামিনীদের কথা শ্রবণ, তন্মধ্যে কোনো রমণীর এতাদৃশ কর্ম শ্রুতিগোচর হয়নি। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক ক্রোধপরতন্ত্র হয়েছিলেন, এক্ষণে দ্রৌপদী শস্ত্রমধ্যে শান্তিস্বরূপা হলেন।

কর্ণের এই বাক্যে ভীম আবার কুপিত হলে অর্জুন ও যুধিষ্ঠির তাঁকে নানা যুক্তি দিয়ে শান্ত করলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—

—হে রাজন! এখন আমাদের কী কর্তব্য অনুমতি করুন। আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্তী হয়ে থাকতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে অজাতশত্রু! তোমাদের কল্যাণ হোক। আমি আদেশ দিচ্ছি, তোমরা গমন করো, সমস্ত ধন নিয়ে গমনপূর্বক নিজ রাজ্য শাসন কর। তোমাতে ধর্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং গুরু শুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হচ্ছে, অতএব হে বৎস! তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে গমন কর। ভ্রাতাদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব এবং তোমার মন ধর্মে অনুরক্ত হোক।

যুধিষ্ঠির তখন শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ মেঘসঙ্কাশরথে আরোহণ করে হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করলেন।

যুধিষ্ঠিরাদির সবিত্ত ও সসম্মানে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, দুর্যোধন ও কর্ণ, শকুনিরা কিছুতেই মানতে পারলেন না। ভীমের প্রতিজ্ঞা দুর্যোধনকে ভয়ানকভাবে সন্ত্রস্ত করেছে। তাঁরা বৃদ্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে পাণ্ডবদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে লাগলেন যাতে স্নেহান্ধ মহারাজের মনে আশঙ্কা ও ভয়ের সৃষ্টি হলো।

কর্ণ বললেন—মহারাজ! আমাদের কাছে পরাজয় ও অপমানের গ্লানি পাণ্ডবরা ভুলতে পারবে না, আর তারা আমাদের ক্ষমা করবে না। বিশেষত দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা যে কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে তা নিশ্চিত। এক্ষণে পাণ্ডবদের ক্রোধ থেকে অব্যাহতির একমাত্র পথ পুনরায় দ্যূতক্রীড়া। পাণ্ডবদের আহ্বান করে আরেকবার পণ রেখে দ্যূতক্রীড়া হোক। এবারের পণ হবে পরাজিত পক্ষের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস। যে পক্ষ পরাজয় বরণ করবে তারা সপরিবারে বারো বছরের জন্য বনে গমন করবে এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকবে। আমাদের পক্ষ পরাজিত হলে আমরা সপার্ষদ বনে গমন করব আর পাণ্ডবপক্ষ পরাজিত হলে তারাও সপরিবারে বনে গমন করবে।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—বৎসগণ! তোমরা অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে বার্তা দাও, তারা এসে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হোক।

রাজার এই বাক্য শোনামাত্র দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, বিদুর, সোমদত্ত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ প্রমুখ সমস্বরে পুনরায় দ্যূতক্রীড়া আয়োজনের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু পুত্রপ্রেমে অন্ধরাজা অর্থবশী সুহৃদ বর্গকে অনাদর করে পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলেন। সতীসাধ্বী গান্ধারীর আবেদনও অগ্রাহ্য করলেন ধৃতরাষ্ট্র।

পাণ্ডবরা পুনরায় আহূত হয়ে হস্তিনাপুরে আগমন করলেন। আবার সেই দ্যূতগৃহে ক্রীড়া শুরু হলো। পণ একটাই—পরাজিত পক্ষের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং একবর্ষ অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের মধ্যে পরিচয় প্রকাশ পেলে আবার দ্বাদশবর্ষ বনবাস।

শুরু হলো ক্রীড়া। একপক্ষে যুধিষ্ঠির, অপর পক্ষে সুবলনন্দন শকুনি। আবার সেই কপট পাশায় জয়ী হলো শকুনি। যুধিষ্ঠির সপরিবারে চললেন বনবাসে। মাতা কুন্তী ধর্মাত্মা বিদুরের আশ্রয়ে। পাণ্ডবদের রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন আচার্য দ্রোণ। পুরবাসীদের হাহাকার ও বিলাপের মধ্য দিয়ে অরণ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন পাণ্ডবগণ। চলেছেন রাজনন্দিনী রাজরাজেশ্বরী দ্রৌপদী। পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের সীমানা অতিক্রম করা মাত্র বিনামেঘে বজ্রপাত, অসময়ে সূর্যগ্রহণ, উল্কাপাত হতে লাগল। গর্দভ, শেয়াল, শকুন, বায়স প্রচণ্ড নিনাদে কোনও অশুভ বার্তা প্রেরণ করতে লাগল। ভীষ্ম ও বিদুর এই অশুভলক্ষ্মণ যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিতার ভরতকুল বিনাশের ইঙ্গিত এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এই সময়ে মহর্ষি পরিবৃত দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হয়ে এক ভয়ঙ্কর বাক্য শোনালেন— আজ থেকে চতুর্দশ বর্ষে দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জুনের শক্তিতে এই কুরুকুল নির্মূলিত হবে।

কুরুবংশ ধ্বংসের এই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দেবর্ষি অন্তর্ধান করলেন।

* * * * *

মুনি ঋষিদের সান্নিধ্যে কাম্যকবনে কুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডব। নিত্য যাগ্‌যজ্ঞ, ধর্মালোচনা, বেদপাঠ— এক অনির্বচনীয় আনন্দে দিন কাটছে পাণ্ডবদের। এখানে হিংসা নেই, রাজনীতির কুটিলতা নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই। এইভাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত। এক মধ্যাহ্নে সেই তপোস্থলীর অদূরে শোনা গেল নগরের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। যেন কোনো সেনাদল তপোভূমি আক্রমণ করতে আসছে। ভীম ও অর্জুন সশস্ত্র হয়ে অগ্রসর হতে চাইলে যুধিষ্ঠির নিষেধ করে বললেন—

—যদি তপোভূমি আক্রান্ত হয় তবে তোমরা প্রতিরোধ করবে। তার আগে তোমরা আক্রমণ করতে যেও না।

কিয়ৎকাল পরে হস্তিনাপুরবাসী কিছু নাগরিক অনেক সন্ধান করে যুধিষ্ঠিরের কাছে হস্তিনাপুরের অন্তঃপুরবাসিনীদের এক

জরুরি বার্তা নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ রাজপুরুষেরা অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে এই বনে বিহার করতে এসেছিলেন। এক সরোবরের সাময়িক অধিকার নিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে তাঁদের কলহ শুরু হয়। যার ফল যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। মহাবীর কর্ণ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। দুর্যোধন ও অন্যান্য কুরুবীররা অন্তঃপুরিকারা-সহ গন্ধর্বদের হাতে বন্দি। মহারানি ভানুমতি তাঁদের উদ্ধারের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাহায্য প্রার্থনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন।

দূতমুখে দুর্যোধনের এই পরিণতির কথা শুনে ভীম অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং সহসা কুলবধূদের উদ্ধারের জন্য অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সশস্ত্র করে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। ভীম অর্জুনের বীরত্বের কাছে অচিরেই গন্ধর্বরা পরাজিত হলো। অর্জুনের মিত্র চিত্রসেন দুর্যোধনের অনেক কুকীর্তির কথা প্রকাশ করলেন এবং শেষপর্যন্ত অর্জুনের অনুরোধে কুলকামিনীগণ-সহ কৌরবগণকে মুক্তি দিলেন। মুক্ত হয়ে দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং এই অপমানের জন্য আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কর্ণ অনেক নীতিবাক্য শুনিয়ে তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করলেন। অপ্রসন্ন মনে তাঁরা রাজধানীতে ফিরে এলেন।

হস্তিনাপুরে ফিরে কর্ণ নিজ রাজ্য অঙ্গদেশে গমনের জন্য দুর্যোধনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং অনুমতি পেয়ে রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা করে অতি শীঘ্র অঙ্গদেশে পৌঁছে গেলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষসেনের উপর রাজ্যভার। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট বৃষসেন বিজ্ঞমন্ত্রীদের সুপরামর্শে রাজ্যশাসন করে প্রজাদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য পেয়েছেন। অনুজ চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুযেন অগ্রজের চির অনুগত। সত্যের পূজারি কর্ণকে অধিকাংশ সময় হস্তিনাপুরে থাকতে হয়। আপন পরাক্রমে কর্ণ একের পর এক রাজ্য জয় করেছেন। কৌরবদের রাজ্যে পদার্পণের অনুমতির জন্য কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে মহারানি গান্ধারী ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের চরণ বন্দনা করলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করে গমনের অনুমতি দিলেন। বললেন —শকুনি সেই থেকে এটা স্থির করেছিল যে, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করে রেখেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

পাণ্ডবদের সঙ্গে কর্ণের নিজের কোনও শত্রুতা নেই, বরং ধীর, স্থির, তেজস্বী পাণ্ডবদের কর্ণ শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের সঙ্গে শত্রুতার কারণ দুর্যোধন। একমাত্র দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা। সহায় সম্বলহীন সূতপুত্র কর্ণকে দুর্যোধন রাজ্য দান করেছেন, রাজার সম্মান দিয়েছেন। তাঁর আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছেন। দুর্যোধনের সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ সব কিছুই করতে পারেন, এমনকী হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জনও করতে পারেন। প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়েছেন কর্ণ। রাত্রি প্রথম প্রহর, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় স্নাত ধরণী, দূরে কোকিল ডাকছে, গন্ধে আমোদিত প্রাসাদ অঙ্গন। হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে কার কোমল করস্পর্শ অনুভব করলেন কর্ণ। চেয়ে দেখেন পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রী পদ্মাবতী।

—পদ্মা!

—কতদিন পর এলে বলতো?

—কী জানি, বেশ কয়েক বছর হবে।

—ওই দুর্জনের সান্নিধ্য আপনার ভালো লাগে?

—না।

—তবে?

—কৃতজ্ঞতা, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য।

নির্মল আকাশে হঠাৎ এক মেঘখণ্ড পূর্ণ চন্দ্রকে ঢেকে দিল।

* * * * *

পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হতে চলল। এবার তাঁদের যেতে হবে এক বছরের অজ্ঞাতবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে। মৎস্যরাজ বিরাট সর্বদা পাণ্ডবদের অনুগামী। ধর্মের বরে পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে বিরাট রাজের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত হলো এক শ্মশানের পার্শ্বস্থিত শমীবৃক্ষে। গুজব রটিয়ে দেওয়া হলো ওই শমীবৃক্ষে ভয়ংকর ব্রহ্মদৈত্যের বাস। লোকজন ভয়ে ওদিকপানে যেত না।

যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে দ্যূতকার বেশে বিরাট রাজসভায় প্রবেশ করেন। ভীম পাচকরূপী বল্লভ নামে, অর্জুন নারী বেশধারী বৃহন্নলা রূপে। নকুল অশ্বপালক এবং গোপবেশে সহদেব গোরক্ষক রূপে বিরাট সভায় প্রবেশ করে। দ্রৌপদী পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রী রূপে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মনৈপুণ্যে অচিরেই রাজ আনুগত্য অর্জন করেন। সবই ঠিকঠাক চলছিল। সমস্যা হলো সৈরিন্ধ্রীর অন্তরালে দ্রৌপদীকে নিয়ে। রাজশ্যালক কীচক বিরাট রাজ্যের সেনাপতি। রানির প্রশ্রয়ে অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি। সেই দুশ্চরিত্র কীচকের নজর পড়ল দ্রৌপদীর দিকে। দ্রৌপদীকে পাওয়ার জন্য কীচক পাগল হয়ে উঠল। কোনো অজুহাতে যখন তাকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না তখন দ্রৌপদী সব কথা প্রকাশ করল বল্লভরূপী ভীমসেনের কাছে। ভীমসেনের পরামর্শে দ্রৌপদী সেই রাতে কীচককে আহ্বান করল প্রাসাদের নৃত্যশালায়। সেখানে আগে থেকেই দ্রৌপদীর পোশাক পরিধান করে অপেক্ষা করছিল বল্লভরূপী ভীম। অন্ধকারে কীচক দ্রৌপদী ভেবে ভীমের কাছে যেতেই ভীম তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। পরদিন সকালে প্রচারিত হয় সৈরিন্ধ্রীর রক্ষক যক্ষই কীচককে হত্যা করেছে।

কীচকের অনুচরেরা সৈরিন্ধ্রী কীচকের মৃত্যুর জন্য দায়ী এইরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কীচকের মৃতদেহের সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীর দেহকে রজ্জুদ্বারা বেঁধে এক সঙ্গে দাহ করার উদ্দেশ্যে শ্মশানভূমির দিকে যাত্রা করে। এই সংবাদ পেয়ে ভীম এক বিশাল পাদপ মূল-সহ উৎপাটন করে তার প্রহারে কীচক অনুচরদের নিহত করে দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন। দ্রৌপদী আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। তৎক্ষণাৎ রানি সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে রাজাদেশ জানিয়ে দেন যে তাঁকে এই মুহূর্তেই প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে, কারণ রাজা গন্ধর্বদের ভয়ে ভীত হয়ে আছেন সৈরিন্ধ্রী প্রাসাদে থাকলে আবারও কোনো বিপদ ঘটতে পারে। সৈরিন্ধ্রী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আর মাত্র ত্রয়োদশ দিন প্রাসাদে অবস্থানের প্রার্থনা জানালেন।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময়সীমা প্রায় শেষ। পাণ্ডব সন্ধানে কৌরবের অনুসন্ধানকারী দল চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু কোথায় পাণ্ডবরা তারা যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। এই সময়ে একদিন ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মা সসৈন্য বিরাট রাজের বিখ্যাত গোশালা আক্রমণ করে অনেক গোধন অপহরণ করে। সেনাপতি নেই, রাজা বিরাট কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এই সময়ে রাজাকে আশ্বস্ত করে পাশে দাঁড়ালেন তাঁর আশ্রিত কঙ্ক, পাচক বল্লভ, অশ্বপাল নকুল এবং গোপাল সহদেব। রথ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মৎস্যরাজকে অগ্রভাগে রেখে তাঁরা যুদ্ধযাত্রা করলেন। সুশর্মা মৎস্যরাজকে একা দেখে এক ঝটিকা আক্রমণে তাঁকে পরাজিত ও বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আদেশ দিলেন দ্রুত মৎস্যরাজকে উদ্ধার করার জন্য। ভীম যথারীতি পাদপ উৎপাটন করতে গেলে যুধিষ্ঠির তাঁকে নিষেধ করে বললেন—

—এই কাজটি করিও না। তাহলে লোকের সন্দেহ হবে ভীমসেন ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই যুদ্ধ সম্ভব নয়। তুমি স্বাভাবিক অস্ত্রশস্ত্র ও রথ নিয়ে মৎস্যরাজকে উদ্ধার করে নকুল ও সহদেব তোমাকে সাহায্য করবে। ভীমের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সুশর্মা পর্যুদস্ত হয়ে বিরাটরাজকে রথোপরি রেখে নিজে পলায়ন করছে, ভীম পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে বন্দি করেন। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব তীব্র আক্রমণে সুশর্মার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। অসংখ্য হতাহত এবং অবশিষ্ট সৈন্যরা পলায়ন করে। এত দ্রুত জয় করায়ত্ত হবে মৎস্যরাজ ভাবতেও পারেননি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে কঙ্ক, বল্লভ এবং অশ্বপাল ও গোপালকে নিয়ে বন্দি সুশর্মা ও উদ্ধারকৃত গোধনসমূহ নিয়ে বিজয়ীর বেশে রাজধানীর দিকে যাত্রা করলেন।

এদিকে বিরাট নগরে তখন আর এক হাহাকার। দুর্যোধন প্রধান প্রধান কুরুযোদ্ধাদের নিয়ে এসেছে বিরাট রাজ্যের বিখ্যাত গোশালা থেকে গোধন হরণ করতে। কে নেই সেই গো-তস্করদের দলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা সবাই। বিরাটের সৈন্যদল তখন সুশর্মার আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং গোরক্ষা করতে ব্যস্ত। রাজপ্রসাদ রক্ষার দায়িত্ব কুমার উত্তরের। এই সময়ে ভীত সন্ত্রস্ত গোরক্ষকেরা প্রাসাদে এসে সংবাদ দিল কৌরব সেনারা গোশালা আক্রমণ করে গোরক্ষকদের আহত অথবা হত্যা করে ষাট হাজার গোধন অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজিত উত্তর বার বার বলতে লাগল যদি একজন সারথি থাকত তবে যুদ্ধ করে গৌরবদের হাত থেকে গোধন উদ্ধার করতে পারত। তখন সৈরিন্ধ্রী বললেন—বৃহন্নলা একজন উত্তম সারথি। পাণ্ডবদের সঙ্গে বহুযুদ্ধে রথ চালনার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। তিনি অনায়াসে তোমার রথের সারথি হতে পারেন।

উত্তর সম্মতি দিলে বৃহন্নলারূপী অর্জুন রথে অস্ত্রসন্নিবেশ করে অতি দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে কুরু সৈন্যদের সামনে রথ স্থাপন করলেন। কিন্তু রণে অনভিজ্ঞ বালক উত্তর বিশাল কৌরব বাহিনী দেখে ভীত হয়ে সারথিকে রথ ঘুরিয়ে প্রাসাদে ফিরে যেতে বললেন। উত্তরের মনোভাব অবগত হয়ে ধনঞ্জয় বললেন— যুবরাজ! আপনি যদি সারথি হয়ে রথ চালনা করতে পারেন তবে আমি কৌরবদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করতে পারি। গোধন অপহৃত হলে আপনার অপযশ।

উত্তর রথ চালনায় সম্মত হলে বৃহন্নলা প্রথমে শ্মশানের শমীবৃক্ষ থেকে অস্ত্রগুলি নামিয়ে নিলেন। অতঃপর গাণ্ডীবে শর যোজনা করে শত্রু সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। উত্তরের সারথি হয়ে বৃহন্নলা যখন প্রথম রণক্ষেত্রে যান তখন কুরু যোদ্ধাদের অনেকের সন্দেহ হয় এই সারথি অর্জুন নয়তো? এইবার যোদ্ধা রূপে বৃহন্নলাকে দেখলেন। সবার মনে একটাই প্রশ্ন—কে এই যোদ্ধা?

কর্ণের স্পষ্ট উক্তি—

—মৎস্যরাজই আগমন করুন অথবা ধনঞ্জয়ই আসুক, আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে, আমি এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীগণ এসময়ে কেন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে রথোপরি দাঁড়িয়ে আছেন? বিনা যুদ্ধে কারও নিস্তার নেই। যদি কোনও বজ্রধর বা দণ্ডধর বলপূর্বক আমাদের বিজিত গোধন হরণ করেন, তথাপি কোন ব্যক্তি বিনাযুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করবেন? পদাতিক হোক বা অশ্বারোহী, সমরে পরান্মুখ হলে কেউ আমার শরে জীবিত থাকবে না। পাণ্ডবগণ বিশেষত অর্জুন আচার্যের সবিশেষ প্রিয় পাত্র, আগত যোদ্ধাকে অর্জুন কল্পনা করে আচার্য এত বিহ্বল হয়েছেন যে তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করেছেন। বিপক্ষের অনুরাগী সমরনায়কদের উপেক্ষা করে শত্রুসংহার উপযোগী নীতি প্রয়োগ করুন, চতুর্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনাপূর্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করে সযত্নে রক্ষা করুন, যাতে আমরা

অনায়াসে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি।

কর্ণের এই উদ্দীপনাময় বাক্যেও মহারথীদের মধ্যে যেন কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। প্রায় সকলেরই দৃষ্টি দূরে রথোপরি সেই অর্জুনসদৃশ যোদ্ধার দিকে। প্রত্যেক মহারথীর চোখেমুখে বিস্ময়, কৌতূহল। কুরুবীরদের এই আচরণে কর্ণ ক্ষুব্ধ হলেন। দুর্যোধনের ইপ্সিত কোনো কর্ম বিঘ্নিত হোক কর্ণ তা মন থেকে মানতে পারেন না সে যত অন্যায় কাজই হোক না কেন। কর্ণ সম্যক জানেন দুর্যোধন শঠ, প্রবঞ্চক, লোভী, দাম্ভিক, হিংস্র, পরশ্রী কাতর, তথাপি দুর্যোধন কর্ণের কাছে দেবতা। অজ্ঞাত কুলশীল সূতপুত্র কর্ণকে দুর্যোধন রাজ্য দিয়েছেন রাজকীয় মর্যাদা দিয়েছেন, তাই শুধুমাত্র দুর্যোধনের সন্তুষ্টির জন্য কর্ণ সবকিছু করতে পারেন, তা যত বড় অধর্মই হোক না কেন? এই এক অদ্ভুত রণক্ষেত্র এখানে কোনো রণহুংকার নেই। কোলাহল নেই। কুরুপক্ষীয় সব যোদ্ধারাই যেন চিত্রার্পিতের মতো তাকিয়ে আছে একমাত্র বিপক্ষীয় রথীর দিকে। সেই মহরথীও যেন হিংসা ভুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন কুরুপক্ষীয় মহরাথীদের দিকে দৃষ্টিতে ক্রূরতা নেই, আছে শ্রদ্ধা।

হুংকার দিয়ে উঠলেন কর্ণ—

—কী আশ্চর্য! সব ধনুর্ধরকেই ভীত ও সমরপরাঙ্মুখ দেখছি। ওই যোদ্ধা মৎস্যরাজই হোক বা অর্জুন হোক তাকে ভয়ের কী আছে? বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে রুদ্ধ করে রাখে, সকলে নিশ্চিন্ত থাকুন আমি একাই তাকে অবরোধ করবো। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হলো, অর্জুন আমাকে সমরে পরাজিত করার জন্য একান্ত উৎসুক হয়েছে। আজ এই সংগ্রামে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমাকে প্রহার করবে, তাতে সন্দেহ নেই। মহাবীর ধনঞ্জয় আমার নিশ্চিত শরসমূহ প্রয়োগ করার উপযুক্ত পাত্র। এই মহাবলপরাক্রান্ত ধনুর্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত। আমিও তার থেকে কোনো অংশে কম নই। আজ আকাশমণ্ডল আমার বাণে সমাচ্ছন্ন হয়ে অতিকায় বিহঙ্গের স্বর্ণময় পক্ষবিস্তার বলে বোধ হবে।

আজ আমি সমরে অর্জুনকে সংহার করে দুর্যোধনসমীপে পূর্বপ্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করব। মাহুত অঙ্কুশদ্বারা যেমন মহাগজকে নিপীড়িত করে অদ্য যুদ্ধে আমি মহেন্দ্র সমতেজা ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আজ আমিও সর্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করব। যেমন সৌদামিনীর নাথ জলধর পটল অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে প্রবল হুতাশনকে নির্বাপিত করে, সেইরূপ আমিও অদ্য রথারোহণপূর্বক শরজালদ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়কে সংহার করব। আজ আমি রথ থেকে অর্জুনকে নিপাতিত করে দুর্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উৎপাটিত করব। আজ কৌরবগণ পুরুষাকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হয়ে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে দেখবেন। এক্ষণে তাঁরা গোধন নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্বক আমার রণনৈপুণ্য দর্শন করুন।

কৌরব বীরগণ কর্ণের এই আস্ফালনের প্রত্যুত্তর করলেন না। কেবল কৃপাচার্য অগ্রণী হয়ে মৃদু প্রতিবাদ করলেন।

—হে কর্ণ! ক্রূর যুদ্ধে তোমার নিপুণতা আছে এবং কীরূপে মন্ত্রণা করতে হয়, তাও তোমার অবিদিত নেই, কিন্তু উত্তরকালে কী ফল হবে তার কিছুমাত্র পর্যবেক্ষণ কর না। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হয়েছে বটে কিন্তু পণ্ডিতগণ ওই সমুদয় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলে কীর্তন করেছেন। উপযুক্ত দেশকাল পর্যালোচনা করে যুদ্ধ করলে জয়লাভ হয়। কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করলে কখনও জয়লাভ হয় না।

যাহোক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত অতএব দ্রোণ, ভীষ্ম, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা তুমি ও আমি এই ছয়জন রথী প্রস্তুত হয়ে থাকি সকলে একত্র হয়ে অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করব। একাকী যুদ্ধ করব বলে বৃথা সাহস ও দর্প করার আবশ্যকতা নেই। সৈন্যসমুদয় ও প্রধান প্রধান ধনুর্ধরগণ বর্মধারণ ও ব্যূহ রচনা করে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক সাবধান হয়ে থাকুক। পূর্বে দানবগণ বাসবের সঙ্গে যেরূপ সংগ্রাম করেছিল অজুর্নের সঙ্গে আমাদের সেই রকম সমর হবে সন্দেহ নেই।

ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রমুখ গৌরব মহারথীগণও কর্ণের এই আস্ফালন সমর্থন করলেন না। ভীষ্ম বললেন—

—মহামতি কৃপ ও অশ্বত্থামা অতি উত্তম বলেছেন। কর্ণ ক্ষাত্রধর্মাবলম্বন পূর্বক কেবল যুদ্ধ করার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। আর আচার্য যা বলেছেন সে সম্বন্ধে দোষারোপ করা বিজ্ঞব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তম রূপে দেশ-কাল পর্যালোচনা করে যুদ্ধ করাই কর্তব্য। হে দুর্যোধন, এবিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদের উত্তেজিত করার নিমিত্তই সমর বাসনা প্রকাশ করেছেন, অতএব আচার্য দ্রোণ, কৃপ ও আচার্যপুত্রের এবিষয়ে ক্ষমা করা কর্তব্য এবং তোমারও এতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎ কার্য সমুপস্থিত, অর্জুন আগতপ্রায়, অতএব আমাদের সকলেরই একত্র হয়ে যুদ্ধ করা উচিত এক্ষণে পরস্পর বিরোধ করার সময় নয়।

তখন আচার্য দ্রোণ বললেন—

—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পূর্বে যা বলেছেন আমি তাতে সহমত পোষণ করি। হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাতে দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে না পারে, যাতে মহারাজ দুর্যোধন সাহস বা মোহবশত শত্রুর বশীভূত না হন এই বিষয়ে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হলে অর্জুন কদাচ আত্মপ্রকাশ করত না। ওই মহাবীর এক্ষণে গোধন উদ্ধার করতে এসেছে, সে কাউকে ক্ষমা করবে না। অতএব যাতে

অর্জুন মহারাজ দুর্যোধন ও এই সকল সৈন্যকে পরাজিত করতে সমর্থ না হয় এ বিষয়ে নিয়ম নির্ধারণ করা।

ভীষ্ম বললেন—

—কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর নিয়ে এক একটি 'কালচক্র' হয়। এদের কালাতিকের ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের ব্যতিক্রম বশত প্রতি পঞ্চমবর্ষে দুই মাস করে বৃদ্ধি হয়। এইরূপে তাদের ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হয়ে পাঁচ মাস ছয়দিন অধিক হয়েছে। তারা যা যা প্রতিজ্ঞা করেছিল তা পূর্ণ হয়েছে জেনে অর্জুন সমাগত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

—দুর্যোধন বললেন—

—পিতামহ! আমি কদাচ পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।

ভীষ্ম বললেন—

—হে কুরুনন্দন! যতে তোমাদের শ্রেয় লাভ হয়, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্তব্য। আমার অভিপ্রায়ে শ্রবণ করো। তুমি সমস্ত সৈন্যকে চারভাগে বিভক্ত করে তার একভাগ নিয়ে নগরে প্রস্থান কর, অপর এক ভাগ গোধন নিয়ে গমন করুক। পরে কৃপ, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই ভাগ সৈন্য নিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

পিতামহ ভীষ্মের বাক্য সকলে নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। কুরুরাজ দুর্যোধন তন্নির্দিষ্ট সুমদয় কার্য সম্পাদন করলেন। ভীষ্ম প্রথমে দুর্যোধন, পরে গোধনসমূহ, যথাযথ গন্তব্যে সৈন্য বেষ্টন করে প্রেরণ করলেন। অতঃপর ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে দ্রোণকে সম্বোধন করে বললেন—

—আচার্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থান করুন, অশ্বত্থামা বামপার্শ্ব ও কৃপাচার্য দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা করবেন। সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হবেন এবং আমি পশ্চাদ্‌ভাগে থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।

তখন দ্রোণাচার্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন—

—এই দেখ, দূরে মহাবীর অর্জুনের রথের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাচ্ছে, ধনঞ্জয় সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক মুহুর্মুহু গাণ্ডীব শরাসনে অশনিনির্ঘোষ সদৃশ টঙ্কার প্রদান করছে।

অর্জুনের এখন লক্ষ্য একমাত্র দুর্যোধন। অর্জুনের নির্দেশে উত্তর যেদিকে গোধন-সহ দুর্যোধন গমন করেছে সেইদিকে রথ চালনা করলেন। অচিরেই অর্জুন অপহৃত গোধন সমূহকে মুক্ত করে মৎস্যরাজ্যের গোশালার দিকে ধাবিত করলেন এবং স্বয়ং দুর্যোধনের দিকে ধাবমান হলেন। উত্তরকে লক্ষ্য করে বললেন—

—ওই দেখ, সূতপুত্র কর্ণ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আমার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য সমুদ্যত হয়েছে। ওই দুরাত্মা দুর্যোধনের আশ্রয় বলে একান্ত দর্পিত। তুমি সত্বর ওই নরাধমের কাছে আমাকে নিয়ে চল। উত্তর দক্ষ সারথির ন্যায় অতি দ্রুত অশ্বসমুদয় চালনা পূর্বক শত্রুসৈন্য বিনাশপূর্বক রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত করলেন। তখন কর্ণের সহযোগী যোদ্ধারা অর্জুনের উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগল। এই যোদ্ধারা অর্জুনের শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় আলোড়িত হয়ে উঠল। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পরাক্রান্ত সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক পৃথ্বীতলে শায়িত হলো।

তখন কর্ণ ক্রোধভরে অর্জুনের সমীপবর্তী হয়ে দ্বাদশবাণ দ্বারা তাঁর অশ্ব, সারথি এবং স্বয়ং অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। আহত অর্জুন সহসা কর্ণের সমীপবর্তী হয়ে শরবর্ষণ দ্বারা তাঁর রথের অশব সারথিকে ভূপাতিত করে কর্ণকে শরজালে আচ্ছন্ন করলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড বাণ বর্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহারথীদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেল। তখন মহাবীর কর্ণ বহুতর শরনিক্ষেপ দ্বারা পার্থের সমুদয় বাণ প্রতিহত করে অগ্নিবাণ দ্বারা পার্থকে আচ্ছাদিত করলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হয়ে নানাবিধ বাদ্য সহকারে কর্ণের প্রশংসা করতে লাগল। অর্জুন তখন বরুণবাণ দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করে ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য যোদ্ধাদের আক্রমণ করলেন। বারিধারার মতো শরবর্ষণে কর্ণের অশ্ব সারথিকে পুনরায় ভূপাতিত করলেন। কর্ণও বিবিধ সায়ক দ্বারা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধে দুই বীরকে মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র সূর্যের ন্যায় বোধ হতে লাগল।

কর্ণ সত্বর অর্জুনের রথের অশ্বগুলিকে পুনরায় বাণবিদ্ধ করে সারথির উপর তিন শর এবং ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করলেন। তখন ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হয়ে শরনিক্ষেপ দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদন পূর্বক তূণীর থেকে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করে ত্বরায় কর্ণের গাত্রে বিদ্ধ করলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা সুতপুত্রের বাহু, শির, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করলে গজ যেমন অন্য গজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ কর্ণ অশনিসন্নিভ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করলেন।

কর্ণ প্রস্থান করলে দুর্যোধন প্রমুখ বীরপুরুষগণ স্ব-স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে পার্থকে আক্রমণ করে চর্তুদিক থেকে শরবর্ষণ করতে লাগলেন। নির্ভীক পার্থ সহাস্যবদনে বেলাভূমির ন্যায় সমুদ্র-সদৃশ কৌরবসেনার বেগ ধারণ করে দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

অস্তকাল উপস্থিত হলে দিবাকরও বিশ্রাম করে থাকেন, কিন্তু মহাবীর অর্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হন না। তিনি সেই সমস্ত কুরুবীরদের লক্ষ্য করে অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রমুখ বীর

কখনো এককভাবে বা কখনো সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন এবং বারংবার পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন। এই সময়ে কর্ণ পুনরায় রণক্ষেত্রে আগমন করে উৎকৃষ্ট কার্মুক আকর্ষণপূর্বক অর্জুনের প্রতি শরবৃষ্টি করতে লাগলেন। রণস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ উত্থিত হলো। অর্জুন তখন ইতস্তত দৃষ্টিপাত করামাত্র কর্ণকে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ দেখে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন এবং জিঘাংসাপরবশ হয়ে আরক্ত নেত্রে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধ অভিলাষে তাঁকে বললেন—

—হে কর্ণ! ভূমিতলে তোমার সদৃশ যোদ্ধা নেই বলে তুমি পূর্বে সভামধ্যে সাতিশয় অহংকার প্রকাশ করেছিলে। এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত, একবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহলে তুমি আপনার পরাক্রম জানতে পারবে অন্যের অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হবে না। তুমি আমার অসমক্ষে সে সকল কথা বলেছিলে আজ কৌরব সমক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে দেখাও। এই দুরাত্মারা যখন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্বক সভামধ্যে নিগ্রহ করেছিল তখন তা নিষ্পত্তি না করে অনায়াসে তাঁর সেই দুরবস্থা অবলোকন করেছিলে, আজ তার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। ধর্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলে পূর্বে ক্ষমা করেছি, আজকের যুদ্ধে সেই ক্রোধের প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করবে।

কর্ণ তখন বললেন—

—পার্থ! কথায় যা বললে, তা কাজে করে দেখাও। অনর্থক বাক্যব্যয় করে কী হবে? তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশবর্ষ বনে বাস করে সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েছ, তাই তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছ সন্দেহ নেই। হোক যুদ্ধ, এই যুদ্ধে যদি স্বয়ং দেবরাজও তোমার সাহায্যার্থে যুদ্ধ করেন তাতেও তুমি অব্যাহতি পাবে না। তোমার যুদ্ধাভিলাষ আচিরেই নিবৃত্ত হবে। আমার শক্তি ও বিক্রমের ধারণা তোমার নেই।

অর্জুন বললেন—

রাধেয়! তুমি এইমাত্র রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নিজের জীবন রক্ষা করেছিলে তোমার সহযোদ্ধারা নিহত হয়েছে তথাপি তোমার লজ্জা বা অনুশোচনা নেই। তোমার মতো নির্লজ কাপুরুষ দ্বিতীয়টি ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই কথা বলে অর্জুন কর্ণের দিকে বর্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করলে কর্ণও তৎক্ষণাৎ অর্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করতে থাকেন। অর্জুন বাণদ্বারা কর্ণের তূণীর রজ্জু কর্তন করলে কর্ণ অন্য তূণীর থেকে শরবর্ষণ করতে থাকে। সহসা অসংখ্য কর্ণসৈন্য অর্জুনকে একযোগে আক্রমণ করলে অর্জুন সবাইকে শমনভবনে পাঠিয়ে আবার কর্ণকে আক্রমণ করেন। কর্ণের রথের অশ্ব ও সারথি নিহত হয়। অর্জুন কর্ণের দিকে এক জ্বলন্ত বাণ নিক্ষেপ করেন, সেই বাণের আঘাতে কর্ণ মূর্চ্ছিত হন, কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে কর্ণ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেন।

এই মহাসংগ্রাম দর্শনে কুমার উত্তর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে অর্জুন তাঁকে তার বংশগৌরব ও বীরত্বের কাহিনি শুনিয়ে উজ্জীবিত করেন। অতঃপর ভীষ্মকে আক্রমণ করে তাঁকে সংজ্ঞাহীন করেন এবং সম্মোহন বাণে কুরু সেনাপতিদের মূর্চ্ছিত করে উত্তরের সাহায্যে তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহরণ করেন। যুদ্ধ জয়ের পর আবার সেই শমীবৃক্ষের কাছে গিয়ে অর্জুন অস্ত্রগুলি পুনরায় উত্তরকে দিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

এদিকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে কৌরবগণ লজ্জায় অপমানে ও ভয়ে দ্রুত বিরাটনগর ত্যাগ করলেন। অর্জুন উত্তরকে আপাতত যুদ্ধের সমুদয় ঘটনা প্রকাশ না করার নির্দেশ দিলেন। বিরাট নগরবাসী যেমনটি দেখেছে বৃহন্নলার সারথ্যে উত্তরের যুদ্ধযাত্রা, তেমনিই জানুক উত্তরই এই যুদ্ধজয় করেছে। উত্তর যেন কোনো অবস্থাতেই পঞ্চপাণ্ডবদের বিরাট নগরের প্রাসাদে অবস্থান করছেন একথা যেন প্রকাশ না পায়। গোগৃহে গোধনের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বিজয়ী উত্তর ও বৃহন্নলা নগরে প্রবেশ করলে নগরবাসী বিজয় উৎসবে মেতে উঠেন।

উৎসব বিরাট রাজপ্রসাদেও। উত্তরের বীরত্বে গর্বিত বিরাট। অপরাজেয় কুরুসেনাকে নবীন যোদ্ধা উত্তর পরাজিত করেছে এই কথা তিনি বারবার বয়স্য কঙ্ককে বলছেন। কঙ্কও বলছেন যেখানে সারথি বৃহন্নলা আছেন সেখানে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। বার বার বৃহন্নলার নাম উল্লেখ করাতে রাজা বিরাট ক্রুদ্ধ হয়ে কঙ্ককে হস্তস্থিত পাশা ছুঁড়ে মারেন। পাশার আঘাতে কঙ্কের কপাল কেটে যায়, রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ সৈরিন্ধ্রী এক স্বর্ণপাত্র ধরে রক্তধারা ভূমিতে পড়া আটকায়। কারণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যুধিষ্ঠিরের রক্ত ভূমিতে পতিত হলে প্রহারককে তিনি হত্যা করবেন।

এমন সময়ে উত্তর ও বৃহন্নলা ফিরে এল। রাজা বিরাটের আজ আনন্দের দিন। সুশর্মাকে পরাজিত করে বল্লভ বিরাটকে উদ্ধার করেছে, আবার বৃহন্নলার সারথ্যে উত্তর কুরুদের বিতারিত করে ষাট হাজার গোধন উদ্ধার করেছে।

ক্রমে উত্তর সব বৃত্তান্ত পিতার কাছে ব্যক্ত করল এবং পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করলেন। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়লে পাণ্ডবদের মিত্রগণ বিরাট রাজ্যে উপস্থিত হলেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ-বলরাম, সুভদ্রা অভিমন্যু, এলেন দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সঙ্গে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র। বিরাটের আগ্রহে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইবার কৌরবদের কাছ থেকে হৃতরাজ্য উদ্ধারের প্রস্তুতি।

* * * * *

একা পার্থের হাতে ভুবনবিখ্যাত কৌরববাহিনীর পরাজয়

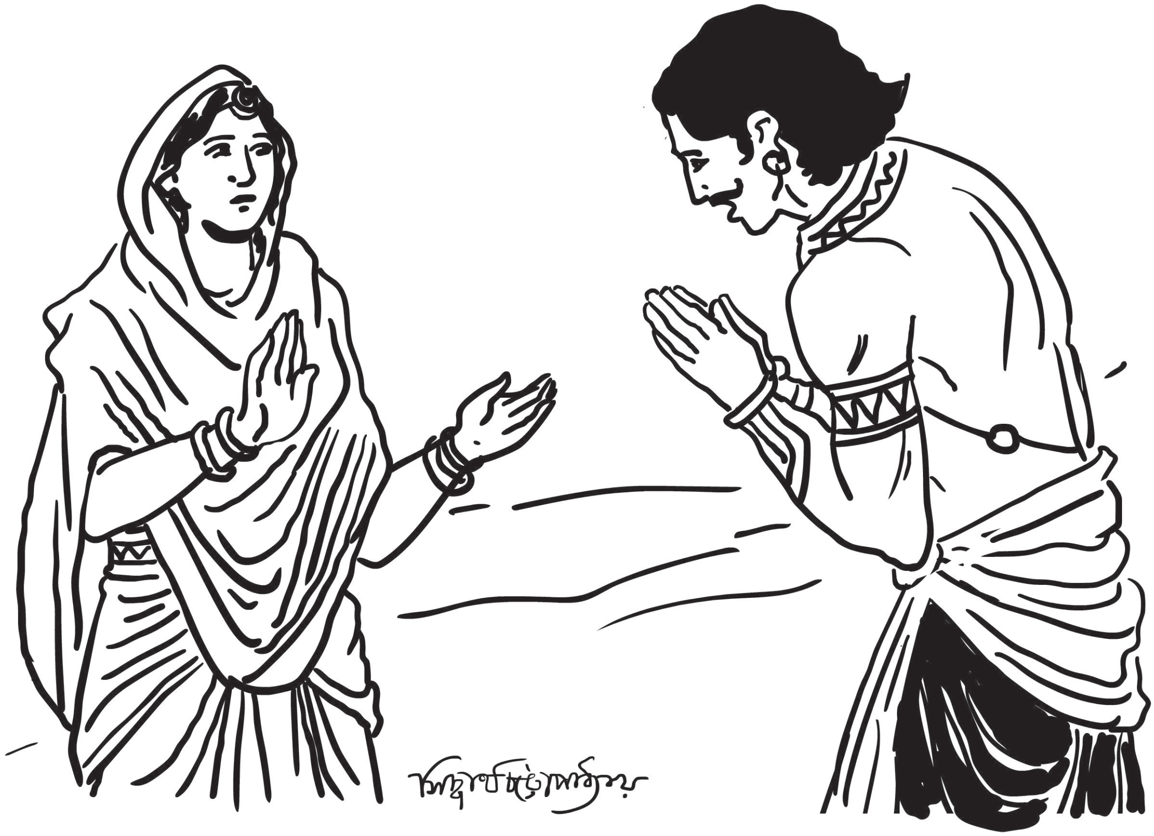

কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না মহামানী দুর্যোধন। অর্জুন শেষ পর্যন্ত তার শিরস্ত্রাণটাও কেটে দিল। এ যেন শার্দূলের হাতে কুঞ্জর প্রধানের পরাজয়। সভামধ্যে অধোমুখে বসে আছেন দুর্যোধন, রথী, মহারথী, পার্ষদবর্গ কারও মুখে কোনো কথা নেই। দুর্যোধনের পাশের আসনে বসেছিলেন সখা কর্ণ। তিনি প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—

—মহারাজ, চিন্তা ত্যাগ করুন। পঞ্চপাণ্ডবকে মারার জন্য কৌশল স্থির করতে হবে। যে কৌশলে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধ করেছিলেন, অথবা স্বয়ং মহাদেব ত্রিপুরকে বধ করেছিলেন। পাণ্ডব বধের জন্য আমাদেরও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমার মতে অবিলম্বে বিরাটনগরে দূত পাঠিয়ে পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করে হস্তিনায় আনা হোক। বিরোধ নিরসনে তাঁদের ভোজনে আপ্যায়িত করা হবে। সুপকারদের গোপন সংকেত দিতে হবে যেন তারা পাণ্ডবদের খাদ্য ও পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দেয়। বিষপানে হীনবল হলে কৌরব যোদ্ধারা তাঁদের বেষ্টন করে হত্যা করবে। ছলে-বলে শত্রু নিধন শাস্ত্রের বিহিত। অথবা সৈন্য সজ্জা করে বিরাট নগরী আক্রমণ করা হোক। বিরাটের পুরী চতুর্দিকে ঘিরে অগ্নি সংযোগ করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারা হোক। কর্ণের এইসব পরিকল্পনা দুর্যোধনের মনঃপুত হলো না, কারণ অতীতে এইরকম বহু পরিকল্পনা পাণ্ডবরা ব্যর্থ করেছে।

দুর্যোধন এবার যুদ্ধপণ করলেন। বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়া হবে না। এবার পাণ্ডবদের ধনে প্রাণে শেষ করতে হবে। কর্ণকে বললেন—

—সখা! তুমি দিকে দিকে দূত প্রেরণ কর। আমার অধিকারে যত রাজা আছে সবাইকে বার্তা পাঠাও। মদ্ররাজ, সুমন্ত, কলিঙ্গ, কামোদ, ভোজ, বাহ্লীক, সুর্শমা সবাইকে যুদ্ধের জন্য বরণ কর। এই আসন্ন যুদ্ধের জন্য একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য সমাবেশ করতে হবে, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে।

দুর্যোধনের এই সিদ্ধান্তে কর্ণ অতিশয় প্রীত হলেন। বুদ্ধি, বলে ও গুণে দুর্যোধনকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলে রাধেয় ঘোষণা করলেন। দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, প্রজাপতিদের মধ্যে দক্ষ, তারাগণের মধ্যে চন্দ্র তেমনি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে দুর্যোধন প্রধান বলে কর্ণ সগর্বে ঘোষণা করলেন। ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধ বিমুখ হলে শাস্ত্রমতে তাঁকে ক্ষত্রিয়রূপে গণ্য করা যায় না। কর্ণ ও দুর্যোধন সেই মুহূর্ত থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কর্ণ দুর্যোধনের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে ভীষ্ম এইবার কথা বললেন—

—দুর্যোধন! কর্ণ! তোমাদের এই যুক্তি আমি মানতে

পারলাম না। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ উত্তম দেখায় না। এযাবৎ পাণ্ডবেরা তোমাদের অহিত কিছু করেনি। তাই এই সর্বনাশা যুদ্ধের পরিকল্পনা ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। তুমি স্বেচ্ছায় তাদের যে রাজ্যভাগ দেবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাতেই তারা সন্তুষ্ট হবে।

ভীষ্মের বাক্যে দুর্যোধন অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বললেন—

—প্রাণ গেলেও আমি শত্রুর ভজনা করব না। শত্রুর হাতে যে রাজ্য তুলে দেয় তাকে শত ধিক। সে ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য।

ভীষ্ম বললেন—তবে তোমার যা ইচ্ছা কর। যুদ্ধানলে দগ্ধ হওয়াই তোমার ভবিতব্য। তবে তুমি একা দগ্ধ হবে না সমগ্র কুরুকুলকেও মজাবে।

অতঃপর দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, বাহ্লীকরাজ প্রত্যেকেই ভীষ্মের কথা মেনে নেওয়ার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন। পূর্বে যে ইন্দ্রপ্রস্থের উপর পাণ্ডবগণের অধিকার ছিল সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে নেবার জন্য একে একে সবাই পরামর্শ দিলেন দুর্যোধনকে। কিন্তু পাষণ্ড দুর্যোধন কারও কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। সকলেই তখন অদৃষ্টকে মেনে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। দুর্যোধন ও কর্ণ তখন ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পরিকল্পনায় ব্যস্ত হলেন।

* * * * *

এদিকে বিরাট রাজ প্রাসাদেও বসেছে আর এক মন্ত্রণা সভা। দায়মুক্ত পঞ্চ পাণ্ডব, অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাট রাজকন্য উত্তরার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রাতঃকালে সভায় উপস্থিত আছেন পঞ্চপাণ্ডব, রাজা বিরাট, উত্তর, রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সবার সম্মুখে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমেই দ্রুপদ পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস অন্তে আপন পৈতৃক রাজ্য কৌরবদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে প্রিয়ংবদ, স্থিতধী কোনো দূতকে হস্তিনায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠানোর জন্য সবার অনুমোদন প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কোনো প্রিয়ংবদ, প্রাজ্ঞ দূত গিয়ে যদি জ্যেষ্ঠতাত, পিতামহ ও দুর্যোধনকে এবং সূতপুত্র কর্ণকে বুঝিয়ে যদি আপোশে নিষ্পত্তি করতে পারে তবে বিবাদে কাজ কী? আর যদি তাঁরা সম্প্রীতি না করে তখন অন্য বিধান নেওয়া হবে।

পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন বাস্তব কথাটাই বললেন—

—হস্তিনায় দূত প্রেরণ অনাবশ্যক, কারণ পাপাচারী দুর্যোধন সম্প্রীতে রাজ্য প্রত্যার্পণ করবে না। দুর্যোধন যতটা দুরাচার কপট তার থেকেও অধিক তার পরমসখা কর্ণ। বিনাযুদ্ধে তারা কদাপি শান্ত হবে না। আমার মতে আমাদের যৌথবাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুর আক্রমণ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির বাহুবলে আপন হৃতরাজ্য উদ্ধার করুন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যে ভীম অত্যন্ত প্রীত হলেন। অর্জুনও সহমত পোষণ করে অচিরেই হস্তিনাপুর আক্রমণ করে কৌরবদের বিনাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নকুল,সহদেবও সহমত পোষণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ নীরবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এইবার প্রথম কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণের মতামত শোনার জন্য সভাস্থ সকলে এতক্ষণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, ফাল্গুনী, নকুল ও সহদেবের মত সমুচিত। তথাপি শাস্ত্রের বিধান, রিপুর সঙ্গেও সম্প্রীতির সন্ধান করা উচিত। আমার মত এই যে হস্তিনাপুরে একজন বাগ্মী, দূরদর্শী দূত প্রেরণ করা হোক। তিনি শাস্ত্রের বিধানে কৌরবদের ধর্মনীতি বোঝাবেন। তাতে যদি দুর্যোধন রাজ্যপাট ফিরিয়ে দেয় ভাল অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সভাস্ত সকলে একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ধৌম্যকে দূত রূপে হস্তিনায় প্রেরণ করা হলো। শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকা ছেড়ে এসেছেন বহুদিন হয়ে গেল। তিনিও এবার সপার্ষদ দ্বারকায় ফেরার অনুমতি চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের হাত ধরে বললেন—

—হে নারায়ণ! দুষ্ট দুর্যোধন, সম্প্রীতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই যুদ্ধে কৌরব সহায় মহা মহা বীরগণ। আর আমাদের সহায় কেবলমাত্র তুমি। তুমি অনুকূল না হলে আমরা পঞ্চভ্রাতা কালসলিলে নিমজ্জিত হব।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—আমি সর্বদা পাণ্ডবদের সঙ্গে আছি। আসন্ন মহারণে আমি পার্থের রথের সারথি হব। পার্থের বিক্রম ত্রিভুবনে খ্যাত, পার্থ একাই কুরুদের পরাজিত করতে পারে। এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধব দ্বারকাবতীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এদিকে কুরুসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আসীন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্যোধন, কর্ণ প্রত্যেকই স্ব স্ব আসনে আসীন। অন্যান্য অমাত্যগণও সভায় উপস্থিত। এমন সময় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সভায় প্রবেশ করলেন পাণ্ডবদের প্রেরিত দূত পণ্ডিত ধৌম্য। ব্রাহ্মণ দেখে সভাসদরা তাঁকে সসম্মানে বরণ করে মহার্ঘ আসনে বসালেন।

এইবার ধৌম্য আপন পরিচয় দিয়ে তাঁর আগমনের কারণ কুরুসভায় ব্যক্ত করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য, খুল্লতাত বিদুরের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে, ভ্রাতাদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে তাঁদের পৈতৃক রাজ্য প্রত্যার্পণের জন্য প্রার্থনা

জানিয়েছেন।

ধৌম্যের এই বচন শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—হে পণ্ডিতপ্রবর! আপনার বাক্য অসদৃশ হয়। পাণ্ডুর তনয়রা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। আমার পুত্র দুর্যোধন এবং কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের নিমিত্ত এইসব অঘটন ও পাণ্ডুপুত্রদের এই দুর্ভোগ। তাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের শর্ত পালন করেছে। অতএব এখন তাঁদের সমুচিত ভাগ ছেড়ে দেওয়া হোক। তাঁদের প্রাপ্য ধনরত্ন-সহ ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ধৃতরাষ্ট্রের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে ভীষ্ম অত্যন্ত প্রীত হলেন। ভীষ্ম অবগত আছেন যদি পাণ্ডবদের অপহৃত রাজ্যপাট ও ধনরত্ন তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে যে মহাসংগ্রাম হবে তাতে কুরুকুল বিনাশ হবে। তাই পাণ্ডবদের আহ্বান করে সসম্মানে তাঁদের প্রাপ্য অংশ প্রত্যার্পণ করে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা আশু কর্তব্য।

সভামধ্যে দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, বাহ্লীক নৃপতি প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে আপোশ মীমাংসার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্যোধনকে অতীতের বিভিন্ন উপমা দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ভাই ভাই বিরোধে মহা সর্বনাশ সমুপস্থিত হবে। তাই পাণ্ডবদের হস্তিনায় আহ্বান করে তাঁদের প্রাপ্য ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

পিতা ও সভাস্থ সকলের মতামত শোনার পর দুর্যোধন বললেন—আপনাদের এই বিচার ন্যায়সঙ্গত নয়। পাণ্ডবরা আমার পরম শত্রু, তাদের সঙ্গে কখনও সম্প্রীতি সম্ভব নয়। বিনাযুদ্ধে শত্রুকে রাজ্য,ধন ফিরিয়ে দেওয়া ক্ষাত্রধর্ম শাস্ত্রসম্মত নয়। ওই পরম শত্রুকে আমি বিশ্বাস করি না এবং এই রাজসভায় কেউ সেই শত্রুর মহিমা প্রকাশ করে তাও আমার অভিপ্রেত নয়। পিতা আপনি রুষ্ট হোন, ক্রুদ্ধ হোন, বিনা যুদ্ধে আমি পাণ্ডবকে রাজ্যভূমি ছাড়ব না।

এই কথা বলে দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন সহ দুষ্ট মন্ত্রীদের নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। বিফল মনোরথ হয়ে ধৌম্য ফিরে গেলেন বিরাটরাজ্যে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীকরাও অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করলেন।

* * * * *

বিরাট রাজসভায় আলোচনা হচ্ছিল হস্তিনায় কী হতে পারে। দুর্যোধন যে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন না তা নিয়ে সবাই একমত। এমন সময় প্রবেশ করলেন পণ্ডিতপ্রবর ধৌম্য। জানালেন কুরু রাজসভার বৃত্তান্ত। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুরাদির সৌজন্য, দুর্যোধনের ক্রূরতা, ঔদ্ধত্য। এবার বিরাট সভায় সকলে একমত যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এবার সৈন্য সংগ্রহের তৎপরতা শুরু করতে হবে। সর্বাগ্রে এই সংবাদ জ্ঞাত করাতে হবে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে। জানতে হবে তাঁর অভিমত। দ্রুপদ, বিরাট, পাণ্ডবদের পরম আত্মীয় এছাড়া অন্যান্য রাজাদেরও আমন্ত্রণ জানাতে হবে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বনের জন্য।

দুর্যোধন কালবিলম্ব না করে ইতিমধ্যেই সৈন্য সমাবেশ শুরু করে দিয়েছেন। চেদিরা দুর্যোধনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমন্ত্রণ পেয়ে ভগদত্তও সসৈন্যে এসে হাজির। রাজা বৃহদ্বলও পত্রপাঠ সসৈন্যে এসে গেছেন। কলিঙ্গ নরপতিও রণসাজে সজ্জিত হলেন দুর্যোধনের আমন্ত্রণ পেয়ে। কিরাত, যবনরাও এসে উপস্থিত দুর্যোধনের শিবিরে। এসেছেন মীনধ্বজ অর্বুত অর্বুদসেনা নিয়ে। এলেন দুর্যোধনের পরম মিত্র রাজা সুশর্মা বিশাল বাহিনী নিয়ে। অগণিত সৈন্য নিয়ে আসে ত্রিগর্ত রাজা। এলেন রাজা ক্ষেমবতী, রাজা অনুবিন্দ, রাজা সুমন্ত্র আর রাজা জরাসন্ধও প্রচুর সৈন্য নিয়ে উপস্থিত। এইভাবে প্রায় ছয় হাজার নৃপতি, রথ, অশ্ব, গজরথী, পদাতিক সমবেত হলো দুর্যোধনের শিবিরে। এই বিপুল সংখ্যক সেনা এবং গজ, অশ্ব রাখার জন্য দুর্যোধনের নির্দেশে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আগমন স্কন্ধবার নির্মিত হলো। হাতি এবং অশ্বের রাখার জন্য নির্মিত হলো হাতিশালা ও অশ্বশালা। মজুদ হলো অফুরন্ত রসদ।

এদিকে পাণ্ডবরাও আর চুপ করে বসে নেই। পাণ্ডবদের যত মিত্র, সুহৃদ, বন্ধুজন আছে সবাইকে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। সৌবল, সুমিত্র, মদ্র, যদু, ভোজ অন্ধ্র, পাণ্ডবগণের বার্তা পেয়ে সবাই সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। দ্রুপদ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তত্ত্বাবধানে কুরুক্ষেত্রে তৈরি হলো পাণ্ডব শিবির পরিখা, জলাশয়, হাতিশালা, অশ্বশালা খাদ্যভাণ্ডার সবই নির্মিত হলো সুপরিকল্পিতভাবে।

এইভাবে যখন দিকে দিকে রাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে আনার জন্য সচেষ্ট তখন দুর্যোধন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর উলূককে দূতরূপে পাঠালেন। এই সংবাদ অপগত হয়ে পিতামহ ভীষ্ম বললেন—

—দ্বারকাধিপতির কাছে তুমি না বুঝে দূত প্রেরণ করেছ। ত্রিভুবন জানে কৃষ্ণ পাণ্ডব হিতৈষী, তোমার স্বপক্ষে কৃষ্ণ কদাচিত আসবেন না।

কর্ণ বললেন—

—মিত্র! কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মিত্র। তোমার কোন কাজে, কবে কৃষ্ণ সহায় হয়েছেন? তাঁর কাছে দূত পাঠানোটাই তোমার উচিত হয়নি। যদি-বা কৃষ্ণ তোমার সপক্ষে আসে কপটতার আশ্রয় নিয়ে তোমার সর্বনাশ করবে। তুমি বরং বলরামের কাছে দূত পাঠাও। সংকর্ষণ তোমার সহায় হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শকুনি ও দুঃশাসন কর্ণের প্রস্তাব একবাক্যে সমথন করলেন। শকুনি বললেন—দুর্যোধন! একটা কথা বলি শোন, কৃষ্ণকে পেয়ে তোমার কোনো কাজ হবে না। শত কৃষ্ণের সমান কর্ণ আমাদের সহায়। তবে কৃষ্ণের যে নারায়ণী সেনা আছে তারা সমরে অজেয়, দেবতার সমান তাদের তেজ সেই নারায়ণী সেনা যদি কৃষ্ণের কাছে চেয়ে নিতে পার তবে এই যুদ্ধে জয় তোমার অনিবার্য।

দুর্যোধন বললেন—আমি যুদ্ধহেতু কৃষ্ণকে বরণ করতে চাইছিনা। আমি চাই কৃষ্ণ আমার রথের সারথি হোক।

দুর্যোধনের এই বাক্য শুনে দ্রোণ ও কৃপ বললেন—

—এরকম বাক্য তুমি মুখে আনছ কী করে? শ্রীকৃষ্ণ হবেন তোমার সারথি। যিনি সর্বদা পাণ্ডব সহায়, তিনি তোমার সারথি হবেন তা তুমি ভাবলে কী করে?

এই বিতণ্ডার মধ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বললেন—

—দুর্যোধন! পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করার আগে তুমি বরণ করে নাও।

দুর্যোধন ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। সেই দূত উলুক কী বার্তা নিয়ে আসে তার জন্য অপেক্ষা করা কর্তব্য। যথা সময়ে উলুক হস্তিনায় ফিরে এল শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন অর্জুন তাঁকে বরণ করতে আসছেন, দুর্যোধনও যদি আসেন তবে সে তাঁকে আগে বরণ করবেন। অর্জুন দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন দূতমুখে সংবাদ পেয়ে দুর্যোধনও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন। পাঁচদিন পরে অপরাহ্ণে অর্জুন ও দুর্যোধন দ্বারকায় পৌঁছালেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে শুনলেন কৃষ্ণ তখন নিদ্রামগ্ন। তাঁরা সেই শয়নমন্দিরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ নিন্দ্রামগ্ন। পালঙ্কের শিয়রের দিকে এক রত্ন সিংহাসন। দুর্যোধন সেই সিংহাসনে উপবেশন করলেন। নিন্দ্রামগ্ন কৃষ্ণের পায়ের কাছে এক অতি সাধারণ আসন। অর্জুন সেই আসনে উপবেশন করে নির্নিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর চরণপদ্মে ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করছেন। কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করে অর্জুনের এই হীন আচরণ, দুর্যোধন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না।

নিদ্রাভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দেখলেন অর্জুনকে। তাঁকে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করলেন। এবার ধনঞ্জয় আগমনের কারণ জানালেন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ অনবার্য উভয়পক্ষই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় অগ্রজ যুধিষ্ঠির আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাকে আমাদের পক্ষে বরণ করতে।

অগ্রজের আবেদন তুমি আমাদের পক্ষে সারথ্য গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন— অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা আমি অবশ্যই পালন করব।

শুনে অর্জুন অত্যন্ত হৃষ্টমন হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম জানালেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন দুর্যোধনের দিকে। দুর্যোধনকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ যথাযথ সম্মান দেখিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্যোধন বললেন—

—আমি বহুক্ষণ এখানে এসেছি, অর্জুন আমার পরে এসেছে। যাহোক তোমার সারথ্যগুণ ভুবনবিদিত। তাই আমি এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি যে আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সারথি হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—কুরুরাজ! তুমি যথার্থই বলেছ। কিন্তু আমাকে ইতিপূর্বে অর্জুন সারথিপদে বরণ করেছে, তাই তোমার প্রার্থনা পূরণে আমি অপারগ। তবে তোমাকে আমি শূন্যহাতে ফিরাব না। আমার নারায়ণী সেনা ভুবনবিখ্যাত। বলে বীর্যে তারা আমার সমকক্ষ। যদি তুমি সম্মত থাক তবে এই অপরাজেয় সেনা তুমি গ্রহণ করতে পার। অগ্রজ বলরাম তীর্থক্ষেত্র থেকে আমাকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন আসন্ন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে আমাকে অস্ত্রধারণ না করতে, কাজেই এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না।

নিরস্ত্র কৃষ্ণের থেকে সশস্ত্র অপরাজেয় নারায়ণী সেনা দুর্যোধনের কাছে অধিক কাম্য, তিনি কৃষ্ণের কাছে নারায়ণী সেনা প্রার্থনা করলেন এবং এই বিশাল সেনা নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

নারায়ণী সেনা দুর্যোধনকে দেওয়াতে অর্জুনের মনে দুঃখ হলো। এই অপরাজেয় নারায়ণী সেনা দুর্যোধনের হাতে, তার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। কৃষ্ণ বললেন—নারায়ণী সেনার মৃত্যু তোমার হাতে। মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে এক যুদ্ধে এই নারায়ণী সেনা আমি সৃষ্টি করেছিলাম। তোমার হাতে তাদের মৃত্যুও আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ এলেন পাণ্ডব শিবিরে। যুদ্ধ পাণ্ডবদের কাম্য নয়। যুদ্ধে রক্তক্ষয়, আত্মীয় বিয়োগ, রাজ্যের অর্থনীতি পঙ্গু। শ্রীকৃষ্ণেরও একই মত। সম্প্রীতি, আপোশে নিষ্পত্তি, কিন্তু কৌরবরা বিশেষত দুর্যোধন ও তার দুষ্ট মন্ত্রীরা যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ শেষ চেষ্টায় আগ্রহী। যদি কোনোভাবে এই আসন্ন যুদ্ধ রদ করা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মরাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষের হিতার্থে কৌরবসভায় গমন করব। যদি শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে পাণ্ডব, কৌরব এবং যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ রক্তপাত ও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং আমারও তাতে মহাফলপ্রদ পুণ্য লাভ হবে।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! আমার মতে তোমার কৌরব সভায় গমন যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ সেস্থানে তুমি যতই হিতকর বাক্য প্রয়োগ কর দুর্যোধন তা মানবে না। অন্যান্য যেসকল নৃপতি ওখানে আছেন তাঁরাও দুর্যোধনের আজ্ঞাবহ।

অতএব তোমার কৌরবসভায় গমন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তোমার অপমানের বিনিময়ে দেবত্বও আমাদের অভিপ্রেত নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মরাজ। পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের প্রকৃতি আমার আজানা নয়। কিন্তু অগ্রে সেখানে উপস্থিত হয়ে সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন করলে লোকমধ্যে আমরা নিন্দনীয় হব না। সুতরাং আমি কুরুসভায় গমন করছি।

যথাসময়ে কৃষ্ণের রথ এসে থামল কৌরব সভাগৃহের সিংহদ্বারে। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করলেন। বিদুর ও সাত্যকির হস্ত ধারণ করে তিনি রাজসভায় প্রবেশ করলেন তাঁর সম্মুখে কর্ণ ও দুর্যোধন এবং পশ্চাতে কৃতবর্ম্মা, শকুনি, দুঃশাসন প্রমুখ রাজপুরুষ। নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কুশলাদি বিনিময়ের পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে কুরুসভার কাছে সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

—হে ভরত বংশাবতংস! আমার মানস এই যে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়। বীরপুরুষদের বিনাশ না হয়। এই প্রার্থনা নিয়ে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনাকে অন্য কোনো হিতোপদেশ দেওয়ার বাসনা নেই। এক্ষণে কুরুকুলে ঘোরতর বিপদ আগত। আপনি যদি এই পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেন, এর ফলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হবে। আপনি শান্তি স্থাপন করলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হবে। অতএব বৈরিতা নিষ্ফল বিবেচনা করে শান্তি স্থাপনে যত্নবান হোন।

ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সাগ্রহে শ্রবণ করলেন। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর বললেন—হে কেশব ! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্মানুগত, ন্যায়পরায়ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই। সুতরাং আমার কোনো প্রিয়কার্য অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব তুমি পাপাত্মা দুর্যোধনকে শান্ত করার চেষ্টা কর। সে গান্ধারী, ধীমান বিদুর বা ভীষ্ম প্রভৃতি সুহৃদ্গণের হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর, তা হলে তোমার বন্ধুজনোচিত্ত কার্য করা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

—হে ভ্রাতঃ! পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা, তোমার পিতার ও অন্যান্য অমাত্যগণের নিতান্ত অভিপ্রেত। এক্ষণে তা তোমারও অনুমোদিত হোক। যে ব্যক্তি সুহৃদবাক্য শ্রবণ করে, গ্রাহ্য করে না, সেই ব্যক্তিকে পরিশেষে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করতে হয়। অতএব তুমি ধর্মপথে এসে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্যপাট তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে সম্প্রীতির কবলে আবদ্ধ হও, এতে দুই পক্ষেরই কুশল।

কৌরবসভায় উপস্থিত প্রাজ্ঞজন, মুনিঋষিগণ সবাই পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধে করলেন। ক্রান্তদর্শী ঋষি মুনিগণ এও জানালেন যে যদি যুদ্ধ হয় তাতে কুরু বংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্যোধন অনড়, তাঁর কথায়।

—আমার জীবদ্দশায় পাণ্ডবের সঙ্গে সন্ধি হবে না। যুদ্ধ ছাড়া পাণ্ডবদের আমি রাজ্য দেব না। এই আমার পণ। পাণ্ডবরা যুদ্ধ করুক, আমাদের পরাজিত করে, সমগ্র কুরু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হোক।

শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসি মুখে বললেন—দুর্যোধন! তোমার মনের কথা বুঝতে পারলাম। তোমার বীরত্বের প্রতিশ্রদ্ধা জানিয়ে আমি একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা তোমার কাছে নিবেদন করছি। তোমাকে পাণ্ডবগণের অর্ধরাজ্য ছাড়তে হবে না, তাঁরা তোমার অধীন হয়ে পাঁচটি গ্রাম ছেড়ে দাও। তুমি সুখে রাজ্য ভোগ কর, শুধুমাত্র পাণ্ডব-নগর, কুশস্থল, সিদ্ধিগ্রাম, ইন্দ্রপ্রস্থ আর বারণাবত গ্রাম পাঁচটি তাঁদের ছেড়ে দাও। বিবাদের অবসান হোক।

কৃষ্ণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—অতি উত্তম, দুর্যোধন তুমি কৃষ্ণের এই প্রস্তাব মেনে নাও, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাক্।

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে দুর্যোধন ক্রোধভরে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন—

—বিনাযুদ্ধে আমি সূচ্যগ্র মেদিনীও পাণ্ডবদের দেব না। সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত হলে, আকাশ ভূমিতে লুটিয়ে দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোভিত হয় তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা খণ্ডন হবে না।

বিফল মনোরথ হয়ে কৃষ্ণ ফিরে আসছেন পাণ্ডব শিবিরে। দুর্যোধন এরমধ্যে আর এক ষড়যন্ত্র করেছেন কৃষ্ণকে বন্দি করার জন্য। সভামধ্যে ছদ্মবেশে বহু বীর যোদ্ধা নিয়োজিত আছে। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের কাছে কিছুই অবিদিত থাকে না। প্রচণ্ড অট্টহাস্যে সভাস্থল প্রকম্পিত করে শ্রীকৃষ্ণ বিশাল দেহ ধারণ করলেন। আকাশব্যাপী প্রলম্বিত এই দেহে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, নবগ্রহ, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সর্পকুল স্থাবর-জঙ্গম সবই বিরাজিত। এই বিশ্বরূপ দেখে তপস্বীরা স্তব করতে লাগলেন, পাপীরা মূর্চ্ছিত হলো। সভাগৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের সময় কৃষ্ণ দেখলেন পথের পাশে কর্ণ একাকী দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভের আশায়। দাঁড়ালেন কৃষ্ণ, বললেন— বসুসেন আমাকে খানিকপথ এগিয়ে দাও।

কর্ণ নিজের রথে না উঠে, উঠলেন শ্রীকৃষ্ণের রথে। রথ চলতে লাগল, সেদিন শ্রীকৃষ্ণের মুখে কর্ণ জানলেন তাঁর আসল পরিচয়। কৃষ্ণ বললেন—বসুসেন! তুমি আজ আমার সঙ্গে চল। পাণ্ডবরা জানুক তুমি যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ। জননী কুন্তী ও মিত্রগণ আনন্দিত হবেন। পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ হোক। যুধিষ্ঠির তোমাকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে শ্বেতচামর ব্যজন করবেন। ভীম ধরবেন রাজচ্ছত্র। অর্জুন হবেন তোমার রথের

সারথি। পঞ্চপাণ্ডব হবেন তোমার অজ্ঞাবাহ সেবক এবং দ্রৌপদী করবেন তোমার চরণ বন্দনা। ভারতের সমস্ত রাজা, রাজকুমার, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধাগণ তোমারই চরণে মস্তক নত করবেন। পুরোহিত ধৌম্য করবেন তোমার রাজ্যাভিষেক। সূত, মাগধ বন্দিগণ করবে স্তুতি ও যশোগান। চতুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে শান্তিবারি সিঞ্চন করবেন। তুমি নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজ্য শাসন এবং কুন্তীর আনন্দবর্ধন কর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে কর্ণ বিষণ্ন বদনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— হে নারায়ণ! তুমি যা বললে আমি তা জানি। আমি সূর্যের পুত্র হয়েও জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত। আর আমি এও জানি তুমি যা বলছ আমার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ, আমি কেমন করে ভুলব, অধিরথ সূত আমাকে পরম স্নেহে লালন করেছেন। তাঁর পত্নী রাধার স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছে আমারই জন্য। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধিদ্বারা আমার জাতকর্মাদি সম্পন্ন করে আমার নাম বসুসেন রেখেছেন। আমার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে, পরিবার রয়েছে। আমার হৃদয় সেখানে আবদ্ধ। অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশিকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করার সামর্থ্য আমার নেই। আমার আজকের প্রতিপত্তি, রাজকীয় সম্মান সব কিছুর মূলে দুর্যোধন। আবার রাজা দুর্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হয়েই উৎসাহ সহকারে পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন। দ্বৈরথযুদ্ধে আমিই সব্যসাচীর প্রতিযোদ্ধা বলে পরিগণিত হয়েছি। এক্ষণে আমি বধ, বন্ধন, ভয় বা লোভবশত ধীমান দুর্যোধনের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করতে পারব না।

তুমি যে আমার হিতের জন্য এত কথা বলছ তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই এবং পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হয়ে আছে তখন তারা অবশ্যই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করবে। তুমি যে আমার জন্ম বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে গোপন করে রেখেছ তা আমি হিতকর বলে অঙ্গীকার করছি। জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে অগ্রজ বলে জ্ঞাত হলে আর রাজ্যপাট গ্রহণ করবেন না, আর আমি যদি এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই তা আমি দুর্যোধনকেই দান করব, অতএব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজ্যেশ্বর হয়ে থাকুন।

হে কৃষ্ণ! আমি দুর্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অনেক কটুবাক্য বলেছি, এক্ষণে সেই অপকর্মের জন্য অনুতাপ হচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধযজ্ঞের ফল আমি নক্ষত্রালোকে পাঠ করছি। যখন তুমি আমাকে ধনঞ্জয়ের হাতে নিহত হতে দেখবে, তখন এই যজ্ঞের অগ্নিচয়ন হবে। যখন ভীমসেন সিংহনাদ সহকারে দুঃশাসনের রুধির পান করবে তখন সোমরস পান সমাপন হবে। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করবেন সেই সময়ে এই যজ্ঞের বিশ্রাম হবে। যখন মহাবল ভীমসেন দুর্যোধনকে সংহার করবে তখন তাঁর যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ ও পৌত্রপত্নীরা স্বামীহীন, পুত্রহীন ও নাথহীন হয়ে গান্ধারী-সহ শিয়াল, শকুন ও কুকুরসঙ্কুল রণক্ষেত্রে রোদন করবেন তখন এই যজ্ঞের 'অবভৃথস্নান' সমাধান হবে। হে কেশব! ত্রিলোকের মধ্যে এই কুরুক্ষেত্র অতি পুণ্যতম স্থান, যাতে ক্ষত্রিয়গণ এই ক্ষেত্রে শস্ত্রদ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন তা সম্পাদন কর, তাহলে এই পর্বত ও নদীসকল যাবৎ বর্তমান থাকবে তাবৎ তোমার কীর্তিও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয়সমাজ এই যশস্কর মহাভারত যুদ্ধ কীর্তন করবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে কর্ণ! আমি তোমাকে পৃথিবী প্রদান করলাম, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করে শাসন করতে অনিচ্ছুক হলে, অতএব তুমি রাজ্যলাভের উপায় প্রাপ্ত হবে না। পাণ্ডবরাই জয়লাভ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কর্ণ বললেন—হে মধুসূদন! তুমি আমাকে সম্যক জেনেও রাজ্য ও ধনসম্পদে আসক্ত করার চেষ্টা করছ। এই যে পৃথিবীর প্রলয়দশা সমুপস্থিত হয়েছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্যোধন— এই চার জন এর কারণ। পাণ্ডব ও কৌরবগণের এই ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী রক্তে কর্দমাক্ত হবে। অনেক অনেক দুঃস্বপ্ন, ভয়ঙ্কর উৎপাত যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্যোধনের পরাজয় সূচিত করছে। গ্রহ-নক্ষত্রের বিপরীত অবস্থানে কৌরবদের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত তাতে সন্দেহ নেই। হে কৃষ্ণ, ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রে কী হবে সবই তুমি জান। বৃথা কেন আমাকে ভোলাতে চাইছ? হে নারায়ণ! আর কি আমাদের দেখা হবে, নাকি স্বর্গেই আমাদের মিলন হবে? আমাকে এবার বিদায় দাও। তুমি যাও ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, সদাচারী পাণ্ডবদের শিবিরে আর আমি চললাম রসাতলগামী পাপাত্মা দুর্যোধন আর অনাচারী কৌরবদের শিবিরে।

শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করে রথ থেকে অবতরণ করলেন কর্ণ। দুজনের চোখ অশ্রুসিক্ত। এগিয়ে চলেছে কর্ণের রথ কৌরব শিবিরের উদ্দেশে। শ্রীকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন তাঁর গমনপথের দিকে।

* * * * *

জন্মের পর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার পর থেকে কর্ণের সব সংবাদ রাখতেন মাতা কুন্তী। সেই সংবাদে কখনও হর্ষে উৎফুল্ল হয়েছেন, কখনও-বা বিষাদে ভেসেছেন। আসন্ন যুদ্ধে কুন্তীর চিন্তা গেছে বেড়ে, কর্ণ যে পাণ্ডবদের বিপক্ষে! অর্জুনের সমকক্ষ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী। এইবার কর্ণের আসল পরিচয় দিয়ে তাকে পাণ্ডবদের পক্ষে ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে। কর্ণের সঙ্গে একবার নিভৃতে সাক্ষাতের প্রয়োজন। কুন্তী সংবাদ

পেয়েছেন কর্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে যমুনায় স্নান করে দীর্ঘ সময় জপতপ করেন। পরদিন প্রাতে কুন্তী একাকী এলেন যমুনাতীরে। কর্ণ তখন উদীয়মান সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে স্তব করছেন। ধীর পদক্ষেপে কুন্তী এসে দাঁড়ালেন কর্ণের পশ্চাতে। স্তব শেষে কর্ণ পশ্চাদ্ দিকে দৃষ্টিপাত করতেই নয়নগোচর হলো এক দেবীমূর্তি। চম্‌কে উঠলেন কর্ণ, অনেকদিন স্বপ্নে এই দেবীমূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তবে অস্পষ্ট। কর্ণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—হে দেবি! সূত অধিরথের ঔরসজাত, রাধা গর্ভসম্ভূত কর্ণ আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে। ভদ্রে! আপনার এই স্থানে আগমনের হেতু কী ? আজ্ঞা করুন কী করতে হবে?

কুন্তী বললেন—বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন। রাধাগর্ভসম্ভূত নও। আর সূত অধিরথও তোমার পিতা নন। তোমার পিতা ভুবন প্রকাশ ভগবান দিনকর। তুমি আমার কানীন পুত্র। তুমি সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী, দেবপুত্র সদৃশ ও দুর্ধর্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ।

কর্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দেবী! আপনি অর্জুন জননী! কেন এসেছেন আজ আমার কাছে?

—তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

—কোথায়?

—তোমার আপন সহোদর ভ্রাতাদের কাছে।

—কেন হঠাৎ এতদিন পর মনে পড়লো সেই হতভাগ্য সন্তানের কথা, যাকে জন্মলগ্নে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করেছিলে।

—ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সহ্য করতে পারছি না বলে। ফিরে চলো আপন সহোদর ভাইদের কাছে। আপন জননীর কাছে।

—জন্মক্ষণে যে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছ, সেই স্বপ্ন আর দেখিওনা জননী। সহায় সম্বলহীন এক সূতপুত্রকে দুর্যোধন সম্পদ দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, রাজার মর্যাদা দিয়েছে। আজ এই আসন্ন সংগ্রামের মুহূর্তে তাঁকে পরিত্যাগ করার মতো দুর্বুদ্ধি যেন আমার না হয়। জননী ফিরে যাও পঞ্চপুত্রের কাছে। কথা দিলাম একমাত্র সব্যসাচী ছাড়া তোমার অন্যপুত্রদের আমি বধ করব না। এই যুদ্ধে হয় পার্থ নয় কর্ণের বিনাশ হবে, বাকি পাঁচপুত্র তোমার থাকবে। দূর থেকে জননীকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন কর্ণ। দুঃখ, গ্লানি, হতাশায় বিষাদ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কুন্তী।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন শেষ। এই ভয়াবহ যুদ্ধে পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা আহোম এবং দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের নৃপতিগণ কোনও না কোনও পক্ষে যোগদান করলেন। কৌরবপক্ষে এগারো এবং পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে অবতীর্ণ হলো। এক অক্ষৌহিনী সেনা দলে ২১,৮৭০ রথ, ২১,৮৭০ হস্তী, ৬৫,৬১০ অশ্ব এবং ১,০৯,৩৫০ পদাতিক অর্থাৎ মাহুত ও সারথি-সহ প্রায় ২,৬২,৪৪০ জন লোক থাকত। সুতরাং ১৮ অক্ষৌহিণীতে ৪৭,২৩,৯২০ জন লোক থাকবার কথা। একটি মাত্র রণক্ষেত্রে প্রায় অর্ধকোটি মানুষ, হস্তী ও অশ্বের সমাবেশ এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

কৌরবপক্ষের আগ্রহে এবং দুর্যোধনের অনুরোধে ভীষ্ম কুরুদের সেনাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর অঙ্গীকার, প্রত্যহ পাণ্ডব পক্ষের এক অযুত সৈন্য সংহার। তবে তিনি একটি নিয়মও নির্ধারণ করলেন। ভীষ্ম বললেন—

—সূতপুত্র কর্ণ সতত আমার সঙ্গে রণের স্পর্ধা করে এক্ষণে আমাদের উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে?

কর্ণ বললেন—মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম জীবিত থাকতে আমি কদাচ অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব না। তিনি বিনষ্ট হলে পরে অর্জুনের সঙ্গে সংগ্রাম করব।

ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণ ছিলেন সংগ্রামে অজেয়। তার ছিল সূর্য প্রদত্ত কবচ-কুণ্ডল। যতদিন কর্ণ ওই দৈব কবচ কুণ্ডলে ভূষিত থাকবেন ততদিন যুদ্ধে অবধ্য। তাই এবার এলেন পুত্র স্নেহাতুর পিতা ইন্দ্র। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। ভিক্ষার ছলে কর্ণের জীবনের শেষ রক্ষাকবচটি হরণ করতে। কর্ণ তা অবগত। আগের রাতে সূর্যদেব তাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন,

—তুমি যদি তোমার সহজাত কবচকুণ্ডল ইন্দ্রকে দান কর তাহলে জানবে তোমার আয়ু শেষ হয়েছে। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

কর্ণ বললেন—দেব আপনি আমাকে নিবারণ করবেন না। আমাকে ব্রতভঙ্গ করতে বলবেন না— 'ন নিবার্য্যে ব্রতাদস্মাৎ'। কর্ণ দাতা। বিশেষত কোনো ব্রাহ্মণ প্রার্থী হয়ে কর্ণ নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। কর্ণের সেই দানব্রত ত্রিলোক বিশ্রুত।

ছদ্মবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। স্মিত হেসে কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—

—হে দেবরাজ! আমি আগেই জানতাম আপনি আমার কাছে এসে এই ভিক্ষাই চাইবেন। কিন্তু আপনাকে আমি নিরাশ করব না।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের হাতে কর্ণ তাঁর অঙ্গ থেকে কবচ কুণ্ডল ছিন্ন করে অম্লানবদনে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। তখন অন্তরিক্ষে দেবতা, গন্ধর্ব, দানব সিংহনাদ করতে লাগল। স্বর্গে দেবদুন্দুভি বেজে উঠল। দেবতারা কর্ণের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে সেনাপতিত্বে বরণ করা হলো দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিন, যোদ্ধারা সব রথে আসীন। ধনঞ্জয়ের রথের সারথি স্বয়ং

কৃষ্ণ। রথ নিয়ে যাওয়া হলো উভয়পক্ষের সামনে। বিপক্ষের যোদ্ধাদের দেখে মহারথী অর্জুন বিমর্ষ হয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? বিপক্ষে গুরু, পিতামহ, মাতুল আর ভাইয়েরা। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের বাণী শুনিয়ে উজ্জীবিত করলেন অর্জুনকে। শুরু হলো প্রচণ্ড সংগ্রাম।

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে কর্ণ অস্ত্রধারণ করেননি। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতন হলো। কিন্তু দক্ষিণায়নে ভীষ্ম দেহত্যাগ করবেন না। সেই শরশয্যায় উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। শরশয্যার স্থানটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। মাংসাশী হিংস্র পশুরা যাতে আক্রমণ করতে না পারে তারজন্য রক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে প্রজ্বলিত হয়েছে মশাল। অজুর্নের তীক্ষ্ণবাণ ভীষ্মের উপাধান। অন্য বাণে পাতালগঙ্গার জল ভীষ্মের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। রাত্রি আসন্ন, একে একে কৌরবপক্ষ এবং পাণ্ডবপক্ষের সকলে ভীষ্মকে প্রণাম করে শিবিরে ফিরে গেছে। নির্জন সন্ধ্যায় একাকী শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম। আশে পাশে হিংস্র পশুর চীৎকার রাত্রির অন্ধকারকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। শ্মশানের আলোয় দেখা যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ভীষ্মের দিকে। শিয়রের কাছে এসে থেমে গেল সেই মূর্তি। অতি ক্ষীণস্বরে বলল—পিতামহ!

ভীষ্ম ধ্যানমুদ্রিত চক্ষু মেলে তাকালেন।

—কে?

—কুরুশ্রেষ্ঠ, আপনি যাকে কোনোদিনই পছন্দ করতেন না, আমি সেই সূতপুত্র কর্ণ।

ভীষ্ম দেখলেন বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে আছে কর্ণ। তার চোখে জল। ইঙ্গিতে কর্ণকে কাছে ডাকলেন ভীষ্ম, সস্নেহে বললেন—

—হে বীরোত্তম! তুমি কুন্তীপুত্র। পাণ্ডবদের ভাই। নারদের মুখে শুনেছি তোমার জন্মকথা। তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই। তুমি দুর্যোধনের হীন সংসর্গে পরশ্রীকাতর হয়ে উঠেছিলে, তাই তোমাকে কটুবাক্য বলতাম। আমার অনুরোধ তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হও। সব বৈরিতার অবসান হোক।

—তা আর হয় না পিতামহ। আমি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমার শেষ পরিণতি আমি জানি। হে মহাত্মন্! এতদিন ক্রোধে উত্তেজনায় কিংবা চপলতাবশত আপনাকে যে অপমান করেছি, আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন।

কর্ণের পরামর্শে ও সকলের সম্মতিকে এবার দ্রোণ হলেন সেনাপতি। কর্ণ এবার রণাঙ্গনে। রণাঙ্গনে কর্ণপুত্র বীর বৃষসেনও। সেনাপতি বৃদ্ধ কিন্তু যোদ্ধারা তরুণ। ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে কৌরবরা থরহরি কম্পমান। কর্ণ একাগ্নি বাণে নিহত করলেন ঘটোৎকচকে। পাণ্ডবশিবিরে হাহাকার।

আচার্য দ্রোণের পতনের পর কৌরব পক্ষের সেনাপতি হলেন মহাবীর কর্ণ। সুবর্ণ নির্মিত বিজয় ধনুকে টঙ্কার দিয়ে মকরব্যূহ রচনা করে কর্ণ যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিল। তার রথে উড়ছে শ্বেত পতাকা-ধ্বজা চিহ্ন হস্তীবন্ধন রজ্জু। শ্বেতপতাকা কেন? তবে কি কর্ণ যুদ্ধ চায় না? কিংবা যুদ্ধ চায় শুধু শৌর্য ও পরাক্রম প্রকাশের জন্য। কর্ণের অন্তরই জানে এর উত্তর। মাতা কুন্তীকে তিনিতো কথা দিয়েছিলেন চিরদিন কুন্তী থাকবেন পঞ্চপুত্রের জননী। সেদিন সেই নির্জন যমুনা তীরে জননীর আশীর্বাদরূপে কর্ণ শিরে তুলে নিয়েছেন আপনার মৃত্যু। কেউ জানে না। কেবল সাক্ষী তাঁর অন্তর, আর দেব দিবাকর।

কর্ণতো ভীমকে পরাস্ত করেছিলেন অনায়াসে তাঁকে নিহত করতেও পারতেন। আর ভীম নিহত হলে যুদ্ধের গতিই পালটে যেত। কিন্তু তবু কর্ণ একটু করুণ হেসে ভীমকে বধ না করে ছেড়ে দিয়েছিল।

অর্জুনকে বধ করবার জন্যে যে একাগ্নি বাণ তার কাছে ছিল সেই বাণ অর্জুনের প্রতি প্রয়োগ করলেন না। অথচ এই বাণ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণেরও চিন্তার অন্ত ছিল না। ভীষ্মের সেনাপত্যের দশ দিন ছাড়াও দ্রোণের সেনাপত্যে চারদিন কর্ণ যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেই একাগ্নি বাণের প্রয়োগ করেননি। অবশেষে ঘটোৎকচকে বধ করার জন্য ওই বাণ প্রয়োগ করেন। শুনে ধৃতরাষ্ট্র মন্তব্য করেছিলেন —এইভাবে কর্ণ নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনল?

কর্ণ কি তা ভাবেননি?

তাছাড়া অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে তক্ষক নাগ কর্ণকে বলল—

—তুমি আবার বাণ নিক্ষেপ কর। আমি যোগবলে তোমার বাণের মধ্যে ঢুকে অর্জুনকে বধ করব।

অর্জুনকে বধ করার এই শেষ সুযোগও কর্ণ গ্রহণ করলেন না। বললেন—

—আমি অন্যের সাহায্য নিয়ে শত্রুকে বধ করব না।

অর্জুনকে বধ করা হয়তো কর্ণের অভিপ্রায় ছিল না। অর্জুনের সামনে রথ স্থাপিত করে কর্ণ সারথি শল্যকে ম্লান হেসে প্রশ্ন করল—

—শল্য! তুমি সত্যি করে বল আজ যদি অর্জুন আমাকে নিহত করে তুমি কী করবে?

এই কথা বলে কর্ণ প্রকারান্তরে তাঁর নিজের মৃত্যুর সংকেতই জানিয়ে দিলেন। বস্তুত কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের কাউকেই বধ করতে চায়নি। একের পর এক সুযোগ এসেছে কিন্তু কর্ণ গ্রহণ করেননি।

নকুল অস্ফালন করে কর্ণের সঙ্গে সংগ্রাম করতে এসেছেন, পরাজিত হয়েছে, কিন্তু কর্ণ হাতে পেয়েও নকুলকে বধ করলেন না। তারপর যুধিষ্ঠির কর্ণকে আক্রমণ করলেন, বললেন—

—কর্ণ! তোমার মতো বীরত্ব আর পাণ্ডবদের প্রতি যত বিদ্বেষ আছে আজ তা দেখাও।

দুজনের ভীষণ যুদ্ধ হলো। যুধিষ্ঠিরের কবচ বিদীর্ণ। তিনি

আহত, রক্তাপ্লুত। রথ ও ধ্বজ ভঙ্গ। বিষণ্ণ যুধিষ্ঠির অন্য একটি রথে উঠে পলায়ন করছেন। কর্ণ ছুটে গিয়ে দৃঢ় হস্তে তাঁর স্কন্ধ স্পর্শ করে বললেন—

—যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। তুমি যাগযজ্ঞ, বেদপাঠ কর, ব্রাহ্মবলে কুশল, তাই বলে কখনো যুদ্ধ করতে এসো না। আর আমাকে কোনোদিন অপ্রিয় বাক্য বলো না। শোন রাজা, আমি তোমাকে বধ করবো না।

কেননা কর্ণ মনে মনে চেয়েছেন রাজা হোক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র নিহত। কেবল দুর্যোধন জীবিত। কর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করলেন অর্জুনকে। আরতো কর্ণের অপেক্ষা করার সময় নেই। দুর্যোধনের মৃত্যু কর্ণ নিজের চোখে দেখতে পারবেন না। দুর্যোধনকে কর্ণ বললেন—

—মিত্র! কেবল শৌর্য আর পৌরুষ ছাড়া আজ আর আমার কিছু নেই। আমি নিজে অরক্ষিত। সহজাত কবচকুণ্ডল হারিয়েছি। শেষ হয়েছে ইন্দ্রের একাগ্নি বাণ। অবশিষ্ট আছে শুধু পরশুরাম প্রদত্ত আমার এই বিজয় ধনু আর মৃত্যুভয়হীন বীরের হৃদয়।

কর্ণ মনে-মনে নিজের মৃত্যুচিন্তাই করছেন। তবুও তাঁর মুখে সেই করুণ হাসিটুকু লেগে আছে। তাঁর কথায় নয়, আচরণেও নয়, কর্ণের ওই ম্লান হাসির মধ্যেই রয়েছে তাঁর প্রকৃত আত্মপরিচয়।

কর্ণ-অর্জুনের এই যুদ্ধে দুই পক্ষ দুই দিকে। ব্রহ্মা তাই বললেন কর্ণ দানবপক্ষ আর অর্জুন দেবপক্ষ। তাই অর্জুনের জয় হবে। ব্রহ্মা-মহেশ্বর-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অন্তরিক্ষ থেকে এই যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। কৃষ্ণ বার বার চেষ্টা করেছেন কর্ণকে কৌরবপক্ষ থেকে পাণ্ডবপক্ষে নিয়ে আসতে। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছেন কর্ণ উঠে আসুক তাঁর পিতৃযান থেকে দেবযানের পথে।

অর্জুনের অগ্নিরথ কর্ণের রথের অগ্রভাগে প্রতিহত হলো। উভয়ের শ্বেত অশ্বের গ্রীবায়-গ্রীবায় সংঘর্ষ ঘটল। অর্জুনের ধ্বজা থেকে মহাকপি সবেগে লম্ফ দিয়ে আক্রমণ করল কর্ণের ধ্বজা লাঞ্ছনা।

ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। অর্জুন ভয়ংকর আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত হয়ে আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নিতে প্রজ্বলিত সৈন্যগণ আর্তনাদ করতে লাগল। কর্ণ তৎক্ষণাৎ বরুণ অস্ত্রে অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্র ব্যর্থ করে দিল। অর্জুন ইন্দ্রের বজ্রমহেন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কর্ণের ভার্গব অস্ত্রে তা নিষ্ফল হলো।

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—পার্থ, তোমার দিব্যাস্ত্র সকল নিষ্ফল হচ্ছে কেন? আবার কি তোমার মোহ উপস্থিত হয়েছে?

ভীম হতাশ উত্তেজিত হয়ে বললেন—

—অর্জুন, তোমার অস্ত্রসকল নিবারিত হচ্ছে। শত্রুরা হর্ষধ্বনি করছে। যদি তুমি না পার ছেড়ে দাও আমি কর্ণকে বধ করি।

অর্জুন বললেন—

—কৃষ্ণ! তুমি অনুমতি দাও, দেবগণ অনুমতি করুন, আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে এই উগ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলাম। কিন্তু এবারও অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত হলো।

অর্জুনের গাণ্ডীবের গুণ বারবার ছিন্ন হতে লাগল। অর্জুন শরাহত হলেন, কৃষ্ণ বাণাহত।

কর্ণ তখন তাঁর সর্পবাণ যোজনা করলেন। সেই বাণে পাতাল থেকে তক্ষক নাগ যোগবলে প্রবেশ করে আছে। কর্ণ তা জানেন না। সারথি শল্য দেখলেন, এইবাণ অর্জুনের মৃত্যুতুল্য, তাই কর্ণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলল—কর্ণ, তুমি অন্যবাণ প্রয়োগ কর। এই বাণে অর্জুনের কিছু হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গুনলেন, করাল অগ্নির মতো সেই সর্পবাণ আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। তিনি তড়িৎগতিতে পদাঘাতে অর্জুনের রথ একহস্ত পরিমাণ মাটিতে প্রোথিত করে দিলেন। হেম আভরণ ভূষিত রথের অশ্বগুলি নতজানু হয়ে ভূমি স্পর্শ করল। কর্ণের সর্পবাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু অর্জুনের মাথার সোনার মুকুটখানি ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল।

সর্পবাণ ব্যর্থ হলে তক্ষক স্বমূর্তিতে কর্ণের সামনে গিয়ে বলল—

—হে বীর, তুমি অন্যমনস্ক ছিলে তাই আমাকে দেখতে পাওনি। তুমি আবার বাণ নিক্ষেপ কর। আমি তোমার বাণে প্রবেশ করে অর্জুনকে নিহত করবো।

কর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—

—কে তুমি ভয়ংকর নাগ?

—আমি তক্ষকপুত্র অশ্বসেন। এই অর্জুন আমার মাতৃহন্তা। আমি অর্জুনের শত্রু। তুমি বাণ নিক্ষেপ কর। আমি এবার অর্জুনকে বধ করব।

কর্ণ বললেন—

—হে তক্ষক আত্মজ। কর্ণ যুদ্ধে কখনো অন্যের সাহায্য নিয়ে জয়লাভ করে না। আর শত অর্জুনকে বধ করতে হলেও কর্ণ এক বাণ দুবার ব্যবহার করে না। তুমি এখন যেতে পার।

তখন অর্জুন যমদণ্ড তুল্য এক লৌহবাণে কর্ণের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। কর্ণের দেহ অবসন্ন। মুষ্টি শিথিল। হাত থেকে পড়ে গেল ধনুর্বান। কর্ণ বজ্রাহত পর্বতের মতো টলতে লাগলেন। সর্বাঙ্গে তাঁর রক্তধারা। অস্ত্রহীন, দুর্বল।

অস্ত্রহীন, আহত কর্ণকে আঘাত করতে অর্জুনের হস্ত উত্থিত হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

—পার্থ! প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। দুর্বল শত্রুকে অবসর দিতে নেই। বিলম্ব করো না, শত্রুকে বধ করো।

তখন কর্ণের শ্রবণে এল অদৃশ্য মহাকালের বজ্রনির্ঘোষ ব্রাহ্মণের অভিশাপ—

—মৃত্যুকাল সমুৎপন্ন হলে মেদিনী তোর রথচক্র গ্রাস করবে।

গুরু জামদগ্নির অভিশাপ —সংকটকালে সকল অস্ত্রবিদ্যা বিস্মৃত হবে।

হঠাৎ প্রচণ্ডশব্দে মেদিনী বিস্ফারিত হয়ে কর্ণের রথচক্র বসে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা তিনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন। রাগে দুঃখে কর্ণের নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। অর্জুনকে উদ্দেশ করে কর্ণ বললেন—

—অর্জুন, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। মেদিনীর গ্রাস থেকে আমাকে রথচক্র উদ্ধার করতে দাও। তুমি মহাক্ষত্রিয়, ধার্মিক। নিরস্ত্র রথীকে আক্রমণ করা অধর্ম। অতএব, হে অর্জুন, তুমি আমাকে একটু সময় দাও।

শ্রীকৃষ্ণ তখন কর্ণকে বললেন—

—কর্ণ! তুমি আজ দৈবের নিন্দা করছ, ধর্মের দোহাই দিচ্ছ? কিন্তু যেদিন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় অপমান করেছিলে সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? শকুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শঠতায় কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তোমার সম্মতিতে দুর্যোধন যেদিন বিষ প্রয়োগে ভীমকে হত্যা করতে গিয়েছিল সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যুদ্ধের নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে যেদিন সপ্তরথী মিলে একা নিরস্ত্র, বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে সেদিন তোমার ন্যায়নীতি ধর্ম কোথায় ছিল?

কর্ণ নতমস্তক, নিরুত্তর, হয়তো অনুশোচনায় দগ্ধ।

অর্জুন তখন শিবের পিনাক, নারায়ণের সুদর্শন তুল্য, কালাগ্নি সম ভীষণ আঞ্জলিক বাণ ধনুতে যোজনা করে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন—''যদি আমি তপস্যা ও যজ্ঞ করে থাকি, সুহৃদগণের বাক্যের মর্যাদা দিয়ে থাকি, গুরুসেবা করে থাকি তাহলে এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণ সংহার করুক।

ভয়ংকর শব্দে সেই প্রজ্বলিত বাণ কর্ণের মস্তক ছেদন করল। ছিন্নশির মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তাক্ত সূর্যেদেব যেন অস্তাচল থেকে পতিত হলো। নিহত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে ম্লান মন্দরশ্মি নিয়ে অস্তাচলে বিলীন হলেন দেব দিবাকর। পাণ্ডব শিবিরে এই সংবাদ পৌঁছালে আরও একজনের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল তিনি জননী কুন্তী।

With Best Compliments from -

SHILPA METAL INDUSTRIES

AN ISO CERTIFIED COMPANY 9001:2015

B-5, Friends Industrial Estate. Opp. Aarti Steels,
Focal Point, Sherpur, Ludhiana - 141010

Manufactures of High Quality SHOVELS & FASTENERS

Phone ; +91 98559 77770,
E-mail : salesexport@muwo.co.in, abhishekgsmi@gmail.com
Website : www.muwo.co.in

ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা

সত্যানন্দ গুহ

মধুমিতার চোখে তীব্র তেজ। শরীরের সমস্ত রাগ ঘৃণা মুখে জমেছে। মুখটা মেঘলা আকাশের মতো থমথমে। ‘নারীর পথে’ বইটি ছুঁড়ে ফেলল। বলল, তোমার মন সংকীর্ণ। ভালোবাসার কোনো জাত-ধর্ম নেই।

জ্বালাতে এলে? উপন্যাসটা শেষ করতে না পারলে মান-সম্মান সব যাবে। বিরক্তি প্রকাশ করে পুণ্যব্রত।

আমার তাতে কী? তোমার মতিগতি বুঝেছি। অনুলোম-প্রতিলোম বিয়ে নিয়ে আদর্শ দেখাচ্ছ। আমাকে বিয়ে করতে চাও না। এই তো? রাগ রাগ ভাব চোখে মুখে।

হ্যাঁ, তাই, এ পাপ, এ অন্যায়। তুমি ছাড়া আমার জীবন বৃথা, শূন্য। তুমি আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে, হৃদয় জুড়ে। তবুও

অবুঝ হয়ো না। সান্ত্বনা দেয় পুণ্যব্রত।

ফাঁকা দুপুর, নির্জন নিরালা। বাড়ির আর সবাই সিনেমায়। অঘ্রান মাস। না শীত না গরম। খদ্দরের একটা পাতলা চাদর গায়ে। 'ভালোবাসার বৃত্তে' উপন্যাসটা লিখছিল। পাকা ধানের রঙের রোদ ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মধুমিতা ফাঁক খুঁজেই বসেছে।

ওসব তত্ত্বকথা আমি বুঝিনে। স্পষ্ট কথা—তোমাকে ভালোবাসি। তোমার প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারব না। মিথ্যায় ভুলিয়ো না। মধুমিতা গোঁয়ারের ভাব দেখায়।

তোমার বাবা সুপাত্র খুঁজছেন। আমি আর্যধর্মে বিশ্বাসী। চরিত্র নষ্ট করতে পারব না। লিখতে লিখতেই বলল পুণ্যব্রত।

পাঠকদের কাছে তুমি বলিষ্ঠ লেখক, সমাজে চরিত্রবান। আমার কাছে তুমি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। অন্য কেউ আমার শরীর পেতে পারে। মনটা তোমার ডালেই বসে থাকবে। ক্ষোভে দুঃখে তার মনে আগুন জ্বলে ওঠে। ব্যঙ্গ করে বলে—'নারীর পথে' বইটি দু'বার পড়েছি। শুধু আদর্শের কচকচি, জ্ঞানগর্ভ কথা। আমাদের মন মুখ এক না হলে, আদর্শ কেন্দ্রিক চরিত্র না হলে, আর্যধর্মকে না মানলে জীবনের স্তরে স্তরে ষড়রিপুর ঘুণপোকারা একদিন অস্তিত্ব বিনষ্ট করে দেবে। আরও কত কী আছে।

গোপনে হাসে পুণ্যব্রত। এদের কী বোঝাবো? প্রবৃত্তির দাস এরা। অনুভূতিও ভোঁতা। ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতাও নেই। লিটল ম্যাগাজিনের সীমা ছাড়িয়ে সম্প্রতি যে কমার্শিয়াল পত্রপত্রিকায় লিখছে। একজন বলিষ্ঠ লেখক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। অভিজ্ঞতায় টইটম্বুর। চেহারায় আত্মপ্রত্যয়শীল গাম্ভীর্য। সৌম্যদর্শন কান্তিময়। 'ভালোবাসার বৃত্তে' তার দ্বিতীয় উপন্যাস। জীবনের পরতে পরতে যে উপলব্ধি তারই পাকা ফসল। অনেক দেখে শুনে অনেক খেটেখুটে লেখা। এক মুখ হেসে বলে এ উপন্যাস তোমাকে ঘিরে। ভালোবাসা ও ভালোলাগার উত্তাপ মিশ্রিত উপলব্ধি।

পুণ্যব্রতের বহু লেখা ও পড়েছে। কোথাও নিজের চরিত্র খুঁজে পায়নি। ফ্রক পরা অবস্থায় পেন্সিল স্কেচ দিয়ে খাতায় একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল মাত্র। পুণ্যব্রত ওর নতমুখের দিকে তাকাল। বলল—এ বইটির মূলকথা, ভালো জমিতে ভালো ফসল হয়, খারাপ জমিতে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। পশুপাখির বেলায় ভালো বীজ, ভালো ক্ষেত্র খুঁজব; মানুষের বেলায় মানব না? বিয়েটা ঠিকঠাক হলে নারীর গর্ভ হতে সুসন্তান জন্মায়। না হলেই অধম, ইতর, বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ কুসন্তান জন্মায়।

ফোঁস করে ওঠে মধুমিতা। পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। উত্তেজিত সুরে বলে ছাই পাঁশ লিখছ। আগুন ধরিয়ে দেব। লেখার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করছেন। স্বয়ং অবতার যেন। তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ কথার মধ্যে।

একি করলে? অবুঝ হয়ো না। মুখের সঙ্গে হাত চলছে কেন? রেগে ওঠে পুণ্যব্রত। মন মেজাজ খিঁচড়ে গেল। এই মেয়ের এত সাহস। দু'বছর আগেও ফ্রক পরে স্কুলে যেত। এক ঝাঁক মেয়ের মধ্যে প্রজাপতির মতো দেখাত। চোখ ফেললে চোখাচোখি হতো। কলেজে উঠেই সাহসী হলো। একদিন মুখোমুখি হল। বলল, আপনার 'প্রথম প্রহর' উপন্যাস দু'বার পড়েছি। আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন না। মা খুব মাই ডিয়ার লোক।

পুণ্যব্রত কথা রেখেছিল। অষ্টাদশী, মধুমিতার যৌবন তাকে দোলা দিয়েছিল। একদিন দু'দিন নয়, বহুদিন গিয়েছিল। বুকের কৌটোয় সে সব স্মৃতি সযত্নে রক্ষিত। একদিন ওমলেট খেতে দিলে বলেছিল—নিরামিষ খাও, শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। নীরোগ ও কর্মঠ হবে। আয়ু দীর্ঘ হবে, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও নানা মানবিক শক্তি দৃঢ় হবে।

মধুমিতা টিপ্পনী কাটে একেবারে বৈষ্ণব। অল্প বয়সেই ধর্মকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার দ্বারা এ বয়সে ওসব হবে না।

বাজে বকছো। পৃথিবীতে কত লোক আমিষ খায় খোঁজ রাখো? মাদ্রাজী, সিন্ধী, গুজরাটি, মারাঠিদের স্বাস্থ্য দেখেছো? বৈষ্ণব ও বিধবাদের শরীর অপেক্ষাকৃত নীরোগ। পৃথিবীর বহু দার্শনিক, শিল্পী ও মহাপুরুষ নিরামিষাশী। পূজাপার্বণে নিরামিষের বিধান কেন? দৃঢ় কণ্ঠে আত্মোপলব্ধি নিয়ে বলেছিল পুণ্যব্রত।

নানা ব্যথা ওর মনে। পুণ্যব্রতের জন্য দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে। অন্য পুরুষে মন বসাতে পারে না। সোমত্ত মেয়ে। যৌবনের ভীরু ক্ষুধায় নানা গোপন ইচ্ছে জাগে। সুযোগ খোঁজে। বাড়ির পেছনে সুন্দর সাজানো বাগান। গাছে গাছে কুল, পেয়ারা। মৌ মৌ গন্ধ। অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ।। প্রেম জেগে ওঠে। পাশেই মাংসল তাজা যৌবন। নিঝুম নিরালা পরিবেশ। পুণ্যব্রত এই মুহূর্তে যা খুশি করতে পারে। ধর্মভীরু সে। মতিভ্রমে যোগভ্রষ্ট হলো না। জীবনব্রত ভঙ্গ করলে তার সাধনা মিথ্যা হয়ে যাবে। ওকে নীল শাড়িতে কেমন পবিত্র দেখাচ্ছিল। লোভের গন্‌গনে আগুনটাকে চাপা দিল সে। সান্ত্বনা দিল মনকে—মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা না হলে মেয়েদের ছুঁতে নেই। মেয়েদের শরীর পবিত্র রাখলে মন্দির, অপবিত্র করলে নরক। ধর্মগ্রন্থে ঠিক এমন কথাই আছে। এমনি করেই কুমারী মেয়েরা দুর্বল হয়ে অসতর্ক মুহূর্তে অপবিত্র হয়ে যায়।

মধুমিতা ওকে ভীতু, নাবালক ভাবল। অন্য ছেলেরা তাকে খাই খাই করে। পুণ্যব্রত আশ্চর্য ব্যতিক্রম। শ্রদ্ধায় ওর মাথা নত হয়ে যায়। ঘোর কাটলে

বলে—তুমি জিতেন্দ্রিয় সংযমী ধর্ম পুরুষ। তোমাকে নিয়ে যে কোনো মেয়ে, যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময়ে একাকী যেতে পারে।

দীর্ঘদিন মধুমিতা ভীরু ক্ষুধায় ভুগছে। কামনা বাসনা তার অতৃপ্ত। পুণ্যব্রতের কঠোর সংযম, অহংকারী ব্যক্তিত্ব ভালো লাগত না। আজ ওর ব্রত ভঙ্গ করবেই। কোমর বেঁধে মনকে শক্ত করে এসেছে। ভীরু ক্ষুধা মেটাতে চায়। এ ক্ষুধার জন্ম ও লয় অন্ধকারের মধ্যেই। সভ্য পৃথিবীতে এ ক্ষুধা ধ্রুবসত্য হয়েও চালাকি করে গোপন করতে চায়। না বোঝার ভান দেখায়। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাল—তুমি বোনকে কী বলেছ?

সংযম উত্তর এল—ও বলেছিল দিদির মাথা খাচ্ছেন কেন? বাবা পাত্র খুঁজছেন। দিদির ঘোর আপত্তি। আপনাকে ছাড়া বিয়ে করবে না।

তুমি কী বললে? শাস্ত্র হতে কী কী মুখস্থ বললে? বাঁকাস্রোতে কথা ঢালে মধুমিতা।

মেয়ে হলেই বিয়ে করা যায় না। অনেক বাধা, অনেক কারণ আছে। বিবাহিত জীবনের উপরই আমাদের সমস্ত জীবনের দুঃখ সুখ নির্ভর করে। বিয়েটা বাজারের সওদা নয়। দু' একদিনের ব্যাপার নয়।

জানি আমাকে তুমি বিয়ে করতে চাও না। আমি দ্বিজ, তুমি অ-দ্বিজ। প্রতিলোম বিয়ে তোমার কাছে অশাস্ত্রীয়। তাই তো? অভিনয়ের ঢঙে এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করে।

মিছে রাগ করছ! আমাকে ভুল বুঝছো; তুমি গুণবতী পদ্মিনী পাত্রী। তোমার মতো পাত্রী পেলে জীবনে সুখীই হতাম। উপায় নেই। কথার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

গোপন কান্নায় ভেঙে পড়ে

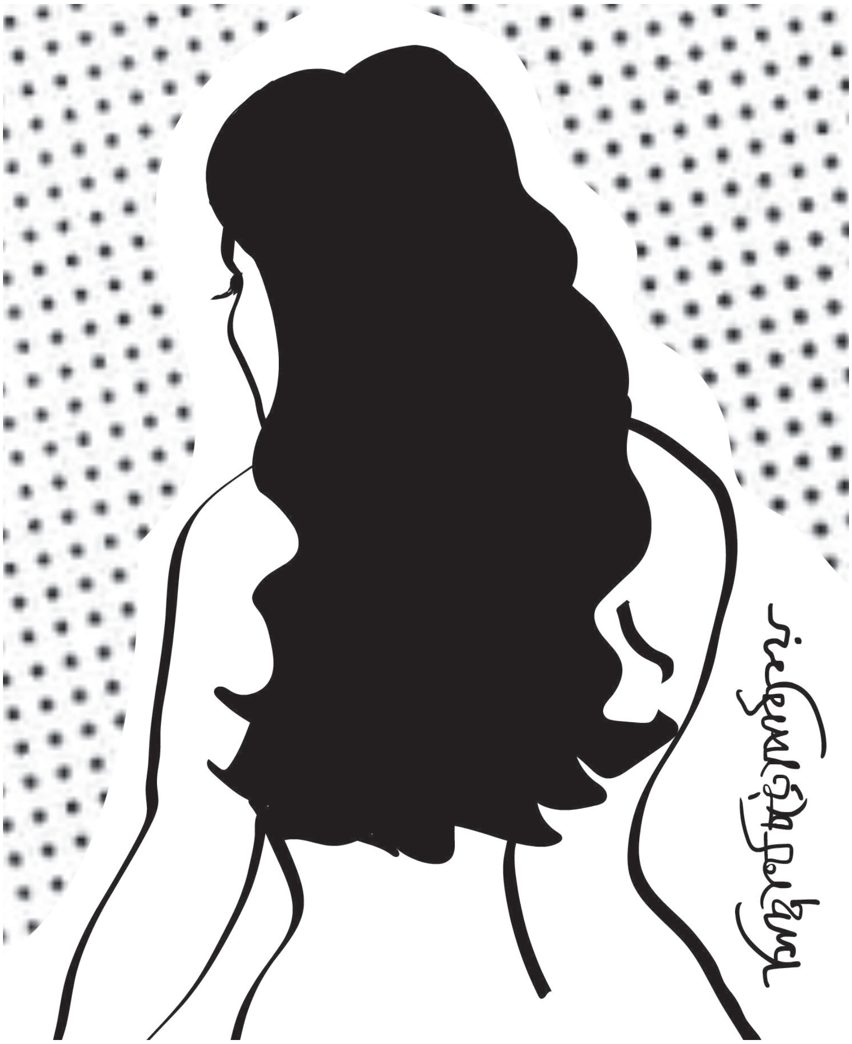

মধুমিতা। প্রশ্ন তোলে প্রতিলোম বিয়ে কি রামায়ণ মহাভারতের যুগে হয়নি? সে যুগে তো একাধিক বিয়েও হত। ভীম, অর্জুনরা তো রাক্ষসদের মেয়েও বিয়ে করেছিল। অনুলোম বিয়ের সত্যতা, যুক্তি খোঁজে সে।

ওরা একটি সবর্ণে, অন্যটি নিম্নবর্ণে বিয়ে করেছে। বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকলে একাধিক নারী গ্রহণ করতে পারে। উচ্চবর্ণের ছেলেরা যে কোনো বর্ণের মেয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মেয়েরা নিম্নবর্ণের ছেলেদের বিয়ে করতে পারবে না। প্রতিলোম বিয়েতে জাতি ধ্বংস হয়, রাজ্য ধ্বংস হয়, সমাজের বাঁধন ভেঙে যায়। সংসার অধঃপাতে যায়। নানা রোগ ব্যাধি আশ্রয় নেয়। বংশে অকালমৃত্যু হয়। আরও নানা ক্ষতি হয়। গ্রিস-রোম-ফ্রান্স-ইটালি এ ভাবেই ধ্বংস হয়েছে। জার্মানির পরাজয়ের মূলেও তাই। জার্মানির নোবেল বিজয়ী বৈজ্ঞানিক কার্ল রেইস্টেইনার তাঁর বইতে এসব শাস্ত্র কথা ব্যাখ্যা করেছেন।

পুণ্যব্রত শরীরের সম্পর্ক পাতেনি। খুবই সতর্ক। নানাভাবে এড়িয়ে যেত। কেউ কাউকে ভুলতে পারে না। মেয়েরা পূর্ব- প্রণয়ীদের ভুলতে পারে যদি পরবর্তী প্রণয়ীরা পূর্বাপেক্ষা ধনী ও গুণী হয়। মধুমিতা পুণ্যব্রতের মতো শিক্ষিত,

চরিত্রবান ও গুণী লোক দ্বিতীয়টি পায়নি। আর কেউ স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয়। কান্নাভেজা গলায় বলে শাস্ত্র আজকাল অচল। একজন অখ্যাত দ্বিজের চেয়ে খ্যাতিমান অ-দ্বিজের রক্ত অনেক পরিশ্রুত। আমাকে আর ঠকাবে না। কাতরভাবে তাকায় ওর দিকে।

ভারতীয় শাস্ত্র তার নখদর্পণে। তার সাধনার, জীবনদর্শনের উপলব্ধি দিয়েই সাহিত্য। কম্প্রোমাইজ করতে পারল না। কঠিন সুরে বলল—শাস্ত্র মনগড়া জিনিস নয়। আমাদের বাঁচতে-বাড়তে যা যা লাগে তা নিয়েই শাস্ত্র। তত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিরা এসব বিধিবিধান দিয়ে গেছেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। একজন দ্বিজও যতই হোক অধঃপতন হতে পারে না।

বেলা বয়ে যায়। সারা দুপুর মাটি হয়। রোদ প্রায় মুখ তুলে নিয়েছে। আলো-আঁধারের মায়াবী সন্ধিক্ষণ। পাখিদের ঘরে ফেরার লগ্ন। কার্নিশে চড়ুইগুলি কিচির মিচির লাগিয়েছে। ওর মুখে চোখে ব্যথা জেগে ওঠে। বলে তুমি শিক্ষিত মানুষ, শিল্পী। কেন ভেদাভেদ সৃষ্টি করছ? আজকাল কেউ এসব মানে না। তোমার কাকা কেন হরিপদ বিশ্বাসের মেয়েকে বিয়ে করলেন? রূপসী না ধনী বলে?

ওতো অনুলোম বিয়ে। এর দ্বারাই নিম্নজাতি উন্নত হতে পারে। পশুপাখির বেলাতেও উচ্চ পুরুষ-বীজ, নিম্ন স্ত্রী-ক্ষেত্রে দিয়ে উন্নত প্রসব করানো হয়। এসব কথা আজ ঘরে ঘরে জনে জনে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন।

এবার রেগে যায় মধুমিতা। কেউটের মতো বিষ ঢেলে দেয়। ঝংকার দিয়ে বলে তোমার মাথা মুণ্ডু। তোমার সব অহংকার আজ চূর্ণ করে দেব। মিথ্যা স্তোক দেওয়ার জন্য কিছু বুলি মুখস্থ রেখেছো। তোমার চরিত্র, নিষ্ঠা আজ বালিয়াড়ি করে দেব। আত্মীয় স্বজনদের কাছে মাথা নীচু করে দেব। যোগব্রত সন্ন্যাসীর ভড়ং ভেঙে দেব। প্রেমের কাছে পাপ পুণ্য নেই। আদর্শ সংস্কার নেই। আমি তৃষ্ণার্ত, অতৃপ্ত। আজ সব মিটিয়ে নিতে চাই, কড়ায় গণ্ডায়। চোখে কেমন তীব্র চাহনি, সুরে ব্যঙ্গ, চাঞ্চল্য।

দুষ্ট গ্রহণের মতো গ্রাস করতে চাও? ব্রত ভঙ্গ করতে চাও? এত নিষ্ঠুর হয়ো না মিতা। সামনে তোমার বিয়ে। অন্যপুরুষে নিবেদিতা। মান সম্মান লজ্জা ঘৃণা তোমার নেই? মা বাবার মুখে কলঙ্ক দিতে চাও? জীবনে সুখী হতে পারবে না। কী লাভ এঁটো হয়ে? স্বামী তোমার পূরণকারী পুরুষ। আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত দিকই স্বামী পূরণ করে। তাকে নৈবেদ্য দিও। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করে পুণ্যব্রত। ঘরের মধ্যে যেন মেঘ নেমে এসেছে। সুইচবোর্ড গার্ড করে মধুমিতা দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালাতে দেবে না!

যা খুশি বকে যাও। যত খুশি জ্ঞান দাও। আমার কাছে ভালোবাসার জাতবর্ণ নেই। আমাকে দুঃখ দিলে অধর্ম হবে। ধর্ম কারও অস্তিত্ব নষ্ট করে না। বিশুদ্ধ চরিত্র নিয়ে শিল্পী হওয়া যায় না, শিল্পীরা জীবনকে নানাভাবে দেখে। এসব তুমিই আমাকে বলেছিলে।

পুণ্যব্রত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। উত্তেজিতভাবে বলল ধর্ম-অধর্ম আমাকে শেখাতে হবে না। শিল্পীরা জীবনকে নানাভাবে ভোগ না করেও দেখতে জানে। বিশেষ চোখ থাকা চাই। চলা-বলা-করা ঠিকভাবে না হলে পতন কেউ রোধ করতে পারে না। সংযম ছাড়া জীবনে ধর্ম টেকে না।

ধ্যাত, শুধু জ্ঞানগর্ভ কথা। ধর্মের কচকচি। কুইক প্লিজ, ধার্মিক প্রবর। বলেই ব্রেসিয়ারে হাত দিল। এক এক করে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল। নির্লজ্জ বেহায়া হলো।

প্রমাদ গুনল পুণ্যব্রত। একটা মেয়ের জন্য করায়ত্ত শত যশ নষ্ট হবে? শরীর ছুঁইয়ে একটা নগ্ন দেহ। যৌবন বন্যায় টলটল করছে। চারদিকের পরিবেশ শান্ত। ঝড় ওঠার আগের অবস্থা। যা খুশি করার অপূর্ব সুযোগ। বুক ধুকপুক করতে লাগল। কী করবে ভেবে পেল না। এমন শক্ত পরীক্ষা জীবনে দেয়নি। কেউ দেখলেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। পাপপুণ্যের দোলায় দুলতে লাগল। দূরে কাদের পদধ্বনি শুনতে পেল। পুণ্যব্রতের বাড়ির লোক হতে পারে। কম্পিত হাতে ওর মাথাটা ধরে আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল পদ্ম পাপড়ির মতো কোমল গালে। নাথিং এল্‌স বলে জামাকাপড়গুলি হাতে ছুঁড়ে দিল। বি রেডি প্লিজ। বাড়ি যাও। মা ওরা আসছেন বোধ হয়। এটাই প্রসাদ, স্মৃতি হয়ে থাক। তুমি কুমারী, এর বেশি পাপ, ঘোর অন্যায়। লক্ষ্মীটি আমায় ক্ষমা করো।

মধুমিতা ওকে প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম হতে দেখল। অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। পীড়াপীড়ি করা মিছে। কৌমার্য ও নষ্ট করবে না। সব দেবতার এক প্রসাদ নয়। বুঝতে পারল পুণ্যব্রতের যশ, মান, খ্যাতি তাকে অহরহ জ্বালাবে। জীবনটা ধূপকাঠির মতো নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পুণ্যব্রত বিয়ে না করলে তবু মনে রাখবে। বিয়ে করলেই নিষ্ঠুরভাবে ভুলে যাবে। আরও নানা চিন্তা মাথায় জট-বাঁধে। এ হয়তো শেষ দেখা, শেষ কথা। মনের মধ্যে অনেক মেঘ জমে কালো ঘন হয়ে গেছে। জল ভরা আকাশের মতো ভারাক্রান্ত মনে ঘরের বাইরে পা ফেলল। দ্রুত পা চালাল। ঘরে ফিরে বিছানায় মনের সমস্ত মেঘ জল হয়ে ঝরে পড়বে। ভেজা ভেজা চোখে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

খুড়োমশাই

সিদ্ধার্থ সিংহ

থুখুড়ে খুড়োমশাই এক মুহূর্তের জন্যও বালিশটাকে হাতছাড়া করেন না। মাথায় দিয়ে তো শোনই, মনে হয় ঘুমের মধ্যেও ধরে থাকেন। সকালে নিম দাঁতন করার সময় হাতের কাছাকাছিই রাখেন। স্নান করতে যাওয়ার আগে রোদে বসে গায়ে তেল মাখার সময়ও চোখে চোখে রাখেন। পুকুরে ডুব দিতে যাওয়ার

Celebrating
Durga
Puja
2025
On this auspicious occasion, avail the facility of
HOME LOAN
ROI STARTING
7.5%
CAR LOAN
ROI STARTING
7.9%
EDUCATION LOAN
ROI STARTING
7.65%
(Collateral free Loan for 860 institutes under PM Vidyalaxmi Scheme)
पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank
...the name you can BANK upon !

আগে, পাড়ে উঠে পরার জন্য নিয়ে যাওয়া ধুতি দিয়ে ভালো করে ঢেকে রেখে যান। যাতে কারও নজরে না পড়ে। খেতে বসার সময়ও পাশে রেখে যান। কোথাও বসলে কোলে নিয়ে বসেন।

বাড়িতে তাঁর চার-চারটে ভাই। বয়সে তাঁর চাইতে ঢের ছোট হলেও সকলেই প্রায় বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁদের একগাদা ছেলে-মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে। তারা নাতি-নাতনি নিয়ে সব ঘরসংসার করছে। ছেলেগুলোও বিয়ে করে বউমা নিয়ে এসেছে ঘরে। তাদের ঘরেও বাচ্চাকাচ্চা থিকথিক করছে। তারা কেউই ওই বালিশটার দিকে এত দিন ফিরেও তাকায়নি। একেবারে তেলচিটে হয়ে গেছে।

যেহেতু খুড়োমশাই একা, বিয়ে-থা করেননি—তাই ভাইবউ, বউমা, এমনকী তাদের ঘরের মেয়েরাও মাঝে মাঝে তাঁকে বলে, হ্যাঁগো খুড়োমশাই, দাও না বালিশটা। তুলোটুলো বের করে বালিশের খোলটা একটু কেচে দিই। শুকিয়ে গেলে আবার না হয় ওই সব ভরেটরে আগের মতো করে দেব গো। ওটার গন্ধে যে তোমার কাছেই ঘেঁষা যায় না—

কিন্তু তাতেও তাঁর ঘোর আপত্তি। বালিশের খোল তো দূরের কথা, বিশ্বাস করে কাউকে বালিশের ওয়ারটা পর্যন্ত মনে ধরে খুলে দিতে পারেন না তিনি।

কী এমন ধনসম্পত্তি আছে গো ওটার মধ্যে যে, সারাক্ষণ বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াও? কেউ এ ধরনের কোনও প্রশ্ন করলেই উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সে আছে একটা জিনিস। কিন্তু সেটা যে কী জিনিস, কাউকেই উনি সেটা খোলসা করে বলেন না। আর বলছেন না দেখেই এখন সবার নজর গিয়ে পড়েছে ওই বালিশটার ওপরে। কী আছে ওটার মধ্যে! কী আছে!

এই কৌতূহলটা হওয়াই স্বাভাবিক। আসলে, এই পরিবারের পুরুষদের মধ্যে বালিশে করে কিছু রেখে যাওয়ার একটা বাতিক আছে। এই খুড়োমশাইয়ের বাবাও বুড়ো বয়সে যে বালিশটা মাথায় করে শুতেন, রোগশয্যায় থাকার সময় তিনি একদিন তাঁর ছেলে-মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, শোন, আমি যখন মারা যাব, তখন কিন্তু অন্যান্য বাড়ির লোকেদের মতো আমার সঙ্গে বিছানাপাটি দিলেও এই বালিশটা কিন্তু কিছুতেই দিও না।

বড় ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন বাবা?

মেজ ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন, এর মধ্যে কি কিছু আছে?

সেজ ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা হলে এটা কী করব?

খুড়োমশাইয়ের বাবা বলেছিলেন, এর মধ্যে একটা নামাবলী আছে। আমি মারা গেলে এই বালিশটা আমার ছোট ছেলেকে দিয়ে দিস। দশ দিনের দিন ও যখন ঘাটকাজ করবে, তখন যেন এই বালিশটার ভিতর থেকে নামাবলীটা বের করে সেটা গায়ে দিয়েই আমার কাজ করে, কেমন?

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কথামতোই দশ দিনের দিন যখন নামাবলী বের করার জন্য ছোট ছেলে ওই বালিশটা ছিঁড়ল, দেখা গেল, নামাবলী কোথায়? বালিশের মধ্যে শুধু গাদা গাদা টাকা।

তাই বালিশের মধ্যে নামাবলী বা ওই জাতীয় কিছু একটা আছে বললে নির্ঘাত তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ধরেই নেবে, উনিও তাঁর বাবার মতো বালিশের ভিতরে টাকাপয়সাই রেখে যাচ্ছেন। এটা ভেবেই হয়তো খুড়োমশাই মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলছেন না। তবে না বললেও, এই ভাবে তাঁর বালিশ আগলে রাখা দেখেই সবাই আন্দাজ করছে, ওই তেলচিটে বালিশটার মধ্যে কী আছে—

তবু এ জিজ্ঞেস করে, ও জিজ্ঞেস করে, সে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু উনি কাউকেই কিছু বলেন না। কায়দা করে ঠিক এড়িয়ে যান। আর উনি যত এড়িয়ে যান, ততই সবার সন্দেহ বাড়তে থাকে। নিশ্চয়ই ওটার মধ্যে তেমন কিছু আছে।

আসলে খুব ছোটবেলায় একদিন হঠাৎ করে উনি বাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফিরে এলেন তখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছেন। উনিই বললেন, হাতের লেখা অত্যন্ত খারাপ বলে বাবা এমন বকেছিলেন যে, উনি নাকি রাগ করে যেদিকে দু'চোখ যায়, সে দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন এবং হাঁটতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন যে বহু দূরের একটা রেলস্টেশনে। সেখানে গিয়ে কোনও কিছু না জেনেই একটা দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে বসেছিলেন। একদম শেষ স্টেশনে নেমে উনি যখন খিদের জ্বালায় কাঁদছিলেন, সে সময় এক দম্পতি তাঁকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁরা নাকি খুড়োমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কে কে আছে? তখন খুড়োমশাই নাকি বলেছিলেন, আমার কেউ কোত্থাও নেই। আমি একা। তখন তাঁরা একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে মহা ঘটা করে তাঁকে দত্তক নিয়ে নেন।

তাঁদের ছিল দেশজুড়ে নানা রকমের ব্যবসা। তাঁরাই তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী হলেও তাঁর হাতের লেখা এত খারাপ ছিল যে, বেশিরভাগ লোক তার পাঠোদ্ধার করা তো দূরের কথা, বুঝতেই পারত না, ওটা বাংলা, উর্দু না চীনা ভাষায় লেখা। তবু তিনি অনেক দূর পর্যন্ত পড়েছিলেন। পড়াশোনার পাট চুকে যাওয়ার পরে সেই ব্যবসা উনি দেখাশোনা করতে লাগলেন এবং সেই ব্যবসাতে তিনি এতটাই ডুবে গেলেন যে, যখন হুঁশ হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তত দিনে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন সেই দম্পতিও। ফলে সমস্ত ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু তিনি ব্যবসাটা পুরোপুরি হাতে নেওয়ার পরেই নাকি সেই ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে শুরু করে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই একদম লাটে উঠে যায় যাবতীয় ব্যবসাপত্র।

উনি যখন এখানে আসেন তাঁর তখন একগাল দাড়ি। পরনে জোব্বা মতো কী

একটা। পিঠে বিশাল বড় একটা বোঁচকা। শরীরটাও কেমন যেন জুবুথুবু। তাঁকে দেখে প্রথমে তো কেউ চিনতেই পারেনি। যখন চিনল, তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো একটা ঘর। ভাইয়েরা 'দাদা দাদা' বলে ডাকলেও, ভাইদের কোনও ছেলে-মেয়েই তাঁকে আর 'জেঠু' বলে ডাকতে পারল না। কারণ, তাঁর কথা তারা জানতই না। শোনেইনি কোনও দিন। ফলে তাঁর পরের ভাইকেই ওরা জেঠু বলে ডাকত। একজন জলজ্যান্ত জেঠু থাকতে আর একজনকে কী নতুন করে জেঠু ডাকা যায়। না, এক নম্বর জেঠু, দু'নম্বর জেঠু; কিংবা বড় জেঠু, ছোট জেঠু অথবা নতুন জেঠু, পুরনো জেঠু, বলা যায়? তাই তারা ডাকা শুরু করল খুড়োমশাই বলে। আর তাদের দেখাদেখি সবার কাছেই তিনি হয়ে উঠলেন—খুড়োমশাই।

সব ক'টা ভাই-ই তাঁদের ঘর হাট করে খুলে রাখলেও তিনি কিন্তু তার ঘর সবসময় আটকে রাখতেন। ঘরে থাকলে ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিতেন। আর সামান্য সময়ের জন্য বাইরে গেলেও দরজায় তালা আটকে যেতেন। তাঁকে তখন ভাই-বউরা খেতে-পরতে দিলেও তাঁর মনে হতে লাগল, কেউ যেন তাঁকে ঠিক মতো কদর করছে না। তাঁকে মানুষ বলে মনে করছে না।

এর পরেই হঠাৎ একদিন সবাই দেখল, চোস্তা-পাঞ্জাবি পরে সক্কাল সক্কাল তিনি বেরোচ্ছেন। হাতে একটা বালিশ। তাঁকে ও ভাবে যেতে দেখে কে যেন বলে উঠেছিল, কই যাও গো খুড়োমশাই?

উনি বলেছিলেন, কই আর যামু? যাওয়ার জায়গা তো একটাই। চুলার দুয়ার।

---এ সব কথা বলতে নেই গো খুড়োমশাই। হাতে ওটা কী?

—শকুনের চোখ ঠিক ভাগাড়ের দিকে, না? দেখতাছিস না বালিশ।

—সে তো দেখছিই। কিন্তু বালিশ নিয়ে যাও কই?

—তোর হাউড়ির কাছে।

—আমার শাশুড়ি তো অনেক দিন আগেই স্বর্গে চলে গেছে গো....

—আমিও তো সেখানেই যাচ্ছি।

না। সেদিন সারা দুপুর আর বাড়ি ফেরেননি উনি। ফিরেছিলেন সেই রাত্রে। রাত্রেও কিছু দাঁতে কাটেননি। সারা দিন কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, কী খেয়েছিলেন কাউকেই কিছু বলেননি। তবে তার পর থেকেই তাঁর হাতে দেখা যেত লাগল সেই বালিশটা। বালিশ নিয়ে তাঁর আদিখ্যেতা দেখে প্রথম প্রথম সবাই হাসাহাসি করলেও কিছু দিন পর থেকেই অনেকে বলতে শুরু করল, হয়তো সারা জীবনের সঞ্চয় উনি ওটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই যক্ষের মতো সারাক্ষণ ওটাকে আগলে রাখেন। কিন্তু আগলে রাখলেও উনি আর কত দিন! বয়স তো কম হলো না। কবে দুম্ করে চোখ বুজবেন, কোনো ঠিক আছে?

চোখ বুজলে কে পাবে ওটা। কাকে দিয়ে যাবেন উনি। পেতে গেলে তো ওঁর মন জয় করতে হবে। উনি যা খেতে ভালবাসেন, তা ওঁর মুখের সামনে এগিয়ে দিতে হবে। দরকার হলে তাঁকে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে উনি যে টিভি সিরিয়াল দেখতে পছন্দ করেন, নিজেদের ভালোলাগা, মন্দলাগা জলাঞ্জলি দিয়ে সেটা খুলে দিতে হবে। ইদানীং ওঁর খুব চাকুমচুকুম খাওয়ার জিভ বেড়েছে। প্রয়োজন হলে সেই মতো আইসক্রিম, বনকুল—না, দোকান থেকে নয়, পাতি হজমিওয়ালার কাছ থেকে হজমিমাখা, চালতার আচার এনে দিতে হবে। এবং সবথেকে যেটা বড় কথা, সেটা হলো—ওঁর কোনও কথাতেই রাগ করা চলবে না। যত কষ্টই হোক, যত বিরক্তই লাগুক, ওঁর মুখের উপরে 'না' বলা চলবে না। ইচ্ছে না করলেও ওঁর মন জুগিয়ে চলতে হবে।

প্রত্যেকটা ভাইয়ের ছেলে-মেয়েই তাঁকে তোয়াজ করে চলতে লাগল। শুধু তোয়াজ নয়, তোয়াজের যেন বন্যা বয়ে যেতে লাগল। এ এটা করে তো, সে সেটা করে। কে কাকে টেক্কা দেবে, তা নিয়ে যেন অলিখিত কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল। খুড়োমশাই নিজেও টের পেতে লাগলেন, নিজের ছেলে-মেয়ে থাকলেও এমন সেবা বুঝি তাঁকে কেউ করত না। দারুণ সুখে আছেন তিনি। তিনি যত সুখে আছেন, ঠিক ততটাই অ-সুখে আছে বাকিরা। কেউই আন্দাজ করতে পারছে না, ওই বালিশের ভিতরে ঠিক কত ভরি সোনা আছে। কত হিরে-জহরত আছে। কত জমিজমার দলিল আছে এবং নগদ কত টাকা আছে। তবে, যাই থাকুক না কেন, সেটা যে খুব একটা কম নয়, এ ব্যাপারে বাড়ির প্রায় সকলেই নিশ্চিত।

এমন সময় দিন কয়েকের জন্য এই বাড়ির সেজ মেয়ে ঘুরতে এল তার বাবা-মায়ের কাছে। সঙ্গে তার ছোট মেয়ে চম্পা। সামনের বার নাকি উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। যেমন ছটফটে, তেমনই মিশুকে। তেমনই আবার বাচাল। কোনও কথা পেটে রাখতে পারে না। হড়হড় করে বেল দেয়। সব সময় তার মুখে যন কথার ফুলঝুড়ি ফুটছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ব্যস, তার মধ্যেই সে খুড়োমশাইয়ের এমন নেওটা হয়ে গেল যে, তা বলার নয়। সে আগেই মায়ের কাছে শুনেছিল ওই বালিশের কথা। এখন স্বচক্ষে সেটা দেখে সে বলেই ফেলল, এর মধ্যে কী আছে গো? খুড়োমশাই তো কিছুতেই বলবেন না। মেয়েও তেমনই নাছোড়বান্দা। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টার পীড়াপীড়িতে খুড়োমশাইয়ের মুখ থেকে সে বের করে ফেলল, ওই বালিশের মধ্যে কী আছে—

যদিও সেটা বলার আগে খুড়োমশাই বারবার করে বলে দিয়েছিলেন, আমি তোকে যা বললাম, তুই কিন্তু এটা আর কাউকে বলিস না, কেমন?

উনি বারণ করলে কী হবে, বরং উনি বারণ করেছেন বলেই হয়তো ওর মনের মধ্যে যুদ্ধ জেতার একটা দম্ভ কাজ করছিল। এত দিনেও কেউ যেটা করতে পারেনি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই ও সেটা করে ফেলতে পেরেছে। আর সে যে এটা পেরেছে, সেটা জাহির করার জন্যই জনে

জনে সে বলে বেড়াতে লাগল, একটা কথা বলছি শোনো, কাউকে কিন্তু বোলো না। খুড়োমশাই আমাকে পইপই করে বলতে বারণ করে দিয়েছেন, আমাকে শুধু বিশ্বাস করেন বলেই বলেছেন। আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি, খুড়োমশাইয়ের ওই বালিশের মধ্যে না—অনেগুলো মোহর আছে।

মোহর! তার মানে, যাঁরা ওঁকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরে ওই বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ায় তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, যতই ওঁরা লিখে দিয়ে যান না কেন, ওই দম্পতির নিকট আত্মীয়রা নিশ্চয়ই এটা ভালো চোখে দেখছেন না। তলে তলে হয়তো নানারকম ষড়যন্ত্র করছেন। তাই তিনি কৌশল করে বিশাল সম্পত্তি হাতিয়ে রাতারাতি সব ক'টা ব্যবসাকে চৌপাট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অত সম্পত্তি তো একদিনে সরিয়ে ফেলা যাবে না। তাই সেটাকে খুব ছোট আকার দেওয়ার জন্য উনি এই মোহরগুলো কিনেছিলেন।

চম্পার মুখ থেকে বাড়ির লোকেরা, বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে পাড়াপ্রতিবেশীরা, পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছ থেকে গোটা গ্রাম, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সেই খবর। আর এ খবর যে-ই শুনল সে-ই লাফিয়ে উঠল। এবং বলল, শেষ পর্যন্ত তা হলে উনি স্বীকার করলেন। অবশ্য স্বীকার না করেই বা উপায় কী। উনিও তো বুঝতে পারছেন, উনি মুখে না বললেও সবাই টের পাচ্ছে ওই বালিশের মধ্যে কী আছে। ফলে বাধ্য হয়েই উনি বলেছেন। আর যেই এটা বলেছেন, ব্যাস, অমনি খুড়োমশাইকে সেবা করার জন্য যেন সবাই উঠেপড়ে লেগেছে। এমন যত্ন-আত্তির ধুম যে খুড়োমশাইয়ের প্রাণ যায় যায়। প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আমি জানতাম ওটার মধ্যে এ রকমই কিছু একটা আছে। না হলে খুড়োমশাই ওটাকে ওভাবে কখনও আগলে রাখেন!

কিন্তু মোহর থাকলেও ওটার মধ্যে ঠিক ক'খানা মোহর আছে। এটা নিয়ে সকলেই বেশ চিন্তিত। চিন্তিত আর একটা বিষয় নিয়েও—উনি কি মরার আগে কোনও একজনকে বালিশটা দিয়ে যাবেন, নাকি সবাইকে ডেকে বলবেন, এখানে যা আছে, তোরা সবাই মিলে ভাগ করে নে। নাকি নিজের মর্জি মতো কাউকে বেশি, কাউকে কম, এই ভাবে ভাগ করে দেবেন। আর উনি যদি ভাগ করে দেওয়ার মতো অবস্থায় না থাকেন কিংবা কাউকে দেওয়ার আগেই যদি চোখ বোজেন, তখন!

সবাই তক্কে তক্কে আছে ওঁর কিছু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। না। কেউই কাউকে একা কিছু নিতে দেবে না। যে ক'টা মোহর আছে, সবাই ভাগ করে নেবে। উনি তো আর বোকা নন, নিশ্চয়ই মাথা পিছু একটা হিসেব করেই রেখে যাচ্ছেন। আর তা যদি নাও রেখে যান, তা হলে যে ক'টা মোহর পাওয়া যাবে, তা বিক্রি করে সেই টাকা সবাই মিলে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে।

কেউ কেউ এটা বললেও, কেউ কেউ আবার এর-ওর সঙ্গে শলাপরামর্শও করতে লাগল। মেয়েদের তো বিয়ে হয়ে গেছে, তারা কেন ভাগ পাবে? কেউ বলল, বড়দার তো প্রচুর টাকা ও আবার এটায় ভাগ বসাবে নাকি? কেউ বলল, দ্যাখ, আমার দুটো ছেলেই তো বেকার, আমার কথাটা একটু মাথায় রাখিস। আমার মনে হয়, ফোকটেই যখন পাচ্ছি, যার অবস্থা যত খারাপ, তাকে তত বেশি টাকা দেওয়া উচিত।

রোজই এসব নিয়ে চলছে। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করে আছে কী হয় কী হয়। না। কারও চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই খুড়োমশাইয়ের অসুস্থতা নিয়ে নয়, ঘুম নেই খুড়োমশাইয়ের কিছু হলে ওই বালিশের কী হয়, তা নিয়ে। উনি আবার কোনও উইলটুইল করে যাননি তো।

অবশেষে খুড়োমশাই একদিন সত্যি সত্যিই চোখ বন্ধ করলেন। করলেন মানে চিরদিনের জন্যই করলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন সব ক'টা ভাই, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনি, এমন কী মেয়েরাও।

সবাই খুড়োমশাইয়ের ঘরে গিয়ে ভিড় করল ঠিকই, কিন্তু কেউই খুড়োমশাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। সবার চোখ তখন ওই বালিশটার দিকে। সবারই এক কথা, আগে বালিশটা খোলো। ভিড়ের মধ্যে কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে গিয়েছিল, আগে দাহটা সেরে এলে হতো না...

না! কে যেন বেশ জোরের সঙ্গেই ধমক দিয়ে উঠল। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলল—না।

অবশেষে সবার সামনে বালিশটা খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ব্লেড দিয়ে চেরা হলো। এত যত্ন করে চেরা হলো, যাতে বালিশের ভিতরে তুলোর গায়েও যেন না লাগে। না। এতটুকুও আঘাত লাগল না। ওখানে উপস্থিত থাকা, বালিশের ভিতর থেকে কী বেরোয়, তা দেখার জন্য বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে ভাই, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনি, এমনকী বোনেরাও। সবাই দেখল, না। মোহর নয়। বালিশের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সাদা রঙের একটা লম্বা মতো খাম। খামটার মুখ আঠা দিয়ে আটকানো। সেটা খুলতেই বেরিয়ে এল ভাঁজ করা এ-ফোর সাইজের ধবধবে একটা পাতা। আর তাতে বিশাল বড় বড় হরফে কালো কালি দিয়ে কমপিউটারে লেখা দু'টি শব্দ—কেমন দিলাম?

লেখাটা দেখে সবাই এতটাই হতাশ হলো যে, কারও মুখে আর কোনও কথা ফুটল না। সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from New Delhi Rly. Station
Only 1 km. from Cannaought Place
Homely Atmosphare
Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road, Ram Nagar, Pahar Ganj
New Delhi - 110055 (India)

Phones : +91 11 43505463 (10 Lines)
Cont : 9811044543

E-mail : info@aryatouristlodge.in
website : www.aryatouristlodge.in

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

পাতালপুরীর রহস্য

নবাঙ্কুর

অজয় ভট্টাচার্য

গভীর রাত। খাটে এপাশ-ওপাশ করছিলাম। হঠাৎ যেন মেঝে থেকে উঠে এল আওয়াজটা। শুনেছি মিশরীয়দের মৃত্যুর দেবতা ওসিরিসের দরবার পাতালে। আওয়াজটা কি সেখান থেকে এল! সাত-পাঁচ ভাবছি। হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে উঠে এল একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ভয়ে দরদর করে ঘামছি। ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীটি বদলে গেল একটি মানব শরীরে। মুখটা শেয়ালের মতো। তাহলে কি এই সেই মৃত্যুদূত আনুবিস? আমাকে নিয়ে যাবে ওসিরিসের দরবারে। ঘুরে-ফিরে আমাকে দেখছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি?

গুরুগম্ভীর স্বরে আওয়াজ এল, 'মৃত্যুদূত'।

—কিন্তু আমি তো এখনও মরিনি!

—আশীর্বাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে বলল, 'তোমার সময় পূর্ণ হয়েছে। এবার তোমায় যেতে হবে।'

—কোথায়?

—'দুই সত্যের সভাগৃহে। সেখানে তোমার বিচার হবে।'

—'বিচার হবে মানে! আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। তাহলে কীসের বিচার?''

—শান্ত হও। ন্যায়-অন্যায় বোঝা যাবে মমিফিকেশনের পর।

দেবদূতের মতলব তো ভালো ঠেকছে না। আমাকে খুন করতে চাইছে।

মুখে বললাম, 'তাই বলে জীবিত মানুষের মমিফিকেশন?'

—'কে বলল, তুমি জীবিত! জীবিত হলে রাজার এত অন্যায় মুখ বুঝে সহ্য কর কীভাবে? তোমাদের মতো রাজনীতির কারবারিদের জন্যেই চারদিকে এত অত্যাচার, অনাচার। দুর্নীতির টাকায় পুকুর বুজিয়ে প্রাসাদ বানিয়েছ।

স্বার্থপরের মতো প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষত করেছ। আর এখন বলছ, তুমি নির্দোষ!

—'কিন্তু জীবিত মানুষের মমিফিকেশন—সে তো এক প্রকারের হত্যা!'

—'হত্যা নয়, শাস্তি। ভেবে দেখ তোমার সমাজকে কতটা বিষিয়ে দিয়েছ। ঘুষ ছাড়া এখানে কোনো কাজ হয় না। তাই এই শাস্তি তোমার প্রাপ্য।'

বলতে বলতে এগিয়ে এল আমার দিকে। হাতে একটি লোহার শলাকা। হয়তো লোহার শলাকা দিয়েই মমিফিকেশনের কাজ শুরু করবে। ভাবতে ভাবতেই ভয়ে কাঠ হয়ে এল শরীর। দৌড়ে পালাতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে খাটের সঙ্গে। বাধাও দিতে পারছি না। সকল শক্তি যেন শুষে নিয়েছে দেবদূত। হঠাৎ নাকের ছিদ্র দিয়ে সজোরে শলাকাটি পুরে দিল মস্তিষ্ক পর্যন্ত। শলাকা দিয়ে মাথার ঘিলু টেনে টেনে বার করতে লাগল। ও কী অসহ্য যন্ত্রণা! ছটপট করতে করতে চিৎকার করে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আমি ন্যায়ের পথে চলব।'

রক্তমাখা ঘিলু ছিটকে পড়তে লাগল চারদিকে। নাক দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত। মাথাটা বন বন করে ঘুরছে। শুধু কানে এল একটা কথা, 'সিস্টার অক্সিজেনের নলটা ভালো করে পেশেন্টের নাকে পুরে দিন।' তারপর আর কিছু মাথায় ঢোকেনি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি ডাক্তারবাবু স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমার বুকের ধুকপুকুনি মন দিয়ে শুনছেন। পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীকে বললেন, 'মনে হচ্ছে আর কোনো ভয় নেই। কিন্তু ট্রমা-টা বেশ কিছুদিন থাকবে। তবে আমরা আরও দু'একদিন দেখে নিতে চাইছি। একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়ে নিতে হবে। পেশেন্টকে বেশি বিরক্ত করবেন না।' সিস্টারের কড়া পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে আমার স্ত্রী ফিস ফিস করে বলল, ক'টা দিন যা ভুল বকছিলে। খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম! 'মমিফিকেশন'-এর বইটি আমি ফেলে দিয়েছি। ওসব ছাইপাঁশ পড়েই তোমার এই অবস্থা।

—কিন্তু মেঝেতে ফাটল ধরল কী করে?

—পুকুর বুজিয়ে বাড়ি বানানোর খেসারত। ইঞ্জিনিয়ার তো তাই বলল।

ব্যাখ্যাটি ভালো। তবুও মন মানছে না। দু'দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম। এখন শুধু রাতে নয়, দিনেও আওয়াজটা পাই। ঠকঠক করে কী যেন হচ্ছে। কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমি আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পাই। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠে। পাতালপুরীতে নিশ্চয় কিছু আছে। জলাজমি বুজিয়ে ইমারত না বানালেই হতো।

With Best Compliments from -

SPORTSLINE

Certified Substantial Sports Protection
Made in India
H-29, Udyog Nagar Industrial Area, Near Peeragarhi
New Delhi - 110041, India
+91-11-25470502, +91-11-49052142
sportslineindia@gmail.com
www.sportshelmet.com

শেক্সপিয়রের বরপুত্র

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে বেতের মতো শরীর, মাথায় টাক আর খাড়া নাক। এই নিয়ে এক অসীম মোহময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমাদের ইংলিশ জেঠু।

আমি টিটো। ইংলিশ জেঠু আমার বাবার নিজের ছোটোমামা। সম্পর্কে আমার দাদু হলেও আমরা যারা ওঁর কাছে ইংলিশ পড়েছি, সবাই ওনাকে ইংলিশ জেঠু বলেই ডাকি। এমনকী আমার বাবাও। ছোটো দাদুর এই ইংলিশ জেঠু নামটা কে যে কবে শুরু করেছিল কে জানে! এখন ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু নয়, তাদের বাবা-মারাও তাঁকে ইংলিশ জেঠু বলেই ডাকে। নামটা এখন এই এলাকায় সর্বজনীন!

এহেন ইংলিশ জেঠু একসময় বড় একটা বেসরকারি কোম্পানির খুব উঁচু পদে কাজ করতেন। অবসর নেওয়ার পর শুরু করলেন পড়ানো। এ তল্লাটে আমরা যারা একটু-আধটু ইংরেজি শিখেছি, তা তাঁরই কল্যাণে। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ। তাঁর হাতের ছাগুলে গাঁট্টা খায়নি এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী এই তল্লাটে বিরল। একই ভুল বারবার করলে যে গাঁট্টা তিনি মারতেন সেটাকে আমরা নাম

দিয়েছিলাম ছাগুলে গাঁট্টা। বল স্পিন করানোর কায়দায় কবজির মোঁচড়ে মুহূর্তে মাথায় ছোট্টো একটা আলু গজিয়ে দিতেন। খুব একটা না লাগলেও একদিন ব্যথা থাকবেই। আর এটা খাওয়ার পর ভুলের পুনরাবৃত্তি কারও কখনো হয়েছে বলে শুনতে পাইনি।

আমাদের পাশের পাড়াতেই ছিল আমার বাবার মামার বাড়ি। আমার বড়োদাদু অর্থাৎ আমার বাবার বড়োমামা এবং আমার ছোটোদাদুর চরিত্রের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাত। বড়োদাদু রাশভারী বৈজ্ঞানিক, আর ছোটোদাদু মজাদার, দিলখোলা এক মানুষ। পৃথিবীর কাউকে ভয় না করলেও এই বড়োদাদুকেই ছোটো দাদু একটু ভয় ভক্তি করতেন।

এই গল্পের আরও এক প্রধান চরিত্র হচ্ছেন আমার ঠাকুরদা অর্থাৎ বাবার বাবা। ইংলিশ জেঠুর যত রাজ্যের কীর্তি-কাহিনি তাঁর কাছ থেকেই আমি শুনেছি। ইংলিশ জেঠু লেখাপড়ায় এমনিতে ভালো হলেও পড়াশোনার চাইতে আড্ডা, খেলাধুলাই বেশি পছন্দ করতেন।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিল সন্ধ্যা নামলেই বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু ইংলিশ জেঠু কোনোদিনই ঠিক সময় বাড়ি ফিরতেন না। দাদু বলেছিলেন, এর সঙ্গে ইংলিশ জেঠুর ছিল পরোপকারের নেশা। মড়া পোড়াতে গিয়ে বা এইসব পরোপকার করতে গিয়ে কত যে ঘটনার ঘনঘটা ঘটিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার দাদু তাঁর এই ছোটো শ্যালকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। প্রায়ই গল্পে গল্পে ইংলিশ জেঠুর কত যে কাণ্ড শুনিয়েছেন তা লিখতে শুরু করলে মহাভারত হয়ে যাবে। দাদুকে প্রশ্ন করেছিলাম—''এই যে দেরি করে ইংলিশ জেঠু ফিরতো, তা কেউ কিছু বলতো না?'' দাদু বলেছিল—''বলতো না আবার।'' প্রতিদিনই প্রায় বকা খেত দাদার কাছে। বাড়ির সবার কাছে।

—''তবু শুধরাতো না!'' —আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম।

— ''নারে, এমন সব উদ্ভট উদ্ভট কারণ বের করে তোদের ইংলিশ জেঠু কথার মোড় ঘুরিয়ে দিত যে, বকাবকিটাই মুলতুবি হয়ে যেত।'' একবার বুঝলি—দাদু বলতে থাকলো, ''দেরি করে ফিরে কৈফিয়ত দিয়েছিল পাড়ার ধোপা রাম খিলাওনের গাধাটা নাকি অঙ্ক কষে নির্ভুল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে দিচ্ছে! সবার তাক লেগে যাচ্ছে! সবাই দলে দলে দেখতে যাচ্ছে। সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে তারও দেরি হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, গাধাটাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আসতে হলো বলেই তার বাড়ি ফিরতে এত দেরি হলো।''

এমন অদ্ভুত কথা শুনে সবাই ইংলিশ জেঠুকে ছেড়ে দিল? নিনিরা কিছু বলেনি?

—''তোর ঠাকুমা অর্থাৎ নিনি উলটে প্রশ্ন করেছিল''—''গাধা কী করে অঙ্ক কষবে? দেরি করে বাড়ি ফিরে মিথ্যে কথা বলতে তোর লজ্জা হয় না?''

''উলটে তোর ইংলিশ জেঠু কী বলেছিল জানিস?'' আমি মাথা নেড়ে বললাম—''না''।

''ঠিক তোর মতো মাথা নেড়ে গাধাটা নাকি অঙ্ক করে দিচ্ছিল।''

''মানে? তুমি কি আমাকে গাধা বললে নাকি?''

''না তো আমি তো গাধাকে তোর মতো বলেছি!''

মুচকি হেসে দাদু বলেছিল, ''তা যাই হোক।'' শোন্, এরপর তোদের ইংলিশ জেঠু বলল গাধাটাকে দুই আর দুই যে কত হয় জিজ্ঞাসা করলে চারবার মাথা নাড়াচ্ছে। দশ আর দশে কত হয় প্রশ্ন করলে কুড়ি বার মাথা নাড়াচ্ছে। এমনভাবেই যোগ, বিয়োগ করে যাচ্ছে। তা তোদের ইংলিশ জেঠু নাকি পরীক্ষা করার জন্য পঁচিশ আর পঁচিশে যোগ করলে কত হয় জিজ্ঞাসা করার পরেই প্রশ্ন করেছিল তার সঙ্গে পঞ্চাশ বিয়োগ করলে কত হয়। আর তাতেই গাধাটা নাকি পঞ্চাশ বার মাথা নাড়ার পর যেই শূন্য দেখাবার জন্য মাথাটা গোল করে ঘুরিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে চার পা চিতিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাকে হাসপাতালে দিয়ে বাড়ি আসতেই নাকি তোদের ইংলিশ জেঠুর দেরি হয়েছিল। এরপরও কি কেউ তাকে আর কিছু বলতে পারব? আবার কোনোদিন দেরি করে এসে বলল যে কে একজন মাটিতে একটা টাকা পুঁতেছিল তার থেকে গাছ গজিয়েছে। খবরের কাগজের লোকেরা এসে দেখে গেছে। তিনিও সেখানে গিয়ে দেরি করে ফেলেছেন।'' একটু থেমে দাদু বললো—''নিত্যনতুন এমনতরো অজুহাত সৃষ্টি করলেও প্রতিটা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট করতো তোদের ইংলিশ জেঠু।'' কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি ছিল ইংলিশে তোদের ইংলিশ জেঠু পাশ করত একদম টায়েটুয়ে, কোনোমতে কান ঘেঁষে।

এতটা শুনে আর থাকতে না পেরে দাদুকে বলে উঠেছিলাম— ''এবার তোমার লেগেছে ইংলিশ জেঠুর ছোঁয়া।''

এবার কিন্তু তুমি গুল দিচ্ছ। যে মানুষটার ইংলিশে এত নাম ডাক। পাড়ার রিকশাওয়ালা থেকে দোকানদার, বাজারের লোকেরা যাকে ডাকে কিনা ইংলিশ জেঠু বলে, সে কিনা প্রতিবছর গণ্ডায় গণ্ডায় ছাত্র-ছাত্রীকে ইংলিশ পড়াচ্ছে, সে কিনা ইংলিশে ভালো ছিল না? আশ্চর্য!

একদম সত্যি—দাদু বলল, তবে কিনা যেদিন কবি শেক্সপিয়রের আশীর্বাদ পেল সেদিন থেকে বদলে গেল তোদের ইংলিশ জেঠু।

আরও একটা গল্পের গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

দাদুকে দেখি রকিং চেয়ারে দুলতে

দুলতে মুচকি মুচকি হাসছে আর সুকুমার রায় আওড়ে বলছে—

''আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা,
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়।
আয়রে পাগল, আবোল তাবোল,
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।''

চেপে ধরলাম দাদুকে, কী ঘটেছিল বলতেই হবে। আরাম করে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দাদু বলল—''সে অনেক কথা। যা আগে তোর মাকে বল্, একটু চা দিতে।''

''বলছি, কিন্তু গল্পটা বলতেই হবে।''—মাকে চায়ের কথা বলেই এসে বসলাম দাদুর কাছে।

''তখন তোদের ইংলিশ জেঠু পড়ে ক্লাস সেভেন কী এইটে।'' চোখ বুঁজে দুলতে দুলতে শুরু করল দাদু।—''বেশ ছোটো। এমনিতে লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু একটা সাবজেক্ট ছাড়া। ইংলিশটাকে তোদের ইংলিশ জেঠু কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারতো না। পারবেই-বা কীকরে? যে ভাষায় পি-ইউ-টি পুট হয়, আবার বি-ইউ-টি বাট, তাকে কি আর তোদের ইংলিশ জেঠুর মতো সাদামাঠা সরল ছেলে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারে? তার ওপর বিদেশিদের ভাষা, নিজের মায়ের ভাষা হলেও কথা ছিল! Mutual কেন মুটুয়াল না হয়ে মিউচুয়াল হবে বা Future কেন ফুটুরে না হয়ে ফিউচার হবে এসব ভাবনাই তোদের ইংলিশ জেঠুর মাথায় ঘুরে বেড়াত।''

''বাবা আপনার চা''—মায়ের হাত থেকে কাপটা নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে, আবার শুরু করল দাদু।

—''শুধু এই একটা সাবজেক্টের জন্য সবার কাছে গঞ্জনা পেতে পেতে তোদের ইংলিশ জেঠু ভাবতো একটা বিদেশি ভাষা কীকরে এদেশে কে ভালো ছাত্র আর কে খারাপ ছাত্র তার মাপকাঠি তৈরি করে দিতে পারে!''

''যাই হোক'' —দাদু বলতে লাগলো—''একদিন একটা ট্রানস্লেশান করতে না পারার জন্য যৎপরোনাস্তি অপমানিত হতে হলো তোদের ইংলিশ জেঠুকে। মনের দুঃখে ছাদের ঘরে একা বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে! হঠাৎ একটা শব্দ হতে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে, ঘরে আরও একটা লোক! চোর নাকি! কিন্তু কী অদ্ভুত নাটকের চরিত্রের মত পোশাক! একটু কেমন যেন চেনা চেনাও ঠেকছে!

''কে তুমি? এখানে এলেই-বা কী করে?'' সাহস করে একটু জোরেই বলে উঠলো ইংলিশ জেঠু।

''আমাকে চিনতে পারছো না? আমার নাটক তো কাল রাতেও পড়ছিলে তুমি!''

''কাল রাতে তো আমি 'ম্যাকবেথ'; তবে তুমি মানে আপনি শেক্সপিয়র!'' ভয়ে বিস্ময়ে ইংলিশ জেঠুর গলা বুজে আসতে চায়।

''দাদু এটা কী হচ্ছে। শেক্সপিয়র বাংলা বলছেন?''

''কেন বলবেন না, স্বর্গে তো কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম সব পাশাপাশি বসে আড্ডা মারেন।''—আমি হতভম্ব।

দাদু বলতে লাগলো—''আর শেক্সপিয়র শব্দ করে কথা বলছেন এটা কি আমি বলেছি? কথা হচ্ছিল মানসিক তরঙ্গে। আর মানসিক তরঙ্গে তো শব্দের প্রয়োজন থাকে না।''

একটু হেসে বলল দাদু—''এটা ঠিক বুঝতে পারা যায়। তুই কি পুরোটা শুনবি না বাধা দিয়ে যাবি?''

''না, না বলো। তারপর?'' আমি চুপ করে গেলাম।

দাদু আবার বলতে লাগলো—''তুমি যখন খুব মন দিয়ে আমার নাটক নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলে, আমি সেইসময় রোঁদে বেরিয়েছিলাম।''

ইংলিশ জেঠু জিজ্ঞাসা করলো—''সেটা আর কী?''

''আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হই। আমরা মানে যত পরলোকগত কবি, গায়ক, সুরকার, নাট্যকার, বৈজ্ঞানিকের দল। কখনো একা, আবার কখনও দল বেঁধে।''

শেক্সপিয়রের কথা শেষ না হতেই ইংলিশ জেঠুর প্রশ্ন?—''কেন আপনারা এভাবে বেরোন?''

—''আমরা দেখি কে কী করছে। কারও কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। এটাই ভগবানের আদেশ।''

একটু ঢোঁক গিলে ইংলিশ জেঠু বলে উঠলো—''তা আমার কাছে কেনো?''

''কাল যখন আমি, নিউটন আর কালিদাস রোঁদে বের হলাম, তখন কালি বলল—শেকু, ওই ছেলেটা তোমার ম্যাকবেথ পড়তে পড়তে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সর্দি বসে মরে না যায়।''

—''সেকি! আপনার সঙ্গে কালিদাস আর নিউটনও ছিলেন।'' ইংলিশ জেঠু প্রণামের ভঙ্গিতে বললো।

—''ছেলেটার ওজন বেড়ে গেছে। নিশ্চয় মন খারাপ।''

—''মন খারাপ হলে ওজন বেড়ে যায়! কী যাচ্ছেতাই কথা। এরপর তো বলবেন মড়ার চুল ছাঁটলে ওজন কমে যায়!''

—''বিশ্বাস হচ্ছে না! নিউটন একজন বৈজ্ঞানিক; ও বাজে কথা বলে না। তোমাদেরও দেশের আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যদের থেকেও তো তোমরা বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের বেশি বিশ্বাস কর। তাহলে!''

—একটু বিরক্ত হয়েই বললেন শেক্সপিয়র। ''তাছাড়া জেনে রাখ, মন ভার হলে যেমন মনের ওজন বেড়ে যায়, মড়ার চুল কাটলেও মড়ার ওজন কমে।'' বেশি তর্ক করো না, ডেঁপো ছোকরা!''

''ঠিক আছে তর্ক করবো না। এরপর হয়তো বলে বসবেন— হয় হয় জানতি পারো না; সেটাই একরকম বললেন অবশ্য। কিন্তু, আমার কাছে কেনো?''

সাহস করে ইংলিশ জেঠু বললো।

—‘‘কালিদাস বললো—তুমি নাকি ম্যাকবেথের অনুবাদ পড়ছিলে। আসলে মূল ভাষায় মূল জিনিস না পড়লে রস পাবে? যদিও এটাও কালিদাসেরই কথা, ও বলে ওর লেখার আসল রস পেতে গেলে সংস্কৃতে পড়তে হবে।”

‘‘হ্যাঁ, প্রতিটা প্যারা উপরে ইংলিশে ছিল আর তার তলায় বাংলা মানে ছিল। কিন্তু সেটাও আপনার ইংলিশ নয়। আপনার ইংলিশ পড়তে গেলে আমি ঘেমে নেয়ে, গলে যেতাম। আমি ইংলিশ বুঝি না, একদম ওই সাবজেক্টটা আমার আসে না। আপনি আমার কাটা ঘায়ে নুন দিতে এসেছেন, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। আপনি এবার আসতে পারেন।” রাগে দুঃখে ইংলিশ জেঠুর চোখ ফেটে জল এসে গেল।

‘‘সে কী দাদু! ইংলিশ জেঠু শেক্সপিয়রকেও রেয়াত করেনি।”

‘‘কী করবে? সবার অপমান আর কথার বিষে জর্জরিত ইংলিশ জেঠু সেদিন শেক্সপিয়রের উপরেই ঝাল মিটিয়েছিল।” দাদুর গলা বেশ গম্ভীর।

‘তারপর? বললাম আমি।

তারপর শেক্সপিয়র বললেন—‘‘দেখো বাছা, তোমার কষ্ট লাঘবের জন্যই আমার এখানে আসা। আমার পাঠকের প্রতি তো আমার একটা কর্তব্য আছে। আমি বর দিচ্ছি আজ থেকে ইংলিশে তুমি হয়ে উঠবে দিকপাল।”

মিলিয়ে গেলেন শেক্সপিয়র।

‘‘এটা গুল, পুরো গুল”—তীব্রভাবে বলে উঠলাম।

‘‘গুল কিনা, তোদের ইংলিশ জেঠুকে দেখে বুঝিস না?”

সে যে শেক্সপিয়রের বরপুত্র সেটা তোদের দেখেই বোঝা যায়, নইলে তোরা কী করে ইংলিশে এত ভালো!”

এরপর আর কোনো কথা চলে না। দাদু মোক্ষম চাল চেলে দিয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলাম দাদু ফের সুকুমার রায় আওড়াচ্ছে—

রোদে রাঙা ইটের পাঁজা
তার উপরে বসলো রাজা।
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।

সত্যি, দাদু খাওয়ালো বটে, কিন্তু গিললাম কি?

With Best Compliments From :

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

ADMINISTRATION OFFICE :
1A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor) Kolkata-700013
Phone : 2237 5919 / 2090 / 2822
Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779
E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com
Web-site : www.allindiatpt.com
(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)
Behala : 363, Diamond Harbour Road, 14 No. Bus Stand,
M : 8981006500

TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.
SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.
SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)

BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA

ANU
SAREES

ANUSHREE TEXTILES PVT. LTD.

14, Amratalla Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001 (W.B.)
Phone : 033-22351257, E-mail : anusaree@gmail.com

With Best Compliments from -

AHUTI DEALERS PRIVATE LIMITED

CIN - U52390WB2010PTC154516

12/1, Nellie Sengupta Sarani, Kolkata- 700 087

Ph. No. 033-2252-3520, E-mail : ahutidealers2010@yahoo com

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শাড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ৭০৪৪০৯২০০০
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ৮৪২০০৭০৯৫৯

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা -
৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ৭০৪৪০৮৮৪০৮

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

বারাসত ঃ ৫৬, কে এন সি রোড, হরিতলা, ফোন ঃ ৭০৪৪০৫০১৩৭

এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মেদিনীপুর।